ভারতের লোকনাট্য

ডঃ ধ্রুব দাস



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
অরুণ পুরকায়স্থ
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা
আষাঢ় ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তরুণ রায়ের স্মৃতির
উদ্দেশে

সূচীপত্র

নিবেদন ॥

ভারতবর্ষে প্রসেনীয়াম মঞ্চে ভারতীয় ভাষায় ভারতীয়দের দ্বারা নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত আজ থেকে দু'শো বছর আগে—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে (২৭ শে নভেম্বর ১৭৯৫, ডুমতলা, কলিকাতায়)। মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে এই নগর-নাট্য তার বিকাশের চরম পর্যায়ে পৌছায়। ফলে স্বাধীনতা-লাভের কিছু আগে ও পরে—পাঁচের দশকের শেষাবধি কয়েকজন ব্যতিক্রমী নাট্য-ব্যক্তিত্ব ব্যতিরেকে ভারতীয় সুধীজনের নাট্যচর্চা সীমাবদ্ধ থাকে এই নগর-নাট্যে। অথচ এই নাগরনাট্যের সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যময় নাট্যরীতির কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। ফলে মুখ্যতঃ স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত-বাসীর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসারে শিল্পের অন্যান্য শাখার অনুরূপে, সাম্প্রতিককালের নাট্যচর্চাকেও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার, যুগোপযোগী ভারতীয় নাট্যরীতির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখা দেয়। ছয়ের দশকে এই প্রবণতা তীব্রতর হ'য়ে ওঠে। ফলে কেবলমাত্র ঐতিহ্য-বিবিক্ত নগর-নাট্যের মাধ্যমে নাট্য-ব্যক্তিত্বের বা নাট্য-প্রতিভার বিকাশের পথ রুদ্ধ হ'য়ে পড়ে। এই পর্বের একজন শহুরে নাট্যকর্মী হওয়ায় অবদমিত, ফলে অবিকশিত ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা অন্য অসংখ্য নাট্যকর্মীর মত আমিও অনুভব করতে থাকি। অনুভব করতে থাকি এই সত্য যে, কেবলমাত্র দেশীয় নাট্যরীতির পুনরুজ্জীবনই নয়, যুগের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ নবীকরণ এবং তজ্জনিত নূতন ও পুরাতন রীতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভূত নাট্যেই এই অবদমিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। আর এই অতি আকাঙ্খের নাট্যচর্চার সাফল্য নির্ভরশীল আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনাট্যসমূহের সম্যক জ্ঞানের উপর। ফলে প্রাদেশিক লোকনাট্যের সাধারণ জ্ঞান আহরণ ও সহকর্মীদের সঙ্গে তার সুষম বণ্টন আজকের ভারতীয় ন্যাট্য কর্মীমাত্রেরই অন্যতম এক দায়।

তাছাড়া ভৌগোলিক ও ভাষাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও সংস্কৃতির এক সর্বভারতীয় রূপ সুদূর অতীতেই সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছিলো। মহান সত্য ক'রে তুলেছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্বটিকে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা আপন স্বার্থের তাগিদে এই সাংস্কৃতিক চেতনায় ফাটল ধরায় এবং পারস্পরিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে ভারতবোধের গতিশীলতার যে পথ, তাও বন্ধ করে—নানা কৌশলে। অবশ্য এই সময়েই প্রযুক্ত হ'য়েছে সর্বভারতীয় রেললাইন, সর্বভারতীয় শিক্ষা ও শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বভারতীয় এক মাধ্যম-ভাষা। কিন্তু দেশশাসনের প্রয়োজনে এগুলির যতটা ব্যবহার হ'য়েছে, ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক ঐক্য সুদৃঢ় করে তোলার ক্ষেত্রে ততটা অবশ্যই হয়নি। ফলস্বরূপে কোনো প্রদেশের অধিবাসীই জানতে পারেনি অন্যপ্রদেশের চিত্র,

সাহিত্য, নৃত্য গীত, নাট্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং মূল্যবোধের স্বরূপ ও তার বিকাশ বৈশিষ্ট্য। মুখ্যতঃ প্রশাসনিক বাধার কারণেই এই বিস্তীর্ণ পরিসরে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার যে ক্ষেত্র, সেখানে মিলিত হ'তে পারেনি ভারতবাসী। ধীরে ধীরে ফাটল ধরে যায় আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্যে। ফলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রাচীন সূত্রটিও যায় কেটে—আসলে কেটে দেয়া হয়। আর তার ফলে আমরাও একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাই আবার আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়, অনুপ্রেরণা জোগায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের। সেই আন্দোলনের ঢেউ-এ একদিন ইংরেজ গেল ভেসে। স্বাধীন হ'লাম আমরা। আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে যে প্রশাসনিক বাধা প্রায় দু'শো বছর ধরে বিরাজমান ছিল, তা দূর হ'লো। স্বাধীন ভারতবাসী হিসেবে, আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়া সেই ঐক্যসূত্রটির পুনরনুসন্ধানের যুগানুগ দায়ও আজ আমাদের ঘাড়ে ন্যস্ত।

এই উভয়বিধ দায়বোধ থেকেই এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কুমার রায় ও শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্তের সস্নেহ পরামর্শক্রমে এই 'ভারতের লোকনাট্য'-এর পরিকল্পনা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে লোকনাট্যের সঙ্গে আমার সংশ্রব আশৈশবের। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ছিলেন শৌখিন গ্রাম্যযাত্রার সংগঠক-অভিনেতা, মাতুল পেশাদারী কীর্তনীয়া এবং রামায়নী। আর পেশাদারী যাত্রার প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রী নিতাই দাস আমার নিকট জ্ঞাতি-কুটুম্ব। ফলে লোকনাট্যের ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় জন্মগত। তবুও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ার সময় বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ সস্নেহ উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের ও কার্যকরী এক পথের সন্ধান দিয়ে আমার এতদ্বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। সেই ঋণ মাথায় ক'রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের অব্যবহিত পরেই আমি তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তরুণ রায়ের তত্ত্বাবধানে "ভারতীয় লোকনাট্যের ধারা" নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করি।

গবেষণাকর্মে নিযুক্ত হ'য়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রত্যক্ষ নাট্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'য়েই আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছি, অসংখ্য লোকনাট্য আঙ্গিক প্রত্যক্ষ করেছি এবং সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছি বিভিন্ন আঙ্গিকের শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। অর্থাৎ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করতে আমি অবলীলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্রের সাহায্য নিয়েছি। বলাই বাহুল্য যে, এই দুরূহ কাজ, অর্থাৎ বহুভাষী বিশাল এই দেশের অসংখ্য লোকনাট্য আঙ্গিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান আহরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ প্রায় সম্ভবই হত না যদি

লোকনাট্যের নিজস্ব ভাষার—নাট্য ভাষার সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয় না থাকত, সময়মত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশীপ দিয়ে আমাকে সাহায্য না করতেন এবং প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও নির্দেশাদি না দিতেন আমার গবেষণা নির্দেশক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তরুণ রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

গবেষণার কাজে এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকনাট্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনে ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহে যাঁদের অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি, তাঁরা হ'লেন শ্রী বৈদ্যনাথ হালদার, শ্রী নির্মল দাস (নিরু), শ্রী উত্তম দাস, শ্রী সুধাকুমার চক্রবর্তী, শ্রী ধীরেন ঠাকুর, অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত, অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীগণেশ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, ডঃ শিশির মজুমদার, ডঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রীতামিতাভ রায়, শ্রীদীপেন মণ্ডল, শ্রীকালিদাস মুখার্জী, শ্রী শুভাশিস বসু, শ্রীরবীন ভট্টাচার্য, শ্রীমানিক বিশ্বাস, শ্রীমহেশ্বর নেওগ, শ্রীদুলাল রায়, শ্রী হেমেন দাস, শ্রীধীরেন দাস শ্রী ধীরেন পট্টনায়েক, শ্রী দোল গোবিন্দ রথ, শ্রী রাজেন্দর নাথ, মহম্মদ ইসমাইল, শ্রীদিলীপ বিশ্বাস, বন্ধু কুশাবর্তী, ডঃ অজ্ঞাত, সারোদ নাগর, মনিভাই, ভাঁড় আমকাক, গোবর্ধন পাঞ্চাল, কৈলাস পাণ্ডে, রামনারায়ণ উপাধ্যায়, ভাউ সাহব খিখড়কর, বসন্ত নিরগুণে, ডঃ শিবকুমার 'মধুর', ডঃ রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী' নেমিচন্দ্র জৈন, বিমল পাঠক, শ্রীঅভিজিৎ চ্যাটার্জী, কুমুদ মেহতা, এল. এস. সুধীন্দ্র, পি, ধনঞ্জয় রাও, এন, বাসুদেবন পিল্লাই, এ. সি. জি. রাজা, মাণোক জারোলী প্রমুখ। এঁদের সকলের এবং অন্য অসংখ্য খ্যাত, অখ্যাত নাট্যকমার কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ।

প্রকাশের সুবিধার্থে বিশাল আয়তনের এই গবেষণাপত্রটি পাঁচটি পর্বে ভাগ ক'রেছি। 'ভারতের লোকনাট্য' তারই একটি। অন্য চারটি পর্ব হ'লো—(১) প্রসঙ্গ লোকনাট্য। শতাধিক অপ্রধান তথা আঞ্চলিক লোকনাট্যের সাধারণ আলোচনা, বিভিন্ন আঙ্গিকের পারস্পরিক তুলনা, লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও লোকনাট্যের উপকরণ সমূহের আলোচনা স্থান পেয়েছে এই পর্বে। (২) ভারতীয় নাট্যকলায় মহিলা ও মহিলা লোকনাট্য। ভারতীয় লোকনাট্যের স্বতন্ত্র এবং প্রায় অনালোচিত একটি ধারা—মহিলা লোকনাট্য ও ভারতীয় নাট্যকলায় মহিলা সমাজের স্থান নির্ণয় করা হ'য়েছে এই পর্বে। (৩) ভারতের পুতুলনাট্য। ভারতীয় পুতুলনাট্যের সার্বিক আলোচনা নিয়েই এই পর্ব। (৪) ভারতীয় লোকনাট্যের ধারা। ভারতের লোকনাট্য, লোকনৃত্য ও লোকগীতির পারস্পরিক তুলনা ও সম্পর্ক নির্ণয় সহ উদ্ভব কাল থেকে অদ্যাবধি ভারতীয় লোকনাট্যের ধারা পর্যায়ক্রমে বিবৃত হ'য়েছে এই পর্বে। আশাকরি,

শীঘ্রই এই পর্ব চারটি স্বতন্ত্র চারখানি গ্রন্থের আকারে সহৃদয় পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো।

আর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্য আঙ্গিক সমূহের সাধারণ আলোচনায় সমৃদ্ধ 'ভারতের লোকনাট্য' প্রকাশিত হ'লো। স্বল্পায়তনের একখানি গ্রন্থে ভারতীয় লোকনাট্যের আপাত সম্পূর্ণ এক পরিচয় দানের আকঙ্ক্ষায় কয়েকটি অপ্রধান লোকনাট্য আঙ্গিকও স্থান পেঁ‚ছে এই গ্রন্থে, স্থান পেয়েছে ভারতীয় লোকনাট্যের সংজ্ঞা, উৎপত্তি এবং প্রগতির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পরিকল্পিত পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়তনের সীমাবদ্ধতার কারণে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী সূত্রনির্দেশ সংযোজন করা সম্ভব হ'লো না। অন্য গ্রন্থ "প্রসঙ্গ লোকনাট্য"-এ তা সংযোজিত হ'বে। গ্রন্থখানি যদি ভারতের লোকমানসিকতা ও লোকসিদ্ধ নাট্যরীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় তুলে ধরতে পারে এবং সুধীপাঠক যদি এই গ্রন্থপাঠে সামান্যতম মাত্রাতেও উপকৃত হন, তাহলেই এর সার্থকতা স্বীকৃত হবে।

গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কুমার রায় ও বিষ্ণু বসু আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রতিভাস গ্রন্থখানি প্রকাশ করায় আমি একই সঙ্গে বাংলা আকাদেমি ওপ্রতিভাসের নিকট কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ বন্ধুবর বিজেস সাহা ও শ্রদ্ধেয় অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। মূল্যবান প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে অমিয় ভট্টাচার্য এবং পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন আঙ্গিকের আসর সংস্থানের স্কেচ এঁকে দিয়ে গ্রন্থখানির সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন বন্ধুবর শ্রী অরুণ পাল, অশোক পাল ও শেখর। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণাপত্রের অন্যতম পরীক্ষক শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার ঘোষ মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আমি তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। আর স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। ফলে এই অপরিশোধ্য ঋণের পরিশোধ প্রয়াসে বিরত রইলাম।

দুঃখ থেকে গেল গ্রন্থখানি আমার পরম শ্রদ্ধেয় 'গবেষণা-নির্দেশক অধ্যাপক তরুণ রায়ের হাতে তুলে দিতে না পারায়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে সেই দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

পরিশেষে সহৃদয় পাঠকের কাছে সবিনয় নিবেদন এই যে আন্তরিক যত্ন ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মুখ্যতঃ অনভিজ্ঞতার কারণে বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেলই। আশা করি গ্রন্থখানির অন্যান্য ত্রুটির মত এই প্রমাদও মার্জনার সঙ্গেই উপেক্ষণীয় হবে।

তারিখ—২১শে অক্টোবর '৯২ বিনীত
বরানগর / কলিকাতা ধ্রুব দাস

ভূমিকা

লোকেদের দ্বারা রচিত, অভিনীত এবং লোকেদের সম্মুখে পরিবেশিত নাটককেই লোকনাট্য বলে। লোক বলতে এখানে বিশেষ অর্থে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক রাজ্যের অধিবাসী সমষ্টিগত জনগোষ্ঠীকেই বোঝায়। লোক ইংরেজী folk-এর প্রতিশব্দ। folk বলতে কতকগুলি প্রথা ও ঐতিহ্যে আবদ্ধ বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কথাই মনে হয়। সেই জনগোষ্ঠীর নাটকই হ'ল folk drama এবং তার আভিনয়িক রূপই হ'ল folk thetre। বাংলায় তাকেই বলা হয় লোকনাট্য, লোকনাট্যের অভিনয় হ'ল লোকাভিনয়। নগরপত্তনের পর নগরের সীমিত স্থানে অভিনয়ের জন্য প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা হয় এবং লোকাভিনয় যখন এই বদ্ধ গৃহে স্থানান্তরিত হ'ল তখন তা হ'য়ে উঠল কৃত্রিম আলো ও শব্দের ব্যবহারে শিল্পকলাশ্রিত অভিনয়। এই অভিনয়ের পৃষ্ঠপোষক হ'লেন রাজপরিবার ও রাজসভার বিদগ্ধ দর্শক, এবং শ্রেষ্ঠী ও বণিক শ্রেণীর ধনবান্ প্রেক্ষক। অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের নৈকট্যের ফলে অভিনেতার৷ যেমন অভিনয়ের সূক্ষ্ম ভাব ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারলেন, তেমনি অভিনেয় নাটকও লেখার মধ্যে রক্ষিত হ'য়ে স্থায়ী সাহিত্যের সামগ্রী হ'য়ে উঠল। তখন থেকেই নাটকের দুটি ভাগ হ'য়ে গেল—লোকনাট্য ও শিল্পগুণান্বিত দৃশ্য ও পাঠ্য নাটক। এই লোকনাট্য ও শিল্পসম্মত নগরনাট্যের অভিনয়ও যে দু'রকমের তা আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারি। ভ ত বলেছেন, লোকধর্মী ভবেত্বন্যা নাট্যধর্মী তথাপরা। স্বভাবো লোকধর্মী তু বিভাবো নাট্যমেব হি।'—অর্থাৎ, স্বাভাবিক অভিনয় হ'ল লোকধর্মী অভিনয়, আর স্বভাবাতিরিক্ত অভিনয় হ'ল নাট্যধর্মী অভিনয়। নেপথ্য বিধানের সাহায্যে নাট্যধর্মী অভিনয়ে অভিনেতা নিজের চেহারা ও ভাব পরিবর্তন করে অন্য ব্যক্তিত্ব ধারণ করে। নাট্যশাস্ত্রের গোড়ায় বর্ণিত হয়েছে কিভাবে উন্মুক্ত স্থানের লোকাভিনয় প্রেক্ষাগৃহের শিল্পিত অভিনয়ে রূপান্তরিত হ'ল। ভরত প্রথমে উন্মুক্ত স্থানে পুত্রদের সহায়তায় ইন্দ্রধ্বজ উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যপ্রয়োগ করেছিলেন। সেই নাটকে দেবতাদের জয় ও দৈত্যদের পরাজয় দেখানো হয়েছিল, এতে দেবতারা অবশ্য খুব আনন্দিত হলেন, কিন্তু দৈত্যরা ক্ষেপে গেল। দৈত্যরা তো অভিনয় বর্জন করল। এবং নানা বিঘ্ন ও মায়া সৃষ্টি ক'রে সূত্রধার সহ সকলকে অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলল। ইন্দ্র তাঁর দিব্যাস্ত্র দ্বারা অসুরদের জর্জরিত করলেন বটে, কিন্তু এ-ভাবে তো অভিনয় চালানো যায় না। তখন ভরতের অনুরোধে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে নাট্যগৃহ নির্মাণ করতে আদেশ করলেন। বিশ্বকর্মা যে নাট্যগৃহ নির্মাণ করলেন তার সম্মুখে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত হ'ল এবং ইন্দ্র সহ বিভিন্ন দেবতা এর অভ্যন্তর ভাগ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই নাট্যগৃহ যে দৈত্যদের অভিনয় দর্শন থেকে বঞ্চিত

করবার জন্যই নির্মিত হয়েছিল দৈত্যরা তা বুঝতে পেরে ব্রহ্মার কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। ব্রহ্মা অবশ্য তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন আমার নাট্যবেদে দেবতারা যেমন থাকবেন দৈত্যরা ও তেমনি থাকবে—'দেবতানামসুরাণাং রাজ্ঞামথ কুটুম্বিনাম্। কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে।।'—দেবতা, অসুর, রাজা ও গৃহস্থের কৃতকর্মের অনুকরণই নাটক নামে অভিহিত হবে। নাটকের মধ্যে এই উদারতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও দৈত্য ও অনার্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করবার জন্যই যে চতুর্দিক বেষ্টিত রঙ্গালয় নির্মিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। সেকারণে ভারতীয় রঙ্গালয়ে অনার্য অথবা শুদ্রদের স্থান একেবারে নিষিদ্ধ না হ'লে ও যে সঙ্কুচিত ও নিয়ন্ত্রিত ছিল তাই মনে হয়।

লোকনাট্যের উদ্ভব কিভাবে হল তা আলোচনা করা যেতে পারে। আদিম মানবগোষ্ঠী আনন্দ অথবা দুঃখের ভাব প্রকাশ করত সম্মিলিত নৃত্যের মাধ্যমে। সৃষ্টির আদিতম চারু শিল্পকলা হ'ল নৃত্য। কিন্তু নৃত্যের জন্য বাদ্যের প্রয়োজন। মানুষের দ্বারা নিহত পশুদের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকেই বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হত। চর্ম থেকে নির্মিত হ'ত চর্মবাদ্য, শৃঙ্গ থেকে বানানো হত শিঙা এবং অস্থ্র থেকে তৈরী করা হত চর্মবাদ্য। প্রথমে ভাবপ্রকাশক কতকগুলি ধ্বনি নৃত্যের সঙ্গে উচ্চারিত হত। তারপর অর্থবহ ভাষার সৃষ্টি হ'লে তার সঙ্গে সুর সংযোগ ক'রে সঙ্গীত সৃষ্টি করা হ'ল। এই নৃত্য ও সঙ্গীতই হ'ল লোকনাট্যের প্রধান উপাদান। নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে অনুকরণ-মূলক কৌতুকরসাত্মক অঙ্গভঙ্গি যুক্ত হ'ত। সব শেষে এল কথা। মাঝে মাঝে স্বল্প ভাবে। তারপর লোকনাট্যের বিবর্তনে কথা বাড়তে লাগল, কথার পাত্রপাত্রীও বাড়তে লাগল। সেই কথা যখন কাহিনীরূপে সুসংবদ্ধ হল তখনই জন্ম নিল নাটক। কিন্তু লোকনাট্যে কাহিনী এলেও সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রাধান্যই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

লোকনাট্যে মানুষের স্বভাব ও অবস্থা অনুকরণ ক'রে দর্শকদের আনন্দদানই প্রধান লক্ষ্য। এই অনুকরণই যে নাটকের প্রধান লক্ষণ তা ভরত ও অ্যারিস্টটল দু'জনেই বলেছেন। ভরত বলেছেন, 'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমে-তন্ময়া কৃতম্।' —আমার এই নাটক লোকবৃত্তের অনুকরণ। অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডি, কমেডি, মহাকাব্য, ডিথাইর‍্যাম্ব কবিতা, বীণার সঙ্গীত সবই অনুকরণের বিভিন্ন রীতি মাত্র। অনুকরণমাত্রই হ'ল কৌতুকজনক, সেজন্য এই কৌতুকজনকতাই নাটকের আদি লক্ষণ। ক্রমে ক্রমে হালকা কৌতুকজনকতা সুখদুঃখের গাঢ় অবস্থায় নাটকে রূপায়িত হয়েছে। গ্রীসে ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়েছিল এমনিভাবে,—প্রথমে ছাগসঙ্গীত, তারপর কৌতুক-রসাত্মক গ্রাম্য নাটক salyric drama, তারপর ডিথাইর‍্যাম্ব সঙ্গীত থেকে গুরুভাবযুক্ত বিষাদাত্মক ট্র্যাজেডির উদ্ভব হ'ল। কমেডির উদ্ভব হ'ল লিঙ্গসঙ্গীত

(phallic song) থেকে। লিঙ্গ-শোভাযাত্রায় নাচগান, রংতামাশাই প্রধান ছিল। সুতরাং ধর্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে সঙ্গীত, নৃত্য ও অনুকরণমূলক অঙ্গভঙ্গি ছিল সেখানে আমোদ ও কৌতুকসৃষ্টি করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের দেশে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে দেব বিগ্রহ নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যে লোকযাত্রা হ'ত তাতে গান ও কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি এবং নৃত্যের ছন্দ ব্যবহৃত হত, তা থেকেই পরে যাত্রাগানের উদ্ভব হ'ল।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের নানা অঞ্চলের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও লোকনাট্যের নানা ধারা ও রীতি প্রচলিত আছে। ভারতের লোকনাট্যের বৈচিত্র্য ও সাধারণ লক্ষণ বিচার করে দেখা যেতে পারে। বৈচিত্র্যের প্রধান লক্ষণ ভাষাগত। দশম শতাব্দী থেকে আধুনিক ভাষাগুলির উদ্ভব হল। তখন থেকে লোকনাট্যে ভাষাশ্রয়ী দিকের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিল। নৃত্যের ভাষা সকলের বোধগম্য, কিন্তু লোকনাট্যের সঙ্গীত ও সংলাপ ভাষানির্ভর। ভাষা, উপভাষা ও বিভাষা অনুযায়ী লোকনাট্যের নানা বিভিন্নতা দেখা দিল। অবশ্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার উদ্ভবের আগেও লোকনাট্যের ধারা প্রচলিত ছিল। সেই লোকনাট্যের ভাষা ছিল লোক প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা। তবে সেই প্রাকৃতও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতে প্রচলিত লোকনাট্যের ধারাই আধুনিক ভাষারূপকে আশ্রয় করে বিবর্তিত হয়েছিল। ভারতীয় লোকনাট্যের বৈচিত্র্যের আর একটি লক্ষণ হল বিভিন্ন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ লোককথা, কিংবদন্তী, লৌকিক দেবদেবীর উৎসব ধারা এবং সামাজিক প্রথা, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদির অস্তিত্ব। এগুলি সর্বব্যাপী ভারতসংস্কৃতির অন্তর্গত হ'য়েও অঞ্চলের বিশিষ্টতা অনুযায়ী কিছুটা স্বতন্ত্র।

এবার ভারতীয় লোকনাট্যের অভিন্ন লক্ষণগুলি আলোচনা করা যাক। ভারত ভূখণ্ডের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মূল অখণ্ডতাই প্রধান। এই অখণ্ডতা এসেছে ইতিহাস, কাব্য, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় দেবদেবীর সর্বজন-গৃহীত ঐতিহ্যধারা থেকে। বিভিন্ন অঞ্চলে লৌকিক দেবদেবীর পূজা-উৎসব প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অনার্য সমাজের সেই সব দেবদেবী ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে, কোথাও শিবের সঙ্গে, কোথাও কৃষ্ণের সঙ্গে, কোথাও বা শক্তির সঙ্গে। পূজা পদ্ধতিও ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত মন্ত্র এবং হিন্দুর পূজার অন্যান্য উপকরণ এবং মাঙ্গলিক ক্রিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক সাধারণ রূপ লাভ করে চলেছে। আরণ্যক জাতি ও উপজাতির ভাষা যেমন ভাবে আর্যীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাদের নৃত্য, গীত ও নাটকও ক্রমে ক্রমে আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা হারিয়ে সর্বভারতীয়তার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হ'য়ে পড়ছে। যে-কোনো অঞ্চলে রাম, কৃষ্ণ, শিব ও শক্তির কোনো বিশেষ কাহিনী অবলম্বনে নৃত্য, গীত ও নাটকের উদ্ভব হয়েছে। ভারতীয় লোকনাট্যের মধ্যে

সর্বত্র নৃত্য, গীত ও স্বল্প সংলাপের ব্যবহার হয়। নিম্নবিত্ত কৃষক, দিনমজুর ও গ্রামের বেকার যুবক এই লোকনাট্যে অংশগ্রহণ করে। কোথাও পুরুষরাই স্ত্রীভূমিকায় অংশগ্রহণ করে যেমন ভাওয়াই। আবার কোথাও মেয়েরাই স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করে যেমন নৌটঙ্কী। বাংলাদেশে মেয়েদের পরিচালনায় অনেক ঝুমুরের দল ছিল। বহু মেয়েলি যাত্রার দল ছিল। ভারতের লোকনাট্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণ সকলকে আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু নিজেরা চিরবঞ্চিত, চিরদারিদ্রই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের ছৌনাচের শিল্পীদের কথা বলা যেতে পারে। তারা বিত্তহীন, ভাগ্যহীন অপরিপুষ্ট কৃষক, কিন্তু তারা যে লোকনাট্যে অংশগ্রহণ করে তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি উত্তেজক। ভারতীয় লোকনাট্যের আর একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে, তা কৃষিকর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কৃষির কল্যাণে এবং ফসলবৃদ্ধির কামনায় লোকোৎসব ও লোকনাট্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধান কাটার পরে ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব চলতে থাকে, তারই অঙ্গরূপে লোকনাট্যের অভিনয় হয়। গ্রীসে ডায়োনিসাস যেমন কৃষিদেবতা, ভারতে শিব তেমনি কৃষির অধিদেবতা।

ভারতের লোকনাট্য নিয়ে প্রশংসনীয় গবেষণা করেছেন ডঃ ধ্রুব দাস। এই গবেষণা-কর্মের জন্য তিনি পি-এইচ ডি. উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এই গবেষণা-নিবন্ধের অন্যতম পরীক্ষক রূপে আমি এর উৎকর্ষ উপলব্ধি করেছিলাম এবং ডঃ দাসকে পরে এটি প্রকাশ করবার কথা বলেছিলাম। আনন্দের বিষয়, গবেষণা-নিবন্ধটি এতদিন পরে প্রকাশিত হল। তবে সেই বৃহৎ গ্রন্থটির একটি অংশ মাত্র প্রকাশ করা হ'ল। বাকি অংশগুলি হয়তো পর পর প্রকাশিত হবে, এই আশা করি। ডঃ দাস ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোকনাট্য নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি লোকনাট্যের নাট্যরূপ এবং প্রয়োগ ও অভিনয় সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এ-কাজের বিপুলতা ও বহুবিস্তৃতি বিস্ময়জনক। পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য না বলে বঙ্গের লোকনাট্য বললে বোধহয় ভালো হত। তার কারণ, একই লোকনাট্যের ধারা উভয় বঙ্গে প্রচলিত রয়েছে। রাজনৈতিক বিভাগ সত্ত্বেও একই ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত উভয় বঙ্গের লোকনাট্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যসূত্র বর্তমান। বাংলার লোকনাট্যের মধ্যে শুধু আলকাপ ও গম্ভীরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাত্রা, ছৌনাচ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ-গ্রন্থে থাকা প্রয়োজন। লোকনাট্য সম্পর্কে এ-গ্রন্থ একটি প্রামাণ্য সংযোজন রূপে স্বীকৃত হবে। এ বিশ্বাস আমার আছে।

এ-ই ৫১০
সল্টলেক
কলিকাতা—৭০০ ০৬৪

অজিতকুমার ঘোষ

ভারতের লোকনাট্য ঃ
সংজ্ঞা, উৎপত্তি এবং প্রগতি



ভারতের লোকনাট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই লোকনাট্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। কেননা অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষমুক্ত এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ও যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা ব্যতিরেকে ভারতীয় লোকনাট্যের স্বরূপ সন্ধান অসম্ভব।

□ সংজ্ঞা ঃ

লোকনাট্য লোক ও নাট্য এই দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। তাই লোকনাট্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার আগে লোক ও নাট্য—এই শব্দ দু'টির অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক। বলাই বাহুল্য যে লোক সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহে 'লোক' শব্দের যে অর্থ নিরূপিত হ'য়েছে তা 'The Encyclopoedia Britanica (VoL—IX—Lond, 1929)-য় প্রদত্ত ইংরেজি 'FLOK' শব্দের অর্থ ও অর্থানুষঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রভাবের পশ্চাতে 'লোক' ও 'FOLK'—এই শব্দদু'টির ধ্বনিসাম্য খুবই ক্রিয়াশীল নিঃসন্দেহে। তবে 'লোক' একটি সংস্কৃত শব্দ এবং ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে 'লোক' শব্দের প্রয়োগ থাকায় ভারতীয় রীতিতে ব্যুৎপত্তিগত ভাবে নির্ণনীত এর অর্থই অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ফলে যুক্তিগ্রাহ্য এবং এই আলোচনার উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক।

লোক একটি সংস্কৃত শব্দ। এর ব্যুৎপত্তি 'লোক' (বা দর্শন) ধাতু থেকে। অর্থাৎ লোকের ধাতুগত অর্থ হ'লো দর্শনক্ষম ব্যক্তি। অবশ্য সংস্কৃত অভিধান থেকে পাই—"লোকস্তু ভুবনে জনে"। অর্থাৎ সংস্কৃত অভিধানে লোক শব্দ

দ্বারা মানুষ এবং পৃথিবী দুইকেই বোঝানো হ'য়েছে। আবার ঐতরেয়—উপনিষদে বলা হয়েছে 'স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমপশ্যত্। ইদ দর্শমিতি।' অর্থাৎ লোকের মৌলিক উপাদান হ'লো ইন্দ্রিয়। আর ইন্দ্রিয় হ'লো প্রকৃতিকে দর্শন এবং উপভোগ করার মাধ্যম। অর্থাৎ লোক হ'লো সেই মানুষ যে প্রকৃতিকে ভালোভাবে দর্শন এবং উপভোগ করে। প্রতিমুহূর্তের এই দর্শন মানুষের জীবনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব সংস্কারের জন্ম দেয়। আর এই সব সংস্কারই মানুষের দার্শনিক, ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক চিন্তাধারা এবং এতদ্বিষয়ক তাবৎ সামাজিক সংস্কার মূলাধার। সুতরাং কোনো সমাজ বা দেশের মানুষ বর্তমান কালাবধি ধর্ম, দর্শন, সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে যা কিছু চিন্তা করে বা ক'রে এসেছে, তার আধার হ'লো লোক। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে লোকের অর্থ বা অর্থানুষঙ্গ হ'লো—মনুষ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন হেতু অর্জিত জ্ঞান।

মানুষের সমাজ ব্যক্তিমানুষেরই সমষ্টিগত এক একক বিশেষ। ফলে ব্যক্তির মত সমাজেরও আছে চেতন ও অবচেতন মন। এই চেতন মনের প্রকাশ হ'লো সাহিত্য আর অবচেতন মন হ'লো লোক। মহাভারত এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসে লোক এবং সাহিত্যের (বা শাস্ত্রের) অনুরূপ সম্পর্কের সমর্থন পাওয়া যায়। ভারতে লোক ও বেদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণাও অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়মাধ্যমে প্রত্যক্ষ-দর্শন হেতু লোকের সংস্কার সাহিত্যকে প্রভাবিত করে সেইভাবেই যেভাবে ব্যক্তির চেতন মনকে প্রভাবিত ও চালিত করে তার অবচেতন মন। ফলে লোকান্তরগত সূক্ষ্ম অথচ প্রভাবশালী অংশই শাস্ত্র-সম্মত সাহিত্যে প্রকাশলাভ করে। তবে লোকচেতনার খুব সামান্য অংশই প্রকাশ পায় সাহিত্যে বা শাস্ত্রসম্মত আঙ্গিক সমূহে। অর্থাৎ লোক যদি সাগর হয় তো শাস্ত্র বা সাহিত্য হ'লো সেই সাগরতীরের কয়েকটি ঢেউ মাত্র।

'লোকে বেদে চ'—এই সূত্রে নিহিত ভারতের জনজীবন। বেদ ভারতীয় সমাজের সমস্ত ব্যক্ত চেতনার মূলাধার আর লোক হ'লো তার অব্যক্ত চেতনার সমাহার—যা কিনা প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে উপজাত। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য লোক হ'লো নগর ও গ্রামের অধিবাসী যারা আহার-আচার, ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কারগত ভাবে দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বা প্রতীক এবং 'নাট্য' হ'লো পুরুষবাচক একটি সংস্কৃত শব্দ আর এর অর্থ হ'লো—নাচ, গান, বাজনা সংলাপ, অভিনয়, অভিনেতা, সাজপোষাক এবং দর্শকের সমন্বয়। অর্থাৎ লোকনাট্য হ'লো—সমাজের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ দর্শন-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চালিত নাট্য। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে লোকনাট্য হ'লো লোকধর্মী আচরণের বা সংস্কারের এমন এক নাট্যরূপ যা তার আপনক্ষেত্রের

জনমানসকে আনন্দিত, উল্লসিত এবং অনুপ্রাণিত করে। নাট্যশাস্ত্রের গভীর অধ্যয়ন থেকেও আমরা লোকনাট্যের অনুরূপ এক সংজ্ঞার সন্ধান পাই। নাট্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে শাস্ত্রকার ভরত বলেছেন "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্"—অর্থাৎ নাট্য হ'লো লোকবৃত্ত অর্থাৎ জনসাধারণের আচরণ অথবা বৃত্তান্তের অনুকরণ। এখানে লোকবৃত্ত কেবলমাত্র কোনো জাতি বিশেষের লৌকিক আচার এবং জনসাধারণের রীতিনীতিই নয়, বরং তা হ'লো সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসও ঐতিহ্য, ধর্মাচরণ এবং কর্মকাণ্ড, মনোভাব এবং অবধারণা জাদু ও মন্ত্র এবং ইতিহাস—সমস্ত কিছুই। অর্থাৎ লোকবৃত্ত হ'লো কোনো একটা যুগ বা বিশেষ কোনো জাতির সম্পূর্ণ লোকধর্ম। আর এই লোকধর্মের আধার হ'লো লোকমানস। লোকমানসের নিজস্ব একটি চরিত্র আছে, আছে নিজস্ব এক গতি। যে নাট্যে লোকমানসের এই গতিশীল চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটে তাকেই বলা হয় লোকধর্মী নাট্য। আর এর বিপরীতে বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে, নাট্যধর্মী নাট্যে।

আমরা জানি যে ধর্মিগতভাবে ভরত নাট্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে লোকধর্মী নাট্যের সীমাহীন বিস্তৃতির জন্যে নাট্যধর্মী নাট্যের অনুরূপে তিনি লোকধর্মী নাট্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করেন নি। উপরন্তু নাট্যধর্মী নাট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে অভিনেতাদের এমন নির্দেশও দিয়েছেন যে নাট্যধর্মী রীতি যেখানে রসের সিদ্ধিতে অনুপযোগী কিংবা অপর্যাপ্ত সেখানে নট লোকধর্মী রীতিকেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ ক'রে তার প্রয়োগ করতে পারে বা তার অনুসরণ করতে পারে। তবে সে সময়ে তাকে মনে রাখতে হবে যে লোকধর্মী রীতি কোনো শাস্ত্রের অনুশাসন মানে না। কেননা স্বচ্ছন্দ লোকজীবনের মত তার গতি স্রোতস্বিনীর মত অপ্রতিহত এবং ঝর্ণার মতই উন্মুক্ত এবং পবিত্র। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রকারের মতে লোকধর্মী হ'লো স্বভাব বা বস্তুর লোকপ্রত্যক্ষ স্বাভাবিক রূপ, আর নাট্যধর্মী হ'লো সেই স্বভাবেরই বিভাব। অর্থাৎ নাট্যধর্মী লোকধর্মী থেকে ভিন্ন কোনো রীতি নয় বরং তা হ'লো—প্রাতিভ দৃষ্টিতে দেখা লোকধর্মীরই উন্মীলিত রূপ।

যাইহোক, লোক ধর্মী স্বভাব আবার দুই প্রকারের—শুদ্ধ এবং বিকৃত। শুদ্ধ স্বভাবের প্রকাশ ঘটে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে। আর এই শুদ্ধ স্বভাবই কালক্রমে কৃত্রিম হ'য়ে বিকৃত হ'য়ে পড়ে। অর্থাৎ শুদ্ধস্বভাবী লোকধর্মী নাট্যে লোকবৃত্ত অথবা লোকক্রিয়ার যথাযথ সমাবেশ ঘটে আর অঙ্গলীলা ও অঙ্গহারাদির অভাবহেতু বিকৃত স্বভাবী লোকধর্মী নাট্যের অভিনয়ে কৃত্রিমতা দেখা দেয়। আর লোকধর্মী নাট্যপ্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন—

স্বভাবাভিনয়োপেতং নানাস্ত্রীপুরুষাশ্রয়ম্।
যদিদৃশং ভবেন্নাট্যং লোকধর্মী তু সা স্মৃতা॥—লোকনাট্য

হ'লো স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক অভিনয়ে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ ভরত লোকনাট্যের বা লোকধর্মী নাট্যের যে দু'টি স্বভাবের ওপর জোর দিয়েছেন, তা হ'লো—(১) অভিনয়ে স্ত্রী এবং পুরুষের যোগদান এবং (২) স্বাভাবিক অভিনয়, যাতে লোকক্রিয়া বা লোকবার্তার যথাযথ সন্নিবেশ ঘটে। ভরত দ্বারা নির্ধারিত লোকনাট্যের এই সংজ্ঞা খুবই বিশদ, ফলে আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একে মেনে নিতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়।

উৎপত্তি □

নাটকের মৌলিক উপাদান হ'লো—নাচ, গান (বা সংলাপ) এবং অভিনয়। পৃথিবীতে মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে (মানুষের জীবনে) গানের উদ্ভব ঘটেছে সবচেয়ে আগে। তবে এই আদিম গান স্বরালাপী বা শব্দালাপী ছিল না। এই গানের সঙ্গে বা গানের উদ্ভবের অব্যবহিত পরে উদ্ভব হয়েছে নাচের। আর ওসবের বিকাশে ক্রিকাশীল ছিল তাল-লয় সমন্বিত প্রাকৃতিক ধ্বনি। যাইহোক, নাচের পরেই এসেছে চিত্রকলা। প্রাচীন গুহাগাত্রে এমন অনেক চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায়, মানুষ দলগতভাবে নৃত্য করছে এবং তার সঙ্গে গানও গাইছে। এইরূপ আদিম গুহাচিত্রের সন্ধান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের চনাইমানের একক নারীনৃত্য, দ্বৈতনৃত্য ও পালতোলা নৌকায় বাদ্যযন্ত্রসহ দলগত নৃত্যগীতির চিত্র এবং পাঁচমুখী পাহাড়ের দলগত নৃত্য বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বলাই বাহুল্য যে, এই নাচ, গান ও চিত্রকলার উদ্ভবের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্ম মনোভাব এবং তার অস্মিতার প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টা।

আর এই নৃত্যগীত, বাদ্য ও চিত্রের উদ্ভব হয়েছিল বন্যযুগে, জংলী মানুষের হাতে। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ প্রতিহত ক'রে, ভোজ্য পশু সংহার ক'রে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেরণায় সেই জংলী মানুষ নৃত্য করেছে, তার তাল লয় সঙ্গত করেছে—সঙ্গে কখনো বা একান্তে আপন মনে আবার কখনো বা দলগতভাবে তারস্বরে গান করেছে। কিন্তু এই যুগে মানুষ আগুনের ব্যবহার শেখেনি, ফলে তার জীবিকা যেমন নিশ্চিত হয় নি, তেমনি পর্যাপ্ত মাত্রায় বিকশিত হ'য়ে ওঠেনি তার দ্বিতীয় নার্ভতন্ত্র বা বাগযন্ত্র। পেটের তাগাদায়, ভোজ্যপশুর অনুসন্ধানে, হিংস্র পশু ও ক্ষুধার্ত মানুষের তাড়নায় (ক্ষুধার্ত মানুষ অন্য আহার্যের সন্ধান করতে না পারলে মানুষ খেত) এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির অকস্মাৎ আক্রমণে তাকে নিরন্তর ঘুরে বেড়াতে হ'য়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে, এক বন থেকে অন্য বনে। নাট্যের

জন্যে অপেক্ষিত সুস্থির ও সুস্থ সামাজিক জীবন আগুনের আবিষ্কার ও তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের আগে ছিল তাই একেবারেই অসম্ভব।

বনে জঙ্গলে ছুটতে ছুটতে মানুষ একদিন আবিষ্কার করলো আগুন। মানুষী-শক্তি সে আগুনকে বশ মানালো। মৃত পশুকে আগুনে পুড়িয়ে আহার্যের উন্নতি ঘটালো, মশাল জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করলো, হিংস্র জন্তু এবং ক্ষুধার্ত কিন্তু আগুনহীন মানুষের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো। বাঁচলো শীতের হাত থেকেও। এছাড়া ইতিমধ্যে যে পশুপালন সে আরম্ভ করেছে, সেই পালিত পশুর মাংস এবং দুধ এই আগুনে জ্বালিয়ে সুস্বাদু খাবার তৈরী করলো। আরম্ভ করলো খাওয়ার জন্য মাটির পাত্র তৈরীর কৌশলও। আগুন ও পশুপালন আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে জংলী মানুষের জীবনে এলো বিপ্লব, এলো সুখ-সমৃদ্ধি। বনে বনে তার অবিশ্রান্ত দৌড়-দৌড়ের অনিশ্চিত জীবনের এখানেই ঘটলো ইতি। ফলে বিশ্রাম পেল মানুষ, বিশ্রাম নিতে সে বাধ্য হ'লো—কেননা তখন জীবিকার প্রধান উপকরণ যে আগুন ও পশু, তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এর রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হ'লো। শেষ হ'লো জংলী জীবনের। আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'লো মানুষের যূথবদ্ধ সামাজিক জীবনের ইতিহাস। সমাজশাস্ত্রীদের মতে এটি বর্বর যুগ।

এই যুগে ইওরোপের মত আমাদের দেশেও যূথবদ্ধ মানুষ আগুন, পালিত পশু এবং পশুজাত দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাথরের ঘেরা (বা আড়াল বা বেড়া) দিয়েছে। আমাদের দেশে এই ঘেরাকে বলা হয়েছে অশ্মব্রজ। প্রথম দিকে এই অশ্মব্রজের আকার ছিল খুবই ছোটো। কিন্তু কালক্রমে গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অশ্মব্রজ বেশ বড় আকার ধারন করে। তখন অশ্মব্রজ হ'য়ে ওঠে ১০৮ ফুট দীর্ঘ এবং ৭২ ফুট (থেকে ৯০ ফুট) প্রশস্ত এক আয়তকার ক্ষেত্র। এই অশ্মব্রজের ভেতরে সমিধ নামক এক অতি দাহ্য কাঠ জালিয়ে তা আরেকটি ৭৮ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৬ ফুট প্রশস্ত কাঠের বেড়ার মধ্যে সংরক্ষণ করা হ'ত। আর এই আগুন যাতে কোনো রকমেই বিনষ্ট না হয় তার জন্যে সেই যূথবদ্ধ মানুষ সদা সতর্ক থাকত। সমিধ প্রজ্বলিত এই ঘেরা এলাকাটি ঐ গোষ্ঠীর যৌথ রান্নাঘরেরও কাজ করত। এই অশ্মব্রজের ভেতরে একপাশে থাকত একটি মাচা আর অন্যপাশে থাকত একটি ঘর। মাচার উপর রাখা হ'ত ঘাসজাতীয় সোমলতা, সোমলতা থেকে রস বের করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং সোমরস পানের উপযুক্ত মৃৎপাত্র 'গ্রাহ'। আর ঘরটিতে থাকত দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং তৈরী করা বা আহৃত অন্যান্য ভোজ্যাদি। এই আগুনের চারপাশে বসানো হ'ত মাটির পিঁড়ি (স্থায়ী রূপে)। একে বলা হত চত্বল। এই চত্বল সমূহের উপর কুশ বিছিয়ে গোষ্ঠী-

সদস্যরা সকলে আসন গ্রহণ করত। অশ্মব্রজের মধ্যে সংরক্ষিত আগুন ও খাবারের চারদিকে চত্বর বিছানো এই সামগ্রিক ক্ষেত্রটিকে বলা হত মহাবেদী।

এক্ষণে মহাবেদীর যে চিত্র পাওয়া গেল, তা থেকেই স্পষ্টরূপেই বোঝা যায় যে মহাবেদী ছিল রঙ্গক্রিয়া সম্পাদন ও দর্শনের এক উপযুক্ত ক্ষেত্র। সূর্য উঠতেই সমষ্টিগতভাবে সোমরস পান ক'রে অশ্মব্রজের সকলেই নিযুক্ত হ'ত দৈনন্দিন কাজে। হোতা তাদের নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব অর্পণ করত। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই নিযুক্ত হ'ত নিজস্কন্ধে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে বা 'যজ্ঞে'। আর এই দলগত কাজ যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখত ব্রহ্মা। কাজের পর দিনশেষে সকলেই জড়ো হ'ত বা ফিরে আসত অশ্মব্রজে। তখন গোষ্ঠীর রান্নাঘরে তৈরী হ'ত খাবার আর চত্বরে বসত সোমরসের আসর। খাবার তৈরী করতে করতে আগুনের যুগান্তকারী ক্ষমতায় বিস্মিত মানুষ আগুনের উদ্দেশে তাদের গোষ্ঠীর শ্রদ্ধা জানাত উদ্‌গাতার পরিচালনায় নাচ-গানের মধ্য দিয়ে। ঋগ্বেদে অগ্নিকেই ব্রহ্মারূপে উল্লেখ করায় সেই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এইরূপে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের পর আহার গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হ'ত নিত্যকার 'হবন'।

দিনশেষের এই মিলন মুহূর্তে চত্বরে বসে তারা অতীতের স্মৃতিচারণ করত, বিনিময় করত দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা - গল্পগুজব (সংলাপ) এবং অঙ্গভঙ্গির (মূকাভিনয়ের) সাহায্যে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে বন্যমানুষ নৃত্য ও গান (শব্দালাপী নয়) করেছে কখনো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে, আবার কখনো বা জীবিকার প্রত্যক্ষ উপকরণ হিসেবে। আর অগ্নিসহায় মানুষ নৃত্য ও শব্দালাপী (বাগযন্ত্রের উন্নতি ঘটায়) গান করেছে প্রকৃতিকে জয় ক'রে অতীতের স্মৃতিচারণায় এবং অগ্নির উদ্দেশে আত্মনিবেদনাত্মক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্বেল আনন্দে। আর এই সময়েই নাচ-গানের সঙ্গে এসে মিশেছে সংলাপ বা গল্পগুজব - যা আমাদের ভারতীয় নাট্যের আদিরূপ। বলাই বাহুল্য যে এই নাটক ছিল শুদ্ধস্বভাবী লোকধর্মী নাট্য বা লোকনাট্য। সুতরাং নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে মহাবেদী—যেখানে অগ্নিকে ঘিরে গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের জীবিকার, জীবিকার্জনের অভিজ্ঞতার ও (আপেক্ষিক ভাবে) নিশ্চিততর জীবনের আনন্দ প্রকাশের নাট্যরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল—ভারতের আদি রঙ্গমঞ্চ।

উৎপত্তি মুহূর্তে শুদ্ধ-স্বভাবী লোকধর্মী ভারতীয় নাট্যে যে অতীতের স্মৃতিচারণা, বর্তমানের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্যে প্রধান জীবিকা-উপকরণের কাছে সকৃতজ্ঞ আত্মনিবেদন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সব দেশের, সব সময়ের—এমন কি আমাদের দেশের পরবর্তীকালের নাটকেও তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মেলে। আর এই কারণেই নাটক ত্রিলোকের

প্রতীক বা সমাজদর্পণ নামে অভিহিত। যুগে যুগে তাই এর রূপ-পরিবর্তন ঘটে।

অগ্নিকে ঘিরে এই যে যৌথ সমাজব্যবস্থা, বৈভবের নিরবচ্ছিন্নতার বা অবিযুক্ততার অনাবিল আনন্দের এই যে জীবন—এ থেকেই জন্ম নিল বৈদিক সংস্কৃতি—তার মূল্যবোধ বা দর্শন এবং অন্য যা কিছু মানস সম্পদ। এরপর গোষ্ঠীজীবনের সংকীর্ণতার অর্থাৎ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার নিম্নমানের দরুণ দেখা দিল অসন্তোষ। কাজে কাজেই ভেঙে যেতে থাকলো গোষ্ঠী, অচিরেই তাই গড়ে উঠলো অসংখ্য গোষ্ঠী। কিন্তু উৎপাদনী ব্যবস্থার বিস্তৃতি না ঘটায় গোষ্ঠী জীবনের অসন্তোষ রয়েই গেল। ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বাধলো দ্বন্দ্ব। বলাই বাহুল্য যে, এই দ্বন্দ্ব ছিল গোষ্ঠী-সমূহের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষারই নামান্তর। 'দেবাসুর সংগ্রাম' তারই সাক্ষ্য বহন করে। আর এই সময়েই আরম্ভ হলো কৃষি সভ্যতা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার যুগ। সে অসন্তোষ, সে দ্বন্দ্বের চিত্র আমাদের কাব্যপুরাণাদিতে স্পষ্ট।

এদিকে কৃষি সভ্যতায় গুরুত্ব পেল ঋতু। কেননা ঋতুচক্রই নিয়ন্ত্রিত করে কৃষিকে। আর ঋতুচক্র আবর্তিত হয় সূর্যের আবর্তনে। তবে জীবিকায় আগুনের গুরুত্ব কিন্তু কমলো না আদৌ। তাই এবার একই সঙ্গে অগ্নি ও সূর্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালো কৃষক আর্য। আর অশ্বত্থ ছেড়ে নাট্যানুষ্ঠানও কেন্দ্রীভূত হ'লো কুমারোৎসব (গণেশ আরতি), কার্তিকোৎসব এবং শত্রুজয় স্মরণ ক'রে বিভিন্ন সব বিজয়োৎসবে। রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন উৎসবে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হ'তে থাকায় নাটক ক্রমেই বিকৃত স্বভাবী হ'য়ে উঠতে থাকে। বলাই বাহুল্য যে, এইসব উৎসবও ছিল জীবিকার প্রধান উপকরণের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং অতীতের স্মৃতিচারণারই দ্যোতক।

আর ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি, গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্ন সব গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই সংঘটিত হতে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমে গেল গোষ্ঠীর আধিপত্য। আর বেড়ে গেল একক ব্যক্তির প্রাধান্য। সমাজে দেখা দিল বীরনায়ক—সৃষ্টি হলো রাজতন্ত্র, আর সঙ্গে এলো তার সৌন্দর্যবোধ। ফলে দলগত নায়ক সমৃদ্ধ প্রাচীন নাট্যধারা থেকে তাই জন্ম নিতে থাকলো একক নায়কপ্রধান উৎকৃষ্ট নাটক সমূহ। আর রাজন্য সংস্কৃতির প্রভাবে সে নায়ক হলেন নরশ্রেষ্ঠ নৃপতি। শৌর্যে-বীর্যে তিনি অনুপম, চর্ব্য-চোষ্য ও অন্যান্য সমস্ত ভোগ্য দ্রব্যাদিতে তাঁর প্রথম অধিকার। ব্যক্তিগত মালিকানার যুগে যুদ্ধবিগ্রহাদি যেমন নায়করূপী রাজার আবির্ভাবকে অনিবার্য ক'রে তুলেছিল, তেমনি অনিবার্যভাবে নারীও হ'য়ে পড়েছিল ভোগ্যপণ্য-স্বরূপ। ফলে সর-ঘি-নবনীতে অধিকার রইল না যাদের তারা যেমন মেনে নিতে

পারল না এই সভ্যতা, তেমনি আবার সম্ভবও হলো না ফেলে আসা সেই অশ্মব্রজের জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আনন্দমুখর সে যৌথজীবন রাজানুগতদের সুখস্মৃতি হয়েই টিকে রইলো তাদের মনের গভীরে। সুযোগমত তা অবশ্য প্রকাশ পেত তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সব ক্রিয়াকর্মে, নাট্যানুষ্ঠানে ও অনুরূপ সব আনন্দানুষ্ঠানে। প্রজাপালক রাম-যুধিষ্ঠিরের যুগেও এই অসন্তোষ তাই ডুকরে কেঁদেছিল। শম্বুক একলব্য সেই অসন্তোষেরই স্মৃতিরেশ নিঃসন্দেহে।

এদিকে রাজতন্ত্র দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল—সম্মুখপানে, কালের অনিবার্য গতিতে। উদ্ভূত রাজন্য-সংস্কৃতি এই ক্রন্দনের টুঁটি চেপে ধরতে এবং আপন স্বাধিত্ব রক্ষার তাগিদে সৃষ্টি করলো সব নিয়মতন্ত্র। কাজে কাজেই লেখা হলো পানিনির ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মনুর সংহিতা। আর নাটকের ব্যাকরণ লেখার জন্যে ডাক পড়লো ভরতের, নাট্যকর্মের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ যোগ। ইতিমধ্যে জনজীবনে প্রচলিত নাটকে পর্যাপ্ত মাত্রায় দেখা দিয়েছে বিকৃত-স্বভাবী লোকধর্মিতা—যা উৎকৃষ্ট মানের নাট্যধর্মী নাট্যের রূপ ধারণে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ফলে ভরত সে ডাকে সাড়া দিলেন। জীবন ও জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে উদ্ভূত এই শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে জীবন ও জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন রাজন্য সংস্কৃতির প্রচার-মাধ্যম হিসেবে প্রযোজ্য নাট্যধর্মী নাটকের এক অনুপম ব্যাকরণ তিনি রচনা করলেন—নাম দিলেন নাট্যশাস্ত্র।

ভরতের এই নাট্যশাস্ত্রে ভারতে নাট্যোৎপত্তির এমন এক বর্ণনা পাওয়া যায়, যা আপাত বিরোধী মনে হলেও পূর্বে বর্ণিত নাট্যোৎপত্তির ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাট্যশাস্ত্রের একেবারে শুরুতেই নাট্যশাস্ত্রকার জানালেন যে নাটকের স্রষ্টা হলেন ব্রহ্মা। চতুর্বেদ থেকে উপকরণ, অর্থাৎ—ঋগ্বেদ থেকে সংলাপ, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ থেকে রস সংগ্রহ করে তিনি সৃষ্টি করলেন নাট্যবেদ। কিন্তু দেবতারা নাট্য-প্রচারে অসামর্থ্য প্রকাশ করায় ব্রহ্মা দেবতাদেরই পরামর্শক্রমে স্বয়ং ভরতকে এর প্রয়োগের ভার দিলেন। ভরত তখন তাঁর শতপুত্রের যে যে কাজের যোগ্য তাকে সেই কাজের দায়িত্ব অর্পণ ক'রে সুষ্ঠুভাবে নাট্যের প্রয়োগ করলেন। পরে শিব এবং পার্বতীর কাছে তালিম নিয়ে তিনি মর্ত্য-ভূমিতে এর প্রচার-প্রসার ঘটালেন।

আমরা আগেই দেখেছি যে অশ্মব্রজের যজ্ঞকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে ঋগ্বৈদিক আর্যের মানস-সম্পদ। কিন্তু যজ্ঞ কি? আপাত দৃষ্টিতে অবশ্যই একটি শব্দ। বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে এটি কিন্তু কয়েকটি বাক্যাংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাক্য। আর সে বাক্যাংশগুলি হ'লো 'য', '-জ' এবং

'ন'। আরেকটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—'য' হ'লো একত্রিত হওয়া, বর্গীয় 'জ' হ'লো একত্রে উৎপাদন করা আর 'ন' (বা উর) হ'লো ধাতুর প্রথম পুরুষ (third person) বহুবচনে (plural number-এ) ব্যবহৃত প্রত্যয়। অর্থাৎ যজ্ঞ হ'লো—তারা একসঙ্গে বসবাস (বা গমন) এবং উৎপাদন করে। কি উৎপাদন করে ? না, জীবিকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সন্তানাদি। যাইহোক, সব মিলিয়ে যা দাঁড়ালো তা হ'লো—যজ্ঞ একটি সংজ্ঞা এবং এর অর্থ হ'লো—সমষ্টিগত ভাবে বসবাস এবং উৎপাদনের প্রণালী। আবার বিশেষ কোনো উৎপাদনী প্রণালীতে বিশেষ এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে অশ্বব্রজের যজ্ঞকে ঘিরেও গড়ে উঠেছিল বিশেষ এক সমাজ ব্যবস্থা—যা বৈদিক আর্যের সমস্ত কিছুর মূল এবং যা থেকে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি তাই হ'লো ব্রহ্ম—অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত অশ্বব্রজের অগ্নিকেন্দ্রিক মহাবেদীর যে সমাজব্যবস্থা তাই। আর এই 'যজ্ঞ' ও ব্রহ্মের যে জ্ঞান তাই-ই হ'লো বেদ। যজুর্বেদের ব্যুৎপত্তিগত (যজুর—য+জ+উর) অর্থও এই অর্থানুসন্ধানের সমর্থক। সুতরাং ভরত যখন বলেন যে ব্রহ্মা চতুর্বেদ থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নাটক রচনা করেছিলেন, তখন তিনি এই সত্য প্রকাশ করেন যে, অশ্বব্রজের মহাবেদীর যজ্ঞে নাটকের সমস্ত উপকরণ মজুত ছিল। আর শিবের কাছে তালিম নেয়ার দু'টি অর্থ হয়। এই অর্থ দু'টিও আমাদের পূর্বের আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ। অর্থ দু'টি হ'লো পশুপালন ভিত্তিক অশ্বব্রজে নাটকের বীজ উপ্ত হ'লেও তা অঙ্কুরিত এবং বিকশিত হ'য়ে ওঠার জন্যে—(১) কৃষি সভ্যতার প্রয়োজন ছিল। (শিব কৃষি সভ্যতা এবং সূর্যেরও প্রতীক) আর (২) প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার অভিজ্ঞতার, জ্ঞানের এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদানের (সংস্কৃতি বিনিময়ের)। শিব অনার্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতিরও প্রতীক, ফলে ভরত যখন বলেন যে তিনি শিবের নির্দেশে তণ্ডুর কাছে নাট্যের তালিম নিয়েছিলেন তখন তিনি এই সত্য প্রকাশ করেন যে অশ্বব্রজের নিশ্চিত জীবন থেকেও নিশ্চিততর কৃষিসভ্যতায় (এবং) বিভিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যশিল্প সুঠামো রূপ লাভ করেছিল। আর তখনই নাটক মহাবেদী ছেড়ে কুমারোৎসবে কিংবা অন্যকোনো বিজয়োৎসবে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আর ব্রহ্মার আদেশে ভরত কর্তৃক তাঁর শতপুত্র সহ মর্ত্যে নাট্যপ্রচারের অর্থ দাঁড়ায়—(১) যৌথ-সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর ব্রহ্মের আদর্শ দক্ষিণে প্রসারিত হচ্ছিল এবং (১) তখন কেবলমাত্র ভরতগোষ্ঠীই নাটকের চর্চা করত।

আমরা আগেই দেখেছি যে নাটক সমাজ-দর্পণ বলে এতে অতীতের স্মৃতিচারণা থাকে। ফলে ব্রহ্মার নির্দেশবাহক হওয়ায় ভরতগোষ্ঠীর নাটকে সমষ্টিগত (যৌথ) জীবনের, সমাজ-অবিযুক্ত মানুষের উজ্জ্বল আনন্দ প্রকাশ পাওয়ায় একক প্রাধান্য এবং ব্যক্তিগত মালিকানার যুগে রাজতন্ত্রের পরম

সহায়ক নব্য পুরোহিতরা এদের (ভরতের শতপুত্র বা ভরতগোষ্ঠীকে) অপাংক্তেয় (শুদ্র) করে রেখেছিল বা সমাজ থেকে বিতাড়িত করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ভরতের পৃষ্ঠপোষক রাজা নহুষ অনার্য ছিলেন। এথেকে বোঝাযায় যে এই সময় ভরতগোষ্ঠীকে প্রশ্রয় দিয়েছিল অনার্যরা। যাইহোক, আর্যাবর্তে, রাজতন্ত্রের যুগে নাট্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, নাট্যকর্মে ভরতের বা ভরতদের একাধিপত্য থাকায়, রাজন্য সংস্কৃতির অনুকূলে নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় এবং সর্বোপরি রাজতন্ত্রের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য এই সত্য উপলব্ধি ক'রে ভরত (এক ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী) যুগের অনিবার্য গতিকে স্বীকার করে নিলেন, প্রণয়ন করলেন 'নাট্যশাস্ত্র'। আর সেই অবসরে অনুপম কৌশলে বিবৃত করলেন ভারতের নাট্যেতিহাস। আর এই কৌশল অবলম্বনে তাঁর পরম সহায়ক হয়েছিল যজ্ঞ, ব্রহ্মা, বেদ, শিব প্রভৃতি শব্দ। কেননা ঔপনিষদিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রভাবে ইতিমধ্যেই এই শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটে গিয়েছিল—অথচ পূর্ব অর্থ নিয়ে জাগরূক ছিল শ্রমজীবি মানুষের সুখময় স্মৃতিরেশ হিসেবে। কর্মকাণ্ডবাদের হোতা পুরোহিতরা এ কৌশল ধরতে পারেনি নিঃসন্দেহে। অন্যদিকে নাট্যকর্মীদের শুদ্রে পরিণত করার অপরাধে ভরত পুরোহিতদেরও ক্ষমা করেননি—কৌশলে নাট্যক্রিয়ায় (মঞ্চ নির্মাণ কার্যে) তাদের (অর্থাৎ সন্ন্যাসী বা পুরোহিতদের) অস্পৃশ্য করে রেখেছেন। আর ব্রহ্মা ইতিমধ্যে নির্গুণ সর্বেশ্বরে পরিণত হওয়ায়, তাঁর কাছ থেকে নাট্যপ্রচারের দায়ীত্ব ঘাড়ে নিয়ে ভরত পুরোহিতদের কাছে নিজের গুরুমন্যতা (superiority) প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্য লঘুরসে (গ্রাম্যধর্মিতায়) মগ্ন সাধারণ মানুষকে নাট্যমাধ্যমে জ্ঞান-চর্চায় উদ্যোগী বা একনিষ্ঠ করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল।

দ্বন্দ্বগর্ভ সভ্যতার ইতিহাসে ভরত অবলম্বিত অনুরূপ সব কৌশলের পুণরাবৃত্তি ঘটেছে বহু-বহুবার। ভরত অবলম্বিত এই সব কৌশল নাট্যশাস্ত্রের এক অলঙ্কার বিশেষ। এমনি আরেকটি কৌশলের উল্লেখ করে এখানে এ বিষয়ের ইতি টানা যাক্। ভরত নাটকের দশটি প্রকারের বা দশরূপকের উল্লেখ করেছেন। তাঁর সাজানো ক্রমানুসারে রূপকগুলি হ'লো—(১) নাটক (২) প্রকরণ (৩) অঙ্ক (৪) ব্যায়োগ (৫) ভাণ (৬) সমবকার (৭) বীথি (৮) প্রহসন (৯) ডিম এবং (১০) ঈহামৃগ। এই ক্রমে দেখাযায় সবচেয়ে অর্বাচীন রূপক নাটক স্থান পেয়েছে একেবারে প্রথমে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একেবারে প্রথম পর্যায়ের নাট্যে ছিল দলগত নায়ক, কিন্তু ক্রমান্বয়ে দলগত নায়কের সংখ্যা কমে যায় এবং বেড়ে যায় একক ব্যক্তির প্রাধান্য। (অবশ্য এর বিপরীত মতেরও প্রচার আছে)। সমাজ-বিকাশের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে এ-সত্যও বিপরীতক্রমে ঐ সরণীতে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং বেদ, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি শব্দ

দেখে ভরতের বিবরণ অবহেলা করলে আমরা ভারতে নাট্যোৎপত্তির যথার্থ ইতিহাসকেই হারাবো।

প্রগতি □

ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী। কিন্তু বৈদিকযুগের সূত্রপাত আরো কয়েক হাজার বছর আগে। আর নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী। আর যে সংস্কৃত নাটকের ব্যাকরণ এই নাট্যশাস্ত্র সেই সংস্কৃত নাটকের সূত্রপাত ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে। অনেকে মনে করে থাকেন যে ভাসের নাটকগুলিও এই সময়েই রচিত। সুতরাং ঋগ্বৈদিক যুগ থেকে (ঋগ্বেদ লিখিত হওয়ার সময় থেকে নয়) সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবকাল পর্যন্ত প্রচলিত নাট্য মূলতঃ লোকনাট্য। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো যে ঋগ্বেদ থেকে সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভবকাল পর্যন্ত এই লোকনাট্যের ধারা অব্যাহত ছিল। আর একে মূলাধার ক'রেই সংস্কৃত নাটক ও নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব।

বৈদিক যুগে নাচগান যে খুবই বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল—এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্যাত্মকতার জন্যে ঋগ্বেদের উষস্ সূক্তটির ব্যাপক চর্চা হ'য়ে থাকে। এই সূক্তে উষার তুলনা করা হ'য়েছে সুন্দর পোষাক ও অলঙ্কারে সজ্জিতা মুদ্রাময়ী এক নর্তকীর সঙ্গে। সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে মান্য ইন্দ্রকে বলা হয়েছে নৃতমান, এমনকি তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকও বলা হ'য়েছে। তাছাড়া ইন্দ্রের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে অভিনয় শিল্পের প্রতি তিনি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। এই কারণেই ইন্দ্র অসুর বিজয় করলে সেই বিজয়োৎসবে নাটকের অভিনয় করা হ'য়েছিল। পরবর্তীকালের ইন্দ্রোৎসব বা ইন্দ্রমহঃ এই বিজয়োৎসবেরই সমৃতিরেশ নিঃসন্দেহে। ইন্দ্র যে নৃত্য বিশারদ নাট্যশাস্ত্রেও তার প্রমাণ মেলে। নাট্যশাস্ত্রে ইন্দ্রের সহযোগী মরুৎ এবং অশ্বিনীকেও 'নৃতু' বলে উল্লেখ করা হ'য়েছে। বৈদিক যুগে নৃত্য যে কত জনপ্রিয় ছিল, তা বোঝা যায় দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত থেকে। এই সূক্তে সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক হওয়াকেই মনুষ্যজীবনের পরম সিদ্ধি বলে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

বৈদিক কর্মকাণ্ডবাদে অনুষ্ঠানপরক নৃত্যেরও উল্লেখ আছে। বিবাহবাসরে বিবাহিত রমণীদের নাচেরও উল্লেখ আছে। এইসব নাচে গান, ভাবব্যঞ্জক অভিনয় ও মুদ্রার ব্যবহার করা হত। মহাব্রতের আয়োজন করা হ'ত পৃথিবীর উর্বরা শক্তির বৃদ্ধিকল্পে। এই ব্রতে অগ্নিকে ঘিরে মেয়েরা নৃত্য পরিবেশন করত বর্ষাকে স্বাগত জানিয়ে। আবার এই জাতীয় আনন্দানুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য

অংশ হিসেবে পরিবেশিত হ'ত বৈশ্য ও শুদ্রের লড়াই। এই লড়াই সংগঠিত হ'ত একখণ্ড শ্বেতচর্মের জন্যে এবং শেষাবধি বৈশ্যেরই জয় হত। এই জাতীয় অনুষ্ঠানে গণিকা ও ব্রহ্মচারীর পারস্পরিক গালি-গালাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের হাস্যকর বা কৌতুকপ্রদ বিষয়েরও অবতারণা করা হ'ত। মহাব্রতের নাট্যানুষ্ঠানে নাচ, গান এবং গম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে লঘু বিষয়ের অভিনয়াত্মক পরিবেশন থেকে বোঝা যায় যে এই নাটক ছিল মূলতঃ বিকৃত-স্বভাবী লোকধর্মী নাট্য। বলাই বাহুল্য যে ঐ সময়ে জনজীবনে প্রচলিত এতদ্বিষয়ক শুদ্ধধর্মী লোকনাট্যের ধারাকে অনুকরণ করে এইসব নাট্য বৈদিক কর্মকাণ্ডবাদে আশ্রয় পায় এবং কালক্রমে বিকৃত-স্বভাবী হ'য়ে শাস্ত্রীয় নাট্যধর্মী নাট্যের ভূমি প্রস্তুত করতে থাকে। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের অধ্যর্যু ও সোমবিক্রেতা (আসলে সোমবিক্রেতার অভিনেতা) র হাস্য-প্রসঙ্গ, দ্যূত সর্বস্ব জুয়াড়ীর একালাপ এবং ইন্দ্রের প্রলাপ অনুরূপ সব নাট্যঘটনারই স্মৃতিবেশ নিঃসন্দেহে। অনেকে অবশ্য এইসব ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নাট্যঘটনাগুলিকে পরবর্তীকালেরই ভাণ প্রহসনেরই পূর্বসূরি বলে মনে ক'রে থাকেন।

আর গান যে সেযুগে কতটা উন্নতিলাভ ক'রেছিল সে তো সামবেদ থেকেই বোঝাযায়। সামবেদের দু'টি অংশ আর্চিক এবং উত্তরার্চিক। আর্চিক হ'লো ঋচার সংগ্রহ। এই অংশে ৪৮৫টি ঋচা সংগৃহ ত আছে। ঋচাগুলি গানের সুর এবং লয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ই সংগৃহীত হ'য়েছিল বলে অনুমান করা যায়। আর উত্তরার্চিক অনেকগুলি সম্পূর্ণ গানেরই সংগ্রহ বিশেষ। সুতরাং সামবেদ যে সম্পূর্ণ অর্থে সঙ্গীতেরই গ্রন্থ বিশেষ—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বৈদিকযুগে উন্নত ধরণের বাদ্যযন্ত্র এবং কুশলী পেশাদার বাদ্যযন্ত্রীদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কাত্যয়ন শ্রৌতসূত্রে পিতৃমেধ যজ্ঞে বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যগীতাদি পরিবেশনের বর্ণনা দেয়া হ'য়েছে। আর বাজপেয় যজ্ঞে যজমানের স্ত্রী বিভিন্ন ধরনের বীণা বাজাত, সঙ্গে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও বাজানো হ'ত। এই সময়ে বীণার মধ্যে প্রধান ছিল গাধোবাণা এবং কাণ্ডবীণা। কাত্যায়ণ শ্রৌতসূত্রে এমনও উল্লেখ পাওয়া যায় যে বাজপেয় যজ্ঞে অনুষ্ঠিত নাচ-গানের জন্য পেশাদার আচার্যদেরও আমন্ত্রণ জানানো হ'ত। এঁরা মন্দ্রারাগে বীণা বাজিয়ে গানের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশন করত। বাজপেয়র অনুরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞেও দেশের বিখ্যাত সব বায়নাচার্যদের আমন্ত্রণ জানানো হ'ত। সশিষ্য এসে এঁরা যজ্ঞে গান পরিবেশন করতেন। যজ্ঞ শেষে যজমানের তরফ থেকে গুরু শিষ্য উভয়কেই সম্মান-স্বরূপ একশত ক'রে স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হ'ত।

আর যজুর্বেদে মারণ, মোহন, বশীকরণ প্রভৃতি অভিচারে অঙ্গাভিনয়ের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

উপরের তথ্যাদি থেকে বোঝা যায় যে নাট্যের উপাদানসমূহ, অর্থাৎ নাচ, গান, বাদ্য ও অভিনয় বৈদিকযুগে বেশ পরিণত হ'য়ে উঠেছিল। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসাটা আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে ঐ যুগে উপযুক্ত পটভূমিতে নাট্যাভিনয় বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্যাভিনয়ের কোনো পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে বেশ কিছু সংবাদ-সূক্তের সন্ধান মেলে বৈদিকসাহিত্যে। এই সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে (১) পুরূরবোর্বশী সূক্ত, (২) সরমা-পণি-সূক্ত, (৩) অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, (৪) যম-যমী, (৫) নেমি-ইন্দ্র, (৬) নদ্যঃ বা বিশ্বামিত্র নদী সংবাদ, (৭) ইন্দ্র-মরুত প্রভৃতি সূক্তের সংলাপে নাট্য ঘটনার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বামিত্র-নদীর সংবাদ-সূক্তে নদীর মানবীকরণ যেমন নাটকীয়, তেমনি এর প্রতিটি সংলাপের কাব্যাত্মকতা আজকের মানুষকেও মুগ্ধ করে। যম-যমীর সংলাপে যমীর কামোত্তেজনা এবং যমের বিস্ময়কর সংযম-চেতনা ভাই বোনের এক সংঘাতপূর্ণ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে। ইন্দ্র-মরুত সংবাদকে তো ম্যাক্সমুলার প্রকৃত অর্থে নাট্যাভিনয় বলেই মনে করেছেন। তাঁর মতে দুই দলে বিভক্ত হয়ে এর অভিনয় করা হ'ত। একটি দল হ'ত ইন্দ্রের, অন্যটি হ'ত মরুতের। দশম মণ্ডলের ৯৫তম সূক্তটি আরম্ভ হয় খুবই নাটকীয়ভাবে। এই সূক্তে পুরূরবা-উর্বশীর পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে জানা যায় যে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার পর উর্বশী চিরকালের জন্য পুরূরবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ফলে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় ভীত পুরূরবা ভীষণভাবেই কাতর হয়ে পড়ছে। প্রায় দু'হাজার বছর পরে কালিদাস যখন এই সূক্তটি অবলম্বন ক'রে বিক্রমোর্বশীয় লেখেন, তখন সূক্তটির নাটকীয়তা আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। উপরোক্ত সংবাদ সূক্তগুলি ছাড়া আরো অনেক সংবাদ সূক্ত বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই সংবাদ-সূক্তগুলির গভীর অধ্যয়ন থেকে এই অনুমান করা যায় যে ঋগ্বৈদিক আর্যদের মধ্যে লোককাহিনী আশ্রিত নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। এইসব নাট্যাভিনয়ে গদ্য ও পদ্য উভয়প্রকারের সংলাপ প্রযুক্ত হ'ত। কিন্তু যেহেতু বেদ শ্রুতি এবং গদ্যাংশ মনে রাখা কঠিন সেইহেতু পরবর্তীকালে যখন বেদ লেখা হ'য়েছে, তখন কেবলমাত্র পদ্যাংশই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া গদ্যসংলাপের কোনো নিশ্চিত রূপও ছিল না, অভিনয় মুহূর্তে অভিনেতা স্বয়ং তা রচনা করত। ফলে নাট্যা-ভিনয়ের বাইরে সেগুলির কোনো অস্তিত্বও ছিল না। তাই বেদ রচনাকালে সেগুলি অনুক্ত রয়ে গেছে।

এক্ষণে সংবাদসূক্তগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হ'লো—

(১) বিশ্বামিত্র-নদী সংবাদ সূক্তটি ছাড়া অন্যান্য সূক্তগুলি হয় কোনো মিথ না হয় কোনো লোককাহিনী থেকে নেয়া। এইসব লোককাহিনী জনমানসে অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ার দরুণ বৈদিক আর্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

(২) কাহিনীর সর্বাপেক্ষা নাটকীয় অংশই সূক্তগুলিতে আশ্রয় পেয়েছে, নাট্যপ্রস্তুতির পক্ষে অধিক উপযোগী এই বিবেচনায়।

(৩) প্রতিটি সংবাদসূক্তই উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ। আর এই জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি আবেগাত্মক নাটকীয়তার পরিপোষক। সরমা-পণি সূক্তে সরমা তার তীক্ষ্ণ উক্তির সাহায্যে পণিদের একেবারে হতপ্রদ করে দেয়। যম-যমী সূক্তে যমীর প্রতিটি আহ্বানকেই যম ত্বরিতে বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি দ্বারা অস্বীকার করে। পুররবোর্বশীতেও উর্বশী পুরূরবার অনুনয় বিনয় ভরা প্রতিটি উক্তিকে অগ্রাহ্য করে। এই সূক্তে মোট ১৮টি মন্ত্র আছে—যার ৯টি উর্বশী ও বাকি ৯টি পুরূরবা সংলাপাকারে উচ্চারণ করে। একের পরে অপরের উক্তি সহযোগে এগিয়ে চলে এই সূক্তটি। এই জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি যে সংঘাতপূর্ণ নাট্য ঘটনারই স্মৃতিবেশ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(৪) এই সূক্তগুলির কোনোটিই আপনাতে আপনি পূর্ণ নয়। এই কারণে অন্য সূক্তগুলি থেকে এই সংবাদ-সূক্তের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। অন্যান্য সূক্তগুলি হয় গীতি নয় লঘু কাব্যেরই উদাহরণ বিশেষ, ফলে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং পূর্বাপর কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এইসব সূক্তে চরিত্র বা ঘটনার পরিবর্তে কবির কাল্পনিক অভিব্যক্তিরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এর বিপরীতে সংবাদ-সূক্তে এমন সব চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে—যাদের জীবনে সংঘাতপূর্ণ সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর ঐ সব ঘটনার নাটকীয় অংশ নিয়েই রচিত হয়েছে সংবাদ-সূক্তগুলি।

(৫) সংবাদ-সূক্তের সংলাপ তার আনুষঙ্গিক কার্যাদির সূচনা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ পুরূরবোর্বশী সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সূক্তে উর্বশী পুরূরবাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর তাকে আবার এক সরোবরে হংসরূপে দেখা যায়। পুরূরবা তখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই সময়ে উর্বশী পুরূরবাকে তার মন থেকে উর্বশীকে মুছে ফেলার পরামর্শ দিয়ে বলে—"মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিরর্থক, কেননা তাদের হৃদয় নেকড়ের হৃদয়ের অনুরূপ (অর্থাৎ হৃদয়হীন)"। উর্বশীর এই সংলাপের সঙ্গে সূক্তটি শেষ হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উর্বশী পুরূরবার ঘটনাবলী সূক্তটিতে অন্তর্নিহিত আছে—যা সংলাপ বলার সময় অভিনেতা (বা অভিনেত্রী) স্বয়ং অভিনয় মাধ্যমে প্রকাশ করত। আর তা না হলে সূক্তগুলির সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে উর্বশীর অন্তিম সংলাপের পর পুরূরবা অবশ্যই ব্যর্থ-মনোরথ এবং হতাশ হ'য়ে অভিনয় ক্ষেত্র ত্যাগ করত।

(৬) সূক্তগুলির আগে বা পরে সূক্তকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা বা টিপ্পনী সংযোজিত নয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সূক্তগুলি অভিনয়ের জন্যেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল, কেবলমাত্র পাঠের জন্য নয়।

(৭) সংবাদ-সূক্তগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এগুলি সম্পূর্ণভাবেই ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবেই সংশ্লিষ্ট। কোনো সংবার-সূক্তের সঙ্গেই কোনো দেবতা বা যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের সংশ্লিষ্টতা নেই। চরিত্রগতভাবে এগুলি লোককাহিনীরই সমগোত্রীয়। জনসাধারণ এইসব কাহিনী শুনতে বা এদের অভিনয় দেখতে ভালোবাসত। তাই যজ্ঞে উপস্থিত সকলকে আনন্দ দেবার জন্যেই এগুলির অভিনয় করা হত।

যাইহোক, বেদোত্তর যুগে নাটক আরো পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে কঠোপনিষদে নচিকেতা ও যমের সংলাপে ঋগ্বৈদিক সূক্ত অপেক্ষা অনেক বেশি নাটকীয়তা বর্তমান। কাত্যায়ন সৌতসূত্রের সোমযজ্ঞও এ বিষয়ে বিশেষ ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সূত্রে বলা হয়েছে—পিতৃমেধ যজ্ঞে নৃত্য-গীত ও বাদ্যের প্রয়োগ আবশ্যিক। তথ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই কারণেই যে আজও অসম এবং মণিপুরে শ্রাদ্ধাবসরে নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে ধুমধামের সঙ্গে। আত্মার সদ্‌গতি কামনাই এই জাতীয় অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

উৎপত্তি মুহূর্তে ভারতীয় নাটক (লোকনাট্য) ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। কিন্তু অনুরূপ ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। কেননা আমাদের নাটক উৎপত্তি মুহূর্তে যদি ধর্মভিত্তিক হত, তাহলে ভরতের পুত্রদের অভিশাপ দিয়ে শূদ্র ক'রে রাখতেন না আমাদের মুনি ঋষিরা। পরবর্তীকালের লিখিত সংস্কৃত নাটক থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতীয় নাটক প্রথমাবধি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। রাজ্যাভিষেক (ভাস), ঋতু উৎসব (হর্ষ), জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব, বিজয়োৎসব ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানেই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হ'ত। তবে অনেক নাট্যানুষ্ঠান যে মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তার কারণ হ'লো মেলার অনুরূপে মন্দিরও প্রাচীনকালের মত আজও সর্ববর্ণের মানুষের মিলনক্ষেত্র।

রামায়ণ এবং মহাভারতেও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে, রামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ধরণের উৎসবের উল্লেখ আছে। বালকাণ্ডে অযোধ্যানগরীর বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, অযোধ্যায় সব ধরণের পেশার লোক বাস করে এবং 'বধূনাটক সংঘ'ও প্রতিষ্ঠিত আছে। বধূসংঘ হ'লো নৃত্য প্রদর্শনের স্থল আর নাট্যসংঘ হ'লো নাট্য প্রদর্শনের স্থল। মহাভারতের উপসংহার হরিবংশ পুরাণে 'কৌবের রম্ভাভিসার' নাটকের উল্লেখ আছে। এখানে রামকাহিনী পরিবেশনেরও বর্ণনা আছে। হরিবংশ পুরাণের সেই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বজ্রপুরের দৈত্যরাজ বজ্রনামের কন্যা প্রভাবতী রাজা প্রদ্যুম্নের রূপবর্ণনা শুনে মোহিত

হ'য়ে পড়ে এবং মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হ'য়ে ওঠে। তখন সে যাদব-বীরদের তার সাহায্যে অনুপ্রাণিত করে। যাদববীরেরা দৈত্যরাজ বজ্রনামের অনুমতি নিয়ে নটবেশ ধারণ করে বজ্রপুরে প্রবেশ করে। দলের নায়ক সাজে প্রদ্যুম্ন আর বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সাম্ব। হরিবংশের এই নাট্যাভিনয়ের যে বর্ণনাটুকু পাওয়া যায় তা হ'লো—"প্রথমে নটবর দত্ত নৃত্য দ্বারা বজ্রপুরবাসীকে প্রসন্ন করে। তারপর তারা রামকাহিনী আশ্রিত ঘটনার নাটকীয় প্রদর্শন করে। রাক্ষসরাজকে বধের জন্যে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন বিষ্ণু। আর অন্যান্য অভিনেতারা রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন তথা ঋষ্যশৃঙ্গ এবং শান্তার যে অভিনয় করে, তা ছিল যেমন স্বাভাবিক তেমনি কুশলী। এতে পুরুষরাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে। নৃত্যাশ্রিত এই নাট্যাভিনয় যে লোক-নাট্যেরই পর্যায়ভুক্ত, তা বলাইবাহুল্য।

বাৎসায়নের কামসূত্রে নাট্যাভিনয়কে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—মাসের প্রতিটি পক্ষে নির্ধারিত তিথিতে সরস্বতীর মন্দিরে সমাজের আয়োজন করা হত। এই সমাজ আসলে মনোরঞ্জনাত্মক সভা বা অনুষ্ঠান বিশেষ। এই সমাজে যারা নাচগান করত, তারা সকলেই ছিল নিযুক্ত বেতনভুক শিল্পী। তবে বহিরাগত কুশীলব, নর্তক এবং গায়করাও এই সমাজে নাচ গান এবং অভিনয় করার সুযোগ পেত। উপরন্তু এই বহিরাগত শিল্পীদেরই সমাজে অগ্রাধিকার দেয়া হ'ত। যাইহোক কামসূত্রে প্রদর্শিতব্য নাট্যাভিনয়কে বলা হয়েছে সংগীতক। কেননা এইসব নাট্যানুষ্ঠানে সংগীতেরই প্রাধান্য ছিল। আর সংগীতপ্রধান নাট্য মূলতঃ লোকনাট্যেরই পর্যায়ভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত নাট্যে সংগীতের প্রয়োগ ছিল নামমাত্র।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংস বধ' এবং 'বলিবন্ধ' এই দুটি নাট্যাভিনয়েরও উল্লেখ আছে। এই অভিনয়ে চিত্র ও অভিনয়ের সাহায্যে কংসের মৃত্যু এবং 'বলি বন্ধ' দেখানো হয়। গ্রন্থিকরা কৃষ্ণভক্ত এবং কংসভক্ত—এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল লাল রঙে (কংসভক্ত) এবং অন্য দল কালো রঙে (কৃষ্ণভক্ত) মুখ রঞ্জিত করে কাহিনী পাঠ করতে থাকে আর শৌভিনিকরা সেই পঠিত অংশের অভিনয় করে। মহাভাষ্যে নাট্যাভিনয়ের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা স্পষ্টরূপে লোকনাট্যেরই অভিনয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শৌভনিক 'কংসবধ এবং বলিবন্ধের' অভিনয় করে আর গ্রন্থিক উৎপত্তি থেকে বিনাশ পর্যন্ত কাহিনী পাঠ করে চলে কংসভক্ত কিংবা কৃষ্ণভক্ত রূপে তন্ময় হ'য়ে। বর্তমানে প্রচলিত রামলীলা ও রাসলীলায় অনুরূপ অভিনয় পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। রামলীলায় রামায়ণী অথবা পাঠক এবং রাসলীলায় সমাজী যথাক্রমে রাম এবং কৃষ্ণজীবনের কাহিনী পাঠ করে চলে আর অভিনেতারা সেই পাঠ্যাংশ অভিনয় করে চলে।

বৌদ্ধযুগেও যে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা বৌদ্ধজাতকে নাট্য প্রদর্শনের পর্যাপ্ত উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। বৌদ্ধজাতকে নট, নাটক সমাজ প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। জাতকে উল্লেখিত সমজ্জ-মণ্ডলের নাট্যাভিনয়কে বলা হয়েছে সংগীত-নৃত্যমূলক। ফলে এইসব নাট্যাভিনয় যে লোকনাট্য ছিল এবিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকে না। এই সময়ে অভিনেতারা বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে নাট্যপ্রদর্শন করে বেড়াত। কণবেরা জাতক থেকে জানা যায় যে কাশীর গণিকা শ্যামা তার পলাতক প্রেমিককে খুঁজে বের করার জন্যে এইসব অভিনেতাদের সাহায্য নিয়েছিল। জাতকের অনুরূপে সুত্ত সাহিত্যেও মনোবিনোদের অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ মেলে। বুদ্ধের সময় উপতিস্স এবং মৌদ্‌গল্যায়ণ নামক দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজগৃহে 'সৌগন্ধিকা হরণ' নামক এক রূপকের অভিনয় করে। সংস্কৃতের প্রথম নাটক বৌদ্ধভিক্ষু অশ্বঘোষের সারিপুত্ত প্রকরণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব সংস্কৃত নাটক রাজানুকূল্যে ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। ফলে ব্যয়বহুল ও বিলাস-উপকরণ হওয়ার দরুণ এইসব সংস্কৃত নাটকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল। অশোকের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ "সমজ্জো নাপি কত্তব্যম্" সেই বিরোধেরই পরিচায়ক।

জৈনদের আগম গ্রন্থসমূহেও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন আগম গ্রন্থে এমন কিছু নাট্যানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে যেগুলি অনুষ্ঠিত হত জৈন তীর্থঙ্করদের সম্মুখে। প্রসিদ্ধ রাউপসেনিয় সুত্তে এই প্রকারের নাট্য-বিধির উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মহাবীরের জীবন চরিতও নাট্যাভিনয়ের আকারে পরিবেশিত হ'ত। রাউপসেনিয় সুত্তের এই বিবরণ থেকে সে সময়ের নাট্যরীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখিত সুত্তে নাট্যাভিনয়ের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা হ'লো—দেবকুমার এবং দেবকুমারীরা মিলে মহাবীরের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন—দেবলোকে মহাবীর, অবতার, গর্ভ-পরিবর্তন, জন্ম, অভিষেক, বাল্যাবস্থা, কৈশোর, যৌবন, কামভোগ, নিষ্ক্রমণ, তপোশ্চরণ, জ্ঞানোৎপাদন, তীর্থ পরিবর্তন, পরি-নির্বাণ প্রভৃতি লীলা প্রদর্শন করে। এই লীলাভিনয়ে এই প্রকারের নাট্যবিধি প্রয়োগ করা হয়। এই নাট্যাভিনয়ে তত, বিতত, ধন, সুষির—এই চার প্রকারের বাদ্য; উৎক্ষিপ্ত, পাদান্ত, মাদায়, রচিত—এই চার প্রকারের গীত; উঞ্চিত, রিমিত, আরঘট মসৌল—এই চতুর্বিধ নাট্য এবং দাষ্টন্তিক, প্রাপ্যন্তিক, সামান্তত বিনিপাত ও লোকমধ্যাবসাতি—এই চতুর্বিধ অভিনয়ের সাহায্যে দেবকুমার ও দেবকুমারীরা দর্শকদের রসমগ্ন করে তুলতে সমর্থ হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে উদ্ভবকাল থেকে নাট্যশাস্ত্রের রচনা কালাবধি ভারতীয় লোকনাট্যের ধারা অব্যাহত থাকে। আর ভরত

এই ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যকে আধার রূপে গ্রহণ করেন এবং প্রণয়ন করেন নাট্যশাস্ত্র। তারপর অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে লিখিত সংস্কৃত নাটকের ধারা। সে ইতিহাস আমাদের অজানা বা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। যাইহোক, সংস্কৃত নাটকের যুগে চিরন্তনী লোকনাট্যের ধারা কিন্তু স্তিমিত হয়ে যায়নি। বরং সংস্কৃত নাট্যধারারই সমান্তরালে জনজীবনে বেশ গতিশীল ছিল। ভরতের ভাষায় নাটকের এই ধারা লোকধর্মী রূপে আখ্যাত। এই ধারার প্রতি ভরত যে বেশ আস্থাশীল ছিলেন, তা বোঝা যায় যখন তিনি অভিনেতাদের প্রয়োজনে লোকধর্মিতার দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে নাট্যশাস্ত্রকাররা লোকধর্মী নাট্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারেন নি। নাট্যশাস্ত্রসমূহে তাই লোকধর্মী নাট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রথম নাট্যাভিনয়কে ডঃ সত্যেন্দ্র লোকনাট্য ব'লে মনে করেন। কেননা দেবাসুর সংগ্রামের কোনো রচয়িতার উল্লেখ নেই। লোকনাটকও সাধারণতঃ কোনো একক ব্যক্তির রচনা নয়। তাছাড়া দেবাসুর সংগ্রাম অভিনীত হ'য়েছিল উন্মুক্ত মঞ্চে। আর ভরত যে দশরূপকের বর্ণনা দিয়েছেন তারমধ্যে অন্যতম প্রহসন এবং ভানকে ডঃ তীর্থ লোকনাট্য ব'লে চিহ্নিত করেছেন।

যাইহোক, এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ প্রায় নেই বললেই চলে যে সংস্কৃত নাটক ছিলো সমাজের উচ্চস্তরের মানুষেরই মনোরঞ্জন মাধ্যম। ফলে সাধারণ মানুষ ছিলো এর রসরাজত্বের বাইরে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র সমূহে যে উপরূপকের উল্লেখ ও পরিচয় পাওয়া যায়, তার বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা ছিলো সাধারণ মানুষেরই মনোরঞ্জন মাধ্যম। তাছাড়া উপরূপকগুলির কাহিনী পৌরাণিক ও ভাষা প্রাকৃত এবং এগুলিতে নৃত্য ও সঙ্গীতেরই প্রাধান্য। উপরূপকগুলির কোনো নিদর্শন প্রায় নেই বললেই চলে। রূপক সমবকারেরও 'দেবাসুর সংগ্রাম' ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো নজির এখনো অনুপলব্ধ। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাচীনতম রূপক সমবকার বা উপরূপকগুলি ছিল মূলতঃ লোকধর্মী নাটক। তাই সংস্কৃত নাট্যকাররা এগুলির রচনায় তেমন কোনো উৎসাহ বোধ করেন নি। এমন কি স্বয়ং ভরতও স্বতন্ত্ররূপে কোনো উপরূপকের পরিচয় দেননি, তবে বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫ প্রকার উপরূপকের কেবল উল্লেখ করেছেন মাত্র। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে—পরবর্তীকালের শাস্ত্রকাররা যে উপরূপকের পরিচয় দিয়েছেন, তা সম্ভবতঃ জনজীবনে প্রচলিত নাট্যের উল্লেখ করার প্রয়োজন থেকেই।

দশরূপকের টীকাকার ধণিক সাত প্রকারের উপরূপকের উল্লেখ ক'রেছেন। অগ্নিপুরাণে পাওয়া যায় সাত প্রকার উপরূপকের উল্লেখ। আর নাট্য দর্পণ ও ভাবপ্রকাশে উপরূপকের উল্লেখ করা হ'য়েছে মাত্র। তবে সাহিত্য-দর্পণে

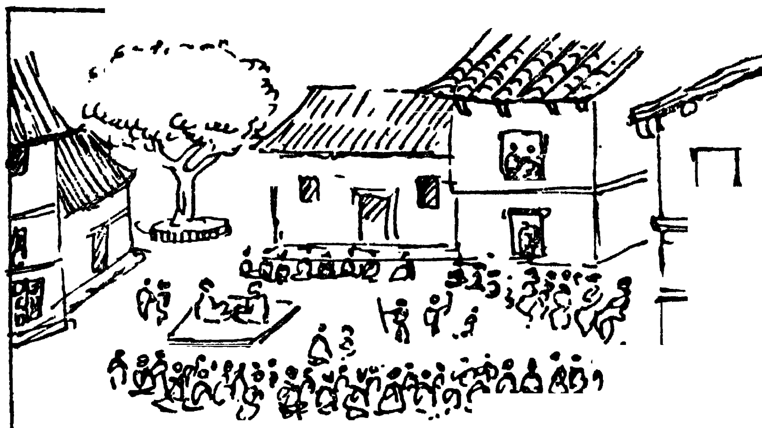
বিবৃত ১৮ প্রকারের উপরূপককে সকলে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই উপরূপকগুলি হ'লো—(১) নাটিকা, (২) ত্রোটক, (৩) গোষ্ঠী, (৪) সট্টক, (৫) নাট্যরাসক, (৬) প্রস্থানক, (৭) উল্লাপ্য, (৮) কাব্য, (৯) প্রেক্ষানক, (১০) রাসক, (১১) সংলাপক, (১২) শ্রীগদিত, (১৩) শিল্পক, (১৪) বিলাসিকা, (১৫) দুর্মল্লিকা, (১৬) প্রকরণিকা, (১৭) হল্লিসক এবং (১৮) ভাণিকা। এগুলির মধ্যে নাট্যরাসক, রাসক, হল্লিসক এবং ভাণিকা মধ্যযুগে প্রচলিত রাস, চর্চরী, কাণ্ড প্রভৃতি নাট্যরূপের পূর্বসূরী। যাইহোক, নাট্যশাস্ত্রে স্থান ক'রে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার কারণে উপরূপকগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে লোকনাট্য না ব'লে লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত মনে করাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

যাইহোক, নাট্যশাস্ত্র রচনার কাল থেকে, কিংবা তারও কিছু আগে থেকে, চতুর্দশ শতাব্দী অবধি অব্যাহত থাকে লিখিত সংস্কৃত নাটকের ধারা। আর একথাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, বিশাখদত্ত শ্রীহর্ষ, ভবভূতি, দিঙনাগ এবং ভট্টনারায়ণ সে ধারাকে অব্যাহত এবং বেগবান রেখেছিলেন। কিন্তু মুরারী, রাজশেখর, ক্ষেমেশ্বর দামোদর (মিশ্র) এবং কৃষ্ণমিশ্রের সময় সে ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসে। কেননা এঁদের নাটকে কার্য অপেক্ষা কাব্যের, সমাজসত্য অপেক্ষা আদর্শবোধের, উল্লাস অপেক্ষা উপদেশের এবং মঞ্চোপস্থাপনা অপেক্ষা বর্ণনার প্রাধান্য দেখা গেল। আমরা জানি সংস্কৃত নাটক ছিলো রাজন্যসংস্কৃতিরই ধারক-বাহক এবং প্রচারক। ফলে অষ্টম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের পর রাজতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার কারণে সংস্কৃত নাটকের ধারাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসে। কেননা সাধারণ মানুষ প্রথমাবধি ছিলো এর রসরাজত্বের বাইরে—মুখ্যতঃ এর ভাষার কারণে এবং গৌণতঃ এর প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্যে। ফলে সংস্কৃত ভাষার অনুরূপে সোনার (মাটির নয়) সংস্কৃত নাটকও ভারতের শিষ্ট জগত থেকে বিদায় নিতে থাকে এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে বিদায় নেয়ও।

অন্যদিকে অগ্নবজে উদ্ভূত নাটকের ধারা চোখের জল পায়ে ফেলে রাজতন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত করেছিলো যারা—তাদের সুখ-দুঃখ হাসি কান্নায় জীবনবেদ হ'য়ে স্বততঃ বহতা রইলো। নাট্যের এই ধারা শুকায় না কখনো। জনজীবনে তা ব্যাপ্ত থাকেই, কোনো রাজাশ্রয় বা পণ্ডিতী ব্যাকরণের প্রত্যাশা না করেই। জনমানসের বিস্তৃত ভূমিতে তার স্বচ্ছন্দ বিহার। আপন অস্তিত্ব ঘোষণার ছেলেমানুষী স্বভাবও নেই তার। সমাজের অন্তঃপ্রবাহী হ'য়ে থাকাতেই যেন তার অধিকতর সুখ। কিন্তু কখনো কখনো সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরের শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি যায় এদিকে। আপন স্বার্থরক্ষায়, উপকরণ সংগ্রহের তাগাদায় তারা সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় জনমানসের এই

জীবনবেদের দিকে। লোকনাট্য স্বভাবে উদার, সাধারণ মানুষকে হতাশ করার প্রকৃতি নয় তার। নয় যে তার প্রথম নজির বৈদিক সংবাদ-সূক্তগুলি, দ্বিতীয় নজির সংস্কৃত নাটক, তৃতীয় নজির মধ্যযুগের লোকনাট্য আর চতুর্থ নজির আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার। লোকনাট্যের লোকধর্মিতার 'বিকৃত-স্বভাব'-এর আধিক্য এবং সংস্কৃত নাটকের অভিনয়রীতির প্রভাবের দরুণ কালক্রমে আপন স্বভাব-বিরুদ্ধ এক রূঢ়তা লোকনাট্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করায় অনেকে একে পরম্পরাশীল নাট্য বা ট্রাডিশনাল থিয়েটার বলার পক্ষপাতী। কিন্তু লোকনাট্যের অনুরূপে লোকনাট্যের আলোচনায়ও বৈয়াকরণিকদের বা ব্যাকরণের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে এই ট্রাডিশনাল থিয়েটার সমগ্র ভারতবাসীর কাছে লোকনাট্য নামেই পরিচিত। ফলে জনজীবনের অনুরূপে জনমানসের জীবনবেদ লোকনাট্যও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনীয় একথা মনে রেখে একে লোকনাট্য বলাই অধিকতর সঙ্গত বলে মনে হয়। যাইহোক, নবোদ্ভূত সামন্তবাদের সাহায্যার্থে কিংবা নিজেদের ধর্ম-প্রচারের সুবিধার্থে বৈষ্ণব প্রভুরাও যখন সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন, তখন স্বভাব-উদার আমাদের লোকনাট্য (সংস্কৃত নাট্যের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে ভারতের জনপ্রিয়তর লোকনাট্য আঙ্গিকগুলির মধ্যে সঙ্গীতক, ছায়াপুতুল নাট্য, মহাকাব্য ও গাথার গান, পট, চিত্রনৃত্য, শোভাযাত্রা এবং স্বাঙ্গ বা সং অন্যতম)—ও তার অতুল ঐশ্বর্যভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিলো তাঁদের হাতে। নতুন রূপে আমাদের লোকনাট্য এগিয়ে এলো ভারতীয় নাট্যের একেবারে প্রথম সারিতে এবং সেই সময় থেকেই অদ্যাবধি (মধ্যে ইংরেজ আমলে বিদেশী প্রভাবে গড়ে ওঠা প্রসেনীয়াম থিয়েটার বা নাগরনাট্যের সমান্তরালে প্রবাহিত হ'য়ে স্বাধীনতা লাভের পর নাগরনাট্যকে তীব্রভাবে প্রভাবিত ক'রে) আপামর ভারতবাসীর নাট্য-পিপাসা চরিতার্থ ক'রে চলেছে। অবশ্য আমাদের লোকনাট্যে লিখিত ধারার কোনো চল না থাকায়, কোনো প্রাদেশিক ভাষার সুস্পষ্ট বিকাশ না ঘটায় এবং নবাবী তখ্তে আরবী-ফার্সী'র প্রাধান্য থাকায় আমাদের লোকনাট্যের সরব আত্মপ্রকাশে কিছুটা সময় লেগেছিলো।

গুজরাতের লোকনাট্য



ভাওয়াই

ভাওয়াই মহাত্মা গান্ধীর জন্মভূমি গুজরাতের লোকনাট্য। রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ ও নিবৃত্তিমার্গী গুজরাতীরা তাদের তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। বম্বাইয়ের বড় বড় শিল্পোদ্যোগ—এমনকি আমেদাবাদের অধিকাংশ সুতাকলের মালিক এরাই। তবুও উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত গুজরাতীদের জীবন অতিশয় সাদামাটা, ফলে বৈচিত্র্যহীন! অন্যদিকে কৃষক থেকে শুরু করে গ্রামের কামার, কুমোর তাঁতী ও অন্যান্য লোকশিল্পী অবধি সব নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যেমন রঙিন, তাদের শিল্পচর্চাও তেমনি বর্ণাঢ্য এবং সমৃদ্ধ।

সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতেই গুজরাতে শক্তি আন্দোলনের জোয়ার আসে। তাই সমগ্র ভারতে কালীর যে নয়টি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র গড়ে ওঠে তারমধ্যে তিনটি এই গুজরাতেই। এগুলি হলো পাওয়াগড়ের মহাকালী, উত্তর গুজরাতের বহুচারাজী এবং আরাসুরের অম্বা। শক্তি আন্দোলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ নবম শতাব্দীতেই গুজরাতে বামাচারী আন্দোলনও শুরু হ'য়ে যায়। বামমার্গী সাধুসন্তেরা তখন বিভিন্ন সব বিকৃত পথে মোক্ষলাভের চেষ্টা ক'রতে থাকেন। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে কেবলমাত্র যৌনতার পথেই আধ্যাত্মিক আনন্দলাভ সম্ভব এবং যৌন-আনন্দের পূর্ণ-তৃপ্তির মাধ্যমেই কেবলমাত্র কামজ প্রবৃত্তি দূর

করা যায়। বলা যেতে পারে এরই প্রতিক্রিয়ায় আচারনিষ্ঠ জৈনধর্মের এবং ভক্তিপূরক বৈষ্ণবধর্মের পুনরাবির্ভাব। গুজরাতে শোলাঙ্কি বংশের রাজত্ব চলে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই বংশেরই রাজা সিদ্ধরাজ ছিলেন অহিংসা ও নিরামিষ ভোজনের এক উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা। এইভাবেই সেই মধ্যযুগ থেকে অদ্যাবধি গুজরাতের সমাজ জীবনে দুটি ধারা চলে আসছে। একটি ধারায় আছে সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ—যারা অতিমাত্রায় ফ্যাসান-দুরস্ত এবং অহিংসা ও আচারনিষ্ঠার প্রবক্তা। আর অন্য ধারায় আছে গুজরাতের নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ—যারা কেবলমাত্র শক্তির দেবী অম্বামাতার পূজো করে সমস্ত প্রকারের গোঁড়ামি ও আচার নিষ্ঠাকে হেলায় তুচ্ছ করার শক্তি আহরণ করে।

দশহারার আগেই গুজরাতে যে নবরাত্রোৎসব পালিত হয় তাতে বেশ ধুমধাম করেই পরিবেশিত হয় ভাওয়াই। পরিবেশিত হয় অম্বামাতার সম্মুখে। ভাওয়াই অভিনেতাদের দৃঢ়-বিশ্বাস এই অভিনয়ানুষ্ঠানে শক্তিদেবী নিজেই সশরীরে উপস্থিত থাকেন। এই ভাওয়াই-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তবে তার বহু আগে থেকেই বিভিন্ন সব উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে ভাওয়াই তার বর্তমান রূপলাভ ক'রেছিল। ভাওয়াইকে ভালোভাবে জানতে গেলে তার সেই উত্থান পতনের ইতিহাস জানা অতি আবশ্যক।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভাষা হিসেবে গুজরাতী তার স্বতন্ত্র রূপলাভ করে। আরো পেছনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী অবধি ভাষার দুটি ভিন্ন ধারা প্রবাহিত। একটি সংস্কৃতের অন্যটি বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষার সমন্বয়ে বিকশিত দেশীয় ভাষাসমূহের যা পরবর্তীকালে অপভ্রংশের চেহারা নেয়। ভোজ, হেমচন্দ্র, সোমেশ্বর প্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্যিক ছাড়াও এই সময়ের গুজরাতে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন জৈন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। ফলে জৈন ঐতিহ্যের স্মৃতিরেশ বহন ক'রে জন্ম নেয় রাসক ও রাস। আর দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত শৈলচন্দ্রের 'ভারতেশ্বর বাহুবলী রাসো' এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে তরুণপ্রভার কৃতি-সমূহতো গুজরাতী সাহিত্যের আদি-পর্বের নজির।

অবশ্য রাস এখানে বেশ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। উপরন্তু আভীর সরজাট বৃষ্ণি প্রভৃতি উপজাতির লোকেরাও রাখালরাজা হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করত। রাসের অনেক গীতিকবিতা তাই শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রত্যক্ষ অবদান। এই সময়ে দুই ধরনের রাস প্রচলিত ছিল। একটি হ'ল হাত-তালি সহ নৃত্যের 'সালারাস', অন্যটি লাঠিসহ নৃত্যের 'লকুটারাস'। এই সময়েই এখানে শক্তিদেবী অম্বা বা অম্বিকার আরতি হিসেবে 'গরবী' নামে মাটির ঘট বা তিনফুট উঁচু কাঠের একটি কাঠামো ঘিরে 'গরবী' বা 'গরবা' নৃত্যেরও প্রচলন ছিল। এই নৃত্য নয়দিনের 'নবরাত্রি' উৎসবেরও একটি অঙ্গবিশেষ। চাষ-বাস বা

ধর্মীয় আচার পালনের দিক থেকে এই উৎসবের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এবং আজও আছে।

দেশীভাষা সমূহের বিকাশ, আভীরদের দ্বারা কৃষ্ণ সংস্কৃতির স্বীকরণ এবং পরবর্তী উৎসবের প্রচলন—এ সমস্তই এক শ্রেণীর উন্নত সাহিত্যের ক্রমবিকাশে সাহায্য ক'রেছিল—যা রাস বা রাসক বা রাসো বা ফাগু নামে পরিচিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই আবার রাস শব্দের অর্থানুষঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় হরিবংশ অথবা ভাগবত পুরাণে যে রাস তা শুধুমাত্র নৃত্য (বা বিশুদ্ধনৃত্ত)-ই ছিল না, ছিল একশ্রেণীর ছন্দবদ্ধ বর্ণনাত্মক আখ্যায়িকা বিশেষ। তখন এতে প্রযুক্ত হ'ত দোহা, চৌপাই প্রভৃতি অপভ্রংশের ছন্দ। দোহা এবং চৌপাই আবার দেশী রাগ সঙ্গীতেরও উপযোগী বাহন। সঙ্গীত-শাস্ত্র-সমূহে—বিশেষ ক'রে শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকর'-এ এই শ্রেণীর রাগসঙ্গীতের অজস্র উল্লেখ আছে।

শুদ্ধনৃত্ত থেকে বর্ণনামূলক গেয়-নাট্যে রাসের রূপান্তরের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকে কথ্য থেকে গেয় শব্দে অধিক গুরুত্বারোপের একটি প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্য আছে। কালিদাস থেকে রাজশেখরের নাটকে এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলাবাহুল্য গীত-গোবিন্দ এবং প্রবন্ধ এই প্রক্রিয়ায় শক্তি জুগিয়েছিল। আর তাই এই সময়েই রাগ ও তালের ব্যবহার ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য হ'য়ে ওঠে।

এই সব কারণেই রাসক এবং ফাগু চতুর্দশ শতাব্দীর আগেই জৈন এবং হিন্দু সাহিত্য ও সঙ্গীতের অন্যতম আশ্রয় বা আঙ্গিক হ'য়ে ওঠে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা সোমসুন্দরের 'রঙ্গসাগর নেমিফাগু' এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'বসন্ত বিলাস' এই ধারার উল্লেখযোগ্য নজির। 'বসন্ত-বিলাস' গীতগোবিন্দের অনুসরণে লেখা হ'লেও স্পষ্ট কামদ-প্রতিবিম্ব রচনায় তা গীতগোবিন্দকেও অতিক্রম ক'রে গেছে। ফলে এটিও পরবর্তীকালের অনেক সাহিত্য-কৃতির অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে অবশ্য নটর্ষির ফাগুরও উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু রাসক, রাস ও ফাগুর কাব্যগীতিরূপ অনেক জৈন সন্ন্যাসীর বেশিদিন ভালো লাগেনি। তখন তারা প্রচলন ক'রলেন গদ্যের। তাই গদ্যেই লেখা হ'ল 'কথা'। কথাসাহিত্যের জনপ্রিয়তার দরুণ অচিরেই গদ্য-সাহিত্য বেশ বিস্তার লাভ ক'রল। অরুণপ্রভা ও সোমশঙ্কর এই রীতিরও অন্যতম লেখক। বিভিন্ন সব উৎস থেকে কথা সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করা হ'তে থাকলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রই 'কথা'-র প্রধান অবলম্বন হ'য়ে ওঠে।

অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর গুজরাতে নাট্যসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার রকমারি এক ধরণের গাথা কাব্যের বা বীর গাথারও প্রচলন ছিল। চতুর্দশ

শতাব্দীর রণমল্লছন্দ এবং কাহ্নাড়দে-প্রবন্ধ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বিনয়সেনের 'রেবন্তগিরি রাস্' ও গঙ্গাবিজয়ের 'কুসুমশ্রীরাস' বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহাসিক কাহিনী নির্ভর এই শ্রেণীর গাথা সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলি অবশ্য গীত না হ'য়ে আবৃত্ত হ'ত।

সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিভিন্ন সব অভিযান এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিপূর্ণ গুজরাতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন, সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য আরো সব ঘটনা আজ ভারতেতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয়। তবুও একথা স্মরণযোগ্য যে গুজরাতের শিল্প—বিশেষ ক'রে সাহিত্য, মিনিয়েচার পেন্টিং এবং নাট্যের প্রচার-প্রতিষ্ঠা এই রাজনৈতিক উত্থান-পতনের যুগে। যে কোনো শিল্পকর্ম সাধারণভাবে তার সময়কে প্রকাশ করে—যদিও প্রাথমিকভাবে মনে হ'তে পারে তা অতীতেরই প্রতিবিম্বমাত্র। আর তাই প্রচলিত রাসকাদির আধারে বিধৃত হ'য়েও গুজরাতী-নাট্যে এই সময়ের সামাজিক ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্র তার সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে উপস্থাপিত হ'তে থাকে। ইতিমধ্যে আবার গুজরাতে আসর জমিয়ে ফেলে ভক্তি-সংস্কৃতি। আর সে আসরে অবতীর্ণ হ'লেন নরসিংহ মেহতা, ভলোন এবং আখোর মত সন্তকবি ও গায়কেরা। এঁরা পৌরানিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে পৌছে দিলেন নতুন যুগের বাণী।

নতুন এই যুগটাকে সম্পূর্ণভাবে ধরার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত গুজরাতেও বিভিন্ন সব রীতি-পদ্ধতি স্বীকার ক'রে পুরনো আঙ্গিক বদলে দিয়ে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলেছিল—যা উনবিংশ শতাব্দী অবধি সমান সক্রিয়তায় অব্যাহত থাকে। ভলোন ছিলেন এই নতুন পথের প্রধান পথিক। তাঁর সমস্ত রচনায় তাই পুরনো বিষয় ও আঙ্গিকে নতুনের ছোঁয়াচ উপলব্ধ হয়। বিষয়গতভাবে মহাভারত ও কৃষ্ণচরিতের দ্বারস্থ হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণচরিত্রের বর্ণনায় তিনি স্বচ্ছন্দে গরবীর ব্যবহার ক'রেছেন। মীরাবাঈ, নরসিংহ মেহতা এবং আরো অনেক সন্তকবি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেছিলেন।

ভাওয়াইকে সম্যকরূপে বুঝতে গেলে গুজরাতী সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুর বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য আজ আর এ দু'য়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কোনোদিন ছিল বলেও মনে হয় না। উপরন্তু ভাওয়াই আজ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ভাওয়াইয়াদের দ্বারাই সংরক্ষিত, ফলে বিশুদ্ধ লোকনাট্য রূপে স্বীকৃত। আসলে লিখিত প্রমাণাদির এবং এমনকি এই শতাব্দীর পাঁচের দশক অবধিও নাগরিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এই ধারণার ও অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে। তবুও মন্দির, বিদগ্ধ সামাজিক ও নাট্যসাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন এই নাট্যে সংস্কৃত নাট্য এবং রাস, রাসক ও ফাগুর অনেক উপকরণ আজও উপলব্ধ হয়। তবে এই সব বিচ্ছিন্নতায় এবং পৌরানিক বিষয়ের প্রতি

অনীহায় ভাওয়াইএর এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে।

প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গুজরাতে ভাওয়াই-এর স্রষ্টা হলেন মেহমানা জিলার উঝার ঔদীচ্য ব্রাহ্মণ অসিত বা অসাহিত। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে গুজরাতী ব্রাহ্মণরা চুরাশিটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। যাইহোক, অসাহিত সিধপুরের এক মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত দর্শনার্থীদের ধর্মগ্রন্থ ও তার ব্যাখ্যা গান ক'রে শোনাতেন। কিন্তু অকস্মাৎ একটি ঘটনায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক নাট্যরূপের স্রষ্টা হ'য়ে ওঠেন। ঘটনাটি হ'লো—এক মুসলিম-রাষ্ট্রপ্রধান প্রতিবেশী গ্রামের মোড়ল এক কনবী হেমানা প্যাটেলের মেয়ে গঙ্গাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়। এতে গ্রামবাসীরা খুবই খেপে যায় কিন্তু ভয়ে গঙ্গাকে উদ্ধার ক'রে আনার কোনো চেষ্টাই করেনা। ঘটনা শুনে অসাহিত সেই মুসলিম-প্রধানের বাড়ি গিয়ে তাকে গান শুনিয়ে খুশি করেন এবং গঙ্গাকে নিজের মেয়ে ব'লে পরিচয় দিয়ে ফেরত চান। গঙ্গা সত্যি সত্যিই অসাহিতের মেয়ে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে সেই মুসলিম প্রধান গঙ্গার সঙ্গে একই থালায় অসাহিতকে খেতে দেয়—কেননা সে জানত কোনো ব্রাহ্মণই কনবীদের মেয়ের সাথে একথালায় আহার করে না। অসাহিত কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন। নিঃসংকোচে তিনি গঙ্গার সঙ্গে এক থালায় ভাত খেলেন। গঙ্গা মুক্ত হ'লো। বিজয়ী অসাহিত গঙ্গাকে নিয়ে গ্রামে ফিরলেন। কিন্তু কনবী-কন্যার সাথে একই থালায় আহার করার জন্যে ব্রাহ্মণরা তাঁকে সমাজচ্যুত করে। স্বভাবতঃই অসাহিত ব্রাহ্মণদের ওপর দারুণভাবে ক্রুদ্ধ হন এবং তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেন। সম্প্রদায়চ্যুত অসাহিত মনোস্থির করলেন যে গান ও অভিনয়কে পেশা ক'রেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। ফলে নিজস্ব পেশার তাগিদেই অসাহিত বেশকিছু 'বেশ' রচনা করলেন। রচনা করলেন সামাজিক অবিচার, ধর্মের নামে ভণ্ডামি এবং অসার ছুৎমার্গী বর্ণভেদ প্রথাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে।

কৃতজ্ঞ গঙ্গার বাবা অসাহিতের ঋণ শোধকরার জন্যে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেন যে অসাহিত বা তাঁর ছেলেরা যে গ্রামেই অভিনয় করতে যান না কেন, সেখানকার গ্রামপ্রধান তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। গঙ্গার বাবা নিজে ছিলেন একজন গ্রাম-প্রধান। তাই আজও গুজরাতের গ্রাম-প্রধানরা তাঁদের এক পূর্বসূরির প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যথেষ্ট যত্নবান। সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা সত্ত্বেও অসাহিত যে সম্মানের সঙ্গে ভাওয়াই অভিনয় ক'রতে পেরেছিলেন তা প্রধানতঃ এই গ্রাম-প্রধানদেরই যত্নবান পৃষ্ঠ-পোষকতায়। আর এর জন্যে অসাহিতের তিন ছেলে রাম, রতনলাল ও মদনলাল কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হ'য়ে অতি স্বচ্ছন্দে বাবার পথ অনুসরণ ক'রে যেতে পেরেছিলেন। অসাহিতের ছেলেরা তরগালা নামে পরিচিত

হন। তরগালার অর্থ তিনটি পরিবার। আজ অবশ্য অসাহিতের বংশধরেরাই 'তরগালা জাতি' হিসেবে পরিচিত। তরগালা জাতি আজ আবার ভোজক, নায়ক, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি উপগোষ্ঠিতে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। ভোজকরা অবশ্য কখনো কখনো নিজে দর ব্যাস বলেও পরিচয় দিয়ে থাকে। আর ভাওয়াইয়ারা ১০ থেকে ১৫ জনের (তবে সাধারণতঃ ১৪ জনের) এক একটি দলে বিভক্ত হ'য়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ভাওয়াই প্রদর্শন ক'রে বেড়ায়। দলের প্রধান বা দলপতি হ'চ্ছেন নায়ক। তিনি একাধারে পরিচালক এবং মঞ্চাধ্যক্ষ। বিভিন্ন গ্রামে ভাওয়াই প্রদর্শন ক'রে বেড়ানোর অনুমতি-পত্রটিও তাঁর নামেই। বাকিদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ চরিত্রের অভিনেতা—এরা 'বেশগর' এবং 'বেশাচার্য'—এই দুই ভাগে বিভক্ত। যিনি নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি বেশগর এবং সহনায়ক চরিত্রে রূপদানকারীকে বলা হয় বেশাচার্য। কয়েকজন আবার থাকেন নারী-চরিত্রে রূপদান করার জন্য। এই নারী-চরিত্রাভিনেতাদের বলা হয় কাঞ্চালিয়া। আর থাকে বিদূষক বা ভাঁড়। ভাওয়াই এর পরিভাষায় এরা হলো রঙ্গলো। আলোর জোগানদারকে বলা হয় মশালচী। দলে আরো থাকে কয়েকজন যন্ত্রী এবং গায়ক। এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী ও অভিনেতাদের নিয়ে গঠিত ভাওয়াই-এর দলগুলি সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী এই ছয়মাস ভাওয়াই প্রদর্শন ক'রে বেড়ায়। রীতি অনুসারে এই ছয়মাস দলের সকলেই ব্রহ্মচর্য পালন করে। কেননা এদের ধারণা নারী সংসর্গ সুষ্ঠভাবে ভাওয়াই প্রদর্শনের পরিপন্থী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় কুস্তীগীররাও অনুরূপ ধারণা পোষণ ক'রে থাকে। সে যাইহোক, গ্রামপ্রধান ও গ্রামবাসীর সযত্ন পৃষ্ঠপোষকতায় ভাওয়াইয়ারা এখনো বেশ বহাল তবীয়তে টিকে আছে। অর্থাৎ দেখাযাচ্ছে যে, ভাওয়াই-এর প্রতিষ্ঠায় অসাহিতের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিল্প-প্রতিভা যেমন দায়ী তেমনি ভাওয়াই-এর প্রচারে ও সংরক্ষণে গুজরাতের গ্রাম-প্রধানদের দায়ও সমান শ্রদ্ধায় স্বীকৃত।

গুজরাত থেকে যেসব লোক রাজস্থান ও মালওয়ায় আসে, মুখ্যত তারাই দূর-দূরান্তে ভাওয়াই-এর প্রসার ঘটায়। কিন্তু ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির একজন উল্লেখযোগ্য গবেষক—দেবীলাল সামর মনে করেন যে রাজস্থান ও মালওয়াতেই ভাওয়াই-এর উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি কাহিনীরও উল্লেখ করেছেন। কাহিনীটি হ'লো—"আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে রাজস্থানের গ্রামদেশে সাম্প্রদায়িকতা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ধনী-নির্ধন সম্পর্কের ফারাক—আসমান জমিন হ'য়ে ওঠে, পারিবারিক জীবনেও দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। ফলে শিল্প হয়ে ওঠে ব্যাভিচার ও বিলাসব্যসনের উপকরণ। আর তার ফলে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ একে তিরস্কারযোগ্য বলে মনে করতে থাকে। তবে এ সম্পর্কে রাজপুত—বিশেষ করে জাঠদের ধারণাটা ছিল একটু অন্যধরনের। ঠিক

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের বাঙালীর মতই এরাও মনে ক'রত—"অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়, নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা জন।" আবার এদেরই একজন নাগাজী ছিলেন কিন্তু একেবারেই ভিন্নধরনের মানুষ। তাঁর বাড়ি ছিল রাজস্থানের ককড়ী গ্রামে। ছেলেবেলা থেকেই নাচগানের প্রতি ছিল তার আন্তরিক ঝোঁক। জাঠেদের এটা পছন্দ হয়নি। তাই তারা মাদল বর্শা ও ভুঙ্গল সহ নাগাজীকে তাদের সম্প্রদায় থেকে বার করে দেয়। অবশ্য নাগাজীকে তারা তাদের সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করার অধিকারও দেয়। সেখান থেকেই নাগাজী ও তাঁর বংশধরেরা ভাওয়াই প্রদর্শনের মাধ্যমে জাঠেদের মনোরঞ্জন ক'রে আসছে। জাতি হিসেবে এরাও ভাওয়াই বলে পরিচিত।

নাগাজীর অনুরূপ ভাগ্যদশা সম্ভবত অন্যান্য জাতির আরো অনেক নাচগান পাগল মানুষের কপালে ঘটে থাকবে। কেননা নাচগান ও অভিনয়কে বংশ ও জাতিমর্যাদার হানিকারক মনে করাটাই ছিল মধ্যযুগীয় সংস্কার। সুতরাং রাজস্থানে 'ভাওয়াই' তিরস্কৃত ও জাতি থেকে বহিষ্কৃত নৃত্যগীত পাগল ব্যক্তিদেরই একটি সংগঠনে পরিণত হয়। নিম্নবর্ণের লোকেরাও সামাজিক অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে এবং ভাত কাপড়ের সংস্থান করতে এই সংগঠনে যোগ দেয়। ফলে জাঠ, ধাঙড়, ভীল, গুর্জর, লোদা, কেশাওত প্রভৃতি জাতির ভাওয়াই আজও রাজস্থান এবং মালওয়ায় দেখা যায়। গুজরাতের ভাওয়াই (লোকনাট্য) রাজস্থানের এই ভাওয়াই (নৃত্যনাট্য)-এর খুব কাছের জিনিস।

অসাহিত্যের মত নাগাজীর বংশধরেরাও অম্বা বা শীতলাদেবীর ভক্ত। তাই কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ভাওয়াই শব্দের উৎপত্তি ভু-আয়ী (বা বসন্তের দেবী শীতলার অনুগৃহীত) থেকে। আবার অন্যরা এর ব্যুৎপত্তি গত তাৎপর্য নির্ণয়ে 'ভাব' ও 'আহী'-তে ভেঙেছেন এবং অর্থ করেছেন ভাবের বিতরক। যাই হোক এ সমস্ত থেকে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হ'লো—(১) যারা ভাওয়াই প্রদর্শন করে তারা সামাজিক দিক থেকে তথাকথিতভাবে নিম্নস্তরের, (২) এরা সকলেই শক্তি, অম্বা এবং শীতলার ভক্ত এবং (৩) এদের কোনো স্থায়ী বসবাস নেই—এরা যাযাবর।

তবে ভাওয়াই নাট্য কিন্তু শুধুমাত্র এই যাযাবর প্রকৃতির ভবঘুরেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তুরী, ভীল প্রভৃতি উপজাতির লোকেরাও ভাওয়াই প্রদর্শন ক'রে থাকে। এছাড়া নবরাত্রি-উৎসবে গরবা ও গরবীর মত ভাওয়াইও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। এখানে ভাওয়াই অম্বাদেবীর উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত ধর্মীয় কৃত্যাদিরই অঙ্গ বিশেষ। ফলে তখন ভাওয়াইতে ব্রাহ্মণ, শুদ্র এমনকি বেশ্যারাও যোগ দিয়ে থাকে। কেউ সাময়িক অর্থোপার্জনের তাগাদায় আবার কেউবা অবসর বিনোদনের নিছক আনন্দে।

এই সামাজিক পটভূমিকায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ ও সামাজিক ব্যঙ্গ

পরিহাস মূলক নাট্য-আঙ্গিক রূপে ভাওয়াই-এর উদ্ভব হ'য়েছিল। এই সময় অবশ্য ভারতের কোথাও সমাজের সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কোনো নাট্য আঙ্গিক ছিল না। তবে নবরাত্রি উৎসবের প্রধান দেবী অম্বা বা শীতলাকে ঘিরে এই নাট্য আঙ্গিকের সাহায্যে গুজরাতের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তাদের লৌকিক বা অলৌকিক উপলব্ধির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হ'য়েছিল। ভাওয়াই-এর ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কোনো ধর্মীয় সংস্কার মতে গ্রামের মঙ্গল নির্ভরশীল ছিল সবগ্রামবাসীরই এই ভাওয়াইতে অংশগ্রহণের ওপর। তাই সকল গ্রামবাসীই এতে অংশ নিত।

অসাহিত ঠাকুরের সমাজচ্যুতি থেকেই গুজরাতে রাতারাতি ভাওয়াই-এর আবির্ভাব ঘটেনি। এই সময়ে গুজরাতে প্রচলিত রাস, রাসক, কথা এবং অভিমলগ্নের সংস্কৃত নাটক ও সঙ্গীত বিষয়ে সম্যকজ্ঞান অসাহিত ঠাকুর কিংবা নাগারা ব্রাহ্মণদের ছিল। ভাওয়াই-এর প্রতিষ্ঠাকল্পে ঠাকুর বেশ সাহসের সঙ্গে পুরনো সেই নাট্য-আঙ্গিকগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। পুরনো আঙ্গিকগুলি থেকে যে সাধারণ উপাদানটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাহ'লো গুজরাতের গ্রামদেশে চর্চিত বিভিন্ন ধরণের শারীরিক কসরৎ। এরমধ্যে ছিল বেড়ানৃত্য বা পাত্রসহ-নৃত্য—যা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। বীরত্বব্যঞ্জক অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াদিরও সযত্ন আশ্রয় মিলেছিল এই নতুন নাট্য-আঙ্গিকে। আহৃত উপাদান-গুলি যদিও পরস্পরবিরোধী এবং বিভিন্ন সামাজিক স্তরের ও বিভিন্ন ঘরানার —তবুও তাদের এই সম্মিলন নতুন এক নাট্য-আঙ্গিকরূপে ভাওয়াই-এর নির্মিতিতে কোনোরূপ বাধা হ'য়ে ওঠেনি।

মন্দির চত্বরেই হোক কিংবা কোনো খোলা জায়গাতেই হোক, নবরাত্রি উৎসবে ভাওয়াই-এর অভিনয় কিন্তু বেশ ধুমধাম ক'রেই হয়। বাঁধাহয় বড়সড় প্যাণ্ডেল বা মণ্ডপ। খেজুরের পাতা, ফল ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তা খুব ক'রে সাজানো হয়। তবে একেবারেই সাধারণ ভাবে। অকারণ জাঁকজমক প্রশ্রয় পায়না একেবারে। চারটি কোনের খুঁটি থেকে গুটিকাযুক্ত পর্দাও প্রায়ই টাঙানো হয়। আর অম্বা বা শক্তিদেবীর প্রতিনিধিত্ব করে 'গরবী' নামে মাটির একটি ঘট কিংবা 'মন্ডবী' নামে কাঠের একটি বিশেষ ধরনের কাঠামো। কখনো কখনো এটিকে রাখাহয় প্যাণ্ডেলের একপাশে। আবার কখনো বা অভিনয় ক্ষেত্র থেকে ১০০ ফুট দূরবর্তী নেপথ্যগৃহে দেবীর প্রতীক-স্বরূপে একটি ত্রিশূল সাদা ফুটকি দিয়ে এঁকে নেয়া হয়। এই ত্রিশূলের সম্মুখে দু'খানি ইটের ওপর রাখাহয় মাটির একটি প্রদীপ। সর্ষের তেলে তা লকলক ক'রে জ্বলতে থাকে। প্রদীপের এই শিখাই শক্তিস্বরূপা অম্বাদেবীর প্রতিমূর্তি—যা সমস্ত অন্ধকার দূর ক'রে আলোয় ভাসিয়ে দেয় জগৎসংসার। অভিনেতারা তাই অভিনয়ের জন্যে অপেক্ষিত শক্তি আহরণের তাগাদায় ধুপধুনা, ফলমূল কর্পূর

নারকেল এবং সাদা ও লাল আবীর ছড়িয়ে এর পুজো দেয়। পবিত্র শিখায় হাতদুখানি গরম এবং শুদ্ধ ক'রে চোখে ও কপালে ছোঁয়ায়। তারপর সেই হাতদিয়ে প্রদীপের পবিত্র তেল নিয়ে মুখে মেখে মেকআপে বসে। মেকআপ হ'য়ে গেলে সকলে মিলে দেবীর স্তুতিতে 'গরবী' গায় এবং সমবেতভাবে পৌধে বা 'চাচরে' যায়। 'পৌধ' হ'লো দশফুট ব্যাসার্ধ—বিশিষ্ট অভিনয়ক্ষেত্র। নায়ক তাঁর কোমরের তরবারির ডগা দিয়ে এর সীমানা নির্দ্ধারণ করে দেন। একে চাচরও বলা হয়। 'পৌধ' ঘিরে চতুর্দিকে বসে দর্শক। তবে নেপথ্যগৃহ থেকে পৌধে আসার জন্যে দর্শকদের মধ্য দিয়ে একটি সরু রাস্তা থাকে। রাস্তাটি পৌধের যেদিকে এসে মেশে তার বিপরীত দিকে বসে যন্ত্রীরা। কেননা নেপথ্য থেকে পৌধে আসার মুহূর্তটুকুও ভাওয়াই এর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নেপথ্য থেকে বেরুলেই অভিনেতা যাতে যন্ত্রীদের নজরে পড়ে তার জন্যে এই ব্যবস্থা। যন্ত্রীদের মধ্যে একজন থাকে পাখোয়াজী, একজন করতালী, একজন নরঘন (নাকাড়া)-বাদক, একজন সারেঙ্গী বাদক এবং দু'জন ভুঙ্গল বাদক। বাজনার সময় ভুঙ্গল ও নাকাড়া বাদকরা দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যরা অবশ্য বসেই তাদের যন্ত্র বাজায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আজকের অন্যান্য ভারতীয় লোকনাট্যর মত ভাওয়াইতেও হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হ'চ্ছে। গ্রামদেশে এর জনপ্রিয়তাও খুব বেশি। নায়ক এবং রঙ্গলো, 'বেশ' চলাকালীন এই যন্ত্রীদের মধ্যেই বা পাশে বসে থাকে। যাইহোক, তরবারির ডগায় এই ভাবে নির্দিষ্ট একটি 'পৌধ'—এক অতি পবিত্র স্থান। নাট্যকর্মী ব্যাতিরেকে অন্যকারও এখানে প্রবেশধিকার নেই। অভিনেতারা মঞ্চে এসে বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে আরো পাঁচখানি স্তুতিগান করে। এই সময় যন্ত্রীরা উঠে দাঁড়িয়ে দেবীর আবাহন করে—সঙ্গে নায়ক আবৃত্তি করে একটি শ্লোক। এই শ্লোকের বক্তব্য হ'লো—"হে দেবী। আবির্ভূতা, হও। আমাদের আশীর্বাদ করো।" প্রথম স্তুতিগানের সময় ভুঙ্গল ছাড়া অন্যকোনো যন্ত্র বাজেনা। কোনো নৃত্যও পরিবেশিত হয় না। সকলেই ধ্যান গম্ভীর থেকে মায়ের আগমনের উপযুক্ত এক পবিত্র মুহূর্ত রচনা করে। পরবর্তী দৃশ্যে যাকে অবতীর্ণ হ'তে হবে কেবল-মাত্র সেই শান্তভাবে নেপথ্যে ফিরে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্তুতিগান শেষ হ'লে অভিনেতারা নেপথ্যে ফিরে যায়। আবার কোথাওবা যন্ত্রীদের সঙ্গে বসে থাকার চলও আছে।. তবে সেসব ক্ষেত্রেও অভিনেতা তার প্রবেশ মুহূর্তের সামান্য আগে নেপথ্যে চলে যায়। আসলে ভাওয়াই অভিনেতা-মাত্রই ভাওয়াইয়ে ব্যবহৃত কোনো না কোনো যন্ত্র বাজাতে সক্ষম। তাই অভিনয় অবসরে তারা যন্ত্রীদের মধ্য ব'সে যন্ত্রীদের বিশ্রাম নিতে সাহায্য করে তার প্রিয় যন্ত্রটি বাজিয়ে। সে যাইহোক, এসমস্তই কিন্তু ভাওয়াই-এর অবশ্য-পালনীয় পুর্বরঙ্গ বিধি—যা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যক্ষগান

এবং ছৌ-তেও অনুরূপ সব আচরণ বিধি লক্ষ্য করা যায়। এর নাটকীয় গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঘট-পূজার সামাজিক তাৎপর্যও বড় কম নয়। কেননা উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ঘটের গুরুত্ব কৃষিপ্রধান এই দেশের সর্বত্রই সমানভাবেই স্বীকৃত। নাটকের ক্ষেত্রে ভাওয়াই ময়ূরভঞ্জ এবং সরাই-কেল্লার ছৌতেও এই ঘট-পূজার বিস্তারিত আয়োজন লক্ষ্যকরা যায়। অবশ্য পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই এই প্রয়োগবিধিতে ›াদৃশ্য লক্ষ্যকরা যায়, লক্ষ্যকরা যায় শক্তি ও সম্পূর্ণতার প্রতীক হিসেবে ঘট-এর ব্যবহারে। একথা এমনকি আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রতীকী ঘট নিয়ে এ:দর আচার-অনুষ্ঠান এবং বৈচিত্র্যময় শিল্পকর্মের সঙ্গে চাষবাসের এক গভীর বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

এই ধর্মীয় আচর-বিধি সাঙ্গ ক'রে অভিনেতারা বাদ্যযন্ত্রীদের পাশে জায়গা নিলে বা নেপথ্যে ফিরে গেলে যন্ত্রীদের মধ্য থেকে দু'জন 'দশাবতার' ভঙ্গীতে 'আবৃত্তী' বা 'আবহু' গায়। 'আবৃত্তী' বা 'আবহু'র শব্দগত অর্থ হ'লো—প্রবেশ বা আগমন। এরপর কিছুক্ষণ ধ'রে বাজানো হয় তামার দীর্ঘনল-যুক্ত বায়ুযন্ত্র ভুঙ্গল। তীব্র আওয়াজে তা অভিনেত:দের পুনরায় মঞ্চে এসে এক বা একাধিক 'বেশ' অভিনয় করার নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভাওয়াই অভিনয়ে এই ভুঙ্গলের গুরুত্ব অপরিসীম। অভিনয় যে আরম্ভ হ'তে চলেছে তীব্র আওয়াজে ভুঙ্গল তা দর্শক ও অভিনেতাদের জানিয়ে দেয়। অভিনেতাকে পোৈধে প্রবেশের এবং পোৗধ থেকে প্রস্থানের নির্দেশ দেয়। যুদ্ধের হার-জিত বা অনুরূপ সব রোমাঞ্চকর ঘটনা এবং নাটকের মোড় পরিবর্তনের সূচনাও এই ভুঙ্গলের আওয়াজ থেকেই পাওয়া যায়। ভাওয়াই-এর দর্শক বসে পোৗধ ঘিরে বৃত্তাকারে। ফলে ষাট-সত্তর হাত দূরের নেপথ্যগৃহ থেকে বেশভূষায় সজ্জিত অভিনেতা মশাল হাতে বের হ'লেই তার পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে ভুঙ্গল তার তীক্ষ্ণ আওয়াজে দর্শককে সতর্ক ক'রে দেয়।

ভাওয়াই-এর এক একটি পালাকে বলাহয় 'বেশ'। প্রায় অনুষ্ঠানেরই প্রথম বেশ হ'লো গণেশ আরতি। গণেশ হলুদ সিল্কের ধুতি এবং সিল্কের জামা পরে। পায়ে দেয় ঘুঙুর আর গলায় পরে ফুলের মালা। তবে কোনো মুখোশ পরেনা। পরিবর্তে মাথায় একটি টুপি প'রে চচকে পিতলের একখানি থালা হাত দিয়ে মুখের সামনে ধ'রে সেটিকে পর্যায়ক্রমে সমান্তরাল ও লম্বভাবে ঘোরাতে থাকে। কোনো ব্যক্তিরই গণেশের রূপদান করা ঠিক নয়। তাই থালাখানি অভিনেতার মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে সাহায্য করে। অবশ্য থালাখানি ঘোরানোয় অভ্যস্ত অভিনেতা থালার ফাঁক দিয়ে তার ঐশ্বরিক দৃষ্টিপাতের অবসর সৃষ্টি ক'রে নেয়। এতে ক'রে মুখ্য দেবতা হিসেবে গণেশের মাহাত্ম্য অনেক বেড়ে যায়—যা অন্যকোনো রীতিতেই সম্ভব নয়। যাইহোক, গণেশের এই অতি প্রভাবশালী নাচ যখন শেষ হয় তখন মশালধারী নাপিত বা মশালচী দর্শকদের মধ্যদিয়ে

নেপথ্যগৃহে যাওয়ার রাস্তায় তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্যে আলো ধরে। ভাওয়াই এর অনুষ্ঠানে এই মশালধারী বা মশালচীর ভূমিকা খুব বেশী। মূলতঃ সে দেবীর একনিষ্ঠ-ভক্ত। তাই মশাল ধ'রে সারারাত জেগে সে মঞ্চের একপাশে বসে থাকে। মশালটি যাতে কখনোই নিবে না যায় তার জন্যে পিতলের দণ্ডের মাথার ন্যাকড়াটি সে প্রায়ই তেলে ভিজিয়ে নেয়। যখনই কোনো অভিনেতা বিশেষ এক ভঙ্গি ক'রে দাঁড়ায়—তখন তার সে ভঙ্গীতে নাটকীয় গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে সে দৌড়ে গিয়ে তার মুখের কাছে জলন্ত মশালটি ধরে এবং অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গে সেও মঞ্চ পরিক্রমণ করে। কখনো কখনো রাজার বা অন্যকোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুচর বৃন্দের দলে যোগ দেয়—তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির মাত্রা-বৃদ্ধি ঘটায় এবং প্রয়োজন মত তাঁর হস্তোপকরণেরও জোগান দেয়। কখন কিভাবে কোথায় মশাল ধরতে হবে কিংবা কার হাতে কখন কোন্ জিনিষের জোগান দিতে হবে সে সব ব্যাপারে মশালচী খুবই ওয়াকিবহাল। তাই সারারাত তাকে মশাল জ্বালিয়ে অতি সতর্কভাবে মঞ্চেই উপস্থিত থাকতে হয়। আলোক-প্রক্ষেপকের এই প্রত্যক্ষ মঞ্চ উপস্থিতি ভাওয়াই-এর এক অন্যতম চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য।

'প্রথম বেশ' গনেশ আরতির পর মঞ্চে আসে ভাওয়াই-এর ব্রাহ্মণ স্টক ক্যারেকটার। সে তার গোড়ালিহীন যতদূর সম্ভব একে অপরের সংশ্লিষ্ট রেখে এই বেশখানি পরিবেশন করে। প্রায় অনুষ্ঠানেই এরপর মঞ্চে আসে 'ভবা আর তার বউ জড়তী'। তৃতীয় বেশ হিসেবে কখনো কখনো পরিবেশিত হয় 'জুঠনমিঞা'। 'জুঠনমিঞা' মূলতঃ অনুকরণধর্মী একখানি হাস্যকৌতুক। সত্যি-কথা বলতে কি জুঠনের মত এরকম এক অসাধারণ চরিত্র ভারতীয় নাট্যে খুব কমই আছে। এই বেশখানির রচয়িতা অসাহিত ঠাকুর নিজে। প্রথা অনুসারে রঙ্গলোই জুঠনের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে থাকে। সে মাথায় পরে রঙ বেরঙের ঝুরি নামানো শঙ্কু-আকৃতির টুপি। টুপিটির গোড়ায় আবার পাগড়ীর মত একটি অংশও থাকে। আর পায়ে পরে ঘুঙুর। সরু পাজামার ওপর শার্ট ও তার ওপর পরে একটি ফতুয়া। সাজ-পোষাকে বাস্তবতার ছোঁয়াচ সত্ত্বেও তার মেকআপ কিন্তু একেবারেই বাস্তব বর্জিত। তবে থিয়েট্রিকালি এর গুরুত্ব অপরিসীম। সাদা প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর সাদা ও কালো রঙের ফুটকি দিয়ে সে তার মুখখানি একেবারেই অবিশ্বাস্য ক'রে নেয়। অবিশ্বাস্য সব মিথ্যে কথা ব'লে সে সত্যবাদিতার ভাণ করে। যেভাবে সে দর্শকদের অভিনন্দন জানায় তাও অদ্ভুত রকমে হাস্যকর—"বসে থাকা দর্শকদের জানাই বসেথাকা সালাম, দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের জানাই দণ্ডায়মান সালাম, মোটাকে জানাই মোটা সালাম, রোগাদের রোগা। তার লম্বাদের লম্বা এবং বেঁটেদের বেঁটে।" অভিনন্দন

জানিয়ে জুঠন তার লাল টকটকে জিব বের ক'রে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে একটু নেচে নেয়। হৈ-চৈ ক'রে কোনো কোনো বিশেষ ধরণের স্ত্রীলোকের, রাজার এবং কুস্তীগীরের অনুকরণ করে এবং এদের দ্বারা সে কিভাবে অত্যাচারিত হ'য়েছে তা অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলে। খুবই গর্বিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তার গর্ব বা দম্ভ প্রকাশের ঢঙে খুব সহজেই বোঝা যায় যে তার মত বোকার হদ্দ আর নেই। তার অনৃতভাষণ ভাওয়াই দর্শকদের কাছে অতি লোভনীয় একটি বিষয় যেসব কথা বলে সে তার দম্ভ প্রকাশ করে, সেগুলির অন্যতম হ'লো "আমি দুধের সমুদ্র দেখেছি", "কাটারীর এককোণে বুড়ো আঙুল কেটে ফেলে আমি আবার তা জোড়া লাগাতে পারি"। "আর যে কোনো তরবারিই আমি দাঁত দিয়ে কড়মড় ক'রে চিবিয়ে একেবারে গুঁড়ো ক'রে ফেলতে পারি।" অসম্ভবকে পেতে চায়, সম্ভব করতে চায় যেসব মানুষ—তাদেরই যথেচ্ছ কল্পনার ভাষ্য অথবা দৃশ্যরূপ এগুলি। প্রয়োজনের তাগাদায় বিপদ এড়াতে সে যেকোনো ধরণের মিথ্যার দ্বারস্থ হয়। তাই সত্যের কাছে সাধারণ মানুষের যে দায়ভার তা হালকা ক'রে দিয়ে দর্শকদের সে মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। জুঠন-মিঞার দুই বিবি—তারা আবার হিন্দু। একজন হ'লো ছোটকী অন্যজন হ'লো মোটকী। দুইবিবি মিলে সকল সময়ই তাকে জ্বালাতন করে। তার সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাকে বোকা বানায়। কিন্তু বিবিদের কাছে হারবার পাত্র সে নয়। এই সময়ে জুঠন সত্যকার এক পুরুষ হ'য়ে ওঠে। পিতৃতান্ত্রিক এই ব্যাবস্থায় মেয়েদের কাছে ঠিক যেমন পুরুষ হ'তে হয় আর কি। সব কিছুতেই সে হাসিখুশি থাকে। ভাবটা এই যেন কোনো কিছুতেই সে দুঃখ পায় না। সে যে আশাবাদী এটা প্রমাণ করার জন্যেও সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাই সে যে কোনো ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখায়। ফলে লাফ দিয়ে বেড়া টপকায় এবং যেকোনো সাহসিক কাজে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে।

কিংবদন্তী অনুসারে জুঠন বোখারার নবাব। সত্যের অনুসন্ধানে তিনি এক ছদ্মবেশী। একবার তিনি সসৈন্যে গজনী অভিযানে চলেছিলেন। পথে মালবোঝাই একটি উট হঠাৎই মারা যায়। তিনি তখন মন্ত্রীকে আদেশ করেন —উটটিকে দাঁড় করিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলার। কেননা, নবাবের মনে হ'য়েছিল উটটি মহান রাজকীয় সময়ের অপব্যয় করছে। মন্ত্রী তখন নবাবকে বুঝিয়ে বলেন যে—উটটি মারা গেছে—তার আত্মা তার দেহ ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। ফলে তার চলার সব শক্তিই আজ নিঃশেষিত। কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রী জানান—কোনো ভারতীয় যোগী কিংবা পারলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই কেবলমাত্র এর কারণ বলে দিতে পারে। পরে অবশ্য নবাব জানতে পারেন

মৃত্যু কি। তখন তাঁর এ সত্যোপলব্ধি হয় যে উটটির মত তিনিও একদিন মারা যাবেন। তখন তিনি তাঁর সৈন্যদের ডেকে তাদের ঘাড়ে সিংহাসনের ভার দিয়ে ছদ্মবেশে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। সত্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারতের একটি শহরে দাম্ভিকের মুখোশ প'রে জুঠন (বা ঝুঠন) হ'য়ে ওঠেন।

জুঠন জগতের সমস্ত মিথ্যাভাষণের দায় কাঁধে নিয়ে মানুষকে মিথ্যাভাষণের পাপকর্ম থেকে মুক্ত করে। জগতের সমস্ত বিষ পান ক'রে জুঠন তাই নীলকণ্ঠ হ'য়ে আছে।

জুঠন মিঞার পর পরিবেশিত হয় 'কাজোরা'। চারমনী এক বৌ-এর আধমনী এক বালকস্বামীর দাম্পত্য জীবন-সম্বলিত স্থূল হাস্যরসাত্মক একখানি 'বেশ' এটি। বউটি যখন—"আমার পোড়া-কপাল একটি দুধের বাচ্চা আমার বর। বাপমাই এই অঘটন ঘটিয়ে আমার স্বাদ-আহ্লাদের মুখে ছাই দিয়েছে। আমি বিছানায় গেলে সে পাশ ফিরে শোয় এবং ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে নাক ডাকায়। সোহাগ ভরে হাতধরলে সে নাকিসুরে কাঁদে। হ্যাঁ, আমি একটু মোটা, কিন্তু আমার বর? তাকে যে আমি অনায়াসেই কোলে নিতে পারি, হাতে করে দোলাতে পারি। হায়! হায়! এ পোড়াকপালের কথা আমি আর কাকে জানাবো।"—প্রভৃতি ব'লে বিলাপ ক'রে তার দুঃখভরা বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, আর তখন দর্শক সমুদায় হেসে একেবারে লুটোপুটি খায়।

অসাহিত ঠাকুরের এই বেশখানিতে পাঁচশো বছর আগেকার গুজরাতের সামাজিক অবস্থা সুন্দররূপে প্রতিফলিত। তবে এখনও অধিকাংশ বিয়ের ঘটকই নব-দম্পতির বাবা-মা। তারাই দেখেশুনে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়। আর ছেলেমেয়ের প্রথম পারস্পরিক সাক্ষাৎঘটে বাসরঘরে। আমাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অসাম্য, অস্বাস্থ্যকর যৌন-সম্পর্ক এবং পারিবারিক কলহকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করা হ'য়েছে এই বেশখানিতে। দর্শকদের উপভোগ্যতার দিক থেকেও কাজোরার জুড়ি নেই।

মধ্যরাত্রে কাজোরা দেখে দর্শক যখন হেসে লুটোপুটি খায় তখনই পরিবেশিত হয় গম্ভীর প্রকৃতির নাটক "ছৈল-বটাউ"। সামাজিক অবিচার ও প্রেম এর মুখ্য বিষয়। নায়ক ছৈলকে প্রশ্ন ক'রে ক'রে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে চলে। উত্তরে ছৈল নিজের পরিচয় দেয় এবং নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। ছৈল নায়ককে একথাও জানায় যে সে এখন তার প্রেমিকা মোহনরাণীর কাছে যাচ্ছে। নায়ক তখন শৌর্য বীর্য-যুক্ত নারী অপহরণ এবং বিশ্বাসঘাতকতায় পরিপূর্ণ ও প্রতিমুহূর্তে শিহরণ জাগানো এই বেশখানির বর্ণনা দেয়।

অভিনেতারা নাচ গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে তা দৃশ্যায়িত ক'রে তোলে। অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন সব ঘটনাও সন্নিবেশিত হয় দর্শকদের চাহিদা অনুসারে। সাধারণতঃ এরকম সময়েই অভিনীত হয় পুরবীয়া। এই বেশে এক পানবিক্রেতা মহিলা পূর্বদেশীয় এক আগন্তুক পুরবীয়ার সঙ্গে পথে বেরোয় তার স্বামীর ঘর ছেড়ে। আর পুরবীয়া তখন মহানন্দে তার নারীর জুতোগুলো বেঁধে মাথায় ক'রে ব'য়ে নিয়ে চলে। ভাঁড় রঙ্গলো তখন তাকে নিয়ে মস্করা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং হাসিঠাট্টা করে। পুরবীয়ার সঙ্গে রঙ্গলোর যেসব কথাবার্তা হয় তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ :—

রঙ্গলো—তুমি তোমার মেয়েমানুষের জুতো মাথায় ক'রেছো। গুজরাতের কোনো অতি স্ত্রৈণও অতটা নীচে নামে না।

পুরবীয়া—কেন, তোমাদের দেশের পুরুষ মানষেরা কি কখনোই তাদের মেয়েমানুষকে সাহায্য করে না ?

রঙ্গলো - না। আমাদের দেশে যেসব পুরুষের তাগড়াই গোঁফ (নিজের গোঁফে তা দিয়ে) আছে, তারা কখনোই তাদের বৌদের সাহায্য করেনা। তবে কিনা তাদের মাসিকের সময় তাদের বৌএর রক্তমাখা শায়া কেচে দেয়াটা খুব একটা অন্যায় কিছু ব'লে মনে করেনা।

সামাজিক দিকথেকে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে এজাতীয় ঘটনা ঘটে থাকে। মস্করাছলে রঙ্গলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এদিকে। গ্রাম্য মজলিশে যেসব স্বভাব স্ত্রৈণ নিজেদের পৌরুষ নিয়ে খুব বড়াই করে—এই সব 'বেশ'-এ তাদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়। বেশখানি পরিবেশন করতে প্রায় ঘণ্টাচারেক সময় লাগে।

আরেকখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় বেশ হ'লো 'ঝাণ্ডা ঝুলন'। মতিরাম নায়েক এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বেশখানি রচনা করেছিলেন। ঝাণ্ডাঝুলনে এক কৃপণ হিন্দু-বনিকের স্ত্রী সুন্দরদর্শন এক মুসলমান যুবকের প্রেমে পড়ে। এতে বণিক খুবই ক্রুদ্ধ হয়। সে তখন সমস্ত গ্রামবাসীকে ঐ মুসলমান যুবকটির বিরুদ্ধে তাতিয়ে তোলে। ফলে বণিকের বৌ শেষাবধি তার স্বামীর আনুগত্য স্বীকার ক'রে নেয়। আর প্রেমে ব্যর্থ হ'য়ে মুসলমান যুবকটি ফকিরী নিয়ে গ্রামঘর ছেড়ে দেয়।

এরপর পুবআকাশ যখন লাল হ'য়ে ওঠে তখন পরিবেশিত হয় মিক্রা বিবি পথন (আদিবাসী), মারওয়াঁরা (মারোয়ারী স্ত্রীলোক), বাবা, খেড় (ঝাড়ুদার) প্রভৃতি ছোটো ছোটো বেশগুলি। ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার পক্ষে এগুলি খুবই কার্যকরী। চরিত্রের দ্রুত পরি-

বর্তনের জন্যে এই বেশগুলিতে বহুরূপী অভিনেতার বেশ বদলানো ও অভিনয় ক্ষমতার পরীক্ষা হ'য়ে যায়।

অতি প্রত্যূষে দর্শক যখন ঝিমুতে থাকে, এই বেশগুলির সাহায্যে তখন পেটফাটা হাসির খোরাক জুগিয়ে চাঙ্গা করে তোলা হয়। কেননা অধিকাংশ অনুষ্ঠানেরই শেষবেশ হ'লো 'রামদেব'। বৌদ্ধিক সতর্কতা ও মানসিক স্থিরতা না থাকলে এই বেশখানির রসাস্বাদন সম্ভব নয়। রামদেব সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ একখানি বিশুদ্ধ বেশ। এই বেশখানিতে অসাহিত যন্ত্রীদের, অভিনেতাদের দর্শকদের এবং রঙ্গস্থলে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। আরম্ভেই নায়ক এইভাবে শুরু করেছেন—"ঢোলকরা এখানে শান্তভাবে বসে। আর দর্শকরা বসে এখানে—প্রয়োজনে তারা হাততালি দেবে। এই জায়গাটি নির্দিষ্ট ভুঙ্গল বাদকদ্বয়ের জন্যে। আর ঠিক এদের ঐ পাশটিতে থাকে রঙ্গলো। অসাহিত ঠাকুর বলেন এখন পরিবেশিত হবে রামদেব। অম্বামাতাকে শ্রদ্ধা জানাতে অনেকেই এখানে সমবেত হ'য়েছেন। চিরন্তনী পবিত্র শিখাটি লকলক্ ক'রে জ্বলছে। ইতিমধ্যেই বিখ্যাত সব অভিনেতারা নাচ ও গানের সাহায্যে মাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমি তো তাদের পদধুলির যোগ্য। তবুও আপনারা শান্ত হ'য়ে বসুন। কেননা তদ্‌গত চিত্তে ভাওয়াই শুনলে আম্বামাতা তার মনোবাসনা পূর্ণ ক'রে দেন। জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা সব এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্যে আমার অজ্ঞতা ও বোকামি দূর হোক। আর যদি কম বা বেশি ব'লে ফেলি—"হে মা অপরাধ নিও না।"—এরপর তিনি অম্বার প্রশস্তিতে একখানি ভক্তিগীতি গান।

রামদেব শেষ হ'লে মঞ্চে শেষবারের মত দেবীর বন্দনা করা হয়। তাঁর পৌধের মধ্যে বন্দনার তালে তালে ঘুরতে থাকেন রানী ও গণেশ। তীক্ষ্ণ আওয়াজে বাজে ভুঙ্গল। রব তোলে ঢোলক। বন্দনা শেষ হ'লে অভিনেতারা এক বিশেষ পদ-বিক্ষেপে ফিরে যায় নেপথ্যে। যন্ত্রী, মশালচী সকলেই তাদের অনুসরণ করে। সেখানে দেবীর প্রশস্তিতে শেষ গানটি গাওয়া হয়। এরপর অভিনেতারা মায়ের প্রতীকস্বরূপ প্রদীপটি তার পূর্বস্থান থেকে সরিয়ে নেয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এইভাবে সরিয়ে নেয়া প্রদীপের শিখায় অম্বা আর অবস্থান করেন না। এইভাবেই সারারাত্রব্যাপী ভাওয়াই-এর একটি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

'বেশ' পরিবেশনের পর্যায় অবশ্য সর্বত্র একরূপ নয়। তবে প্রথম বেশ তিনখানি—অর্থাৎ গণেশ আরতি, ব্রাহ্মণবেশ এবং ভবা ও তার বউ জড়তী প্রায় প্রত্যেক ভাওয়াই অনুষ্ঠানেরই প্রথম এবং নির্দিষ্ট তিনখানি বেশ। নবরাত্রি উৎসবে অবশ্য এক একদিনে এক এক রকমের বেশ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। তবে

গণেশ আরতি সব অনুষ্ঠানেরই প্রারম্ভিক বেশ। গণেশ আরতির পর এক বা একাধিক বেশ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। তবে বেশ একটি বা একাধিক যাই হোক না কেন, দর্শকের মেজাজ ও চাহিদা কিন্তু কখনোই অবহেলিত হয় না। ফলে ভাওয়াই-এর একটি আসরে ভিন্নভিন্ন রসের বেশই পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। অবশ্য কোনো অনুষ্ঠানেই আবার আটটির বেশি বেশ পরিবেশিত হয় না। অনেক সময়ই একটি বেশের সঙ্গে অন্যবেশের কোনোই সম্পর্ক থাকে না। তাই অনুষ্ঠানের পরিচালক 'নায়ক' এগুলিকে যতদূর সম্ভব একই সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করে থাকেন। কখনো কখনো রঙ্গলোও একাজে নায়ককে সাহায্য ক'রে থাকে। দুটি বেশের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে গান, বিশেষ ধরণের বক্তব্য ও কাঞ্চালিয়াদের নাচ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে।

সমাজচ্যুত অসাহিত ঠাকুর প্রায় তিনশো ষাটখানি বেশ রচনা করেছিলেন। সেদিনের মত সে বেশগুলি আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। রাজস্থানী বেশের স্রষ্টা অবশ্য অন্যরা—নাগাজী ও তাঁর বংশধরেরা—ভাওয়াই জাতির লোকেরা। যাইহোক, দক্ষিণভারতীয় নাট্যের মত ভাওয়াই 'বেশ' এর কাহিনী কিন্তু শুধুমাত্র পৌরাণিক বিষয় নির্ভর নয়। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাহিনী—বিশেষ ক'রে ঐতিহাসিক রোমান্সই জনপ্রিয়তার শীর্ষে এবং সংখ্যায় অধিক। এদিক থেকে মাচ ও খ্যালের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই নিকটের। আর তাই কামার্ত যুবতী, কৃপণ-বণিক বিশ্বাস-ঘাতিনী স্ত্রী, রোমান্টিক আগন্তুক, কামার্ত বৃদ্ধ এবং শঠেরাই ভাওয়াই দর্শকদের কাছে অধিক প্রিয়। আর সেই কারণে ভাওয়াই বেশগুলিতে ভীড় ক'রে আছে এরাই।

ভাওয়াই বেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বেশ বোধহয় ঝাণ্ডাঝুলন, জুঠন-মিঞা এবং জসমাওড়ান। এরমধ্যে প্রথম দুটির কিঞ্চিৎ পরিচয় আগেই দেয়া হ'য়েছে। দর্শক উচ্চহাস্যে এবং হার্দিক করতালিতে তাদের প্রিয় বেশ ও সেই বেশের নায়ক চরিত্রকে স্বাগত জানায়। দর্শকের এই উল্লাসে অভিনেতা তার প্রতিভার চূড়ান্ত ঘটিয়ে তবে ছাড়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বেশের কাহিনী নির্দিষ্ট সংলাপাকারে লিখিত নয়। কাহিনীর মূল কাঠামোটাই শুধু লিখিত থাকে বা নির্দিষ্ট থাকে। তাই বিভিন্ন দলের এমন কি একই দলের দুই ভিন্ন অনুষ্ঠানে একই বেশের অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ভাওয়াইতে অভিনেতার যেমন স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অফুরন্ত সুযোগ আছে। অভিনেতাদের এই স্বাধীনতার সঙ্গে যদি যুক্ত হয় দর্শকের উৎসাহ—তাহলে তো আর কথাই থাকে না। দর্শক অভিনেতা উভয়েই তখন সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠে, একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ে। অধিকাংশ বেশ পরিবেশনের সময় যে এই শুভযোগ ঘটেই তা বলাই বাহুল্য।

আগেই বলা হয়েছে ভাওয়াই-এর ভাঁড় এবং বিদূষক হ'লো রঙ্গলো। নাট্য-ঘটনার সঙ্গে সে কখনো যুক্ত কখনো বিযুক্ত। কুটিয়াট্টমের বিদূষকের মতই সে বর্তমানের সঙ্গে অতীতকে মেলায়। আসলে সে সত্যের প্রতিমূর্তি ফলে এক-জন বিজ্ঞ দর্শকও। আমাদের যাত্রার বিবেকের মত সে কখনো কখনো ছোটবড় চরিত্রের রূপদানও ক'রে থাকে।

হাস্যকর অনুকরণ, বিভিন্ন শারীরিক কসরৎ, ডানপিটেমি, উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যঙ্গকৌতুক, কালোয়াতী সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি উপকরণে ভাওয়াই আঙ্গিক সমৃদ্ধ। আর এর কাহিনী এগিয়ে চলে দোহা, চৌপাই, গান ও গদ্য-সংলাপ ভর ক'রে। কখনো কখনো এসে যুক্ত হয় নায়কের বোল, গান ও মন্তব্য। চরিত্রের আগমন, অগ্রগতি এবং আবৃত্তি ও সঙ্গীতের প্রয়োগে সাধারণভাবে প্রচলিত নাট্যরীতিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এর বর্ণনাধর্মী-রীতিটি এসেছে কথা, গীতি-ধর্মী সঙ্গীতক এবং মুক্তকাব্যরীতির রাসক থেকে।

অন্যান্য লোক-আঙ্গিকের মত ভাওয়াইতেও পুরুষই স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় ক'রে থাকে। নারী ও শিশু যে ভাওয়াই প্রদর্শনে অংশ নেয় না—তার অন্যতম কারণ অধিকাংশ বেশই মাত্রাতিরিক্তভাবে অশ্লীল এবং স্থূল-শৃঙ্গার ছোট-রসাত্মক। সে যাইহোক, গুজরাতের মেয়েদের অতি আদরের ঘোমটার জন্যে ভাওয়াই-এর নারী চরিত্রাভিনেতারা কিছু বাড়তি সুবিধে পেয়ে থাকে। কেননা মুখজ অভিনয়ে তাদের পুরুষালী ভাবটা এই ঘোমটার আড়ালেই ঢাকা পড়ে যায়। মুসলিম শাসন ও গোঁড়া হিন্দুর রক্ষণশীল মানসিকতার দরুণ এই ঘোমটা বা পর্দার ব্যবহার দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। কাপড়ের একটি কোণা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী দিয়ে ধরে তার মুখখানা আড়াল করে রাখে। যখন কাপড় না পরে ঘাঘরা পরে (গুজরাতী মেয়েদের মধ্যে ঘাঘরা পরার চলই বেশি) তখন একখানি ওড়না এই কাজে ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র কথা বলার সময় সে এই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকায়। এমনকি স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময়ও সে এই ঘোমটা দিয়ে তার মুখখানি ঢেকে রাখে। ক্রুদ্ধ অবস্থায়, প্রেমালাপের সময়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্যকে গালিগালাজ করার সময়, বাচ্চাকে মারার সময়, কুয়ো থেকে জল তোলার সময় এবং উনুনে মুখ দিয়ে হাওয়া দেবার সময়ও সে তার ঘোমটা খোলে না। ঘোমটা গুজরাতী মেয়েদের মুখ-সজ্জারই অঙ্গবিশেষ। যাইহোক, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী-চরিত্র হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী দিয়ে ধরা দুটি জ্বলন্ত কক্ক বা মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোকবৃত্ত রচনা ক'রে নৃত্যামিত-ভঙ্গিমায় পৌঁছে আসে। তার পরণে থাকে বিস্তর ঘেরের ঘাঘরা, চুমকি বসানো ব্লাউজ এবং ওড়না। ওড়নার একটি প্রান্ত কোমরের ঘাঘরায় গোঁজা থাকে। অপর প্রান্ত ঘোমটার কাজ করে। (এইরূপ স্ত্রী-চরিত্রের সাধারণ নাম কাঞ্চালিয়া। কেননা সে কাঞ্চালী বা ব্লাউজ পরে।

পৌধে এসেই সে প্রথমে দাঁড়ায় পৌধের ঠিক মধ্যস্থলে। মধ্যপৌধে দাঁড়িয়ে সে কক্র দুটিকে নীচের দিকে ধরে একটু ঝাঁকিয়ে নেয়। ফলে আগুন ও উত্তাপ দুইই বেশ কমে যায়। এরপর কক্র দু'টিকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে হাতদুখানি কোণাকুণিভাবে বুকের ওপর রাখে। হাতেধরা কক্রদুটির শিখা তখন মাথার দুইপাশ দিয়ে লক্‌লক্‌ করতে থাকে। ঐ অবস্থাতে সে দর্শকদের দিকে তাকায় অর্থাৎ তাদের অভিনন্দন জানায়। এরপর একে একে ডান ও বামদিকের কক্র দুটিকে ঘুরিয়ে সে ঐ দুটি দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নমস্কার জানায়। এরপর দ্রুতপায়ে বৃত্তাকারে ঘুরে সে যন্ত্রীদের এবং নায়েকের সামনে গিয়ে হাঁটুগেড়ে কিংবা জাবড়ে বসে পড়ে। ঐ ভাবে ব'সে পায়ের গোড়ে হাত রেখে সে মাথা নোয়ায় এবং চোখের মণিদুটোকে খুব ক'রে ঘোরায়। এইভাবে সে সরস্বতী ও তাঁর গুরু দলের পরিচালক নায়েকের কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গান ধরে—সঙ্গত করে পাখোয়াজ। মুখজ অভিব্যক্তি সহ গানের প্রথম পঙক্তি দর্শকের (বা শ্রোতার) বোধগম্য হ'লে সে দ্বিতীয় পঙক্তিটি গায়। তারপর আস্তে আস্তে শুরু করে নাচ এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কক্রকে মুখের সামনে এনে ঐ মুহূর্তের ভাব-প্রকাশক মুখভঙ্গী দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোরে তোলে। দর্শক তখন আবেগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। যন্ত্রীরাও যেন তার মুখ থেকে গান কেড়ে নিয়ে উচ্চস্বরে গাইতে থাকে। এই সময় কাঙ্কালিয়া বিশুদ্ধ নৃত্তের একটি অংশ পরিবেশন করে। এই নাচে তার বাম হাতটি সকল সময়ই পৌধের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে নিদিষ্ট থাকে আর ডান হাত থাকে দর্শকের দিকে। ঢোলক বেজে চলে—ধিনা-ত্রিকিৎ, তিনা ত্রিকিৎ। বৃত্তায়িত নাচের সুললিত পদ-বিক্ষেপে ঢোলকের বোল মূর্ত হ'য়ে ওঠে। লয় দ্বিগুণিত হয়। ভুঙ্গলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ সে লয়কে আরো দ্রুতায়িত করে। তখন ঢোলক বাজে ঘে ঘে ত্রাকাধিনা—ঘে ঘে ত্রাকাতুনা। নায়েক ঢোলকের এই বোল আবৃত্তি করতে থাকেন। আর নৃত্যকার পায়ের তালে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সে বোলে প্রাণসঞ্চার করে। কথাকলির টোড়া-টুকড়া এবং একই ধরণের দক্ষিণভারতীয় জাতি বা সোলোকাটু নৃত্যের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। অবশ্য ভাওয়াইনৃত্য অতটা ষ্টাইলাইজড্ হ'য়ে পড়েনি। তাছাড়া মশাল হাতে থাকার জন্যে যে লম্বমান ভঙ্গিমা তাও ভাওয়াই-এর এক নিজস্ব চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। এই নৃত্যে কখনো কখনো পাছার এক বিশেষ ধরণের মুক্ত—দোলন লক্ষ্য করা যায় উর্দ্ধাঙ্গ বা হাত তখন প্রায় অনড়ই থাকে। তাই কিছু কিছু নৃত্যের গতি ও ছন্দ অনেকটা খ্যালের অপরূপ। আবার তামাশায় প্রযুক্ত বিশুদ্ধনৃত্তের সঙ্গেও এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিজস্বতা অবশ্যই আছে। যেমন ভাওয়াইতে পায়ের সম্পূর্ণ পাতাই মাটিতে পড়ে কিন্তু তামাশায়

পায়ের পাতার অগ্র অথবা পশ্চাৎভাগই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কারণেই যখন কোনো দক্ষ কাঞ্চালিয়া দ্রুততালে নৃত্ত পরিবেশন করে তখন তার নৃত্ত দেখে অনেকেরই কথ্‌কের কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু ভাওয়াই নৃত্যে এমন কতকগুলি নিজস্ব চারিত্র্য বৈশিষ্ট আছে যা কথ্‌কে বা অন্যান্য নৃত্যে একেবারেই অনুপলব্ধ। যাই হোক, নাচ শেষ হ'লে কাঞ্চালিয়া ব'সে পড়ে। পাশে রেখে দেয় হ তের জলন্ত কক্র। মশালচী তখন তা তুলে নিয়ে নিবিয়ে দেয়। নাচের সময় ওড়নীর ঘোমটায় কাঞ্চালিয়ার মুখাকৃতি অতি সুন্দর, মনোহর দেখায়। বিভিন্নভাবে এটির ব্যবহার ক'রে নৃত্যাভিনেতা গুজরাতী মেয়েদের প্রেম, কাম, ক্রোধ, বিরক্তি, বিলাপ, দুঃখ, আনন্দ, লজ্জা ও মারমুখিনতা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। ঘোমটার দুটি দিকই ডানহাতে ধ'রে ডাইনে বাঁয়ে এমনভাবে তাকাতে তাকাতে সে নেচে চলে যে দর্শক চকিতে তার মুখভঙ্গি দর্শন করে একেবারে মোহিত হ'য়ে পড়ে। প্রকাশিত হ'য়েও অপ্রকাশিত থাকার এই রীতি গুজরাতী মেয়েদের সলজ্জ চাতুরীরই দ্যোতক। নৃত্যের লয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটাটি বাঁহাতে ধরে ডানহাতটি পাছার উপর রেখে সে দ্রুত নেচে চলে। অর্দ্ধোন্মুলিত ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তখন সে কটাক্ষপাত করতে থাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে। উত্তেজিত মারমুখিনতারই প্রকাশ এটা।

গুজরাতের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা ঘোমটার সাহায্যে তাদের মুখ আগাগোড়া ঢেকে রাখে একথা আগেই বলা হয়েছে। তবে রক্ষিতা, অপহৃতা এবং বেশ্যারা অবশ্য মুখ খুলেই রাখে। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে সে যখন আহ্বান জানায় তখনও সে মাথা থেকে ওড়নাটা সরিয়ে দেয়। হাতদুটিকে মুড়ে মাথার পেছনে রেখে সে হাই তোলে, তারপর আড়চোখে তাকিয়ে গর্বে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে। এই ভঙ্গীটি অভিসারের অথবা প্রেমের উন্মুক্ত আহ্বানেরই প্রতীক।

দলগত নৃত্যে কাঞ্চালিয়ারা একপা এগিয়ে একপা পেছিয়ে তারপর এগিয়ে চলে পা ভেঙে ভেঙে। বৃত্তাকারে ঘোরে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে তারপর সামনে ঝুঁকে এগিয়ে চলে। এই সময়ে তাদের রঙ-বেরঙের ওড়নায় চোখ জুড়িয়ে যায় দর্শকের। নাচ শেষে খুব দ্রুতলয়ে ঘুরে লাফ মেরে বসে পড়ে। ঘাঘরাটি তখন বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে বৃত্তাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নারী-চরিত্রাভিনেতার একক নৃত্ত থেকেই যে ভাওয়াইতে নৃত্যের সমাগম ঘটেছে এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা দলগত নৃত্যের চলন দীর্ঘদিনের। তবে সে দলগত নৃত্যও আবার পরিবেশিত হয় স্ত্রী-চরিত্রাভিনেতাদের দ্বারাই। একটি বেশ থেকে অন্য বেশে যাওয়ার সময়ও এই ধরণের নৃত্যের ব্যবহার হ'য়ে থাকে। গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিনেতাদের যে সুললিত অঙ্গভঙ্গী তা থেকে বা অভিনেতাদের ছন্দময় গতিতে রঙ্গক্ষেত্র পরিক্রমণের আদল থেকেও

ভাওয়াইতে নৃত্যের সমাবেশ ঘটে থাকতে পারে। তবে নৃত্যের বেশির-ভাগটাই এখানে নাট্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—শুধুমাত্র অলঙ্করণই নয়। ভাওয়াই থেকে নৃত্যকে বাদ দেয়া তাই প্রায় অসম্ভব।

অঙ্কিয়ানাট—ভাওনা. খ্যাল এবং যক্ষগানের মতই ভাওয়াই-সঙ্গীতের উৎসও একই সঙ্গে শাস্ত্রীয় ও লোকসঙ্গীত। ভাওয়াই-এর গানে প্রযুক্ত রাগগুলির মধ্যে দেশ, সারং, পুরবী, রাম কলি, আশাবরী, সোহনী, প্রভাত বিলাওল এবং কলিংগ্র খুবই জনপ্রিয়। লোকসঙ্গীত এবং ভক্তিগীতির সঙ্গে আবার ব্যবহৃত হয় ভজন, গরবা, রাস, দোহা, গজল প্রভৃতি। কখনো কখনো ভক্তিপরক স্তোত্রপাঠও ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কড়া নিয়মের অধীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে যথেচ্ছ বিহারী লোকসঙ্গীতের সম্মিলনে সুষ্ঠ ভাওয়াই সঙ্গীতের কোথাও কিন্তু কোনো ছন্দপতন ঘটেনা। কখনোই কোনো অসামঞ্জস্যও শ্রুত হয় না। ভারতের সমস্ত লোক-নাট্যেই এই জাতীয় বিভিন্ন রীতির সমন্বিত-সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভাষা ও বিষয়ের বৈবিধ্য সত্ত্বেও ভারতীয় লোক-নাট্য এই একটি দিক দিয়ে একটি এককে পরিণত হ'য়েছে। তবে ভাওয়াই এর গায়কদের গলা খুবই চড়া। আর গানের প্রতিটি শব্দ খুবই সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত হয় এবং অর্থও যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ক'রে দেয়া হয়—বোধগম্য অভিব্যক্তির সাহায্যে।

যাত্রা ও খ্যালের মতই ভাওয়াই-এর পোষাক-পরিচ্ছদেও ইতিহাসের ধার আদৌ ধারা হয় না। তাই দেখা যায় রাজার মূলপোষাক সময়ানুকূল হওয়া সত্ত্বেও তাতে সাম্প্রতিক কালের স্থানীয় পোষাকের ছোঁয়াচ লেগেছে। ব্রাহ্মণ মাত্রেরই—তা সে যে সময়ের হোক না কেন, পোষাক একই রকম। তার পরনে থাকে মোটা লালপেড়ে ধুতি। আলগা গায়ে গলায় ঝোলানো লম্বা একটি যজ্ঞোপবীত এবং ঘাড়ে ফেলা ভাঁজকরা একখানা গামছা। তার হাতে ঝোলানো থাকে পেতলের এক কমণ্ডলু, বগলদাবায় একখানি ধর্মগ্রন্থ, আর নেড়া মাথায় একটি টুপি। তার কপালে থাকে চন্দনের লম্বা তিনটি রেখা যার মধ্যস্থলে থাকে সিঁদুরের দুটি ফোঁটা। পুলিশের পোষাক, আবার একেবারেই সাম্প্রতিক কালের—তা সে পুলিশ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর হ'লেও। পুলিশের পোষাক পরিকল্পনার এই হাস্যকর অবস্থা খ্যালেও লক্ষ্য করা যায়। জুঠন-মিঞা এবং রঙ্গলোর পোষাক-পরিচ্ছদ—পরিকল্পনায়ও বাস্তবতা একেবারেই অনুপস্থিত। তবে থিয়েট্রিক্যালী এদের সত্যতা অনস্বীকার্য। অন্যান্য চরিত্রের জন্যে অতিরিক্ত মেকআপের খুব একটা দরকার হয় না। শুধু-মাত্র ভ্রূযুগল এবং গোঁফটাকে একটু বাড়িয়ে নিলেই হ'লো। জুঠনের সাজ-পোষাকের বর্ণনা আগেই দেয়া হ'য়েছে। তা থেকে একথা খুবই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে মেকআপে জুঠনকে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা থাকলেও তার

সাজ-পোষাকে অর্থাৎ টুপি, চিলা শালোয়ার, জামার ওপরে ফতুয়া এবং কোমরপটি গুজরাতী ইতিহাসের সুলতানী যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর বাস্তব জীবনের মতই ভাওয়াই-এর নারী চরিত্রাভিনেতাদের সাজপোষাকও বিচিত্র রকমের। তারা শাড়ী, ঘাঘরা, স্কার্ট সবই পরতে পারে। তবে শাড়ী না পরলে পূর্বে বর্ণিত বিশেষ ধরনের গুজরাতী ওড়নাটা অবশ্যই জড়িয়ে নিতে হয়। তবে নাচের গতি ও ছন্দের জন্যে বেশী উপযোগী হ'লো ঘাঘরা। আর নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে ওড়নার ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটির সুনিপুণ ব্যবহারে চরিত্রের মেজাজ খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্তিত করা যায়। আর একথা বলাই বাহুল্য যে নারীচরিত্রাভিনেতারা প্রত্যেকেই ঘোমটা হিসেবে এই ওড়নার ব্যবহারে অতি নিপুণ। সত্যিকথা বলতে কি মেয়েরাও এই অভিনেতাদের মেজাজ—অনুরূপে ঘোমটার ব্যবহারে লজ্জায় একেবারে রাঙা হ'য়ে যায়। অবিবাহিতারা সকল সময় ঘোমটার ব্যবহার না করলেও বিবাহিতাদের মধ্যে এটি এক অনিবার্য মুখসজ্জা-বিশেষ—একথা আগেই বলা হ'য়েছে। কোনো কারণে ওড়নাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও তার এক বিশেষ অর্থ ভাওয়াই দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

মেয়েদের ওড়নার মতই ভাওয়াইতে ছেলেদের পাগড়ীর ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পাগড়ী চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, বৃত্তি এবং প্রধান প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার পরম সহায়ক। পাগড়ী বাঁধার ধরণে, তার কৌণিক অবস্থানের সামান্য হেরফেরে অভিনেতা একটি চরিত্র থেকে অন্য আরেকটি চরিত্র হ'য়ে উঠতে পারে। বেশ (চরিত্র বা সাজ) বদলানোর দ্রুততায় ভাওয়াই অভিনেতারা খুবই দক্ষ এবং এব্যাপারে তাদের জুড়ি মেলা ভার। একটি চরিত্র থেকে অন্য আরেকটি চরিত্র হ'য়ে ওঠার সময় অভিনেতারা শুধুমাত্র যে বেশ (পোষাক)-ই বদলায়—তা কিন্তু নয়—আচার আচরণেও তারা আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনে। আবার কখনো কখনো একই বেশে অর্থাৎ পোষাক পরিচ্ছদে কোনো পরিবর্তন না এনেও নাচের তালে বা চলনের ঢঙে সামান্য পরিবর্তন এনে একই সঙ্গে অনেকগুলি চরিত্রের, যেমন—মেজাজী জেনারেল, ল্যাংড়া ভিখিরী বা তুলকি চালের মোটকা বণিকের —অভিনয় করতে সক্ষম। এই সব ব্যঞ্জনাময় কৌশল নাট্যকর্মীরা সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছে, না বাস্তবের স্বাভাবিক প্রতিফলন স্বরূপে এসেছে—তা আজ আর বলা সম্ভব না হ'লেও দর্শকদের কম্যুনিকেট করার পক্ষে এগুলি যে খুবই কার্যকরী তা বলাই বাহুল্য।

মশালচী বা কাঙালিয়ার হাতের মশাল বা কক্কই যে ভাওয়াই-এ আলোক প্রক্ষেপক—তা আমরা আগেই দেখেছি। দেখেছি, অধ্যায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত মশালচী কিভাবে প্রত্যেকটি নাটকীয় মুহূর্তে অভিনেতার মুখজ

অভিনয় চাক্ষুষ করানোর উদ্দেশ্যে তার মুখের সম্মুখে এই মশাল ধরে এবং অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ পরিক্রমণ করে। কাঙ্কালিয়ার ক্ষেত্রে এই মশালের ব্যবহার যে খুবই কার্যকরী তাও আমরা দেখেছি। অঙ্কিয়া—ভাওনাতেও এই ধরণের আলোকপাত লক্ষ্য করা যায়। আবার কুটিয়াট্টম বা কথাকলিতে —একটু ভিন্নভাবে হ'লেও—মশালের (প্রদীপের) অনুরূপ ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করে থাকি। সেখানে নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে অভিনেতা মুখ্য প্রদীপের কাছে নিজের মুখটা নিয়ে আসে—অর্থাৎ আধুনিক আলোক ব্যবস্থার স্পটলাইট ও ফলোয়ারের কাজ এই সব মশালের সুকৌশলী প্রয়োগে সম্ভব হ'য়ে থাকে। নাটকীয় মুহূর্তসৃষ্টিতে মশালের নরম আলো অন্যান্য লোকনাট্য আঙ্গিকের মত ভাওয়াইতেও যে কত কার্যকরী—তা যাঁরা ভাওয়াই দেখেননি তাঁদের পক্ষে উপলব্ধি করা শক্ত। তবে সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৌটঙ্কী, মাচ, খ্যাল, তামাশা ও যাত্রার মতই ভাওয়াইতেও আলোক-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। কক্রের প'রিবর্তে তাই আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদ্যুতিক আলোক উৎস ব্যবহৃত হ'চ্ছে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, ফলে তা স্বীকার্যও। তবে একথাও স্বীকার্য যে ফ্লাট—হোয়াইট ফুট লাইট, ওভারহেড ফ্লাডস বা পেট্রোম্যাক্স ল্যাম্পের এলোপাতাড়ি ব্যবহারে চমক যতই থাকুক না কেন নাটকীয়ত্ব নেই আদৌ। লোকনাট্যের উদ্‌যোক্তারা আজ একথা অস্বীকার করতে চলেছেন—এটা একই সঙ্গে খুবই দুঃখের এবং ক্ষতিকারকও।

উদ্‌যোক্তা ও অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সমাজিক স্তরভেদে ভাওয়াই এর গুণগত মানেও ভিন্নতা এসেছে। ভাবনগর ও বরোদায় ভাওয়াই অনুষ্ঠিত হয় অম্বামায়ের মন্দিরে—নবরাত্রি উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে। এতে অংশ নিয়ে থাকেন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা। ফলে এদের ভাওয়াইয়ে কোনোরূপ স্থূলতা প্রশ্রয় পায়নি। অন্যদিকে চোদ্দজনের এক একটি দলে —ভাওয়াই-এর পরিভাষায় টোলায় বিভক্ত হ'য়ে যেসব ভাওয়াইয়া গুজরাতের গ্রামদেশে 'বেশ' পরিবেশন ক'রে বেড়ায়—মাটির সঙ্গে তাদের আন্তরিক যোগ। তাই এদের ভাওয়াই-এ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রুচি দারুণভাবেই প্রশ্রয় পেয়েছে। গ্রাম্যতা তাই এর অঙ্গভূষণ। এতে ক'রে ভাওয়াই-এর সামাজিক মান নেমে এসেছে। উচ্চবর্ণের লোকেরা তাই এদের 'ভাঁড়-ভাওয়াই' ব'লে গালি দেয়। তবে এই স্থূলতা ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত লোক-নাট্যেরই সামাজিক বৈশিষ্ট্য—তাই নৌটঙ্কী, যাত্রা, তামিলনাড়ুর সাদির নৃত্য এবং তামাশায়ও এই স্থূলতা লক্ষ্য করা যায়। আর এই স্থূলতার কারণেই ভাওয়াই গুজরাতের শিক্ষিত নাগরিকের কাছে এখনো অস্পৃশ্য র'য়ে গেছে। শুধু তাই-ই নয়—এই শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেক জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিই

এর প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করেন। রণছোড়ভাই উদয়রাম ভাওয়াইকে সংস্কৃত করার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি নতুন নাটকও লেখেন। রণছোড়ভাই ছাড়াও দলপতরাম, নর্মদাশঙ্কর, মণিভাই, নতুভাই, বিভনরাম প্রমুখেরাও এই কাজে হাত দেন। সমাজের উপরিমহলের এই বিরোধ গুজরাতের সাধারণ মানুষকে কিন্তু ভাওয়াই ছোট-বিমুখ করতে পারেনি—বরং এই বিরোধের সম্মুখীন হ'য়ে ভাওয়াইয়ারা বা তরগালা জাতির লোকেরা বা পেশাদারী শিল্পীর আরো নিমগ্নচিত্তে ভাওয়াই-এর চর্চা ক'রে যেতে থাকলেন। রাজস্থানে অবশ্য ভাওয়াই-এর কোনো বিরুদ্ধাচরণ হয়নি। যাইহোক, পার্সী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর ব্যাপক প্রসারে নাগরিক জীবন থেকে ভাওয়াই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লেও গুজরাতের সাধারণ মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি হ'য়ে সমগ্র গুজরাতে তা পরম আদরের সঙ্গেই পোষিত হ'তে থাকে। আসলে লোকপ্রচলিত কোনো সংস্কৃতি—মাধ্যমের বিলুপ্তি আজ আর সম্ভব নয়। উল্লেখিত সংস্কারকরা এই ঐতিহাসিক সত্যটি ধরতে পারেন নি। তাছাড়া জন-সম্পর্করহিত হ'য়ে ভাওয়াই-এই সংস্কার সাধনে ব্রতী হওয়ায় রণছোড়ভাইরা সফল হ'তে পারেন নি। তাই তাদের প্রচেষ্টায় পার্সী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর প্রচার প্রসার বাড়লেও ভাওয়াইএর জনপ্রিয়তা কমেনি আদৌ। ভাওয়াই-এর জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হ'লো এর ঐতিহ্যমণ্ডিত অভিনয়রীতি এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর রঙ্গলো-রূপী বিদূষক চরিত্রটি। দর্শকের নাড়ীজ্ঞান খুব টনটনে এই রঙ্গলোর। রঙ্গলোর হাস্য-কৌতুকের ঢেউয়ে ভেসে যায় তাই রণছোড়ভাইদের সর্ব-প্রকারের সংস্কার প্রচেষ্টা। কাজেই পূর্ববৎ বহাল থাকে ভাওয়াই-এর দুর্গ-গ্রাম্যতা আসলে মধ্যযুগের প্রভাব মুক্ত ক'রে আধুনিক যুগচেতনার বাহন হিসাবে অতি সম্ভাবনাময় এই ভাওয়াই-আঙ্গিকে নতুন প্রেরণাময়ী এবং প্রাণবন্ত তাৎপর্য আনার জন্যে প্রয়োজন ছিল সত্যিকার সব প্রতিভার ছোঁয়াচ এবং সৃজনশীল সব ব্যক্তিত্বের আত্মসচেতন প্রচেষ্টার। অশ্রদ্ধা আদৌ না ক'রে বলা যায়—এটা ছিলনা রণছোড়ভাইদের।

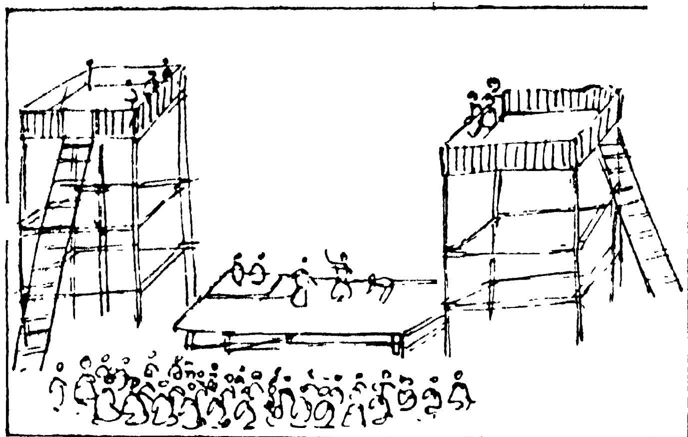
অন্যদিকে বল্লাথোল বা রুক্মিণী দেশাই এই প্রতিভাময় ও আত্মসচেতন প্রচেষ্টারই জাদুস্পর্শে কথাকলি ও ভরত-নাট্যে এনেছেন যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভাওয়াইতে তিনের দশকের আগে এইরূপ প্রচেষ্টা ছিল একেবারেই অনুপলব্ধ। তিনের দশকে জয়শঙ্কর ভোজক সুন্দরী আধুনিক গুজরাতী নাটকের অভিনয় করেন ভাওয়াই আঙ্গিকে। ভাওয়াই-এর সংস্কারে বা এই আঙ্গিকটিকে যুগোপযোগী ক'রে তোলার ব্যাপারে ভোজক সুন্দরীর এই পদক্ষেপ ছিল সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। ভোজক-সুন্দরীর খ্যাতি মূলতঃ একজন শক্তিশালী নারীচরিত্রাভিনেতা হিসাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভাওয়াই এর সেরা অভিনেতারা প্রায় সকলেই নারী চরিত্রাভিনেতা। ভোজকসুন্দরী

ছাড়াও মূলকচাঁদ বল্লভ, লালুভাই ছোকরী এবং প্রাণসুখলাল নায়েক—এঁরা সকলে নারী চরিত্রাভিনেতা হিসেবেই বিখ্যাত। ভোজকসুন্দরী তাঁর নতুন নাটকেও নারী—চরিত্রে অভিনয় করেন। আধুনিক নাটকের উপস্থাপনায় ভাওয়াই আঙ্গিকের এই প্রয়োগ পরবর্তীকালের দীনাগান্ধীরও আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছিল। এই পদক্ষেপে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দীনাগান্ধী ভোজক-সুন্দরীর সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করেন "মীনাগুর্জরী"। পাঁচের দশকের প্রথম দিককার এই প্রযোজনাটি ভাওয়াই-এর আধুনিকীকরণে একটি ল্যাণ্ড-মার্ক হ'য়ে আছে। মীনাগুর্জরীর এই সফল প্রযোজনা থেকেই ভাওয়াই চর্চার দুটি স্পষ্ট ধারা চলে আসছে—একটিতে আধুনিক থিয়েটারের পরিচালকরা আধুনিক থিয়েটারের প্রয়োজনে এই আঙ্গিকের সম্ভাবনাময় প্রয়োগ চালিয়ে আসছেন। অন্যটিতে চেষ্টা চলছে ভাওয়াই-এর স্থূল-গ্রাম্যতা ও অশৈল্পিক দিকগুলি দূর করার। প্রথম ধারায় আছেন ভোজকসুন্দরী, দীনাগান্ধী, শান্তাগান্ধী এবং সঙ্গীত নাটক একাডেমী। এঁদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি হ'লো—মীনাগুর্জরী (নাট্যকার-রসিকলাল পারিখ), জসমাওড়ান (নাট্যকার অঘাহিত ঠাকুর) চন্দ্রবদন মেহতার হো-হোলিকা এবং আরামরাজ। অন্যধারায় আছেন গুজরাতের প্রাণসুখলাল নায়েক ও বিঠলদাস নায়েক এবং রাজস্থানের দেবীলাল সামর। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রবাহিত এই দুই ভিন্ন ধারা ভাওয়াই আঙ্গিকের মূল্যবান সম্পদ বয়ে এনে আধুনিক ভারতীয় নাট্যে তীব্র এক গতির সৃষ্টি করেছেন। আর সেই গতিবেগে ভর করে আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের নাট্য পরিচালকরা ভাওয়াই নিয়ে বিভিন্ন সব পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং আমাদের থিয়েটারের মূল অনুসন্ধানের আন্তরিক আগ্রহে ভাওয়াই ক্রমেই নবীকৃত হ'য়ে চলেছে।

ভাওয়াই-এর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে এটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, মার্গী ও দেশী এই দুই স্বতন্ত্র রূপের ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। বরং এটাই সত্য যে এদের একটি অপরটির পরিপূরক হ'য়ে উঠেছে। অন্যভাবে বললে বলা যায়—এরা একই বৃত্তের দুটি বৃত্তাংশ মাত্র। সাহিত্য ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই এদের মধ্যে পারস্পরিক লেন-দেন হ'য়ে চলেছে। নাট্যধর্মী ও লোকধর্মী শব্দদুটির পারস্পরিক সম্পর্কও অনুরূপ। বিভিন্ন সামাজিক স্তর বিন্যাসের সঙ্গে তাই এদের কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে লিখিত সাহিত্যের অভাবে এবং সামাজিক স্তর বিন্যাসের নিরীখে 'ছৌ' অবশ্যই দেশী গোষ্ঠীভুক্ত। অথচ এর উপস্থাপন ভঙ্গী দারুণভাবেই নাট্যধর্মী। অন্যদিকে নবরাত্রি উৎসবে নাগারা ব্রাহ্মণ এবং রাজকুমারদের দ্বারা অভিনীত ভাওয়াই অর্চনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সামাজিক দিক থেকে অবশ্যই মার্গী

ধর্মী কিন্তু শিল্পের বিচারে কখনোই নয়। আবার ভাওয়াইয়া কোলী ও কাংসারাজদের দ্বারা পরিবেশিত ভাওয়াই সামাজিক দিক থেকে অবশ্যই লেখী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাইহোক সবমিলিয়ে ভাওয়াইতে কিন্তু নাট্যধর্মী অপেক্ষা লোকধর্মীরই প্রাধান্য। যদিও মঞ্চোপস্থাপনার অনেক উপকরণই আবার নাট্য-ধর্মী। অর্থাৎ আমাদের থিয়েটারকে লোকধর্ম এবং নাট্যধর্ম এই দুই স্পষ্টভাগে বিভক্ত করাটাও ঠিক হবে না। যদি হয়ও তাহ'লে শুধুমাত্র অধিকতর গুরুত্ব সম্পন্ন শৈলীটিরই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে। তবে সে নামকরণের বা চিহ্নিত-করণের অর্থ এই হবেনা যে অন্যটির প্রভাব তাতে একেবারেই নেই। এই প্রসঙ্গে অমৃতলাল পানসারওয়ালার উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে এ আলোচনার ইতি টানা যেতে পারে। পানসারওয়ালার মতে—'এদের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কেননা শাস্ত্রীয় নাট্য উচ্চবর্গের লোকেদের জন্যে আর লোক-নাট্য একেবারেই সাধারণ মানুষের জন্যে। তবে একথাও সত্য যে আমরা একই ট্রেনের যাত্রী। শাস্ত্রীয় নাট্য প্রথম শ্রেণীর কামরায় চ'ড়ে আর লোকনাট্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চ'ড়ে ভ্রমণ করে। একটিতে কোনো ধুলোবালি নেই, গরম, ঘাম বা তার গন্ধও নেই—আছে শুধু অনাবিল শান্তি। অন্যটিতে চেঁচামেচি, হৈ হুল্লোড় আর ঘামে ভরা শরীরেরই গন্ধ। একই ট্রেনের যাত্রী হ'য়েও এরা দুই ভিন্ন কামরার আরোহী।"

রাজস্থানের লোকনাট্য



খ্যাল

বিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও রাজস্থানে এত অধিক-সংখ্যক লোক-নাট্য আঙ্গিকের প্রচলন আছে যে ভারতীয় লোক-নাট্যের গবেষকেরা বিস্মিত না হ'য়ে পারেন না। রাজস্থান তথা ভারতীয় লোক-নাট্যের অন্যতম গবেষক ডঃ মহেন্দ্র ভানাবত শিল্প প্রক্রিয়াগত দিক থেকে রাজস্থানের এই বহু বিচিত্র লোক-নাট্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই শ্রেনীবিভাগটি খুবই সমীচীন। সেই অনুসারে রাজস্থানের সমস্ত লোক-নাট্যকে খ্যাল, স্বাঙ্গ ও লীলা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমে এখানে খ্যালের আলোচনা করা যাক।

খ্যাল: খ্যাল লোক-নাট্যের একটি প্রকার। দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত রীতিতে লোকজীবনে পরিচিত ও জনপ্রিয় কাহিনী অভিনীত হ'য়ে লোক-জীবনের সন্তোষ বিধান করে যে লোক-নাট্য, তাকেই খ্যাল বলা হয়।

উদ্ভব এবং বিকাশ:

খ্যালের উৎপত্তি কিন্তু রাজস্থানে নয়। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা অঞ্চলের আশে-পাশে খ্যালের প্রথম প্রচলন। যেখান থেকে খ্যাল পরবর্তীকালে রাজস্থানে

এসেছে। ঠিক কবে থেকে রাজস্থানে খ্যালের প্রচলন হলো—সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

(১) শ্রীঅগরচাঁদ নহটা মনে করেন মধ্যযুগে প্রচলিত রাস, চর্চরি, ফাগু প্রভৃতি থেকেই খ্যালের উৎপত্তি।

(২) নহটাজী 'দেশবন্ধু' ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত উদয়শঙ্কর শাস্ত্রীর একটি নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আগ্রার আসেপাশে নতুন এক কাব্যরীতি প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে যার নাম হয় খ্যাল। ফার্সী ও উর্দু কাব্য-সম্পদের সমন্বয়েই যে খ্যালের সৃষ্টি এবিষয়ে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা নেই। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে খ্যাল রচনা করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে আগ্রাতে প্রতিভাবান খ্যালকারদের নিজ নিজ দল ছিল। তখনো এদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হ'ত।

(৩) ভারতীয় লোক-নাট্যের সর্বমান্য গবেষক শ্রীদেবীলাল সামর লিখেছেন—সপ্তদশ শতাব্দীতে আগ্রার নিকটে খ্যালের এক লোকধর্মী রীতির প্রচলন ছিল। এর ক্ষেত্র ছিল কেবলমাত্র কাব্যরচনা অথবা কোনো পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে নিয়ে কাব্যরচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাব্যের এই ধারাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজস্থানে এসে রঙ্গমঞ্চীয় খ্যালরূপে পরিবর্তিত হয় যা অদ্যাবধি রাজস্থানের সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছে। প্রথমে 'খ্যাল' ছিল কল্পনা ও বিচার শক্তির সংমিশ্রণে উপজাত এক কাব্যশৈলী। কিন্তু যখন থেকে তা মঞ্চে অভিনীত হ'তে থাকলো তখন থেকেই তা খেল বা 'খ্যাল' নামক তামাশা হিসেবে পরিচিত হলো।

রাজস্থানে প্রচলিত খ্যাল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ আজ নানাবিধ রূপ ধারণ করেছে। প্রত্যেকটি আঙ্গিক বা রূপের স্বাতন্ত্র্য খুবই স্পষ্ট। তবুও সাধারণভাবে এরা খ্যালেরই অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক, সামাজিক, লৌকিক ও পৌরাণিক ঘটনাবলী প্রতিটি খ্যালেরই জনপ্রিয় বিষয়। বর্তমানে রাজস্থানে ২০ রকমের খ্যাল খুবই জনপ্রিয়। খ্যালগুলি হ'লো—

(১) মাচ কা খ্যাল, (২) তুর্রা-কলঙ্গী খ্যাল, (৩) কুচামণী খ্যাল, (৪) শেখাওয়াটী খ্যাল, (৫) নৌটঙ্কী খ্যাল, (৬) মেওয়াড়ী খ্যাল, (৭) আলীবক্স খ্যাল, (৮) কিষনগড়ী খ্যাল, (৯) রম্মত, (১০) জয়পুরী খ্যাল, (১১) কাঠপুতলীর খ্যাল, (১২) হাথরসী খ্যাল, (১৩) গন্ধর্বদের খ্যাল, (১৪) নাগৌরী খ্যাল, (১৫) কড়া খ্যাল, (১৬) অভিনয় প্রধান খ্যাল, (১৭) কথাব্যচন প্রধান খ্যাল, (১৮) চৌবোলা খ্যাল, (১৯) ঝাড়শাহী খ্যাল, (২০) দঙ্গলী খ্যাল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণে এখানে শুধুমাত্র তুর্রা কলঙ্গী খ্যালেরই আলোচনা করা হ'লো।

তুর্রা কলঙ্গী খ্যাল: তুর্রা কলঙ্গী খ্যাল মাচকা খ্যালেরই অন্তর্ভুক্ত।

তবুও এর পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যের দরুণ রাজস্থানে এটি আজও অন্যতম এক জনপ্রিয় লোকনাট্য আঙ্গিকরূপে প্রচলিত। শোনাধার তুকনগীর ও শাহআলী এই খ্যালের স্রষ্টা। উভয়েই ছিলেন পরম পণ্ডিত এবং সিদ্ধপুরুষ। এদের একজন ছিলেন শিবের উপাসক এবং অন্যজন ছিলেন শক্তির। প্রায় ৩০০ বছর আগে এঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। দিল্লী ও আগ্রার আসে-পাশে এঁরা বসবাস করতেন বলে মনে করা হয়।

তুর্রা কলঙ্গীর প্রচলন বৈঠকী খ্যাল হিসেবে। বৈঠকে বন্ধুত্ব মনোভাব নিয়ে যোগ দিত অনেক দল। গাওয়া হত দুই ধরনের গান, এক—শর্তাধীন, দুই মিলনাত্মক। প্রথম অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল অংশগ্রহণকারী দলের হারজিতের প্রশ্নটি। এতে প্রথম দল প্রশ্ন ক'রত, অন্যদল তার উত্তর দিত। প্রশ্নোত্তরে ভাষা ও সুরসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। অনেকটা আমাদের তর্জাগানের মত। আর মিলনাত্মক অংশে হারজিতের কোনো প্রশ্ন নেই। ফলে এর সমাপ্তি ঘটতো খুবই অন্তরঙ্গ প'রবেশে। শর্তিয়া বা প্রথম অংশের গানে যে দল হেরে যায় তারা বিজয়ী দলের দাসত্ব স্বীকার করতে এমনকি কখনোই আর শাস্ত্রার্থ না করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য থাকত। বৈঠকী খ্যাল আজও অধিক মাত্রায় প্রচলিত আছে।

বৈঠকী খ্যালে নানাবিধ লাবণীয় প্রয়োগ ও সেই প্রয়োগজনিত প্রতিযোগিতার প্রচলন থাকায় একে 'লাবণী বাজীকে খ্যাল'ও বলা হয়ে থাকে।

বৈঠকী খ্যাল যখন থেকে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে থাকলো তখন থেকেই এর নাম হয়ে গেল 'মাচ কা খ্যাল'। যাই হোক, রাজস্থানে তুর্রা কলঙ্গী খ্যালের প্রচলন ঘটে প্রায় দু'শো বছর আগে। প্রথমদিকে চিতোর এবং ঘোসুণ্ডাতে এর আয়োজন করা হয়। বর্তমানেও এখানে তুর্রা কলঙ্গীর প্রচলন আছে এবং চিতোর তুর্রার এবং ঘোসুণ্ডা কলঙ্গীর আখড়ার জন্য বিখ্যাত।

তুর্রা কলঙ্গীর মঞ্চ : ভারতীয় মঞ্চের ক্ষেত্রে তুর্রা-কলঙ্গীর মঞ্চ নানাদিক দিয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল বাড়ি বা প্রাসাদের অনুরূপে এই মঞ্চ নির্মিত হয়। কোথাও কোথাও এই সব প্রাসাদ নির্মিত হয় ১২ থেকে ২০ ফুট উঁচুতে। নানা রকম রঙের ফুল, পাতা, কাগজ এবং কাপড় দিয়ে এই প্রাসাদ নয়নাভিরাম ক'রে সাজানো হয়। রাজস্থানী স্থাপত্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই খুবই স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে এই প্রাসাদগুলিতে। প্রাসাদগুলি নির্মিত হয় সাধারণতঃ রাণীদের জন্যে। কোনো খ্যালে যদি দু'জন রাণী থাকে তবে তার অভিনয়ের জন্যে একই রকমের দু'টি প্রাসাদ তৈরী করা হয়। এদের সংলগ্ন করে মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু করে তৈরী করা হয় প্রধান মঞ্চ যেখানে তুর্রা-কলঙ্গীর অভিনয় হয়। প্রাসাদ বা মহল থেকে মুখ্য মঞ্চে নেমে আসার জন্যে বাঁশের সিঁড়ি বা মই লাগানো থাকে। সপ্তম সুরে গান ধ'রে রাণী চরিত্রাভিনেতার এই

পথেই মঞ্চাবতরণ ঘটে। মুখ্য মঞ্চের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ প্রস্থের দেড়গুণ। মুখ্য-মঞ্চের এক কোণে আখড়া বা দলের নিজস্ব ঝাণ্ডা লাগিয়ে দেয়া হয়। অন্য তিন কোণে থাকে মশাল। এই মশাল তিনটিই তুর্রা-কলঙ্গীর অভিনয়ে আলোর জোগান দিয়ে থাকে। মঞ্চের এক জায়গায় একখানি টুল থাকে। টুলটি উস্তাদের আসন হিসেবে নির্দিষ্ট থাকে। মুখ্যমঞ্চের সামনে অথবা বাম দিকে ছোটো আর একটি মঞ্চ তৈরী করা হয়। তুর্রা-কলঙ্গীর ভাষায় এটি 'লঘু মঞ্চ'। লঘুমঞ্চে আসন নেয় বাজনদার ও গায়কেরা।

যেখানে তুর্রা-কলঙ্গীর অভিনয় হবে, সেখানে প্রায় একমাস আগেই একটি খুঁটি পুঁতে দেয়া হয়। খুঁটিটির মাথায় থাকে দলের ঝাণ্ডা আর গায়ে লাগানো হয় একখণ্ড কাগজ। কাগজখানিতে অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি লাবনীর আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। এটি আসলে ঐ দলের বা অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র বা বিজ্ঞাপনের কাজ ক'রে থাকে। কখনো কখনো এই সব লাবনী গ্রামে গ্রামে গেয়ে গেয়ে প্রচার করতেও দেখা যায়। এইরূপ প্রচারে প্রদর্শনের দিন পেরিয়ে গেলে বিপক্ষ দল লাবনী তৈরী ক'রে গালি-গালাজ দিতে থাকে।

তুর্রাকলঙ্গীর দলগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক একেবারেই বিরোধাত্মক। ফলে এই খ্যালের অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'লেই বিপক্ষ দল তা বিগড়ে দেয়ার জন্যে সবরকমের চেষ্টাই করে। কখনো কখনো ঠিক পাশেই তারা খ্যালের আয়োজন করে। আবার কখনো বা একই জায়গাতেই দুই এক দিন আগে পিছে খ্যাল শুরু ক'রে দেয়। কখনো কখনো দর্শকদের মধ্যেও নানারকম হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হ'য়ে থাকে। এমনকি শুয়োর ছেড়ে দিয়েও অনুষ্ঠান পণ্ড করার চেষ্টা চলে। অনেক সময় বিপক্ষ দলের যারা দর্শক হ'য়ে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে তাদের সঙ্গে অভিনেতাদের সরাসরি বাকবিতণ্ডা চলে। বলাই বাহুল্য এই সময়ে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় তা ভদ্রজনের শ্রবণযোগ্য নয়।

যাই হোক জাঁকজমকপূর্ণ চমৎকারিত্ব এই খ্যালের অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। রাজা সম্পূর্ণ রাজকীয় কায়দায় মঞ্চে আসে। রাজকীয় পোষাক প'রে ঘোড়ায় চড়ে দর্শকদের মধ্য দিয়ে রাজা ডান হাতে ছড়ি বা চাবুক এবং বামহাতে খোলা তরবারি নিয়ে রাণীকে সঙ্গে নিয়ে সমবেতভাবে কখনো বা পৃথকভাবে গান গাইতে গাইতে মঞ্চে আসে। গানের মাধ্যমেই তারা নিজেদের নাম, ধাম, প্রতাপ ও বংশ পরিচয় জানিয়ে দেয়। তারা মুখ্য মঞ্চে এসে অভিনয় শুরু করে। গান গেয়ে নৃত্য-মুদ্রার সঙ্গে তারা নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে। সানাই, নাকাড়া এবং সারেঙ্গী গানের সঙ্গত করে। তুর্রা-কলঙ্গীর খ্যালে দোহারকিদারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তুর্রা-কলঙ্গীর প্রবর্তকরা তুর্রাকে 'ব্রহ্ম' এবং কলঙ্গীকে শক্তির প্রতীক স্বরূপ উল্লেখ ক'রে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে গেছেন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ। ফলে জীবাত্মা

ও পরমাত্মার আন্তরসম্পর্কের বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠাই এর অন্যতম লক্ষ্য।

রাজস্থানের তুর্রা খ্যালের প্রথম আখড়া তৈরী হয় চিতোরে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন সহেডু সিংহ। মজার ব্যাপার হ'লো এই যে এই সিংহজী ছিলেন একজন গৌড়-ব্রাহ্মণ। সিংহজার পর তুর্রা খ্যালের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন—রূপচাঁদ, ছোটলাল, খেমচাঁদ, চম্পালাল। এরা অসংখ্য খ্যাল এবং লাবণী রচনা ক'রে তার অভিনয়-মাধ্যমে চিতোর অঞ্চলের সাধারণ মানুষের নাট্য পিপাসা দূর করেছে। বর্তমানের শ্রেষ্ঠতম ওস্তাদ হ'লেন চৈনরাম।

আর কলঙ্গী খ্যালের প্রচারকদের মধ্যে বিখ্যাত হ'লেন ঘোসুণ্ডার হমীদবেগ এবং খোজাখালী। তুর্রাকলঙ্গীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'লো এই যে কলঙ্গীর সমর্থকরা প্রায় সবলেই মুসলমান।

যাইহোক, চিতোর, ঘোসুণ্ডা, পাটন, বসী, নিম্বাহেড়া কুকুরেশ্বর, খাণ্ডয়া, জয়পুর, আজমীর, কনেরা প্রভৃতি স্থানে তুর্রা কলঙ্গীর অনেক আখড়া খুবই জনপ্রিয়।

রাসধারী

রাসধারী বলতে আমরা সাধারণতঃ ব্রজের রাসলীলার পরিচালক সংগঠককেই বুঝে থাকি। এরা সকলেই কুলীন ব্রাহ্মণ এবং বল্লভ গোষ্ঠীর বৈষ্ণব পরিবারের লোক। ধ্রুপদ-গীতিতে এদের জন্মগত অধিকার। বল্লভাচার্য—প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ ক'রলে ব্রজভূমির বিভিন্ন বৈষ্ণব মন্দিরে কৃষ্ণজীবনের বিভিন্ন ঘটনা অভিনীত হ'তে থাকে। কৃষ্ণজীবনের সেই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা কালক্রমে পরিমার্জিত হ'য়ে রাসলীলার মত অমন এক নাট্য—আঙ্গিকে পরিণত হয়। যদিও আঙ্গিকের দিক থেকে রাসলীলা লোক-নাট্য তবুও ধ্রুপদ-গীতির সঙ্গে প্রচলিত নটবরী ধরণের নৃত্যও রাস-লীলার প্রয়োজনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। রাসলীলায় রাধা, কৃষ্ণ বা অন্যান্য চরিত্রে রূপদানকারীদের বলা হয়—'স্বরূপ'। উচ্চ-ব্রাহ্মণ বংশের বালকরাই কেবল-মাত্র স্বরূপ হওয়ার অধিকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা আবার রাসধারীদের নিকট আত্মীয়। যারা প্রধান প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হয় তারা প্রচলিত রীতি অনুসারে বিভিন্ন সব আচার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়েই বেড়ে ওঠে। স্বরূপদের নাচগানের চর্চা করতে হয় কঠিন অধ্যবসায়ের সঙ্গেই। তাছাড়া শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তার পালনেও একনিষ্ঠ থাকতে হয় তাদের।

প্রথমদিকের রাসলীলা ছিল মন্দিরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ক্রমে তার বন্ধন-মুক্তি ঘটে। বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব পরিবারের নিমন্ত্রণে মন্দিরের রাসলীলা-মণ্ডলী তাদের বাড়িতে গিয়েই লীলা প্রদর্শন করতে থাকে। নাথদ্বারের

শ্রীনাথজী মন্দির বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। তাই রাজস্থানে প্রায়ই সমাগম ঘটতো ব্রজের রাসলীলা মণ্ডলীগুলির। সঙ্গীত-চর্চায় রাজস্থানী বৈরাগীরা ছিল আন্তরিকভাবেই আগ্রহী। সঙ্গীতের চর্চায় তাদের আনন্দ ও নৈপুণ্য সর্বজন-স্বীকৃত। ভক্তদের দ্বারে দ্বারে ভক্তিমূলক গান গেয়েই তাদের জীবিকা নির্বাহ হ'ত। ফলে রাসলীলা খুব সহজেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো। পরম উৎসাহে তারা 'রাসলীলায় যোগ দিল এবং লীলার উন্নতিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রলো। সঙ্গীতে ও অভিনয়ে অনায়াস দক্ষতার দরুণ ব্রজের রাসলীলায়ও এদের সাদরে আমন্ত্রণ মিলেছিল। অচিরেই তারা ব্রজের লীলাতেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল ক'রে নিল। এর ফলে ব্রজের রাসধারীরা ঈর্ষান্বিত হ'য়ে ওঠে। ফলে তাই হ'লো—যা হবার ছিল; রাজস্থানী বৈরাগীরা ব্রজের লীলা-মণ্ডলীগুলি থেকে একে। একে বহিষ্কৃত হ'লো।

রাজস্থানী-বৈরাগীরাও চুপচাপ মেনে নিল না এটা। তারা সকলে সংগঠিত হ'য়ে একেবারে নিজেদেরই জন্যে স্বতন্ত্র এক রাস-আঙ্গিকের সৃষ্টি ক'রলো। এই ধরণের প্রথম রাসলীলা-মণ্ডলীটি হয় রাজস্থানের ফুলেরা অঞ্চলে। সে প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। শ্রীমতিলাল ছিলেন রাজস্থানের এই ঐতিহাসিক রাস-মণ্ডলীটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথমসারির শিল্পীদের একজন। সেখান থেকেই ফুলেরা অঞ্চল—বিশেষ করে রোজদি গ্রামখানি রাজস্থানী রাসলীলার পাঠস্থান হ'য়ে ওঠে!

অচিরেই রাজস্থানের বিভিন্ন সব বৈষ্ণব-মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে বেশ কিছু সংখ্যক রাসলীলা—মণ্ডলী গড়ে ওঠে। মন্দির চত্বরে ও মন্দিরের হ'য়ে বিভিন্ন ভক্তের বাড়িতে এই সব মণ্ডলী নিয়মিতভাবেই লীলা প্রদর্শন ক'রে বেড়াত। এই প্রসঙ্গে কিষাণগড়, জয়পুর, ভরতপুর, কোটা, নাথদ্বার এবং কাঁকরোলীর বৈষ্ণবমন্দিরের নাম করা যেতে পারে। এই সব মন্দির সংশ্লিষ্ট রাসলীলা মণ্ডলী, ধর্মমূলক বিভিন্ন আচার-আচরণ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালন ক'রতো। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাসমণ্ডলীগুলি ছিল ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে একেবারেই মুক্ত। প্রথমদিকে এই ব্যবসায়িক মণ্ডলী-গুলিরও উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার। কিন্তু অচিরেই সেই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ে এগুলি সহজ আনন্দদানের বাহন হ'য়ে ওঠে। রাজস্থানের মন্দির সংশ্লিষ্ট মণ্ডলীগুলিও শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকেই 'স্বরূপ' নির্বাচনের প্রচলিত রীতি ত্যাগ ক'রলো। ব্যবসায়িক মণ্ডলীগুলি তখন আরো একধাপ এগিয়ে গেল। এরা তখন কৃষ্ণচরিত্র ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে বিষয় সংগ্রহ করতে থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে লীলা করার অধিকার শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

এই ভাবেই ঢোলা, মিরাশী, সরগরা, ভাট, রাওত, রব প্রভৃতি পরম্পরাগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত লোকশিল্পী গোষ্ঠীগুলি সদ্য-প্রচলিত এই নাট্য-মাধ্যমটির চর্চার অধিকার লাভ করে।

সদ্যপ্রচলিত রাসধারীতে এই পেশাদারী লোকশিল্পীদের স্বীকৃতি নানা দিক থেকে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এদের শৈল্পিক নৈপুণ্য রাসধারীকে স্বীকৃতিযোগ্য একটি মানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। ঐতিহ্যবাহী রাসলীলায় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দরুন কৃষ্ণ সংস্কৃতি আর বেশিদিন রাজত্ব করতে পারলো না। রামের জীবন ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য কাহিনীও এদের দারুণভাবে উৎসাহিত করে। করে যে—তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'লো—এই ধারায় অভিনীত প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল রামচন্দ্রেরই জীবন। রাসধারীর অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যে রাসলীলার পরিচালক এবং সংগঠক। কালক্রমে শব্দটির এই প্রচলিত অর্থেও পরিবর্তন এলো। তখন একজন ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র নাট্য-আঙ্গিকটিই রাসধারীরূপে প্রচলিত হ'লো। উদয়পুরের 'ভারতীয় লোককলা মণ্ডল'-এর গবেষণা থেকে এই ধারণা জন্মে যে—এই রীতির নাটক প্রথম প্রচলিত হয় রাজস্থানের ফুলেরা, রোজদি এবং জয়পুর অঞ্চলে।

শাস্ত্রীয় কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসাটাও ছিল রাজধানীতে সংঘটিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। পরিবর্তিত এই রাসলীলায় রাসধারীতে প্রথমাবধি প্রচলিত শাস্ত্রীয় ঢঙের নটবরী নৃত্য কিন্তু বেশ যত্নের সংঙ্গেই প্রযুক্ত হ'তে থাকে। তবে মূল রাসলীলার সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অভিনয়ের শুরুতেই কৃষ্ণ জীবন সম্বলিত একটি বা দুটি পাটনা পরিবেশিত হ'তে থাকে। এই পরিবর্তিত রাসধারী পূর্বোল্লেখিত এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ বছর ধ'রে জনপ্রিয় থাকে। পরবর্তীকালে অবশ্য রামের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নামজী নাগবন্তী, মোরধ্বজ প্রভৃতি উপকাহিনীও এতে অভিনীত হ'তে থাকে। এই সময়ে পরিবর্তিত রাসধারী মূল রাসধারীর চেয়েও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আচার-নিষ্ঠ গোঁড়া কৃষ্ণ-সংস্কৃতি থেকে সরে এসে ধর্মনিরপেক্ষ ও সামাজিক কাহিনীকে বিষয় করায় রাসধারী দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ও আনন্দজনক হ'য়ে ওঠে। এই সময়ে শৌখিন নাট্যকর্মীরা এবং জনসাধারণের ভিতরকার প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও রাসমণ্ডলীতে কাজ করার সুযোগ পায়।

এইভাবেই বেশ ব্যাপকহারে শখের রাসধারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে—বিশেষ ক'রে মারওয়ারার দিকে। রাসধারীর এই শৌখিন চর্চা অচিরেই মারওয়ারের আশপাশের অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ফুলেরা, রোজদি, খোড়, পাওয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভ্রাম্যমান ও পেশাদারী রাসধারীর দলগুলি দ্বারা স্থায়ীভাবে—বিচিত্র বিষয়ের এই রাসধারী অভিনয়ের জন্যে—নিজস্ব দল গড়ায় দারুণ উৎসাহ দেখা গেল। এই কারণেই রাজস্থানের এই নতুন রাসধারীর প্রচার

প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ হ'য়ে ওঠেন ফুলেরার মাষ্টার মতিলাল, রতনপুরের কালু এবং ভেরা ঢোলী আর মারওয়ারের পাওলা গ্রামের মূলধজী, গণেশদাস বৈরাগী ও কুশল ভীল। উপরন্তু এরা আজ অবধি রাসধারীকে যারা টি'কিয়ে রেখেছে তাদের জন্যেও পথ পরিষ্কার ক'রে গেছেন। আজকের বিখ্যাত রাসধারী অভিনেতাদের মধ্যে গয়ারাম বৈরাগী, লক্ষ্মীনারায়ণ রাও, লছমন বৈরাগী, নাগজী রামজী নাই, গোপলাল ঢোলী ও ঠাকুর দাজী অন্যতম।

যদিও পর্যাপ্ত তথ্যাদি এখনো আমাদের অনায়ত্ত তবুও এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা একা বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে রাসধারীই রাজস্থানের প্রাচীনতম লোকনাট্যগুলির মধ্যে অন্যতম। 'ভারতীয় লোক কথামণ্ডল'-এ সংরক্ষিত তথ্যাদি থেকে এব্যাপারটিও খুবই স্পষ্ট হ'য়ে প'ড়ে যে রাজস্থানের পরবর্তীকালের কুচামনি-খ্যাল, চিড়াওয়ী-খ্যাল, কিষণগড়ী খ্যাল, ও আলীবক্সী-খ্যাল এই রাসধারী দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। রাসধারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'লো—একেবারে প্রথমদিকেও তা ছিল পেশাদারী এবং কেবলমাত্র পেশাদারী শিল্পীরাই এতে অংশ নিতে পারতো। প্রথমে জয়পুরেই এই পেশাদারী রাসধারী দীর্ঘদিন যাবৎ বর্তমান ছিল। পরের দিকে বিভিন্ন স্থানে এই ধরণের পেশাদারী রাসমণ্ডলী গ'ড়ে ওঠে। ফলে পরবর্তী কালে পালী, জোধপুর, খোদযনেরাও এই সব এলাকা পেশাদারী রাসধারীর কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। তুলনামূলকভাবে সামাজিক দিক থেকে একটু অধিক কুলীন বৈরাগী সাধু-সন্তেরা খুব সহজেই ঢোলী, মারাশী, সাবগদা, ভাট ও রবেদের মধ্যেকার প্রতিভাবান শিল্পীদের সংগঠিত করতে পেরেছিল। ব্রজরাসে রাসধারী—ব্রাহ্মণদের যে ভূমিকা সেই একই ভূমিকা পালন কোরতো রাজস্থানী রাসধারীর এই বৈরাগীরা। প্রথমদিকে প্রধান প্রধান স্বরূপে কেবলমাত্র এদের ছেলেরাই অবতীর্ণ হ'তে পারতো। অন্যান্য বর্ণ বা গোষ্ঠীর ছেলেদের যে একেবারেই প্রবেশাধিকার ছিলনা--তা কিন্তু নয়, তবে তারা কেবলমাত্র গৌণ-স্বরূপের বেশ নিতে পারতো। স্বাভাবিক ভাবেই রাজস্থানে প্রথমদিককার এই রাসধারীর পরিচালক সংগঠক ছিল এই বৈরাগীরাই। এরাই তখন বিভিন্নস্থানে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে বিভিন্ন সব রাসমণ্ডলী গ'ড়ে তুলেছিল। এইসব বৈরাগীদের দ্বারা পরিচালিত রাসধারীর প্রধান পুরুষ ছিলেন ফুলেরার মাষ্টার মতিলাল। রোজদিতে বসবাসকারী তাঁর গোষ্ঠীর বৈরাগীরাও তাঁরই পথ অনুসরণ করেছিল। আজও রোজদিতে এই শ্রেণীর রাসমণ্ডলীর দেখা পাওয়া যায়। শুধুমাত্র রাজস্থানেই নয়, রাজস্থানের বাইরেও এদের পসার বেশ ভালো। পুরোণো মেওয়ার কাপাসন এলাকাতেও এই শ্রেণীর রাসধারী দেখা যায়। আজকের কাপাসনের রাসধারীর খ্যাত শিল্পীরা হ'লেন —লক্ষ্মণভাট, চুনজী এবং নন্দলাল।

এই পেশাদারী রাসধারীর দলগুলি রাজস্থানের প্রায় সর্বত্রই তাদের নাটক প্রদর্শন ক'রেছিল। ফলে অচিরেই সর্বত্র তারা বেশ জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। সে সময়ে রাজস্থানের অন্যান্য লোক-আঙ্গিক জনসাধারণের মধ্যে তেমন একটা সমাদর লাভ করতে পারেনি। তবে বীকানীরের রম্মত, শেখাওটীর চিড়াওয়া খ্যাল এবং লচ্ছীরামের কুচামনী খ্যালের আত্মপ্রকাশ ঘটে অবশ্য আরো পরের দিকে। ইশ্বরচাঁদ ও নথ্থারাম গৌড়ের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রচলিত হাথরসের নৌটঙ্কীর প্রচলন হয় এই শতাব্দীরই গোড়ার দিকে। জমাটি নাট্যঘটনা, গান ও আকর্ষণীয় আমোদ উপকরণের দরুণ রাজস্থানের সাধারণ মানুষ হাথরসের নৌটঙ্কীর দিকে খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে অচিরেই তা রাজস্থানের জনমানসের নিকট আত্মীয় হ'য়ে ওঠে। রাজস্থানের সীমান্ত এলাকা চিড়ওয়া ও শেখাওটা এসবের দ্বারা দারুণভাবেই প্রভাবিত হ'য়ে প'ড়েছিল। ফলে নালুরাম তুলাজী ও উজিরা তেলির নেতৃত্বে নতুন এক নাট্য আঙ্গিকের আবির্ভাব ঘটে। বীকানের ও জয়সলমীরের রম্মতেরও রাসের অনুরূপ এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তবে পেশাদারী নাট্যহিসেবে রম্মতের উন্নতির কোনো লক্ষনই দেখা গেল না। বীকানেরের শকদ্বীপী ব্রাহ্মণরা পুষ্কর্ণদের নিয়ে এক ধরণের অপেশাদার অভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রতো। এতে ক'রে অবশ্য সঙ্গীতকার, নৃত্যকার এমনকি কবিরাও তাদের নিজেদের প্রকাশ করার এক ব্যাপক সুযোগ লাভ ক'রেছিল। রাসধারী ও চিড়াওয়া খ্যালের সঙ্গে এই রম্মতের কোনোই সম্পর্ক নেই। রম্মত প্রথমাবধিই যেমন অপেশাদার তেমনি আবার খুবই অগোছালো।

কুচামনের ৺লচ্ছীরামের উৎসাহ অনুপ্রেরণায় কুচামণি খ্যালের প্রবর্ত্তন হয়। রাজস্থানের খ্যালের মধ্যে এই কুচামনি খ্যালের প্রবর্ত্তন হয় সবচেয়ে শেষে। রাজস্থানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগও বড় গভীর নয়। এক সময়ে কুচামনে রাসধারীর অত্যন্ত জনপ্রিয়তার দরুণ কুচামনী খ্যাল রাসধারী দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিল।

শেখাওটের চিড়াওয়া খ্যাল কুচামনের কুচামনা খ্যাল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের ভাওয়াই খ্যাল তাদের অত্যন্ত জটিল আঙ্গিক সত্বেও প্রথমাবধি পেশাদারী। তবে রম্মত ও চিতোরের তুরাকলঙ্গী খ্যাল কখনোই পেশাদারী-রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি। অন্যদিকে কোনো পেশাদারী দলও তাদের অবলম্বন করে জীবিকা-নির্বাহের চেষ্টা করেনি।

অন্যদিকে আবার পেশাদারী রাসধারীর জনপ্রিয়তায় অনেক নাট্যদল অপেশাদারী ভাবে রাসধারী প্রদর্শনের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের ও সাধারণ মানুষকে আনন্দদানের ব্যাপারে উৎসাহী হ'য়ে উঠেছিল। উদয়পুর, কানোদ, কাপাসান, নাথদ্বার, চিতোর, আজমীর, বিজয়ার কিষাণগড়ের এই জাতীয় শৌখীন নাট্যদলগুলি রাসধারী প্রদর্শনে বেশ সুনাম অর্জন ক'রেছিল।

'রাজস্থানী খ্যালকে সাধারণভাবে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) ভাওয়াই, গবরী ও রাসধারী,

(২) তুর্রাকলঙ্গী, রম্মত, অলবক্সী ও চিড়াওয়াখ্যাল।

প্রথমভাগের খ্যালগুলি দ্বিতীয়ভাগের খ্যালগুলি থেকে প্রাচীন। ভাওয়াই, গবরী ও রাসধারী অভিনীত হয় সমতল ভূমিতে কিন্তু রম্মত, তুর্রাকলঙ্গী, চিড়াওয়া এবং আলবক্সী খ্যাল অভিনীত হয় অপেক্ষাকৃতভাবে উঁচু কোনো বাঁধামঞ্চে। প্রথমভাবের খ্যালগুলিতে চাঁদোয়া বা অন্য কোনোরকম মঞ্চোপকরণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্যালগুলির জন্যে বিবিধ রকমের মঞ্চসজ্জার প্রচলন আছে। প্রথম শ্রেণীর খ্যালগুলিতে দর্শকমণ্ডলী অভিনয়ক্ষেত্র ঘিরে তার চারদিকেই আসন নিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয়শ্রেণীর খ্যালগুলির অভিনয়দর্শনে দর্শক বসে বাঁধা মঞ্চে তিনদিকে। প্রথম শ্রেণীর খ্যালগুলির পরিবেশনে ঢোলক, ঢোল এবং মাদলের ভূমিকা খুব বেশি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্যালে প্রধান বাদ্যযন্ত্র হ'লো নাকাড়া। প্রধানতঃ নাকাড়ার জন্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রায় সব খ্যালেই লাবনী, চৌবোল, দুবোল, বাহ্রেতবীল প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে।

রাসধারী খ্যালের মঞ্চায়ন : যেহেতু উঁচু ক'রে মঞ্চ-বাঁধার কোনো চল নেই, সেইহেতু কিছু লোক মিলিত হ'তে পারে, গ্রামের এমন যেকোনো সমতল মিলনক্ষেত্রেই রাসধারী পরিবেশন করা যেতে পারে আর তখন বাড়ীর ছাদ, গাছের ডাল বা অভিনয় ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী যে কোনো উঁচু জায়গাতেই দর্শক সাধারণ আসন গ্রহণ করতে পারে। নিকটবর্তী যে কোনো পাকা-বাড়ি বা কুঁড়ে ঘর নেপথ্য গৃহ-হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। রাসধারীতে কোনোপ্রকার মঞ্চ সজ্জারই চল নেই। অভিনেতারা সকল সময়ই নড়াচড়া করে। কোনো সময়েই এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকে না। একজায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেও বৃত্তাকার রঙ্গস্থলের চারিদিকেই বসা দর্শকদের দেখতে খুবই অসুবিধে হয় আর ঠিক একই কারণে রঙ্গস্থলে প্রবেশের জন্যেও কোনো নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ নেই। প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো দিক থেকেই অভিনেতার মঞ্চাবতরণ ঘটে। এব্যাপারে কোনো শাস্ত্রীয় বা প্রচলিত বিধিনিষেধ রাসধারীতে নেই। যন্ত্রীদের বসবার জন্যেও কোনো বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করা থাকে না। দর্শকদের মধ্যে যে কোনো জায়গাতেই তারা আসন নিতে পারে। ইচ্ছুক দর্শক যাতে সহজেই রাসধারীতে অংশ নিতে পারে মুখ্যতঃ তারই জন্যে এই ব্যবস্থা।

রাসধারীর প্রায় প্রত্যেক পালায় এমন কিছু উপকাহিনী থাকে যা হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করতে গেলে নির্দিষ্ট ধরণের স্থানের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। অভিনয় ক্ষেত্রের নিকটবর্তী গাছপালা এবং মন্দিরই এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ ক'রে

থাকে। এই কারণেই একেবারে খোলা জায়গাতে কখনোই রাসধারী পরিবেশিত হয় না। অপেক্ষাকৃতভাবে ছোটো এবং গাছপালা, ঘরবাড়ী ও মন্দির দিয়ে ঘেরা স্থানই রাসধারী পরিবেশনের জন্য উপযুক্ত। এতে ক'রে দর্শক-অভিনেতার পারস্পরিক মিথাস্ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা এবং গানের শ্রুতিগম্যতা অনেক বেড়ে যায়। মঞ্চোপকরণের আড়ালে প'ড়ে অভিনয়ের কোনো অংশ দর্শকের অগোচরীভূত হওয়ার বা দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার আশঙ্কাতেই রাসধারীতে কোনো প্রকারের মঞ্চসজ্জা করা হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়—রাজার ব্যবহারের জন্যে যদি সিংহাসনের দরকার হয় তাহ'লেও কোনো চেয়ার বা অনুরূপ কোনো জিনিস মঞ্চে আনা হয় না। পরিবর্তে দর্শকের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিয়ে—তাকে মঞ্চে তোলা হয়—সে তখন হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে নীচু হ'য়ে পীঠ পেতে দেয়, আর রাজাও বিনা দ্বিধায় তার পীঠে ব'সে সিংহাসনের অভাব পূরণ ক'রে নেয়। অভিনয় চলাকালীন কোনো দর্শক যদি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে চায় বা স্বেচ্ছায় কোনো অংশ নিতে চায়—তাহ'লে নিছক রঙ্গচ্ছলেই তা মেনে নেয়া হয়। আর কখনো যদি মনে হয় যে কোনো চরিত্রের অদৃশ্যভাবে মঞ্চাবতরণের প্রয়োজন আছে—তাহ'লে তাকে কাপড় মুড়ি দিয়ে ধরাধরি ক'রে মঞ্চে নিয়ে আসা হয়।

দর্শক যাতে সকল সময়ে অভিনেতার মুখের ভঙ্গি—মুখের ভাব সহজে দেখতে পায় তারই জন্যে অভিনেতারা সকল সময়ই শৃঙ্খলিত ভাবে রঙ্গক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে অভিনয় ক'রে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলাযায়—সীতাকে অপহরণ করতে এসে সাধু-বেশী রাবণ যখন ভিক্ষে চায়—তখন সব দর্শকই যাতে তা দেখতে পায় তার জন্যে বারণকে মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে একই ভঙ্গিতে ভিক্ষে চাইতে হয়। একই কারণে সাধু-রাবণ থেকে প্রকৃত রাবণে আত্মপ্রকাশও মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে একই রূপে সংঘটিত হয়। তারপর সীতাকে ঘাড়ে ক'রে সে কয়েকবার মঞ্চটা ঘুরে নেয়। যেহেতু রঙ্গস্থলের একইতলে এবং রঙ্গস্থল ঘিরে চতুর্দিকে দর্শকেরা আসন নেয় সেই কারণে উত্তেজিত ও আবেগাত্মক মুহূর্তে রঙ্গস্থলে ঢুকে পড়ার এক স্বাভাবিক প্রবণতা দর্শকদের থেকেই যায়। আর কোন দর্শক কখন যে উত্তেজিত বা আবেগাপ্লুত হ'য়ে পড়বে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই দর্শকদের এই অনিশ্চিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মঞ্চ-প্রবেশ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসধারীর নাচ-গান এবং অভিনয় সকল সময়ই রঙ্গক্ষেত্রের সীমানা বরাবর সংঘটিত হ'তে থাকে। বলাই-বাহুল্য এই পদ্ধতিতে দর্শকের অনাকাঙ্ক্ষিত মঞ্চ-প্রবেশ কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। যেহেতু মঞ্চটি উঁচু নয়, তাই দর্শকদের একই তলে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হয় অভিনেতাদের। ফলে অভিনয়ের কিছু অংশ অবশ্যই দর্শকদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে বিশেষ ঢঙে লাফিয়ে লাফিয়ে অভিনয় করার একটা রীতি রাসধারীতে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং কালক্রমে এটিই রাসধারী অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য

হ'য়ে উঠেছে। অনেকসময় দর্শকরা যাতে নিশ্চিত-রূপে দেখতে পায় তার জন্যে অভিনেতারা নিকটবর্তী কোনো উঁচু জায়গাতে লাফিয়ে উঠে অভিনয় করতে থাকে।

যেহেতু লাউডস্পীকারের প্রচলন রাসধারীতে হয় নি, তাই প্রত্যেক অভিনেতাকেই গান গাওয়ার বা সংলাপ উচ্চারণের সময় গলার সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়।

রাসধারীর বিষয় :

ব্রজের রাসলীলা থেকেই যে রাজস্থানী রাসধারীর জন্ম তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রায় দেড়শো বছর আগে মথুরার রাসলীলার দলও রাজস্থানে তাদের লীলা প্রদর্শনের জন্যে আসতো। রাজস্থানের সাধারণ মানুষের কাছে এই রাসলীলা খুবই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। আবির্ভাব মুহূর্তেই তাই রাজস্থানের রাসধারীতে এই রাসলীলার প্রভাব পড়েছিল। আঙ্গিকগত দিক থেকে ব্রজের রাসলীলা দ্বারা প্রভাবিত রাসধারী বিষয়গতভাবে রামলীলা দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিল। রাজস্থানের সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটানোর তাগিদে তাই রাসধারীতেও রামকাহিনী প্রদর্শিত হ'তে থাকে। রামকাহিনীকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও রাসধারীর আঙ্গিকে কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় নি। রামকাহিনী সম্বলিত এই রাসধারীতে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ বা কোনো প্রকারের গোঁড়ামি একেবারেই প্রশ্রয় পায়নি। যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থাতেই এর অভিনয় করা যেতে পারে। রাজস্থানী রাসধারীতে রামকাহিনীর এই স্বীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব।

ধর্মগতভাবে রাজস্থানের মানুষ মথুরা ঘরানার রাসলীলা দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিল। শ্রেণী ও বর্ণ নির্বিশেষে রাজস্থানের আপামর জনসাধারণের কাছে শ্রীরামচন্দ্র সমান শ্রদ্ধায় আদরনীয় হ'য়ে ওঠেন। এমনকি অনুন্নত উপজাতি—গোষ্ঠীর কাছেও রামচন্দ্র তাদের হৃদয়ের মানুষ (দেবতা) হ'য়ে ওঠেন। অবশ্য কৃষ্ণের জন্যও সকল শ্রেণীর মানুষের দ্বার ছিল উন্মুক্ত, তবে বল্লভপন্থী বৈষ্ণব ধর্মের গোঁড়া ভক্তদের কড়া আচরণ বিধির দরুণ শ্রীকৃষ্ণ সমাজের উচু মহলেরই প্রতিভূ হ'য়ে পড়লেন। অন্যদিকে কবীরদাস, তুলসীদাস ও বাল্মীকির রামকাহিনীর আবেদন সাধারণ মানুষের কাছেও ছিল সমানভাবে গ্রাহ্য। রাজস্থানের রাসধারী তার আঙ্গিকে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে এবং কোনো দ্বিধা না ক'রেই রামকাহিনীকে সম্বল ক'রে নেয়। রাজস্থানের সাধারণ মানুষের মানসিক শূন্যতা দূর করার জন্যেও প্রয়োজন ছিল এর।

শুধুমাত্র সমাজের নীচুতলার মানুষের আমোদ-উপকরণ যোগানোর উদ্দেশ্যেই রাসধারীতে রামকাহিনীর প্রচলন হ'য়েছিল। তাই এর সঙ্গে ধর্মীয়

আচার অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। রাসধারীতে প্রদর্শিত রাম-কাহিনীতে রাম চরিত্রের ধারাবাহিকতা দারুণভাবেই অবহেলিত। শুধুমাত্র সঙ্গীতাত্মক নাটকীয় মুহূর্তগুলিই এখানে বেছে নেয়া হয়—যাতে ক'রে খুব সহজেই তা মানুষকে আনন্দ দিতে পারে। পশ্চিমের অপেরার মতই রাম-কাহিনী-সম্বলিত-রাসধারী মূলতঃ গীতি-নাট্য। বিষয়ের নাটকীয়তা তাই এখানে খুবই কম। রাসধারী তার আবির্ভাবকাল থেকে কখনোই কোনো ধর্মীয়-বোধ বা বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন সস্তা আমোদ উপকরণের বাহন হিসেবে শৃঙ্গার ধর্মী নাট্যআঙ্গিকের আবির্ভাব হ'তে থাকে, তখন এর ভক্তিমূলক দিকটিও একেবারে অপসৃত হ'য়ে যায়। সর্বত্রই, মানে সব প্রদেশেই ভারতীয় লোক-নাট্য এই সময়ে সমাজে প্রচলিত শৃঙ্গারধর্মী কাহিনীর দিকে দারুণভাবেই ঝুঁকে পড়ে। মনোহারী ও চিত্তাকর্ষক নাচ-গানের মধ্য দিয়ে সাধারণ দর্শকের জন্যে সস্তা আমোদ-উপকরণ যোগানোই ছিল এই সময়ের ভারতীয় লোকনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

নিজস্ব আঙ্গিকে উন্নতি সাধনের কোনো আন্তর-সম্ভাবনা রাসধারীতে ছিল না। তবে পরবর্তীকালের কুচামনী, আলীবক্সী ও কিষাণগড়ী খ্যালের বিবর্তনে রাসধারী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রেছিল।

সঙ্গীত ও নৃত্য :

প্রত্যেক লোকনাট্যেই স্থানীয় চাহিদা অনুসারে সেখানকার প্রচলিত সুর ও ছন্দের ব্যবহার হ'য়ে থাকে। গেয় সংলাপের গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগাত্মক দিকটা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এইসব সুর ও ছন্দ গবেষকদের বিষয় নিঃসন্দেহে। সুর ও ছন্দের এই ব্যবহার থেকেই আধুনিক ও প্রচলিত (বা ঐতিহ্যবাহী) নাটককে পৃথক করা যায়। অথচ রাজস্থানের রাসধারীতে এই জাতীয় কোনো প্রচলিত সুর ও ছন্দের ব্যবহার হয় না। রাজস্থানে প্রচলিত গানের ছন্দগুলি হ'লো দুবোল, চৌবোল, বাহ্রেতবীল এবং দীপচাঁদজী। অথচ রাসধারীর অভিনেতা নিজস্ব রুচি এবং কল্পনা অনুসারেই তার ছন্দ ও সুর রচনা ক'রে নেয়—অভিনয় চলাকালীন। সমাজে প্রচলিত সুরের এই কার্যকরী ও তাৎক্ষণিক প্রয়োগের জন্যে রাসধারীর গায়কদের অবশ্যই সাধারণ জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। এটাই এখন রাসধারীর প্রধান চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য—চাইলেই তা দূর করা সম্ভব হবে না।

রাসধারীর বেশিরভাগ গানই গেয়ে দেয় যন্ত্রীরা। অভিনেতা কেবলমাত্র গানটি শুরু করেই থেমে যায় এবং কুটকড়িয়া গদ্য ব্যাখ্যায় অংশ নেয়।

রাসধারীর সবচেয়ে দুর্বল দিক হ'লো এর নাচ। গানগুলি অবশ্য গাওয়া হয় জনপ্রিয় সব সুরে। তবে অন্যান্য জনপ্রিয় খ্যালের সুরের সঙ্গে এর কোনো মিলই

নেই। রাসধারীতে প্রযুক্ত গদ্য পদ্য উভয় ধরনের সংলাপই বড়ই অপরিশোধিত বা অমার্জিত। সংলাপ উচ্চারণেও অপেশাদারীত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অভিনেতাদের আচার আচরণ, বিশেষ করে দর্শকদের নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে একাত্ম ক'রে তোলার ক্ষমতাটা সত্যিই তুলনাহীন। রাসধারীর অনুষ্ঠানে দর্শক তাই কখনোই বিরক্ত হয় না। অধিকাংশ সময়েই সমস্ত দর্শকই অভিনেতাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে গানের আনন্দ উপভোগ করে। অনেক সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ উত্তেজনার চরম মুহূর্তে মঞ্চে উঠে আসে এবং নির্দিষ্ট অভিনেতাকে বসিয়ে দিয়ে নিজেই তার ভূমিকায় অভিনয় করতে থাকে—শুধুমাত্র কৌতুক-ছলে। এই প্রাণবন্ততা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দর্শক, অভিনেতা উভয় পক্ষই সমানভাবে তৎপর থাকে।

আমরা আগেই দেখেছি রাসধারীর সুর, ছন্দ ও তাল একেবারেই নির্দিষ্ট করা থাকে না। আঙ্গিকের এই খামতি পূরণের জন্য কিছু কিছু নাট্য কৌশল প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। এই কৌশলগুলির মধ্যে দর্শকদের অভিনয়কার্যে অংশগ্রহণ করানো, ঘটনার দ্রুততা, কৌতুককর বিষয়ের সংযোজন, চকিতে কোনো বাস্তবানুগ দৃশ্যের সৃজন-প্রচেষ্টা এবং রঙ-বেরঙের হাস্যকর পোষাক অন্যতমা। অন্যান্য খ্যালের মত রাসধারীতে অভিনেতা দীর্ঘক্ষণ ধরে আত্মপরিচয় দেয়না বা অনাবশ্যক সংলাপে কালক্ষেপ করে না। কথকতার সাহায্যে চরিত্রের আত্ম-পরিচয় দেয়া হয় এখানে—খ্যালের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অভিনেতা তার ইচ্ছামত ঘটনার অবতারণা করে এবং প্রয়োজন হ'লে মূল কাহিনী থেকেও সরে আসে। এই স্বাধীনতা রাসধারীর অভিনেতার পক্ষে সকল সময়েই নতুন কিছু সৃষ্টি করার সুযোগ করে দেয়।

বিষয় এবং শৈলী :

অন্যান্য খ্যালের বিষয় লিখিত থাকে। কিন্তু রাসধারীর বিষয় নির্দিষ্ট সংলাপাকারে লিখিত থাকে না। অভিনয়ের প্রতিটি মুহূর্তেই তাৎক্ষণিক সৃজন-প্রক্রিয়াটি তাই রাসধারী-অনুষ্ঠানের প্রধান চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠেছে। রাসধারীর পরিবেশন-রীতির এটি অবিচ্ছেদ্য একটি দিক। এর জন্যে রাস-ধারীর একটি অনুষ্ঠানে বেশ কিছু সংখ্যক গান এবং সত্য ঘটনার নাটকীয় রূপ তাৎক্ষণিকভাবেই রচিত হ'য়ে থাকে। প্রায়ই প্রধান ঘটনা থেকে সরে এসে অপ্রধান ঘটনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়ে থাকে। শিল্পীরা রাসধারীর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন থাকে। তাই দর্শকের চাহিদা অনুসারে ঘটনার পরিবেশনে তারা সদাই সচেষ্ট। এই প্রবণতা নাটকের দিক থেকে যেমন ক্ষতিকর নয়, তেমনি তা অভিনেতাদের পক্ষে মঙ্গলজনকও বটে। রাসধারী পরিবেশনের এই স্বতন্ত্র শৈলীটির দরুণ নতুন নতুন সব শিল্পীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব হ'য়েছে। এই সব শিল্পীরা তাদের প্রতিভা দিয়ে রাসধারীকে

প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যময় ক'রে রাখায় সব সময়ই সচেষ্ট থাকে। তাৎক্ষণিক সৃজন-প্রক্রিয়াটি তাই রাসধারীর আঙ্গিককে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ক'রে চলেছে।

রামকাহিনীর যেসব অংশের নাটকীয়তা খুবই কম, দ্বিধাহীনভাবে সেইসব অংশ অভিনয় থেকে বাদ দেয়া হয়। পরিবর্তে কোনো হাস্যকৌতুক বা অন্য কোনো আকর্ষণীয় ঘটনা জুড়ে দেয়া হয়। ব্যাখ্যা, কখনো কখনো এইসব বিরক্তিকর অংশগুলিকে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে বর্ণনা ক'রে যায়। দর্শক তখন অবশ্যই খুবই ধৈর্য সহকারে সে বর্ণনা শোনে। রাসধারীর একটি পালা অবার অনেক সময়ে দুঃসম্পর্কের বা একেবারেই সম্পর্কহীন সব উপকাহিনীর সমষ্টি হ'য়ে ওঠে। মথুরার ঐতিহ্যবাহী রাসলীলার যে ধর্মীয় দিক তা এই লোকআঙ্গিকে উপেক্ষিত। রামলীলার বিভিন্ন চরিত্র রাসধারীতে এসে তাদের ধর্মীয় ও পৌরাণিক মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলে। তাই ধর্মীয় কোনো মূল্যবোধ সঞ্চার করতে তারা অপারগ হ'য়ে পড়ে। এমনকি শ্রীরামচন্দ্র নিজেও কখনো কখনো একজন অতি সাধারণ মানুষ হ'য়ে পড়েন। ফলে সীতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও এক সাধারণ দম্পতির সম্পর্কে পরিণত হ'য়ে যায়। ফলে সময় মত রান্না ক'রে দি'তে না পারায় সীতা তাই রামের কাছে বকুনি খায়।

রামকাহিনীর অভিনয় করলেও বাস্তব জীবনের পোষাক তারা পরিত্যাগ করে না। লক্ষ্মণ এখানে একজন সাধারণ যুবক। ফলে রাবণের বোন শূর্পনখার সঙ্গে একজন 'রোমান্টিক' যুবকের মত প্রেমালাপ করার সুযোগ তার আছে। কাজেই রাসধারীর হরিণটি আর রামায়ণের মায়ামৃগ থাকে না। সে পরিণত হয় সীতার দীর্ঘদিনের এক পালিত হরিণে। হরিণটি তাই খুবই দুষ্টু। সীতার তৈরী বাগীচা সে অকারণে নষ্ট করে। ফলে রাম এই দুষ্টু প্রকৃতির হরিণটি মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। রাসধারীর রাবণও একজন দুশ্চরিত্র ভবঘুরে। বোনের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিহিংসায় সে সীতাকে অপহরণ করে না—করে দুষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। রাবণ সীতাকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে পঞ্চবটীতে ঢুকলে সীতা একজন সাধারণ রাজস্থানী মেয়ের ঘোমটা টেনে দেয়। রাসধারীর সমস্ত চরিত্রই রাজস্থানের গ্রাম্য মানুষের সাদাসিদে গ্রাম্য পোষাক প'রেই মঞ্চে আসে। প্রধান প্রধান চরিত্রের সঙ্গে সাধারণ সব চরিত্রও ধুতি, পাগড়ী ও ফতুয়া পরে। সীতা পরে কাপড় এবং মাথায় দেয় রাজস্থানী শাড়ির ঘোমটা।

সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেয়াই রাসধারীর প্রধান উদ্দেশ্য। যেহেতু ব্রজ-রাসের গোঁড়ামির বিরোধিতা ক'রেই এর উৎপত্তি, তাই কোনো প্রকারের বিধিবদ্ধ আচরণ বিধি রাসধারীতে একেবারেই নেই। রাসধারীর রামের সঙ্গেও মথুরার রামলীলার রামের আচরণগত কোনো সাদৃশ্য নেই। রাসধারীর সমস্ত চরিত্রই সমকালীন মানুষের অনুরূপ আচরণ ক'রে থাকে।

রাসধারীকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে লোকশিল্প মাত্রই এমন এক বহতা নদী যাকে স্রোতস্বিনী ক'রে রেখেছে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নদীগুলি। সমাজের চলতি সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই তাই লোক-নাট্যের অঙ্গীভূত হয়ে লোকমঞ্চে মূর্তিমান হ'য়ে ওঠে। প্রতিমুহূর্তের এই স্বাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়াটি বন্ধ হ'লে লোকনাট্যও তার সচল প্রাণময়তা হারিয়ে নীরস রীতি-রেওয়াজে পরিণত হবে। তাই ভারতের লোক-নাট্যের ধারা যে সতত বহতা, তার, কারণ হ'লো, এর বিষয় ও চরিত্র সর্বদাই পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছে। নদীর কর্দমাক্ত জল যেমন পানের যোগ্য নয়, তেমনি সাম্প্রতিককালে আহৃত কোনো বিষয় যতক্ষণ না লোকনাট্যের মূল ধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে—ততক্ষণ তা সমাজে আদরনীয় হ'য়ে উঠতে পারে না। লোকনাট্যের আত্মর-প্রবণতায় এই দ্রবীভবনের প্রক্রিয়াটি তাই স্বতঃ ক্রিয়াশীল। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সাদরে আশ্রয় পাওয়ার জন্যে রাসধারীর স্বভাব-বিরোধী অনেক উপকরণ এখন রাসধারীর মূল ধারায় দ্রবীভূত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

শিল্পীদের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ক্ষমতাই রাসধারীর প্রধান আকর্ষণীয় দিক। অন্য সমস্ত নাট্যোপকরণের গুরুত্ব তাই শিল্পীদের পরে। কাহিনী পরিবেশনের শৈল্পিক নৈপুণ্যে দর্শকদের আনন্দে ও হাসিতে মশগুল রাখার জন্যে শিল্পীদের প্রত্যেককেই দরাজ-গলার অধিকারী হ'তে হয়। রাসধারীতে শিল্পীদের এই দরাজ গলার চাপে আঙ্গিকের অন্যান্য সব খামতি চাপা পড়ে যায়।

রাসধারীর অনুষ্ঠানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সকলেরই স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতা আছে। কখনো কখনো পরিবেশিত ঘটনা রামচরিতমানস থেকে এতদূর সরে আসে যে দর্শকের বুঝতে কষ্ট হয় যে এটা রাসধারীরই অনুষ্ঠান; পরিস্থিতি অনুসারে যেকোনো ঘটনা ও সংলাপ পরিবেশন করার ক্ষমতা রাসধারী অভিনেতাদের আছে বলেই এটা সম্ভব হয়। দর্শকদেরও মানিয়ে নেবার ক্ষমতা এত বেশি যে প্রয়োজনে রাম সীতাকে তার ভুল-ভ্রান্তির জন্যে তিরস্কার করলেও আদৌ বিচলিত হয় না। রাম নিজেই যে যোগ্যতম ব্যক্তি এটা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে স্বয়ম্বর সভায় ঢোকে। অনাহূতভাবে আসার দরুণ সে রাবণকে অপমান করে। অন্যদিকে ভরত অযোধ্যার সিংহাসনে তার অধিকার যে যুক্তি-সঙ্গত এ ব্যাপারে মাতা কৈকেয়ীর সঙ্গে একমত হয়।

রামচরিতমানসের এইসব বিচ্যুতি দর্শক সাধারণ যেন দেখেও দেখে না। তারা শুধু চায় সুন্দর নাচ, গান আর অভিনয়। অভিনয় আরম্ভ হ'য়ে গেলেও কোনো সম্মানীয় অতিথি যদি এসে উপস্থিত হন—তা'হলে অভিনেতারা অভিনয়

বন্ধ ক'রে অতিথি সেবায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। দর্শকের সম্মিলিত অনুরোধে বেশ কিছুক্ষণ পরে তারা আবার অভিনয় শুরু করে। পুরাণে যাই থাকুক না কেন, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা কি বলবে বা কি করবে তা এইসব গণ্যমান্য অতিথিদের ইচ্ছাতেই নির্দিষ্ট হয়।

এক্ষনে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে রাসধারীই রাজস্থানের প্রাচীনতম লোক-নাট্য এবং অন্যান্য লোক-নাট্যের উদ্ভবে রাসধারীই প্রত্যক্ষ-ভাবে উপকরণ ও উৎসাহ জুগিয়েছিল। আঙ্গিকের কৌলিন্যে বিশ্বাস বা আস্থা নেই রাসধারীর। দর্শকের মনোরঞ্জনেই তার অধিক আগ্রহ। তার পরিবেশন তাই নিত্যই যেন নতুন। রাসধারী তাই সদাই পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছে—প্রাণবেগ তাই তার অফুরান। যেকোনো পেশাদার দলের মাথাব্যথা থাকে নাটকের চরিত্র সংখ্যা নিয়ে। বিষয়ের যাথার্থ্য নিয়ে মাথাব্যথা তাদের খুবই কম। রাসধারীর একটি অনুষ্ঠানে, একই অভিনেতা অনেকগুলি চরিত্রে অভিনয় করে। অতি নিপুণভাবে তা করতে পারার দিকেই আজকের রাসধারীর দল সদাই সতর্ক থাকে। একটি অনুষ্ঠান থেকে যে টাকা আসে তাতে চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা রাখা অসম্ভব হ'য়ে প'ড়েছে ব'লেই এই প্রচেষ্টা।

গবরী

গবরী রাজস্থানের উদয়পুর, ডুঙ্গরপুর এবং বাঁশওয়াড়ার ভীলেদের লোকনাট্য। শিবকে কেন্দ্র ক'রেই এর কাহিনী গড়ে ওঠে। এই লোকনাট্যে ভোলানাথ শিবকে বিচিত্ররূপে দেখা যায়। এখানে শিব তথা ভস্মাসুরের প্রতীক হ'লেন 'রাই বুড়িয়া'। দু'জন রাই হ'লেন মোহিনী অর্থাৎ পার্বতীর প্রতিমূর্তি। এছাড়া কুটকড়িয়া এবং পাটভোপা—এই পাঁচজন হ'লেন গবরীর মুখ্য চরিত্র। সম্মিলিতভাবে এদের বলা হয় 'তার্জী'। এছাড়াও অন্যান্য যেসব চরিত্র আছে তাদের বলা হয় খেল্যে বা খেলিয়ে।

গবরীতে যেসব দৃশ্য অভিনীত হয় তাদের বলা হয় খেল, ভাব অথবা সাঙ্গ। কুটকড়িয়া গবরীর সূত্রধার। প্রত্যেকটি খেলা আরম্ভের আগে কুটকড়িয়া খুবই সংক্ষিপ্তাকারে কাহিনীটি ব'লে দেয়। তাকে বলা হয় 'ঝামটড়া'। ঝামটডার মাধ্যমে দর্শক খেল আরম্ভের আগেই কথাবস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপ জেনে যায়।

প্রথমাবধি গবরীতে নাচেরই প্রাধান্য। আর সেইজন্যে গবরীনাট্যকে গবরীনাচও বলা হ'য়ে থাকে। বহুপূর্বেই গবরীতে নৃত্য বেশ বিকশিত হ'য়ে ওঠে এবং তখন এতে নানরূপ স্বাঙ্গ-স্বরূপও পরিবেশিত হ'তে থাকে। তাথেকে গড়ে ওঠে কাহিনীর সুঠাম রূপ। কালক্রমে এসে সংযুক্ত হ'লো গান। গ্রামের চৌরাস্তা অথবা কোনো খোলা জায়গা গবরী-প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হ'য়ে

ওঠে। ভাদ্রমাসের প্রথম থেকে প্রায় সোয়া একমাস ধরে চলে এর অভিনয়—প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা অবধি। গ্রামের বিবাহিত মেয়েরাই গবরী প্রদর্শনের তাবৎ ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে। গবরীতে অংশ নেয়াটা ভীল পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কাছেই পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য ব'লে গণ্য হয়। ফলে গবরীর অভিনয়ে অভিনেতার কোনো অভাব লক্ষ্য করা যায় না। এক একটি খেল-এ কখনো কখনো এক থেকে ১০০ অবধি শিল্পী অংশ নিয়ে থাকে।

এত অধিকসংখ্যক অভিনেতা দিয়ে এতদিন ধ'রে বিভিন্নগ্রামে এমন সুব্যবস্থিতরূপে সমস্তদিন ধ'রে নাট্যাভিনয় করার দ্বিতীয় কোনো নজির ভারতবর্ষে আর নেই।

উদ্ভব এবং বিকাশ :

শিব তথা ভস্মাসুরের কাহিনীই গবরীর প্রথম কাহিনী। এই কাহিনীতে ভস্মাসুর কঠোর তপস্যা ক'রে শিবকে তুষ্ট করে এবং বর-স্বরূপে ইচ্ছা অনুসারে ভস্ম ক'রে দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। বর পাওয়ামাত্রই ভস্মাসুর শিবকেই ভস্ম করতে উদ্যত হ'লে বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ ক'রে এসে ভস্মাসুরকেই ভস্মীভূত ক'রে দেন কৌশলে। ভস্ম হওয়ার সময়ও ভস্মাসুর বিষ্ণুর কাছ থেকে আবার অমর থাকার বর লাভ করে এবং সেখান থেকেই ভস্মাসুরের স্মৃতি রক্ষার্থে গবরীনৃত্যের সূত্রপাত। গবরীর নায়ক বুড়িয়া ভস্মাসুরের প্রতীক। তাই সে ই ভস্মাসুরের মুখোশ প'রে সমস্ত কাহিনীর সঞ্চালন ক'রে থাকে।

পুরাণে গবরী কাহিনীর সূত্র :

ভস্মাসুরের উপরোক্ত কাহিনীটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভিন্ন সব পুরাণে উল্লিখিত আছে।

শকুনি অসুরের পুত্র বৃকাসুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতার মধ্যে শিবই যে সবচেয়ে সহজে প্রসন্ন হন এটা জেনে শিবেরই আরাধনা করে। বৃকাসুরের তপস্যায় শিবও তুষ্ট হন। ফলে বৃকাসুর তাঁর কাছ থেকে এই বর লাভ করে যে—সে যার ওপর হাত রাখবে সেই-ই ভস্ম হয়ে যাবে। বর-লাভ ক'রে বৃকাসুর স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে দারুণ অত্যাচার শুরু ক'রে দেয় এবং স্বয়ং শিবের মাথায় হাত রেখে তাঁকে ভস্মীভূত ক'রে পার্বতীকে হস্তগত করার ভয়ঙ্কর নেশায় মাতে। বিপদ বুঝে বিষ্ণু মোহিনী রূপে তার সামনে এসে চতুর কটাক্ষে তাকে মোহিত ক'রে ফেলেন। মুগ্ধ বৃক তখন মোহিনীর অনুকরণে নাচতে শুরু ক'রে দেয়—এবং একসময়ে মোহিনীর অনুরূপে নিজেরই মাথায় রাখে তার সেই অভিশপ্ত হাত—ফলে ভস্মীভূত হ'য়ে যায়। এই বৃকাসুরই পরবর্তী কালে ভস্মাসুর ব'লে পরিচিত হয়।

লোকজীবনে গবরী কাহিনীর স্বরূপ :

ভস্মাসুরের স্মৃতিতে গবরীর নৃত্যে পরবর্তীকালে উনবাসে সংঘটিত নৌলাখ দেবদেবী বড়ল্যাহিন্দওয়া সম্বন্ধীয় ঘটনা সংযোজিত হ'য়ে গবরীর মূল বিষয়

হ'য়ে ওঠে। ভীল সমাজে এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে—তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীটি নিম্নরূপ :—

একবার দেবী অম্বা স্বপ্নে বিশাল একটি বটবৃক্ষ এবং নবরাত্রি পুজোর দৃশ্য দেখেন। মৃত্যুলোকে এর আগে কখনোই তিনি এমন দৃশ্য দেখেন নি। ফলে দৃশ্যটি সরেজমিনে চাক্ষুষ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হ'লো তাঁর। বটবৃক্ষটি ছিল আবার রাজা বাসুকীর বাড়িতে। অতএব তাঁকে এমন এক দেবীর অনুসন্ধান করতেহ'লো—যিনি পাতালে গিয়ে রাজা বাসুকীর বাড়ী থেকে বটগাছটি কৌশলে নিয়ে আসতে পারেন। সংযোগবশতঃ রামু এবং কেবল এই দুই দেবী কঠিন এই কাজটি করার জন্যে রাজি হ'য়ে গেলেন। এমনকি এ প্রতিজ্ঞাও তাঁরা করে বসলেন যে বটবৃক্ষ না নিয়ে তাঁরা আর ফিরবেন না—বরং স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন। দুই দেবী মিলে এবার খুব ক'রে অনুসন্ধান চালালেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যে তখন তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হ'লেন—দেবী অম্বা তখন তাঁদের রক্ষা করলেন।

এদিকে বিশালকায় একটি ভ্রমর রোজই অম্বা দেবীর বাড়িতে আসতে থাকে। ভ্রমরটির ওজন বারোমন আর তার গুঞ্জন শোনা যেত তেরো ক্রোশ দূর থেকে। একদিন দেবী অম্বা একটি ভ্রমরের রূপ ধ'রে বাগানে গিয়ে বসলেন। রোজকার মত সেদিনও সেই বিশালকায় ভ্রমরটি এলো। দেবী কৌশলে তাকে বশীভূত করলেন এবং পাতালের রাজা বাসুকীর বাড়ী যাতায়াতের রাস্তা বলতে বললেন। ভ্রমরটি কিছুতেই রাজি হয় না। অম্বা তখন বিশাল এক তামার কড়াইয়ে তেল ঢেলে তা ফোটালেন খুব ক'রে এবং ভ্রমরটিকে ফেলে দিলেন কড়াই-এর সেই ফুটন্ত তেলে। দারুণ যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে ভ্রমরটি শেষাবধি—বাসুকীর বাড়ী যাতায়াতের রাস্তা ব'লে দিল।

দেবী তখন স্বরূপ ধারণ ক'রে পৌছলেন গিয়ে দেবলউনওয়ায়। সেখানে গিয়ে সমস্ত দেবীকে একত্রিত ক'রে সকলে মিলে বাসুকীর বাড়ী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাওয়ার আগে কড়াইতে দুধ ভ'রে দেবী বললেন—এই দুধ শুকোবেনা কখনো, আর যদি শুকায়, তাহ'লে জানবে যে আমি মারা গেছি।

দেবী এবার পাচ আঙুল চওড়া এবং একশোহাত লম্বা একটি বেজির জন্ম দিলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়েই গিয়ে পৌছলেন বাসুকির বাড়ি। বাসুকি তখন ঘুমুচ্ছিলেন। দেবী তাঁকে জাগানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। প্রহরারত নাগিনীরা তখন তাঁকে বাধা দেয় এই বলে যে, বারো বছরের জন্যে ঘুমে আচ্ছন্ন আছেন তিনি, ফলে অকালে ঘুম ভাঙালে খুবই অনিষ্ট হবে। তোমার যদি বড়ল্যা (বটবৃক্ষ) দরকারে লাগে তো তুমি নিয়ে যেতে পারো। দেবী বললেন—এভাবে নিয়ে গেলে তো লোকে আমাকে চোর বলবে।

বারবার বলা সত্ত্বেও নাগিনীরা যখন নাগকে জাগালো না তখন দেবী নিজেই নাগরাজের আঙুল ধ'রে টেনে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। বাসুকী জেগে উঠে মহাক্রোধে দেবীর দিকে তাকাতেই দেবী ভস্ম হ'য়ে গেলেন। সোনালী জ্যোতি এবং রুপালী ধোঁয়ার মধ্যে দেবী হলুদবর্ণের ছাইয়ে পরিণত হ'য়ে গেলেন। ফলে দেবল-উনওয়ায় রেখে আসা দুধ শুকিয়ে গেল। দেবীরা সব বিলাপ করতে থাকলেন।

এদিকে শিব এবং পার্বতী ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হলেন বাসুকির বাড়ি। পার্বতীর দৃষ্টি পড়লো অম্বার অস্থিভস্মের ওপর। ভস্মের মোহিনী রূপে পার্বতী মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। তিনি শিবের কাছে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা। কিন্তু শিব এড়িয়ে গেলেন। অভিমানে লাগলো পার্বতীর। তখন তিনি মাছি হ'য়ে শিবের জটার মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। খুব ক'রে খুঁজেও শিব যখন পার্বতীকে পেলেন না—তখন তিনি গেলেন নারদের কাছে। নারদের পরামর্শ মত শিব পার্বতীকে উদ্দেশ্য ক'রে চেঁচিয়ে বললেন—"পার্বতী তুমি যেখানেই থাকো ফিরে এসো—তুমি যা বলবে আমি তাই-ই কোরবো।" পার্বতী স্বরূপে উপস্থিত হ'লেন। শিব তখন তাঁর কমণ্ডলু থেকে অমৃত ছিটিয়ে দিলেন সেই ভস্মে। জীবন ফিরে পেলেন অম্বা।

নতুন জীবন লাভ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন দেবী। শিব তখন তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। দেবী বললেন—'এমন বর দিন যাতে বাসুকির ছোবলে আমি মারা না যাই। শিব বললেন—"এই পাতালেই লালা নামে এক কামার আছে—তুমি তার কাছ থেকে একখানি দা ও একটি বিষাক্ত ফুল নিয়ে এখানে ফিরে আসবে। বাসুকি তখন তোমাকে ছোবল মারলেই সেই ফুলের ওপর তার ছোবল ধরে দা দিয়ে কোপ মারতে থাকবে তার ফনায়। দেখবে অচিরেই সে নির্বিষ হ'য়ে যাবে। তখন তাকে মেরে ফেলে তুমি বটবৃক্ষ নিয়ে যেও।"

নির্দেশানুসারে দেবী কামারের কাছ থেকে কাটারী এবং বিষাক্ত ফুল নিয়ে পুনরায় বাসুকির ওখানে আসেন এবং তাঁকে জাগিয়ে তোলেন। বাসুকি মহাক্রোধে তাঁকে ছোবল মারতে থাকেন আর দেবী বিষাক্ত সেই ফুলে বাসুকির ফণা ধ'রে কাটারী দিয়ে তার ফনা কাটতে থাকেন। যখন আর মাত্র একটি ফণা কাটতে বাকি তখন নাগ দেবীর পায়ে ধ'রে মিনতি জানায়—"একটা ফণা অন্তত রেখে দিন, যাতে নাগ ব'লে পরিচয় দিতে পারি।" দেবী করুণাবশতঃ তার শেষ ফণাটি না কেটে তাঁকে ছেড়ে দিলেন।

দেবী তখন বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে নির্দেশ দিলেন বৃক্ষকে—চল আমার সঙ্গে। বটবৃক্ষ জানায় যে অন্যত্র তার নির্বাহ ঠিকমত হবে না, তাই সে এখান থেকে যেতে চায় না। দেবী তখন তাকে খুব ক'রে বোঝালেন—"তোমাকে খুবই যত্নে রাখবো। দুধ খেতে দেবো রোজ—আর ভেঁট দেবো সত্তী।" বটবৃক্ষ এই

লোভনীয় প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে গেল। দেবলউনওয়ায় এনে দেবী তাকে স্থাপন করলেন অন্ধকার একটি জায়গায়।

বেশ কিছুদিন গেল। দুধ, দই দেওয়া হয় রোজ। কিন্তু সতী দেওয়ার কোনো অবসরই আর হয় না দেবীর। ইতিমধ্যে দেবী একদিন জানতে পারলেন যে, এখানে কোথাও কোনো এক পাহাড়ে ভাস্থা নামক এক যোগী কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। সঙ্গে আছে তাঁর আটাত্তর জন চেলা। সুযোগ পেয়ে গেলেন দেবী। যোগীর কাছে গিয়ে তিনি বটবৃক্ষ বৃত্তান্ত সব শোনালেন, যোগী তখন সেই বটবৃক্ষটি দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাঁকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ফিরে এলেন দেবী।

অবসরমত চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে যোগী একদিন এলেন দেবীর ওখানে দেবলউনওয়ায়। দেবীও তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কয়েকদিন যাওয়ার পর যোগী তাঁর চেলাদের রেখে ধারনগরের রাজার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লেন। সুযোগ বুঝে দেবী যোগীর চেলাদেরই ভেঁট-স্বরূপে উপহার দিলেন বটবৃক্ষকে। যোগী ফিরে এসে ঘটনা শুনে খুব দুঃখ পেলেন। তখন তিনি পুনরায় ধারনগর গিয়ে রাজাকে জানালেন—"দেবল-উনওয়ার নতুন বটবৃক্ষটি মানুষ খেকো। গাছটি আমার সব চেলাকেই খেয়ে ফেলেছে। অতএব হে রাজা! বটগাছটি কেটে ফেলে তার শেকড়ে তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দিন। নইলে আমি আপনাকে এমন অভিশাপ দেবো যে আপনার সাম্রাজ্য একেবারেই ধ্বংস হ'য়ে যাবে।"

যোগীর অভিশম্পাতের ভয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন রাজা। ফলে কালবিলম্ব না ক'রে গাছটি কেটে ফেলার জন্যে তিনি সৈন্য পাঠালেন। এই খবর পেয়ে সমস্ত দেবী মাছির রূপ ধ'রে সেই বটগাছের পাতায় পাতায় ব'সে গেল। রাজসৈন্য এসে গাছ কাটতে আরম্ভ করলেই মৌমাছিরা সব উড়তে শুরু করে দেয়। সৈন্যরা এতে ভীত হ'য়ে পালাতে আরম্ভ করে। তারা যখন এইভাবে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে—তখনই পথে তাদের সঙ্গে দেখা হ'লো ধারইয়া ভীলের। সে জাওড়ের লোক। বৌ-এর জন্য জাওড়ের ফক্কুলি, সোয়ামন ধান, সামান্য তামাক আর দুটো বাড়ির বিনিময়ে সে মৌমাছি তাড়াতে রাজি হ'য়ে যায়। ধারইয়া তখন আবার বটবৃক্ষের কাছে যায় এবং অম্বাদেবীর নাম ক'রে ধোঁয়া করে। ধোঁয়ায় মাছিরূপী দেবীরা আর দেখতে পায় না কিছুই। ফলে দেখতে দেখতে গাছটি মৌমাছি-শূন্য হ'য়ে পড়ে। রাজসৈন্য অল্প আয়াসেই তখন গাছটি কেটে ফেলে।

দেবী অম্বা ও চামুণ্ডা রাজার এই কাজের বদলা নেয়ার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে ধারনগর এসে উপস্থিত হন অসংখ্য গাধা এবং শুওর নিয়ে। ধারণগরের ফসলের ক্ষেতে ছেড়ে দিলেন তাদের, সব ফসল তারা খেয়ে ফেললো। আর

সমস্ত ঘরের ভিতগুলো সব ধ্বসিয়ে দিলো শুওরগুলো। ক্রুদ্ধরাজা বেদিনী-বেশী দেবীদের অবিলম্বে ধারনগর ছেড়ে চলে যেতে বললেন কিন্তু দেবীরা সে হুকুম মানলেন না, তাঁরা বললেন—'আমরা খেলা না দেখিয়ে যাবো না।'

তখন রাজারই আদেশে তাঁরা বরত বাঁধলেন এবং খেলাও দেখালেন। তাঁদের তামাশায় প্রীত হ'য়ে রাজা তাঁদের বকশিস চাইতে বললেন। তাঁরা চাইলেন ধারইয়া ভীল এবং জাউড়ী ভীলনী। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হ'লো। দেবীরা তখন নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করলেন এবং ধারইয়াকে তাঁরা নবরাত্রির ব্রত উদ্‌যাপন করার আদেশ দিলেন। ধারইয়া তখন ঢাক বাজালো, জাউড়ী বাজালো থাল। শেষে ধারইয়া করলো পুজো আর জাউড়ী গাইলো গান। দেবীরা চললেন পূজার অর্ঘ্য বিসর্জন দিতে। অনেক দেবতাও অংশ নিলেন এই শোভাযাত্রায়। কেবল হাতীমুখো হওয়ার দরুণ গণেশকে অংশ নিতে দেয়া হ'লো না এই শোভাযাত্রায়। ব্যাপারটা জানতে পেরে খুবই ক্রুদ্ধ হ'লেন গজানন, ধুলো উড়াতে থাকলেন, তখন এতে ক'রে কোনো কোনো দেবতার রথ গেল উল্টে, আবার কারো বা রথের চাকা গেল বসে। দেবতারা জানতেই পারলেন না তাঁদের এই অভিনব বিপর্যয়ের কারণ। ফলে তাঁদেরও শরণাপন্ন হ'তে হ'লো ধারইয়ার। ধারইয়া জানালো যে এসবই ক্ষুব্ধ গজাননের প্রভাব। দেবী অম্বা তখন গণপতি বরণের কথাও বললেন এবং তিনি স্বয়ং গেলেন গণপতির কাছে। গণপতি দাবী করলেন যে সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে তাঁর পুজো দিতে হবে—তবেই শান্ত হবেন তিনি। দেবীরা তাঁর এই দাবী মেনে নিলেন। ফলে রথগুলি আবার চলতে আরম্ভ করলো।

মানসসরোবরের তীরে এসে তাঁবু গাড়লেন তাঁরা। কালিকার কালো, চামুণ্ডার লাল, অম্বার গেরুয়া, রামাপীরের সাদা—এইভাবে নয় লাখ দেবীর প্রত্যেকের জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের ন'লাখ তাঁবু খাটানো হ'লো। দেবীরা এবার তাঁদের পাত্তী-অর্ঘ্য বিসর্জন দিলেন। দুর্গন্ধ হ'য়ে গেল মানসসরোবরের নির্মল জল। এতে ক'রে পিপাসিত জীবজন্তু কেউই আর সে সরোবরের জল খেতে পারলো না; খবর গেল হটিয়ার কানে। সেনা তলব ক'রে বললেন—'যাও দেখো গিয়ে কোন্ হতচ্ছাড়াদের কাজ। ধরে নিয়ে এসো তাদের। তারপর তখন কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ঐ সব দেবীদের।' অচিরেই হটিয়ার সেনা গিয়ে পৌঁছলো মানস সরোবরের তীরে। দেবীরা সকলে মিলে সেনাবাহিনীকে বেদম প্রহার করলেন। এদিকে সেনাদল ফিরে না আসায় হুঠিয়া হংসন্যা নামক এক বিশালকায় দানবকে প্রেরণ করলেন। দেবীগণ তাকেও ফিরিয়ে দিলেন। এখবর পেয়ে হুঠিয়া খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। নীলঘোড়ায় চড়ে চকিতে এসে পৌঁছলেন সরোবরের তীরে। দেবীরা তাঁর ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে পলায়নোন্মুখ হলেন। দেবী অম্বাও অন্যান্য দেবীদের সঙ্গে পালিয়ে

যাচ্ছিলেন, তখন ক্রুদ্ধ হঠিয়া তাঁর কাপড়ের আঁচল ধ'রে ফেলে। হঠিয়া দেবীর সুন্দর চেহারায় মোহিত হ'য়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজি হলেন দেবী। তখন রাজি না হ'য়ে কোন উপায় ছিল না। আষাঢ় সুদীর নবমী তিথিতে বিয়ে হবে ব'লে জানালেন।

সময়মত বরযাত্রীসহ হঠিয়া এসে হাজির হ'লেন। বরকে বরণ ক'রে আনতে গেল হীরা দাসী। সে তার উপহার স্বরূপ পাঁচটি মানুষের কাটা মুণ্ড চেয়ে বসলো। হঠিয়া তার বদলে চাইলো পাঁচটি মোহর দিতে। হীরা রাজি হ'লো না। ফলে হঠিয়াকে তার দাবী মেনে নিতে হ'লো। এবারে হঠিয়া এলো পুকুর ঘাটে। হীরা এবার চাইলো ৫০টি কাটা মুণ্ড। হঠিয়া তাও মঞ্জুর করলো। বরযাত্রী এবার এসে পৌঁছালো তোরণ-দ্বারে। হীরা এবারে দাবী ক'রে বসলো—একশোটি মাথা, এবং এও জানালো যে মোহরে হবে না। হঠিয়া এবারও তার দাবী পূরণ করে। এবারে বর-বরণ করলেন শাশুড়ি ঠাকরুণ। বিবাহস্থলে এলেন হঠিয়া। বিয়ের আগে অম্বা বলেন—"এবার তোমাকে আমার সাথে লড়াই করতে হবে। জিতলে তবেই আমাকে বিয়ে করতে পারবে। আর যদি হেরে যাও তাহ'লে তোমার মাথা যাবে কাটা।' হঠিয়া অম্বার এই প্রস্তাব মেনে নিলেন, কিন্তু লড়াইয়ে হেরে গেলেন তাঁর কাছে। ফলে কাটা গেল তাঁর মাথা। আনন্দে দেবীরা সকলে মিলে নৃত্যোৎসবের আয়োজন করলেন। বিজোয়োল্লাসে মত্ত দেবীদের এই নৃত্য গবরীর সব অনুষ্ঠানেই দেখা যায়।

গবরীর নামকরণ:

গবরীর নামকরণ নিয়ে বেশ কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

(১) শিবের কাছ থেকে ভস্মীভূত করার বর লাভ ক'রে ভস্মাসুর শিবকেই ভস্মীভূত ক'রতে উদ্যত হ'লে বিষ্ণু মোহিনীরূপী গোরাঁর বেশ ধারণ ক'রে ভস্মাসুরকেই ভস্মীভূত ক'রে দেন। এই গোরাঁ থেকে এসেছে গৌরী। আরও পরবর্তী কালে এই গৌরীই গবরীতে পরিণত হ'য়েছে।

(২) গৌরী ভীলেদের অন্যতম আরাধ্যা দেবী। তাই এরা গবরী ধারণ করে—একে গৌরজ্জাও বলা হয়। তা থেকেও গবরী নামের প্রচলন হ'য়েছে ব'লে অনেকে মনে ক'রে থাকেন।

(৩) গবরীতে দু'জন রাই আছেন। এর একজন হ'লেন মোহিনীরূপী বিষ্ণু এবং অপর জন হ'লেন গৌরী স্বয়ং। লোকসমাজে গৌরী গোরাঁ বা গঁওরা নামেও পরিচিত। অনেকে—এই গৌরী, গোরাঁ এবং গঁওরা থেকেই গবরী শব্দের উৎপত্তি বলে মনে ক'রে থাকেন।

তৃতীয় মতটিকেই যুক্তিসিদ্ধ ব'লে মনে হয়। অবশ্য প্রথম মতটি তৃতীয়

মতটিই সমগোত্রীয়। তাই একেও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

গম্ভীরা : রাই।

লোকজীবনে গম্ভীরা রাই নামেও প্রসিদ্ধ। শোনা যায় গৌরীর আরেকটি নাম ছিল রাই। এই কারণে গম্ভীরার সঙ্গে সঙ্গে একে রাইও বলা হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও বলা হয়ে থাকে, যা একেবারে অমূলক নয়। ভস্ম হওয়ার সময়ও ভস্মাসুর অমর থাকার ইচ্ছা জানায়। শিব বলেন "তথাস্তু বৎস! তোমার স্মৃতিতে রাইমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে তাতে তোমার বেশ ধারণ করা হবে। তবে নামটি হবে আমার। এর প্রধান হবে যে তার জটা ও পোষাক হবে আমারই মত। আর মাথাটি হবে তোমার মত।" পরবর্তী-



কালে এই সমস্তই রাই নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এর নায়ক বুড়িয়া হয়ে যান রাইবুড়িয়া। বলা হয়ে থাকে যে, কৈলাসপুরে (কৈলাসধামে) শঙ্কর যখন একযুগ ধরে একাসনে বসে তপস্যা করছিলেন—তখন তাঁকে ঘিরে বিরাট এক ঢিবি বানায় উঁইপোকা, বুকে জন্মায় আগাছা, বাবুই পাখি বাসা বাঁধে তাঁর কানে আর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ব'সে থাকে তাঁর মাথায়। পার্বতী তাঁকে এই অবস্থায় দেখে তাঁর শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে আকাশে নিক্ষেপ করলে তা একটি চিল হয়ে যায়। চিলটি আকাশে উড়তে উড়তে খুবই ক্ষুধার্ত হ'য়ে পড়লে নীচের দিকে তাকায়—এবং একখানি 'বর্শা'-কে চকচক্ করতে দেখে তাকেই খাবার মনে করে তার ওপর এসে পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। একখণ্ড আটকে থাকে সেই বর্শায় এবং অন্য খণ্ডটি ছিটকে এসে পড়ে শিবের মাথায়। পার্বতীর অনুরোধে শিব এই খণ্ড দু'টির ওপর অমৃত ছিটালে বারো বছরের দুটি

মেয়ের আবির্ভাব হয়। এই মেয়ে দু'টিই গবরীতে এসে পড়ে—রাই রূপে। এই কারণেও গবরীকে রাই বলা হ'য়ে থাকে।

গবরীর নৃত্য :

গবরীর উদ্ভব গোষ্ঠী-নৃত্য থেকে। এ সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীগুলি হলো :

(১) ভস্মাসুর নিধনের পর সমস্ত দেবতা মিলে এক গোষ্ঠী-নৃত্যের আয়োজন করে। শিব এই নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন ভস্মাসুরের মুখোশ পরে। শিবের থানে এক ভীল রোজ গাজর, মুলো এসব দিয়ে আসতো। শিব এই ভীলের প'রে খুবই খুশি ছিলেন ; ফলে একদিন তাকে একখানি গেরুয়া চাদর, একটি খাঁড়া ও ভস্মাসুরের মাথার খুলি দিয়ে প্রতি বছরই এক গোষ্ঠী-নৃত্য আয়োজন করার নির্দেশ দেন তাকে। সেই ভীল প্রবর্তিত এই নৃত্যানুষ্ঠানই পরবর্তীকালে গবরী নামে পরিচিত হয়।

(২) পার্বতী বাপের বাড়ি চলে গেলে শিব খুবই দুঃখ পান, বিরহ-কাতর হ'য়ে পড়েন। তখন তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে ভীলেরা এক গোষ্ঠীনৃত্যের আয়োজন করে। শিব নিজেও এই নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন। গবরীর উদ্ভব এ থেকেই।

উপরের কাহিনী দুটির পরিসমাপ্তি ঘটে (গোষ্ঠী-নৃত্যে)। সমাজ বিজ্ঞানের ধারায় আমরা দেখতে পাই যে গোষ্ঠীগত আনন্দ ও উল্লাসের অভিব্যক্তিরূপে নৃত্যের একটা বড় ভূমিকা আছে। গবরীর মত এক সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে নৃত্যের প্রাধান্য থাকাটা তাই আশ্চর্যের কিছু নয়। গবরীর সব অনুষ্ঠানেই নৃত্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

গবরীতে অভিনয়ের বিকাশ :

গোষ্ঠীনৃত্য যত পরিণত হ'তে থাকে, তাতে প্রাধান্য পেতে থাকে অভিনয়—স্বাভাবিক ভাবেই। মনোরঞ্জনের জন্যে আয়োজিত সমস্ত স্বাঙ্গ-স্বরূপে এইভাবেই অভিনয়ের সমাবেশ ঘটেছে সন্দেহ নেই। গবরীতে যেসব স্বাঙ্গ-স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়—তা থেকে এ সিদ্ধান্তে এলে কোনো অন্যায় হবে না যে—পার্বতীর বিরহে কাতর শিবের মনোরঞ্জনার্থে যেসব স্বাঙ্গ-স্বরূপ ধারণ ক'রেছিল ভীলরা এগুলি সবই তারই স্মৃতিরেশবিশেষ। এই নৃত্যানুষ্ঠানে শিবের মুখে ভয়ানক এক মুখোশ লাগানো হ'য়েছিল। পার্বতীকে সঙ্গে সঙ্গে নাচতে দেখলে শিবের বিরহ-যন্ত্রনা কিছুটা উপসমিত হবে এই আশায় একজন ভীল পার্বতীর বেশ ধারণ ক'রে শিবের সঙ্গে নাচতে থাকে। নৃত্যদলের প্রধান হওয়ার দরুণ শিব পার্বতী থেকে অনেক দূরে থাকেন এবং খুবই দক্ষতার সঙ্গে অন্যান্য ভীল অভিনেতাদের অভিনয় দেখেন, তাদের সামনে গিয়ে গোঁফে তা দিয়ে—ঘুঙুর বাঁধা পায়ের তালে তাল দিতে থাকেন…খাঁড়া উঁচিয়ে নিজের উল্লাস ব্যক্ত করেন। কেউ সঠিক ভাবে নাচলে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেন, ভুল করলে মৃদু

তিরস্কারে তা শুধরে নেন। খাজ ধারণের মহত্ব বুঝতে পেরে তিনিও খাজ ধারণ করেন—এবং এব্যাপারেও তাঁর সমান উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। দলগত নৃত্যে অন্য কোনো ভীল তাঁর অন্ধানুকরণ করতে সক্ষম হয়নি, ফলে অন্যদের বিপরীতে তিনি কয়েক কদম আগে ও কয়েক কদম পিছিয়ে নেচে নেচে সমগ্র দলটিকে পরিচালনা করতে থাকেন। এথেকে একথা বলা যায় যে অভিব্যক্তির আবশ্যকতা এবং উন্মুক্ত মানসিকতা গবরীর অভিনয়কে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে তার বিকাশ সম্ভবান্বিত করেছে।

গবরীতে গানের সমাবেশ ও বিকাশ :

গবরীতে অভিনয়াংশ বেশ জোরদার হ'য়ে পড়ায় প্রয়োজন দেখা দেয় গানেরও। কেননা কোনো অভিনয়ই অভিব্যক্তির শাব্দিক প্রকাশ ব্যতিরেকে সহৃদয় সামাজিকের মনে জোরদার কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। মূক-অভিনয়কে তাই মুখর করার জন্যে, অভিনয়ে প্রাণ ও গতিবেগ আনার উদ্দেশ্যে কাজে কাজেই গরবীতে সমাবেশ ঘটে গানের। বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার ও তার যথাযথ ব্যবহারে গান আরও রসময় হ'য়ে ওঠে। গীতিরূপে অভিনয়ের এই প্রকাশ প্রথমে ঘটে পদ্যরূপে, গদ্যরূপে নয়। গবরীর গানও অবশ্য প্রথমদিকে ছিল ছোটো ছোটো বোল-বিশেষ। পরবর্তীকালে অনেক সামাজিক প্রতিভার সমন্বয়ে এইসব বোল গীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গীতির এই বিকাশ কিন্তু একদিনে ঘটেনি। অনেক অনেক বছর লেগেছিল। গবরীতে গীতির সেই আদিরূপ অপরিবর্তিত থাকেনি। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গবরীতে গানেরও অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে।

লোক রঙ্গমঞ্চ :

সমষ্টির মনোরঞ্জনের জন্যে যেসব সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপ বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়—তার সবই অনুষ্ঠিত হয় খোলা জায়গায়। কেননা সমগ্র গোষ্ঠীই অংশ নেয় এতে এবং গোষ্ঠীগতভাবেই আনন্দের অমরাবতীতে পৌঁছে যায়। খেত খামার, উঠোন, এমন কি রাস্তায় তাই আয়োজন করা হ'য়ে থাকে এই সব অনুষ্ঠানের। গবরী যেহেতু ভীলেদের গোষ্ঠীর মনোরঞ্জন-মাধ্যম—সেইহেতু এরও আয়োজন করা হয় মুখ্যতঃ এইসব খোলা জায়গায়। গবরী-মঞ্চ তাই গ'ড়ে ওঠে সমতল ভূমিতে, ফলে সবদিক থেকেই তা দেখা যায়।

গবরী প্রদর্শনের সময় :

রাখীবন্ধনের পর ঠাণ্ডা রাখীর দিন গবরীর প্রতিষ্ঠা এবং এর পরি-সমাপ্তি আশ্বিনের কৃষ্ণ-চতুর্থীতে। এই পোয়া একমাস ধ'রে প্রদর্শিত হয় গবরী। গবরীর প্রথম এবং শেষ—এই দু'টি দিনকে যথাক্রমে খড়াওন এবং বলাওন বলা হয়।

গবরীর প্রতিষ্ঠার দিন দেবীর সমুখে ভীল রমনীরা যে গান গায় তাতেও সূচনা করা হয় সময়ের। এই গানের মধ্যে পার্বতী বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্যে শঙ্করের কাছে বারবার জিদ্ করতে থাকে। শিব তাকে বাপের বাড়ী যেতে নিষেধ করেন এবং বলেন—"বাবা-কাকা সব তোমার মারা গেছেন।" পার্বতী তখন বলেন—"কিন্তু অনেক গাছ-গাছালী তো আছে, তাদের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি"। শুনে শঙ্কর বলেন—"ঝড়ে সব গাছই উপড়ে গেছে"। পার্বতী বলেন—"ওখানে যে পাহাড়টা আছে, তার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবো। অনুমতি দাও দেখবে ঠিক শোয়া এক মাসের মধ্যেই আমি ফিরে আসবো"। শঙ্কর তখন আর কোনো অজুহাত দেখাতে পারেন না। ফলে পার্বতী চলে যান বাপের বাড়ি—শোয়া এক মাসের জন্যে। দিন যেতে থাকে। পার্বতীর বিরহে কাতর হ'য়ে পড়তে থাকেন শঙ্কর। তখন মুখ্যতঃ তাঁরই মনোরঞ্জনের জন্যে, তাঁর বিরহ-যন্ত্রনা উপসম করার জন্যে এই শোয়া একমাস ধ'রে সমষ্টিগতভাবে নাচ-গান চলে। এদিকে পার্বতী বাপের বাড়ি এলে তাঁর বাপের বাড়ির লোকেরা যতদিন সে থাকে ততদিন ধ'রে নাচ গান ক'রে তাদের মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করে। ফলে সেখানেও চলে ঐ শোয়া একমাস ধ'রে নাচ-গান।

ভীলেদের সঙ্গে সম্বন্ধ :

কেবলমাত্র ভীলেরাই এই গবরী প্রদর্শন করে। ফলে গবরীর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি, তা জানা দরকার।

এ ব্যাপারে তিন-চারটি মতের প্রচলন আছে—

(১) ভীলেদের প্রধান দেবতা হ'লেন শিব। এই কারণে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সব ঘটনা অভিনয় মাধ্যমে প্রদর্শন ক'রে তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখানোর এক উৎকৃষ্ট নজির সৃষ্টি ক'রেছে তারা।

(২) শিব মনে করতেন ভীলেরাই সবচেয়ে বিশ্বস্ত। ভস্মাসুরের শেষ ইচ্ছামত তাকে অমর ক'রে রাখার জন্যে প্রয়োজন ছিল এমনি এক বিশ্বস্ত জাতির—যারা ভস্মাসুরের কঙ্কাল নিয়ে তারই স্মৃতিতে দলগত নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে যেতে পারে নিষ্ঠার সাথে। তাই তাঁর থানে গাজর মুলো দিতে আসা ভীলকেই এই কাজের উপযুক্ত মনে করেন তিনি। তাঁর সে ধারনা যে কত সঠিক তা গবরীর প্রচার-প্রসার থেকে স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে।

(৩) আবার একথাও শোনা যায় যে পার্বতীর বাবা হিমাচলপ্রদেশের ভীল ছিলেন। সেই কারনেই ভীলেরা গবরীর উপাসনা করে।

(৪) শিব যে দল তৈরী করেন—তা ভীলদের হাতে ছেড়ে দেন। আর এই দলই পরবর্তী কালে গবরী বা রাই নামে পরিচিত হয়।

এসব থেকে এ সত্য স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে যে গবরীর সঙ্গে ভীলদের সম্পর্ক

প্রথমাবার্ধ। আর সেই কারণে একমাত্র তারাই এর উপাসক, আয়োজক এবং প্রচারক।

গবরীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান :

কেউ কেউ উদয়পুরের ২৫ মাইল পূবে অবস্থিত বল্লভপুরকেই গবরীর উদ্‌গমস্থল ব'লে মনে করেন। আগে এর নাম ছিল উ'ঠালা। এখানকার গবরীতে চারজন রাই এবং দু'জন বুড়িয়া থাকে। বলা হ'য়ে থাকে—একবার বল্লভপুরের গবরী বিসর্জন দেয়ার সময় রাই এবং বুড়িয়াও পুকুরে ডুবে যায় এবং আর ওঠেনা। এতে ক'রে কয়েক বছর সেখানে আর গবরী অনুষ্ঠিত হয়নি। ভোপ একদিন স্বপ্নে পুনরায় গবরী-প্রতিষ্ঠার জন্যে আদেশ পায়। গ্রামের পঞ্চায়েতে এই ঘটনা বিবৃত করে ভোপ। তখন থেকে ভীলেরা পুনরায় গবরী প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে পুনরায় গবরীর আয়োজন করা হয়। গবরীর বিসর্জনেরও দিন এলো। সদলবলে ভীলেরা গেল বিসর্জনে। দু'জন বুড়িয়া গবরী বিসর্জন দিতে পুকুরে নামলো। বিসর্জন দিয়ে তারা যখন উপরে উঠে আসছে তখন দেখাগেল গতবারের দু'জনও রয়েছে তাদের সঙ্গে। আর সেখান থেকেই গবরীতে দুইজন বুড়িয়া এবং চারজন রাই গ্রহণের রীতি চালু হ'লো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বল্লভপুরকে গবরীর উদ্‌গমস্থল বলে মনে করা হয়। এ ঘটনা ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। ফলে এথেকে তাই গবরীর উৎস সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো উচিত নয়।

গবরী-সম্বন্ধীয় গল্প কাহিনীতে যে উনবাস, দেবলউনবা, মানস-সরোবর, ধারনগর, জাওড় প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় তা অবশ্যই ভূগোল এবং ইতিহাস সমর্থিত, ফলে, ঐ কাহিনীগুলি যে কোনো কল্পনা-বিলাসী মানুষের স্বকপোল-কল্পিত নয়—এ বিষয়ে নিঃসন্দিহান হওয়া যায়। উনবাস ঐতিহাসিক হলদিঘাটের পার্শ্ববর্তী ছোট্ট একটি গ্রাম। উদয়পুর থেকে উনবাসের দূরত্ব প্রায় ৩২ মাইল। পীপলাজমাতার একটি মন্দির আছে এখানে। একে দেবলমালিয়াও বলা হয়। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণা পীপলাজমাতা দেবীদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ক্ষমতাশালিনী এবং জাগ্রতা। দেবীর এই মন্দিরের জন্যেই উনবাস দেবলউনবা নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে, বাঁ দিকে ১৭টি পঙক্তি খোদিত একখানি শিলালেখ আছে। কালো পাথরের এই শিলালেখখানিতে ১০১৬ বিক্রম সম্বতে তৎকালীন জটিল লিপিতে খোদাই করা আছে। উনবাস থেকে মাইল খানেক দূরে সেই বিশাল বটবৃক্ষটি এখনো আছে—যাকে পাতাল থেকে নিয়ে এসেছিলেন দেবী অম্বা। এই বটবৃক্ষটিও বড়ল্যা-হিন্দবা নামে পরিচিত। বলা হ'য়ে থাকে যে প্রথম দিকে এই গাছটি বারো বিঘে জমিতে ছড়িয়ে ছিল। থালার মত বড় বড় এর পাতা আর সোনালী এর কুঁড়ি। আগেকার দিনে অনেক শাখা প্রশাখা ছিল এই গাছটির। এই সব শাখায় দোলনা

ঝুলিয়ে দোল খেতেন দেবীরা। মেওয়াড়ী ভাষায় বটকে বড়ল্যা এবং দোলনাকে হিন্দবা বলা হয়। দোলার প্রসঙ্গে এখানে—এই অঞ্চলে হিন্দনা শব্দের প্রয়োগ হয়। ফলে এই বটগাছে দোল খাওয়ার দরুণ এর নাম হয় 'বড়ল্যা হিন্দবা'। কেউ কেউ একে বটসিন্দবাও ব'লে থাকে। কেননা একসময়ে এর পাতা ছিল সিঁদুরের মত টকটকে লাল।

খানমোর বড়ল্যা-হিন্দওয়া বা হিন্দবা থেকে প্রায় তিনমাইল দূরে। খানমোরের যেখানে আজ গোলাপের খেত, এক সময়ে সেখানেই ছিল মানস-সরোবর। গোলাপ বাগিচার জন্যে বিখ্যাত এই অঞ্চলকে আজও অনেকে মানস-সরোবর ব'লে থাকে। আর ধারনগর হ'লো—বর্তমান রাজনগরেরই প্রাচীন নাম। উদয়পুর থেকে প্রায় চল্লিশ এবং উনবাস থেকে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই রাজনগর। এর পাশেই অবস্থিত জাওড়।

গবরীর চরিত্র :

গবরীতে সন্নিবেশিত হয় চারশ্রেণীর চরিত্র :

(১) দেবদেবী।

(২) মানুষ।

(২) দানব।

এবং

(৪) জীবজন্তু ও গাছপালা।

(১) দেবচরিত্র :

দেবচরিত্রগুলি সর্ব প্রকারের বিকারের উর্ধ্বে। তাঁরা সমস্ত প্রকার আদর্শের প্রতীক এবং কালজয়ী। স্বর্গ-মর্ত্য, পাতাল—সর্বত্রই এঁদের সহজ আনাগোনা। বিভিন্ন সব রূপধারণ ক'রে এঁরা যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন। দুঃখীদের সান্ত্বনা দেয়া, ভক্তের দুঃখ-কষ্ট দূর করা, সত্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বর দিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাই এঁদের নিত্যকর্ম। যোগ-শক্তিতে বলিয়ান হ'য়ে, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে সমাজে সুস্থ মানবিক বোধ বা সমস্ত সৎ-কৃতির সৃষ্টি করেন এঁরা। কালিকা, শিব এবং পার্বতী দেবচরিত্রের মধ্যে মুখ্য।

(২) মনুষ্য চরিত্র :

জীবজন্তুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লো মানুষ। চুরাশি লাখ যোনির মধ্যে মানব-যোনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কারণে স্বর্গের দেবতারাও মর্ত্যের মানব-যোনি লাভ করার জন্যে সর্বদাই উন্মুখ থাকেন। তবে এই মানুষ একই সঙ্গে সৎ এবং অসৎ—দেব এবং দানবের মিশ্রণ-বিশেষ। মানুষ একই সঙ্গে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেক-সম্পন্ন। মানুষের এই সব গুণের জন্যেই সম্ভবতঃ গবরীতে মনুষ্য চরিত্রের ছড়াছড়ি। (১) বুড়িয়া (২) রাই (৩) কুটকড়িয়া (৪) কঁজর-কঁজরী

(৫) মীনা (৬) নট (৭) খেতুড়ী (৮) শঙ্করিয়া (৯) কালবেলিয়া (১০) পাইতা (১১) বাল্লিয়া (১২) যোগী (১৩) গবড়া (১৪) কানগুজরী (১৫) কালুকীর (১৬) বনজারা (১৭) শকলাগর (১৮) ভোপ (১৯) বনওয়ারী (২০) গোমা (২১) বাঁঝড়ী (২২) ফত্তাফত্তি (২৩) বগলী (২৪) দেবর (২৫) ভোজাই প্রভৃতি চরিত্র গম্ভীরাতে খুবই উল্লেখযোগ্য।

(৪) দানব চরিত্র :

অশিব ও অসত্যের প্রতীক এবং তামসীবৃত্তিসম্পন্ন অসুর—দৈত্যকেই দানব বলা হয়। এরা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অহঙ্কারী এবং হিংস্র। মানুষকে কষ্ট দেয়াতেই যেন এদের সুখ। প্রকৃতিগতভাবে এরা বিধ্বংসী এবং সংহারক। এদের মাথায় থাকে লম্বা লম্বা শিং, দেখতেও বেশ বীভৎস। গম্ভীরাতে উওয়া (২) খড়ল্যাতুত্তো (৩) হঠিয়া এবং (৪) ভিঁয়াবড় প্রভৃতি দানব চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

(৫) জীবজন্তু ও গাছপালা :

জীব ও উদ্ভিত জগত অবশ্যই দেব, দানব এবং মনুষ্য জগত থেকে ভিন্ন। এদের জীবনচর্যাও ভিন্ন একেবারে। অন্যদের সঙ্গে তার কোনো মিলই নেই। তবে প্রকৃতিগত দিক থেকে এদেরও দুটি পরিষ্কার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) হিংস্র ও (২) অহিংসক। তবে গম্ভীরার সমস্ত জন্তুই হিংস্র, যেমন—শুওর, ভাল্লুক এবং বাঘ।

উদ্দেশ্য :

কেবলমাত্র মনোরঞ্জন বা জীবিকানির্বাহ—কোনোটাই গম্ভীরা আয়োজনের (স্থাপনের) উদ্দেশ্য নয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মীয় কর্তব্যের প্রতিপালন—অর্থাৎ ভৈরব বা শিবকে তুষ্ট ক'রে সমস্ত প্রকারের অনাকাঙ্খিয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া।

তত্ত্বগত দিক :

লোকনাট্য মূলতঃ নৃত্যগীত প্রধান। অভিনয়ের দিকটা নৃত্যগীতের মত অতটা পরিণত নয়। অন্যান্য লোকনাট্যের মত গম্ভীরাতেও নৃত্যেরই প্রাধান্য, তবে সঙ্গীতও কিছু কমে যায় না। পদ্যসংলাপ প্রায় সময়ই গানের সাহায্যে আবৃত্ত হয় বা গীত হয়। এর কয়েকটি স্বাঙ্গ গীতিমূলক স্বাঙ্গেরই শ্রেণীভুক্ত। গানের সাহায্যেই এগুলি পরিবেশিত হয়ে থাকে। এইসব স্বাঙ্গের প্রধান পাত্র বা চরিত্র হ'লো শঙ্করিয়া। শঙ্করিয়া গানের সাহায্যেই প্রদর্শন করে এইসব স্বাঙ্গ। ফলে গানই স্বাঙ্গ সম্পন্ন করার প্রধান মাধ্যম। গান না থাকলে গম্ভীরা একেবারেই নীরস হ'য়ে পড়বে। সঙ্গীতের স্পর্শেই নাটক যেন প্রাণ পেয়ে যায়। নাচ ও গানের প্রাধান্য থাকলেও অভিনয় যে গম্ভীরাতে খুব একটা কম, তা কিন্তু নয়। গানের মত অভিনয়ও গম্ভীরার আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

গবরীর শিল্পগত দিক :

লোকানুরঞ্জনের সঙ্গে শৈল্পিক-সুষমার সম্পর্ক বেশ গভীর। ফলে একথা মনে করা ঠিক নয় যে লোকেরা শিল্প-সুষমার প্রতি উদাসীন। কিন্তু লোকশিল্প বা লোকনাট্যের যে শৈল্পিক দিক তা কিন্তু কোনো শাস্ত্র মেনে চলে না। তবে এরও আছে নিজস্ব একটি শাস্ত্র—যা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসায় আজ সার্বজনীনভাবে সম্মত বা মান্য। প্রদর্শনের সমস্ত উপকরণে—অর্থাৎ নৃত্যভঙ্গিমায়, অভিনয় কৌশলে, সঙ্গীত প্রণালীতে, বাচনভঙ্গিতে এবং রূপসজ্জায় লোকজীবনেরই দৈনিক ক্রিয়াকলাপের অভিব্যক্তি ঘটে। ব্যবহৃত মুখোশের নির্মাণে, তার উপরকার কারুকার্যে লোকশিল্পের যে সুষমা ফুটে ওঠে বা প্রকাশ পায় তা সত্যিই বিস্মিত করে দেয় আমাদের। পোষাকের আকৃতি ও গঠনে তথা রঙের সন্নিবেশে লোকশিল্পের ঐতিহ্য রক্ষিত হয়। পোষাক আবার চরিত্রের সঙ্গে খুবই মানানসই। ফলে পোষাক পরামাত্রই অভিনেতা তার ব্যক্তি-চরিত্র বিস্মৃত হ'য়ে অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং যথাযথভাবে তার রূপায়ণও করে। পোষাকের ওপর চাঁদ, তারা, সূর্য, ময়ূর, পাপিয়া প্রভৃতি ধর্মীয় চিহ্ন একই সঙ্গে অভিনেতা ও দর্শককে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে পৌঁছে দিয়ে তাদের কলাতৃষ্ণা চরিতার্থ করে

রূপসজ্জায় বাস্তব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। আদিবাসীদের মধ্যে এই শিল্পের পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটেছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাঙিয়ে তোলার কিংবা চিত্র-বিচিত্র করায় তা খুবই সক্ষম। লোকনাট্যের অঙ্গসজ্জায় সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব পায় মুখসজ্জা। অভিনেতার মুখই তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। কেননা দর্শকের দৃষ্টি অভিনেতার মুখমণ্ডল ঘিরেই কেন্দ্রীভূত বা নিবদ্ধ থাকে সাধারণতঃ। ফলে তার মুখ যেমন ব্যক্তিত্ব প্রকাশক হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি বাঞ্ছনীয় বেশ দূর থেকেই তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া। এই কারণে গাঢ় রঙে মুখমণ্ডল রঞ্জিত ক'রে তারপরে লাগানো হয় মুখোশ। অঙ্গসজ্জায় সাধারণভাবে চারটি রঙের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি—রঙ চারটি হ'লো—(১) কালো (২) নীল (৩) পীত (৪) লাল। এদের দুই বা ততোধিক রঙের মিশ্রণে অন্যান্য আবশ্যিক রঙও তৈরী করে নেয়া হয়। লোক-পসাধনে কাজল, হাড়ের গুঁড়ো, হলদী, আটা, চালের গুঁড়ো, গাছের ছাল ও তার রস এবং খড়িমাটি ও ভূষো-কালির ব্যবহার খুব বেশি। লোকগ্রাহ্যরূপে এসবের সাহায্যেই চরিত্রের অঙ্গসজ্জা করা হয়, যথা—রাক্ষস চরিত্রের জন্যে গাঢ় নীল, চোরের জন্যে কালো, দেবদেবীর জন্যে লাল, যোগীদের জন্যে পীত বর্ণের ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ গবরীর রূপসজ্জা এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত হ'য়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায় গবরীতে অলঙ্করণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গবরীনাট্য—সাংস্কৃতিক তত্ত্ব :

লোকসংস্কৃতির মানোন্নয়নে লোকনাট্যের একটি কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

এ ব্যাপারে গবরীও বেশ উল্লেখযোগ্য। গবরীতে মানব সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেব-দানব এবং পশুসংস্কৃতিও স্বচ্ছন্দে বিকাশ লাভ করেছে। এতে ক'রে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বিনিময়-প্রক্রিয়াটি বেশ গতিলাভ করেছে এই আঙ্গিকে। ফলে শ্রেণীবৈষম্য কখনোই প্রশ্রয় পায়নি গবরীতে।

ধর্মসম্পর্কে এক উদার মানসিকতা সৃষ্টিতে গবরী উল্লেখযোগ্য এক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। আর তারই দরুণ শাস্ত্রীয় সমস্ত দেবদেবীই অতি সহজে লোক-ধর্মের আধার হ'য়ে উঠেছে এই আঙ্গিকে। দেবতাদের অনড় ও কঠোর মানসিকতা দূর হয়েছে এর ফলে।

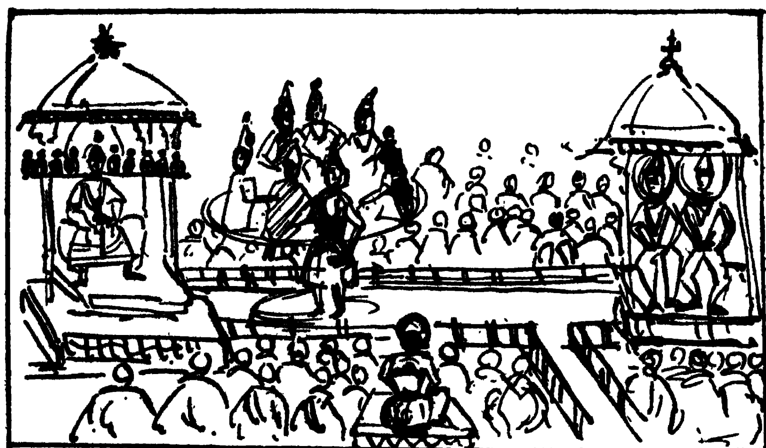
রাজস্থানের লোকজীবনে গবরীর অবদান :

রাজস্থানের লোকজীবনে গবরীর অবদান কয়েকটি কারণে খুবই উল্লেখযোগ্য। একদিকে তা যেমন ভীলেদের গোষ্ঠীজীবনকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খলিত এবং সুদৃঢ় করেছে—তেমনি অন্যদিকে তাদের মধ্যে বিকাশ ঘটিয়েছে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিভিন্ন সব সদ্‌বৃত্তির। দেবতা, দানব, মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীকে গোষ্ঠী-জীবনের মনোরঞ্জনার্থে একই মঞ্চে উপস্থাপিত ক'রে গবরী ভীলেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল মানসিকতার গভীরতা ও ব্যাপ্তি সৃষ্টি করেছে। গবরী-লোকনাট্য আনন্দ উল্লাসের অবসরে সর্ববর্ণ, সর্বধর্মের মানুষকে একত্রিত হ'য়ে স্বতঃ-প্রণোদিতভাবে আনন্দলাভের মাধ্যমে আত্মারবিকাশ ঘটাতে, তাদের মনের বিভিন্ন সব গ্রন্থিমোচনে, কুণ্ঠা দূরীকরণে এবং সমষ্টির কল্যাণে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি-সমূহকে সদা তৎপর রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এর ফলে গবরী অনুষ্ঠানের সময়ে ও তারপরে গোষ্ঠীর জীবন সামগ্রিকভাবেই আনন্দমুখর হ'য়ে উঠে। এসব সত্ত্বেও গবরী তার নিয়মনিষ্ঠা—লোকজীবনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি ক'রে তাকে কিছুমাত্রায় রক্ষণশীল বা স্থিতিশীলও ক'রে রেখেছে!

এই সব কারণে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণ পুরুষ দেবীলাল সামর গবরীকেই ভারতবর্ষের আদর্শ লোকনাট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রাসধারী ও গবরী রাজস্থানী লীলা নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরপ্রদেশের লোকনাট্য



রামলীলা

লীলা এবং সংগীত ঃ হিন্দুধর্মের দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণের স্মৃতিধন্য উত্তরপ্রদেশ মূলতঃ লীলময়। এখানকার লোকনাট্যে তাই লীলারই প্রাধান্য। লীলানাটকের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ নাট্য আঙ্গিক সাংগীতও এখানে বেশ জনপ্রিয় —এমনকি ব্যবসায়িক দিক থেকেও বেশ উল্লেখযোগ্য। লীলানাটকের মধ্যে রামলীলা ও রাসলীলার এবং সাংগীত হিসেবে নোটঙ্কীর আলোচন করা হ'য়েছে এই অধ্যায়ে।

রামলীলা রাসলীলা কৃষ্ণলীলার মতই অবতারকল্প এক মহান ব্যক্তির জীবন-কেন্দ্রিক ফলে ধর্মীয় লোকনাট্যেরই শ্রেণীভুক্ত। অনেকে মনে করেন, আজকের রামলীলার প্রবর্ত্তক রামচরিতমানসের স্রষ্টা ভক্ত তুলসীদাস। জগদীশচন্দ্র মাথুরের মতে তুলসীদাসের রামচরিত মানস এক মহান কাব্য—"A dramatic Narrative"। কেননা রামচরিতমানস কেবলমাত্র পাঠ্য নয়, তা অভিনেয়ও বটে। অর্থাৎ রামচরিতমানসে দৃশ্যকাব্যের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। গ্রামের দিকে রামকাহিনীর পরিবেশকরা পাঠক ও ধারক—এই দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে যান। একদল রামায়ণ পাঠ করেন, অন্যদল করেন তার ব্যাখ্যা। কখনো কখনো এই

ব্যাখ্যায় অভিনয়েরও সমাবেশ ঘটে এবং এই ভাবেই রামলীলা লোকনাট্যের সারবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। সাঁচীতে প্রাপ্ত গুহাচিত্রে এই ধারার প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভারতবাসী অবশ্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই রামকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সেই কাহিনী কথোপকথনের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে তাকে রসময় ক'রে তোলার ব্যাপারে তুলসীদাসের গুরুত্ব সত্যিই অপরিসীম। কিন্তু এই কথোপকথনকে সূত্রবদ্ধ করার বা সূত্রধারের কোনো ইঙ্গিত কিংবা নাটকীয় চরিত্রের আগমন-নিষ্ক্রমণ ও কাহিনীর গতিময়তা—এসবের কোনো প্রত্যক্ষ নির্দেশ রামচরিত-মানসে লক্ষ্য করা যায় না। মনে করা হয় যে, এই নির্দেশগুলো ছিল একেবারেই মৌখিক, ফলে তা উহ্যই থেকে গেছে। আজও অবশ্য রামলীলার এইসব নির্দেশ মৌখিকই রয়ে গেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, অযোধ্যাকাণ্ডে কাহিনীর গাঢ়-সংবদ্ধতা, চরিত্রের বিকাশ—তার অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব এবং করুণরসের অবতারণা এত নৈপুণ্যের সঙ্গে করা হয়েছে যে রামচরিতমানসের এই খণ্ডটি গ্রীক ট্র্যাজেডীর সমতুল হ'য়ে উঠেছে।

সে যাইহোক, রামচরিতমানসের স্রষ্টার দৃষ্টি যে সর্বক্ষণের জন্যেই শ্রীরাম-চন্দ্রের মর্ত্যলীলার নাটকীয়ত্বেই স্থির-নির্দিষ্ট ছিল—এবিষয়ে মতদ্বৈধতার কোনো অবকাশ নেই। তুলসীদাসের রামচরিতমানসের স্বচ্ছতার মূল-কারণ এটাই। অবশ্য এর প্রাণবন্ত কথোপকথনও এই স্বচ্ছতার এক অনিবার্য পূর্ব শর্ত। এছাড়া কয়েকটি স্থানে ভিন্নধর্মী চরিত্র সমূহের মধ্যেকার তার্কিক বাচন-ভঙ্গীও রঙ্গমঞ্চের পক্ষে খুবই উপযোগী।

অভিনয়-রীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দরুণ রামলীলা ইওরোপের "প্যাশান-প্লে"-রই সমধর্মী। বিশেষ কোনো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হ'য়ে উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি শহরে কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শহরের বিভিন্ন স্থানে রামলীলার প্রদর্শন হ'য়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বনবাস অবধি ঘটনা শহরে কোনো মন্দিরের মধ্যে অভিনীত হয় এবং চিত্রকূট ও তার পরবর্তী ঘটনা শহরের বাইরে কোনো প্রান্তরের কিছুটা জায়গা ঘিরে অভিনীত হয়। এরপর ভরতমিলন বা রামাভিষেকের দৃশ্যে নাট্যদলটি আবার শহরে ফিরে আসে। দেখাযাচ্ছে, রাম-লীলার এই অভিনয়রীতি স্বভাবে প্রকৃতিবাদী বা Naturalistic. এই প্রসঙ্গে কাশীর নিকটবর্তী রামনগরের রামলীলা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রায় সাত মাইল বিস্তৃত এলাকা নিয়ে রামনগরের রামলীলা অনুষ্ঠিত হয়। রামায়ণের বিভিন্ন সব ঘটনাস্থলের জন্যে আগে থেকে স্থায়ীরূপে বেশকিছু মঞ্চ নির্মাণ করা হয়, যেমন—অযোধ্যা, জনকপুরী, সরযূনদী, পঞ্চবটি, রণভূমি, লঙ্কা প্রভৃতি। কথাকার রামচরিতমানসের চৌপাইয়া গায়। অভিনেতা স্থানীয় ভাষায় কথোপকথনসহ অভিনয় মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত করে। কাহিনী এগিয়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা ও দৃশ্যস্থলের পরিবর্তন ঘটে। অভিনেতাসহ দর্শকরাও মহোৎসাহে এক স্থান থেকে

পরবর্তী অভিনয় স্থানে গিয়ে হাজির হয়। এই রামলীলার অভিনয়ে সময় লাগে প্রায় চল্লিশ দিন।

অভিনয়-স্থলের তিনদিক ঘিরে বসে হাজার হাজার দর্শক। নাটক আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্বে মহারাজা, তাঁর পরিবার এবং অতিথিবৃন্দ হাতির পিঠে চড়ে উপস্থিত হন রঙ্গস্থলে। শাস্ত্রবেত্তা এবং প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য ও নাট্যে অভিজ্ঞ মহারাজা এই রামলীলার পৃষ্ঠপোষক। তিনি হাতির পিঠে চড়ে মনোযোগ সহকারে নাট্যাভিনয় পরিদর্শন করেন। যদি কোনো অভিনেতা প্রবেশ বা প্রস্থানে কোনোরূপ ছন্দপতন ঘটায় কিংবা সংলাপ উচ্চারণে বা অভিনয়ে কোনো ভুল করে, তাহ'লে মহারাজ স্বয়ং তা শুধরে দেন।

রঙ্গস্থলে অপেক্ষাকৃত একটি উঁচু চৌকিতে বসে কথাকার। তার সঙ্গে থাকে ঢোলক, ছৈমেবাদক এবং বাঁশীওয়ালা। কথাকার তুলসীর চৌপাইয়া গাইতে শুরু করলে সমগ্র অভিনয়ক্ষেত্রের পরিবেশ খুব শান্ত হ'য়ে ওঠে। ধর্মভাবে বিভোর দর্শকমণ্ডলীও তখন পবিত্র চিত্তে স্থির বসে থাকে। কথাকারের গম্ভীর ও সুউচ্চ স্বর দর্শকের মাথার উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এই সময় অভিনেতারা মঞ্চের ওপর মূর্তিবৎ বসে থাকে। কথাকার চৌপাইয়া থামালে, অভিনেতা উঠে স্থানীয় ভাষায় সংলাপের সাহায্যে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে এবং অভিনয়ের সাহায্যে তার শারীরিক অভিব্যাক্তি ঘটায়। যখন দৃশ্য বদলায়—অর্থাৎ অশোকবন থেকে রাবণের সভাগৃহ আসে তখন প্রদর্শক মণ্ডলীর সঙ্গে দর্শক সম্প্রদায়ও স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। প্রথমেই রাজার হাতি শুঁড় উঁচিয়ে নমস্কার জানায় এবং স্থান পরিবর্তনের সংকেত ঘোষণা করে। তারপর পরবর্তী দৃশ্যের উদ্দেশ্যে সকলের আগে আগে চলে হাতির দল। পেছনে থাকে দর্শক। দৃশ্য-স্থল নিকটবর্তী হ'লে আগে পৌঁছে ভালো জায়গা নেয়ার জন্যে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। রামের বনবাসের সময় 'সরযূনদী' পার হওয়ার দৃশ্য সত্যিই খুব করুণ। এই সাতমাইলের মধ্যে ছোটো একটি বহতা নদী আছে—সেটাই হ'য়ে ওঠে রামায়ণের সরযূনদী। মাঝি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নৌকায় তুলে নদী পার করতে থাকে। নৌকা কূল ছাড়লেই সমবেত দর্শকের মুখ খুবই করুণ হ'য়ে ওঠে—অনেকের চোখে আবার সত্যিকার জলও আসে। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সরযূনদী পার করার সময় অযোধ্যাবাসী যেমন আকুল ভাবে কেঁদেছিল—এই দৃশ্যে দর্শকরাও তেমনি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ে। আবার লঙ্কা দহনের মত অমন এক মজার দৃশ্যে অসংখ্য আতসবাজি ফোটানো হয় এবং প্রায় ২০ হাজার দর্শক সমবেত হয়। দৃশ্যের নাটকীয়ত্ব, হাজার হাজার দর্শকের এমনভাবে নাটকীয় কার্যে অংশগ্রহণ এবং চটকদার মুকুট, মুখোশ ও বস্ত্রে সজ্জিত অজস্র অভিনেতা কর্তৃক এক বিস্তৃত মঞ্চে চল্লিশ দিন ধরে সঙ্গীত ও কবিতায় গ্রথিত কাহিনীর মঞ্চোপস্থাপন পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যাবে না।

রামলীলার সময় মহারাজা প্রতিদিন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার আরতি করেন।

প্রায় দু'শো বছর ধ'রে রামনগরে রামলীলার এই অভিনয় হ'য়ে আসছে। যতদিন রামনগরের মহারাজের স্বত্ব কায়েম ছিল ততদিনই রাজকীয় অন্যান্য বিভাগের মত রামলীলারও একটা স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এই বিভাগে একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী থাকতেন।

রামনগরের রামলীলা ছাড়াও মালওয়া এবং বুন্দেলখণ্ডের দিকে রামলীলার আরেকটি পদ্ধতির প্রচলন আছে। এই পদ্ধতিতে উন্মুক্ত প্রান্তরে নির্মিত হয় খোলা মঞ্চ। এই মধ্যমঞ্চের দুই দিকে দুটি পৃথক মঞ্চ নির্মিত হয়। তার একটিকে মনে করা হয় অযোধ্যা এবং অন্যটিকে লঙ্কা। পাঠক ও ধারক বসে মধ্যমঞ্চের এক কোণে। সময়মত রাম অযোধ্যা থেকে এবং রাবণ লঙ্কা থেকে চলে আসে মধ্যমঞ্চে। এই মধ্যমঞ্চের চারদিকেই আসন নিতে পারে এবং নেয়ও দর্শক। কোথাও কোথাও যেমন অস্থায়ী অভিনয় ক্ষেত্র নির্মান করা হয় তেমনি আবার কোথাও কোথাও অযোধ্যা বা লঙ্কার স্থানে ইঁট বাঁধানো চাতাল তৈরী ক'রে তার ওপর স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এইসব কক্ষে যেমন অভিনয় সামগ্রী থাকে, তেমনি অভিনেতারাও অবসর সময়ে এখানে বিশ্রাম নিতে পারে। অর্থাৎ এই কক্ষ গ্রীনরুমের ভূমিকাও পালন ক'রে থাকে। বনবাস দৃশ্যকে আবার প্রানবন্ত করার উদ্দেশ্যে একটি ছোটো কুটির ছেয়ে নেয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে এইসব স্থলে যদি কোনো একটা বড় গাছ থাকে—তাহ'লে তো তার কোনো কথাই থাকে না—ন্যাচারালিজমের একেবারে চরম হ'য়ে ওঠে। কানপুরের দিকে ধনুর্যজ্ঞলীলা খুবই জনপ্রিয়। এই লীলা প্রথমে রামলীলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এই ধনুর্যজ্ঞলীলা স্বতন্ত্র এক লোকনাট্য আঙ্গিকের মর্যাদা লাভ ক'রেছে। এই ধনুর্যজ্ঞের মঞ্চবিধান যেমন সরল তেমনি আকর্ষণীয়। এই মঞ্চ পৃথক পৃথক চারটি মঞ্চের সমষ্টি। সমতল ভূমি থেকে বেশ কিছুটা উঁচু রাস্তার সাহায্য এই মঞ্চচারটি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। ধনুর্যজ্ঞের এই রাস্তাকে বলা হয় রাজপথ। রাজস্থানের ভরতপুরের রামলীলাও বেশ জনপ্রিয়। এই লীলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এতে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও অন্যান্য চরিত্রাভিনেতারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের পোষাক পরেই অভিনয় করে এবং কথা বলে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায়। যাইহোক, রামলীলার দৃশ্যযোজনার সঙ্গে প্রসেনীয়াম-মঞ্চের মঞ্চসজ্জার প্রায় কোনো তুলনাই চলে না। প্রসেনীয়াম থিয়েটারে দৃশ্য যোজনা করা হয় সাধারণত বাস্তবধর্মী রীতিতে আর রামলীলায় নাট্যধর্মী রীতিতে। রামলীলার একই অভিনয়ে, একটি অভিনয় মুহূর্তে কয়েকটি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের সংযোজন করা হয়। ফলে জনকের সভায় যখন স্বয়ম্বর সভা অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে, তখন সেই জঙ্গলের দৃশ্যও দেখা যায়—যেখানে রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস নিধন করেছিলো। একস্থানে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয় তো অন্যস্থানে অশোক বনে সীতাকেও দেখা যায়। শিল্পীদের

সুশৃঙ্খলিত দলীয় বোধ, বিভিন্ন রসের সব ঘটনার সংযোজনা এবং ভিন্নভিন্ন স্থানে ভিন্নভিন্ন দৃশ্য একসাথে উপভোগ করার মধ্যে সত্যিই খুব আনন্দ আছে। অজন্তার ভিত্তিচিত্রে এবং মধ্যযুগীয় ভিত্তিকলায় অনুরূপ দৃশ্য যোজনার নিদর্শন মেলে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজস্থানে এবং কাঁগড়ার পাহাড়ী চিত্রকলায়ও এই ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যাইহোক রামলীলার এই বহুস্তরীয় মঞ্চ দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ এক ভারতীয় নাট্যশিল্পের পরিচয়বাহী। এর দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ নাট্য পরিচালক আধুনিক কালে তাই এই নাট্য পদ্ধতির প্রয়োগ ক'রেছেন। রামলীলার এই উপস্থাপন ভঙ্গীকে সাম্প্রতিক নাট্যের পরিভাষায় 'জোনাল-ডিভিজন সিস্টেম'ও বলা যেতে পারে। বিখ্যাত রুশ পরিচালক মায়ারহোল্ডও তিনের দশকে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ক'রেছেন। প্যারিস এবং নিউইয়র্কের নাট্যকর্মেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ হ'য়েছে ও হ'চ্ছে। এইসব প্রযোজনায় দর্শক-আসন ঘিরেই চলতে থাকে নাটকীয় কার্য। অন্যদিকে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় লোকনাট্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হ'য়ে আসছে।

রামলীলার অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জা এবং মঞ্চোপকরণ খুবই সরল প্রকৃতির অথচ চটকদার। সমস্ত উপকরণই দেশীয় এবং সহজলভ্য। কাজল, চন্দন, সুরমা, লালখড়ি, সাদাখড়ি, শাঁখের গুঁড়ো, চাউলের লেই, মুখোশ, লতা-পাতা দিয়ে তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ (পাটের তৈরী), গেরুয়া কাপড়, কমণ্ডলু, হনুমানজী ও বানরদের জন্যে তৈরী নরম নরম লেজ (কাপড়ের তৈরী), রাম ও লক্ষ্মণের জন্যে নির্দিষ্ট জরির কাজ করা কাপড় এবং ধনুর্বাণ—এইসব জিনিস সাধারণতঃ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

সমগ্র উত্তরভারতে এবং কিছুটা পরিবর্তিত আকারে সমগ্র ভারতবর্ষে ও তার সীমান্তবর্তী দেশসমূহে রামলীলা আজও লোকনাট্যের পরিচয় বহন ক'রে চলেছে। যাইহোক, রামায়ণ ও মহাভারতের ধারক ও পাঠক থেকেই রামলীলার অভিনয়-সূত্র মিলেছে। অবশ্য রামলীলা রামচরিতমানসের অনেক আগে থেকেই অভিনীত হ'য়ে আসছিল। ভক্তিযুগের অনেক আগেও রামলীলাভিনয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিবংশ-পুরাণে রাম-কাহিনী নির্ভর নাটকাভিনয়ের উল্লেখ আছে। বাল্মীকির সময়েও বীরপূজার গানে এবং অভিনয়ে রামকাহিনীর প্রভাব ছিল। লবকুশ যে রামায়ণ গান করে বেড়াত বাল্মীকির রামায়ণেই তার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই প্রাচীনকালে গায়ক এবং অভিনেতা বোঝাতে কুশীলব শব্দের প্রয়োগ হ'ত—আর এই প্রয়োগেরই প্রভাব পড়েছে রামায়ণে। এই সমস্ত নজির থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে রামচরিতমানস রচনার বহু পূর্বেই শ্রীরামচন্দ্রের জীবনলীলার প্রদর্শন প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ সেই অসম্বদ্ধ রামলীলার এক বিধিবদ্ধ রূপ দেয়ার ইচ্ছাতেই তুলসীদাস নাটকীয় ভঙ্গীতে রামচরিতমানস

রচনা করেছিলেন। আর এই কারণেই তুলসীদাসকে রামনগরের রামলীলার সংস্থাপক বলে গণ্য করা হয়।

রামভক্তির প্রচারার্থে গুরু রামানন্দ সম্ভবতঃ রামলীলার সাহায্য নিয়েছিলেন। সে সময়ের মঞ্চ নিশ্চয়ই আজকের মত সুগঠিত ও পরিণত ছিল না। রামচরিত-মানস এই অসংগঠিত মঞ্চ এবং অভিনয় রীতিকে সুগঠিত ও পরিমার্জিত ক'রে ছিল। তুলসীদাসের সময় কিংবা তার আগে ও পরে লোকমঞ্চে রামকথাভিনয়ের জন্যে উপযুক্ত নাটক অবশ্যই লেখা হ'য়েছিল। কিন্তু রামলীলার সেই আদি-পর্বের কোনো নাট্যরূপ এখনো উপলব্ধ হয় নি। কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামলীলা প্রদর্শনের অনেক প্রমাণ আজ আমাদের হস্তগত। ঐ সময়ের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রেই রামলীলা প্রদর্শিত হ'ত। বর্মায় ধমার্খ নামক নাট্যরূপকের মাধ্যমে এবং শ্যামে পুতুল-নাট্যের সাহায্যে রামলীলা আজও প্রদর্শিত হয়। বালির একটি লোকনৃত্যও রামকাহিনী নির্ভর। তবে বিভিন্ন দেশে রামকাহিনী ও রামলীলা প্রদর্শনের রূপে কিঞ্চিদধিক পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে।

মধ্যযুগেই রাসলীলা ও রামলীলার ব্যাপক প্রসার ঘটে। তবে মাধুর্যভাবে ও শৃঙ্গার রসে সমৃদ্ধ রাধাকৃষ্ণের জীবন-সম্বলিত রাসলীলার প্রচার প্রসার ও তজ্জনিত জনপ্রিয়তা সম্ভাবিত হয়েছিল যে অধিকমাত্রায়—একথা বলাই বাহুল্য। অসম, নেপাল ও মিথিলায় রাসলীলা প্রভাবিত কীর্তনীয়া ও আঙ্কিয়া-নাটের প্রচলন থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। রামের মত উদাত্ত চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা করতে গেলে তার রূপায়ণে রাসের অনুরূপে শৃঙ্গার রসের অবতারণা করা একেবারেই অসম্ভব। রামলীলাভিনয় তাই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গম্ভীর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের অনুপ্রেরণায় রামলীলা সম্পর্কিত কয়েকটি নাটক অবশ্যই লেখা হয়েছে যার মধ্যে 'সীতা স্বয়ম্বর' (দেবকীনন্দন ত্রিপাঠী), 'রামলীলা বিহার' (মধুকর), রামলীলা (দামোদর শাস্ত্রী) উল্লেখযোগ্য। ভারতেন্দুর পরবর্তী কালে মাধব শুক্ল্ ও তাঁর অনুগামীরা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'রামলীলা মণ্ডলী'র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিংশ শতাব্দীতে রামলীলা লিখিত খ্যাল ও মাচে উপলব্ধ হ'তে থাকে। আজও মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায়—বিশেষ ক'রে মালওয়ার দিকে মাচ শৈলীতে এই লীলার অভিনয় হ'য়ে থাকে।

তবে রাসের অনুরূপে রামলীলারও স্বাধীন বিকাশ ঘটেছিল। সে সময়ে খুব সম্ভব রামলীলা ও রাসলীলার দলগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো—আর তা চলাই ছিল স্বাভাবিক। তবে অচিরেই রামচরিতমানসের পাঠ রামলীলা-ভিনয়কে উৎকৃষ্টতর করে তুলেছিল। তখন এই পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীরও সূত্র জুড়ে দেয়া হ'তো এবং সেই অনুসারে অভিনয় হ'তো। রিজলে এই লীলা

দেখে ভারতীয় লোক-নাট্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে যে—সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছিলেন তা হ'লো—

(১) নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে কাহিনীর বিকাশ,
(২) গদ্য সংলাপ,
(৩) উন্মুক্ত মঞ্চ,
(৪) গ্রামীণ অলঙ্করণ এবং রঙ লেপন (অঙ্গরাগে),
(৫) মঞ্চে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ

এবং

(৬) গীতিধর্মী অভিনয়।

রামলীলাভিনয়ের অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রীতির মধ্যে অন্যতম হ'লো —দক্ষিণভারতের কথাকলি। কথাকলির বেশ কিছু ভাবভঙ্গিমার আধার কিন্তু রামলীলা। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেরব বর্মা এবং রাম বর্মা প্রথম এই শৈলীতে রামলীলা প্রদর্শন করেন। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামনাথন রামায়ণের প্রধান-প্রধান কয়েকটি ঘটনা দিয়ে কথাকলির কয়েকটি মুদ্রা পরিশীলিত ক'রে তোলেন। কথাকলিও প্রায়ই উন্মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়, এই কারণে তা লোকজীবনের সঙ্গে গাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কথাকলিতে নর্তকের প্রবেশ মাত্রই শুরু হয় নান্দীপাঠ, তারপর কাহিনী। মঞ্চে নর্তক আঙ্গিক অভিনয়ে সে কাহিনীকে চাক্ষুষ ক'রে তোলে। আর মালায়ালাম সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ পায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। বিচ্ছিন্ন কিছু চর্চার কথা বাদ দিলে কথাকলি কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ।

উত্তর ভারতের রামলীলায় দর্শন ও শ্রবণ এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কাব্যের রসে আপ্লুত হওয়া যায়। মঞ্চের এক কোণে বসে পাঠক রামায়ণ থেকে পাঠ করে, পাঠের মধ্যে যেখানে সম্ভব অভিনেতা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে কাহিনীর অভিনয় ক'রে তাকে দৃশ্য ক'রে তোলে। প্রায় অনুরূপ আরেকটি রীতিরও প্রচলন আছে—পাঠক যে অংশ পাঠ করে, অভিনেতা নিজের মত ক'রে কথোপকথনের সাহায্যে তাকে দৃশ্য ক'রে তোলে।

সাধারণ ভাবে আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদে রামলীলা শুরু হয়। আর শেষ হয় বিজয়া-দশমীর দিন মহা ধুম-ধামের মধ্যদিয়ে। ঐদিন রামলীলার মাঠে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের বড় বড় পুতুল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। পুতুলগুলি হা করতে, ঘাড় নাড়তে এবং তাদের বড় বড় চোখগুলি ঘোরাতে পারে। রাম রাবণের যুদ্ধে বিজয়া-দশমীর দিন রামের জয় ও রাবণের পরাজয় হয়েছিল, ফলে ঐ দিনই রামলীলা শেষ হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কাগজের পুতুলগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আগুনের লেলিহান শিখা লকলকিয়ে ওঠে। বাজি ফোটে। সঙ্গে

সঙ্গে পুতুলের প্রাণ-পাখিও আকাশে উড়ে যায়। মেলার সবাই তখন রামের জয়ে প্রসন্ন হ'য়ে বাড়ি ফেরে। মেক্সিকোর গ্রাম-দেশে ইশা-মসীহের জীবন নিয়ে এমনিতর এক লোক-নাট্য ইষ্টারের দিন প্রদর্শিত হয়। এই উপলক্ষে পুতুলও আতসবাজি সহযোগে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

অযোধ্যার রামলীলা শুরু হয় আবার আশ্বিনের কৃষ্ণনবমী থেকে। চলে প্রায় ১৯ দিন ধ'রে। অযোধ্যার এই রামলীলায় বিচিত্র সব দৃশ্য দেখা যায়। এই লীলায় যথার্থবাদী রীতিতে লঙ্কাদহন বেশ ধুমধামের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। এই দৃশ্যকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতে ৬০ থেকে ৭০ ফুট উঁচু রাবণের প্রাসাদ তৈরী করা হয় এবং হনুমান দড়ির সাহায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ক'রে বেড়ায়। রামলীলা শুরু হয় আশ্বিনের কৃষ্ণ প্রতিপদে। এই রামলীলার অনুষ্ঠানেও বনবাসের দৃশ্যে নগরবাসী অভিনয় ক্ষেত্র ছেড়ে রামকে নিয়ে যমুনাতীরে যায়। এখানেও রামায়ণের ক্রমানুসারে রামলীলার ঘটনাবলী উপযুক্ত স্থানে প্রদর্শন করা হয়—রামনগরেরই অনুরূপে। মথুরার বেশ কিছু দল আবার আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ থেকে রামলীলার অভিনয় করে। রামলীলা উপলক্ষ্যে লক্ষ্ণৌতেও রীতি-মত ধুমধাম শুরু হ'য়ে যায়। কূর্মাচল প্রদেশেও বিজয়া দশমীতে রামলীলা প্রদর্শিত হয়। এই রামলীলায় কথোপকথন ছাড়াও দেশীয় রাগরাগিনীর সাহায্যে বাল্মীকি ও তুলসীদাসী রামায়ণের অংশ-বিশেষ গীত হয়। নেপাল এবং তিব্বতেও বেশ পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে রামায়ণ পাঠ করা হয়। দিল্লীতেও মহা সমারোহে রামলীলা প্রদর্শিত হয়। ১৯২০ সালে এখানে রামলীলার একটিমাত্র অনুষ্ঠান হ'তো। ক্রমে এর সংখ্যা বাড়তে থাকে। দিল্লীতে রামলীলার সূত্রপাত কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহের আমলে। উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত রাঘোদাস। ১৯৩৮ সালে রামলীলার পরিচালনায় "রামলীলা সমিতি" সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। সেখান থেকেই অদ্যাবধি দিল্লীতে সুব্যবস্থিত রূপে রামলীলা অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। রাঘোদাসের অনুসারী যেসব মোহান্ত এখনো দিল্লীতে আছেন—তাঁরাই সাধারণতঃ এইসব রামলীলার সঞ্চালক।

উনবিংশ শতাব্দীর পার্সী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানীর প্রভাবে রামলীলাও কোথাও কোথাও প্রসেনীয়াম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে। আজকের গ্রাম ও নগরের অধিকাংশ রামলীলায় সে প্রভাব এখনো লক্ষ্য করা যায়। এসবই জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের অবহেলার পরিচায়ক। অবশ্য স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় আমাদের সচেতন সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান সব শিল্পীরা রামলীলার নৃত্য-নাট্য ও সঙ্গীত-নাট্যরূপ প্রকাশ করেছেন। উদয়শঙ্কর ছায়ানাট্যরূপেও রামলীলা প্রদর্শন করেছেন। ১৯৫০ সালে শচীনশঙ্কর এবং নরেন্দ্র বর্মা (উভয়েই উদয়শঙ্করের শিষ্য) নৃত্য-গীতের মাধ্যমে রামলীলা প্রস্তুত করেছেন। ১৯৫২ সালে শান্তিবর্ধন রামায়ণের কাহিনীকে

পুতুলনাট্যেও রূপান্বিত করেছেন। এসব থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে স্বাধীন ভারতে রামলীলার সংস্কার কার্য বেশ গতিময় হ'য়ে উঠেছে।

এইসব মহান উদ্‌যোগের ঐতিহাসিক সফলতায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে দিল্লীর ভারতীয় কলাকেন্দ্র এক উল্লেখযোগ্য রামলীলা প্রস্তুত করে। এর জন্যে এক ত্রি-স্তরীয় মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। সেখান থেকে প্রতিবছরই ভারতীয় কলাকেন্দ্রের তরফ থেকে বিজয়া দশমীর দিন রামলীলার নৃত্য-নাট্যরূপ প্রদর্শিত হ'য়ে আসছে। এই রামলীলা দর্শনের জন্যে প্রতিদিন প্রায় দশহাজার দর্শক সমবেত হয়। কথাকারের গীতে এই রামলীলা আরম্ভ হয়। লীলা চলাকালে গানের সাহায্যে তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণনা দেন, নাটকীয় কার্যকে গতিশীল করেন এবং ভাবদশাকে তীব্র ও গভীর ক'রে তোলেন। নূতন ও পুরাতন দিল্লীর মাঝখানে একটি বড় মাঠে (রামলীলা ময়দানে) এই রামলীলার জন্যে মেলা বসে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং মেঘনাদের বড় বড় পুতুল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় এবং বিজয়া দশমীর দিন প্রথা অনুসারে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়। মেলাও সাঙ্গ হয়। প্রথমাবধি মুসলিমরাই এই পুতুলগুলি তৈরী ক'রে আসছে। এই রামলীলায় অজস্র টাকা খরচ করা হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক এই মেলায় যোগ দেয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'লো এই যে অনেক অস্বাভাবিকতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ কিন্তু বেশ উৎসাহ সহযোগেই রামলীলা দেখে। এর কারণ সম্ভবত: এই যে রামলীলা একাধারে মানুষের দার্শনিক অন্বেষার রসদ জোগানোর পরম সহায়ক এবং মনোরঞ্জনের এক সার্থক উপায়। অধিকাংশ জায়গায় রামলীলা যদিও আজ স্বাঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, তবুও একটু মাজাঘষা ক'রে দেশব্যাপী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর এক রাষ্ট্রীয় রূপ দেয়ার অনেক সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া দেশের বিখ্যাত কয়েকটি নৃত্যগোষ্ঠীর উপর ইতিমধ্যেই রামলীলার প্রভাব পড়েছে। ফলে এইসব গোষ্ঠী যেসব নৃত্য-নাট্য প্রদর্শন ক'রে চলেছে—তা থেকে রামলীলায় শৈলীগত অনেক ব্যাপ্তি এসেছে। এখন রামলীলার লোক-রূপ অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে অবশ্যই-এর মঞ্চ-আড়ম্বর দূর করতে হবে এবং অভিনয় ও সামগ্রিক উপস্থাপন ভঙ্গীতে আনতে হবে সহজতা। আর কেবলমাত্র তখনই রামলীলা জন-আত্মার নিকট আত্মীয় হ'য়ে উঠতে পারবে।

রাসলীলা

কৃষ্ণের জীবনকথা এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমোপাখ্যান ভারতীয় শিল্পকলায় একটা বড় স্থান দখল করে আছে। গুজরাত ও সৌরাষ্ট্রের রাসনর্তক, রাসধারীর উদযোক্তা, অসমের অঙ্কিয়ানাটের অভিনেতা, মণিপুরী রাসনৃত্যের নায়িকা, বাংলা ও উড়িষ্যার পালাগায়ক তথা কীর্তনিয়া এবং, গাঙ্গেয় উপত্যকার পালাগায়ক ও অভিনেতা—এঁরা সকলেই পরম কৃষ্ণভক্ত। এছাড়া সমগ্র উত্তরভারতের কত্থক-

শিল্পী এবং লক্ষ্ণৌ ও কাশ্মীরের গায়কেরা তো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কৃষ্ণ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আসছে। আর কাঙড়া চিত্রকলার তো একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে রাধাকৃষ্ণেরই প্রেমোপাখ্যান।

হিন্দুদের তেত্রিশকোটি দেবদেবীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় সবচেয়ে মানবিক। তিনি একাধারে প্রেমিক, বীর, রাজনীতিক এবং যোগী। রাম যেমন আমাদের সনাতনী ঐতিহ্যের সংরক্ষক, কৃষ্ণ তেমনি তার এক প্রতিভাবান সংস্কারক। মাখন চুরি, মা যশোদার কাছে অনৃতভাষণ এবং দুর্বৃত্তের সঙ্গে লড়াই-এর কোনো কিছুতেই তিনি পরাঙ্মুখ নন। তাই তিনি মহাভারতের নেপথ্য নায়ক, ক্ষমতা-পিপাসু মাতুল কংসের হন্তারক এবং ধর্মরাজ্যের সংস্থাপক। অর্জুনের প্রতি তার উপদেশাবলী রূপ নেয় ভাগবদ্গীতার—যা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান পবিত্র গ্রন্থ।



মহাভারতে কৃষ্ণের মূর্তি একাধারে যোদ্ধার, দার্শনিকের এবং পারদর্শী এক রাজনীতিকের। রাধা উপাখ্যানের জন্ম ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে। এই সময়েই রাধা এক আধ্যাত্মিক প্রেমপাত্রীরূপে কৃষ্ণ-কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। জন-জীবনে প্রচলিত এই প্রেমকাহিনী অবলম্বনে দ্বাদশ শতাব্দীতে কেন্দুবিল্বের জয়দেব লিখলেন গীতগোবিন্দ। কালক্রমে বৈষ্ণবধর্মের অনিবার্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেম শারীর রূপ নিল—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই।

রাসলীলা রাধাকৃষ্ণের এই লীলারই এক দৃশ্যরূপ। ব্রজভূমিতে অর্থাৎ মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, নন্দগ্রাম ও বর্ষনাতেই এর প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার প্রসার। কৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনার সাক্ষী হয়ে অজস্র মানুষের তীর্থক্ষেত্র হ'য়ে হ'য়ে উঠেছে এই ব্রজভূমি। কংসের হন্তারক রূপে কৃষ্ণের জন্ম হয় মথুরায় কংসেরই কারাগারে।

কংসের সমস্ত অপচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে তিনি বেড়ে ওঠেন বৃন্দাবনে—নন্দ ও যশোদার ঘরে। বৃন্দাবনের তিনি প্রিয় গোপ-বালক, আর বর্ষনা থেকে আগতা শ্রীরাধা তাঁর হৃদয়ের গোপ-বালা। এই সময়েই তিনি তাঁর আঙুলে ক'রে তুলে ধরেন গোবর্ধন পর্বত। প্রাণে বাঁচে অসংখ্য গবাদি পশু এবং দুর্যোগাক্রান্ত মানুষ।

ব্রজভূমিতে কম ক'রে হ'লেও আজ আটশোর বেশি কৃষ্ণমন্দির আছে। এরমধ্যে দ্বারকানাথ মন্দির, শাহজীর মার্বেল মন্দির এবং গত শতাব্দীতে স্বামী রঙ্গাচার্যের শিষ্যদের তৈরী রঙ্গনাথের মন্দির অন্যতম। রঙ্গনাথের মন্দিরে পরস্পর সংলগ্ন বড় বড় সাতটি প্রাঙ্গন আছে। সবচেয়ে ভিতরের প্রাঙ্গনটিতে আছে চন্দন কাঠের বিশাল এক স্তম্ভ—যেটি সাড়ে বারো মন সোনা দিয়ে আবৃত। মন্দিরের অসংখ্য কর্মচারী, ব্রাহ্মণ এবং আশ্রিত সাধুসন্তের খরচ নির্বাহ করা হয় পার্শ্ববর্তী ষাটটি গ্রাম থেকে। এই গ্রামগুলি মন্দিরের নামেই উৎসর্গিত।

বৃন্দাবন সর্বতোভাবেই কৃষ্ণময়। এলাকার মানুষদের মধ্যে কৃষ্ণনামের সমাদর এতবেশি যে শিশুর জন্মমুহূর্তেই কৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শত-নামের কোনো না কোনো নামে নামাঙ্কিত ক'রে তাদের কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ ঘটায়। দেবকীনন্দন, ঘনশ্যাম, নন্দনন্দন, যশোদানন্দন, রাধাবল্লভ, শ্যাম, যোগিরাজ, গোপাল, বংশীধর, মনোমোহন, গিরিধারী প্রভৃতি নাম এলাকার মানুষজনের কাছে তাই খুবই প্রিয়।

ব্রজ মূলতঃ কৃষিপ্রধান এবং ব্রজবাসী নিরামিষাশী। গোঁড়া ভক্তরা আবার পিঁয়াজ রসুন অবধিও খায় না। এখানকার ভাষা ব্রজবুলি। শব্দবন্ধ ও স্বর-বৈচিত্র্যে ব্রজবুলি খুবই শ্রুতিমধুর। দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভক্তিগীতি এবং দর্শন ও অধ্যাত্ম আলোচনার জন্যে এই ব্রজবুলিই সবভারতীয় এক মাধ্যম-ভাষার কাজ করে। চতুর্দশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রের নামদেব, পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুরুনানক, আকবরের সভাকবি রহিম এবং ভক্তগায়ক সুরদাস এই ব্রজবুলিতেই লিখে গেছেন অমরকাব্য এবং মধুর সব গীতি।

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার প্রসারের প্রধানতম কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে এই ব্রজভূমি। ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অসম, দক্ষিণভারত এবং মহারাষ্ট্র থেকে বৈষ্ণবগুরুরা এসে এখানে বসবাস শুরু করেন।

পুষ্টিমার্গই বৈষ্ণব ধর্মানুসারে ঈশ্বর প্রাপ্তির উৎকৃষ্টতম পন্থা। তেলেগু সন্ত বল্লভাচার্য এর প্রণেতা এবং প্রচারক। সুরদাস (১৪৭৯—১৫৮৪) ছিলেন এই বল্লভাচার্যের শিষ্য। অন্যান্য আরো সন্ত কবিকে সঙ্গে নিয়ে বল্লভাচার্য গড়ে তোলেন অষ্টছাপ কবি-সম্প্রদায়। মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতিতে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক। এদিকে সুরদাস তাঁর যৌবনে এক বারাঙ্গনার প্রেমে পড়েন এবং পার্থিব কামনা-বাসনার অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন। ফলে অচিরেই জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত হ'য়ে ওঠেন। তখন নিজের চোখ অন্ধ ক'রে শ্রীকৃষ্ণে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে কৃষ্ণের গুণ-কীর্তনে জীবন

অতিবাহিত করেন। তাঁর সুরসাগর বেদনা-বিধুর কৈশোর জীবনের অন্যতম একটি দলিল হ'য়ে আছে।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র দক্ষিণভারত, গাঙ্গের উপত্যকা এবং বাংলায় ভক্তি-পূজা দারুণভাবেই প্রসার লাভ করে। ভক্তিধর্মের এই প্রসারে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হ'য়েছিল কীর্তন, রাসলীলা তথা সমস্ত লীলানাটক। এই সব আঙ্গিকে কৃষ্ণই পরমপুরুষ এবং পরমেশ্বর আর সমস্ত ভক্তই হ'লো গোপীরূপী নারী।

ভক্তিপথগামীরা নৃত্য এবং সঙ্গীতকে তাদের ভক্তিনৈবেদ্যের অন্যতম উপকরণ ক'রে তোলে। ষোড়শ শতাব্দীতে অসমের শঙ্করদেব ছিলেন ভক্তিরই উপাসক। ফলে অন্যান্য ভক্তের মত তিনিও মনে করতেন সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যই আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম মাধ্যম। অসমে প্রচলিত বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের সাহায্য নিয়ে তিনি রূপ দিলেন 'অঙ্কিয়া নাট'-এর। চারশো বছরেরও বেশি সময় ধ'রে অসমের বৈষ্ণব ধর্মের উপসনা গৃহে বা সত্রায় এই অঙ্কিয়ানাট অভিনীত হ'য়ে আসছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রও প্রচলন করলেন রাসের। আজও মণিপুরের কৃষ্ণভক্ত মানুষের কাছে এই রাসই অন্যতম প্রধান পূজোপকরণ। দোলের সময়ে অনুষ্ঠিতব্য বসন্তরাস খুবই বর্ণাঢ্য, ফলে আকর্ষনীয়। বসন্তরাসে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সঙ্গে নৃত্য করেন—এতে ক'রে শ্রীরাধা খুবই ঈর্ষাকাতর হ'য়ে পড়েন। নিজের ওড়নাখানি ফেলে রেখে শ্রীরাধা যখন চলে যান তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্বিৎ ফেরে। চন্দ্রাবলীর কানন ছেড়ে তিনি তখন শ্রীরাধার কাছে যান এবং প্রত্যাখাত হন। তখন তিনি নানা উপায়ে রাধার মান-ভঞ্জন করেন—মিলিত হন দু'জনে। তখন রাধাকৃষ্ণকে মধ্যে রেখে বৃত্তাকারে নৃত্য পরিবেশিত হয়।

রাসের নর্তকী স্ফীতাকার ঘাঘরা পরে। ঘাঘরাগুলি ভেলভেটের পাড়ে মোড়া এবং দর্পণচূর্ণে ভূষিত। তার মুখমণ্ডল অভ্র এবং চন্দনে সজ্জিত। এরা চুল বাঁধে খোপা ক'রে এবং তাতে লাগিয়ে দেয় ফুলের মালা। শঙ্কু-আকৃতির খোপায় একটি স্বচ্ছ ওড়না আটকিয়ে এরা ঘোমটার মত ক'রে মুখমণ্ডল আবৃত ক'রে নেয়। স্বপ্নাবিষ্টের মত এক ভাবহীন মুখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে এরা নৃত্য পরিবেশন করে।

বিভিন্ন ধরণের তালবাদ্য, বাঁশি, ঝাঁঝ, শঙ্খ এবং পেনা (এক ধরনের আঞ্চলিক তারযন্ত্র) রাসনৃত্যের সঙ্গত করে।

ব্রজের রাসলীলা আঙ্গিকগত দিক থেকে কিন্তু খুবই উন্নত। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজের বিখ্যাত কবি মহাত্মা ধ্রুবদাসজী মহারাজ কৃষ্ণের জীবন নিয়ে বিয়াল্লিশটি লীলা রচনা করেন। 'রাস' শব্দের উৎস এবং অর্থ নিয়ে মতান্তর র'য়েছে। সংস্কৃতে রাস মানে সুগন্ধ উপভোগ এবং এক পরম সুখাবস্থা। 'রসানাং

সমূহ রাস', অর্থাৎ রাস মানেই রসসমুদ্র। রাস দর্শনে ও শ্রবণে রাসদর্শক কিংবা শ্রোতা তাই পরম সুখ লাভ ক'রে থাকে। রাজস্থানে আবার রাস মানে পাঁচটি চরিত্র সম্বলিত একাঙ্ক। জৈন সাহিত্যে এই জাতীয় রাসকের অনেক নিদর্শন আছে। কখনো কখনো রাসোকেও রাস বলা হ'য়েছে। রাসো হ'ল কোনো রাজার শৌর্য-বীর্যপূর্ণ কাহিনী নিয়ে লেখা কাব্য বা বীরগাথা। কবি চাঁদ বরদাই রচিত পৃথ্বিরাজ রাসো এমনি এক বীরগাথা। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল "বীসলদেব রাসোতে বার বার কাব্য অর্থে রসায়ন শব্দের প্রয়োগ করা হ'য়েছে অতএই আমাদের মতে এই রসায়ন শব্দ থেকে রাসোর উৎপত্তি।" আবার হয়ত রস শব্দের আধিক্যবশতঃ বীরলীলা সংক্রান্ত গ্রন্থকে রাসো বলা হ'তে থাকে—হয়তো বা এর মধ্যে অভিনয়েরও সমাবেশ হ'য়েছিল। যাইহোক, ব্রজবুলিতে আবার রাসো বলতে বোঝায় কলহবিবাদ বা দ্বন্দ্ব। তবে এ দ্বন্দ্ব আমাদের পরিচিত লৌকিক দ্বন্দ্ব নয়—এ দ্বন্দ্ব দেহ এবং দেহাতীতের অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং গোপীর। অনেকে মনে করেন গোপীগনসহ কৃষ্ণের বৃত্তাকারে নৃত্যকেই রাস বলা হয়। পণ্ডিত মানকড় মনে করেন রাসের উৎপত্তি 'রস' থেকে নয়, 'রাস' থেকেই। এই রাস হলো নৃত্যরত ব্যক্তিদের উচ্ছল চিৎকার যা এখনো গ্রামীণ আদিবাসীনৃত্যে শ্রুত হয়। সংস্কৃত রহস শব্দের সঙ্গেও অনেকে রাসকে মিলিয়েছেন। রহসের অর্থ নিভৃত আলাপ বা গোপন অভিসার। রাধাকৃষ্ণের মিলন এমনি এক গোপন এবং দুর্লভ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা—আর খুব অল্প মানুষের ভাগ্যেই তা জুটে থাকে। আবার ডঃ দশরথ ওঝা মনে করেন প্রাচীন-কালে এক বিশেষ নাট্যপ্রকারেরই নাম দিল রাস। তবে সাধারণ ভাবে রাস বলতে বোঝায় গোপী এবং রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমনৃত্য—যার প্রতীকী অর্থ হ'লো ভক্ত ও ভগবানের মিলন। সে যাইহোক, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে রাসকের স্বীকৃতি থাকায় এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা 'নারদ পঞ্চরাত্র'-এ গোপিনী-সহ কৃষ্ণের নৃত্যের উল্লেখ থেকে খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলা যায় যে ভরত-কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নের বহু পূর্ব থেকেই ভারতে রাস প্রচলিত ছিল। কবি হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যানুশাসনে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে "রাসক হ'লো গেয় রূপক"। এইসব কারণেই হয়তো ম্যাকডোনাল মনে করেন ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি কৃষ্ণভক্তির প্রসারে। যাইহোক, এইসব বাদবিতণ্ডায় অবতীর্ণ না হ'য়েও বলা যায় যে রাসক বা রাস নৃত্য-গীত-অভিনয়ের ত্রিবেণী সঙ্গমে উপজাত এক অনবদ্য রসরূপ।

যমুনায় গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলিও রাস—এমনতর লোকমতেরও প্রচলন আছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার দশম সর্গে মহারাসের উল্লেখ করা হ'য়েছে। মহারাসে কৃষ্ণ নিজেকে গোপীদের সম সংখ্যায় বিভক্ত ক'রে তাদের সঙ্গে নৃত্য করেন।

আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে রাসলীলা মূলতঃ ভক্তিরসাশ্রিত। নারায়ণ ভট্ট, ঘমণ্ডদেব এবং হিতহরিবংশ—এই তিন ভক্ত-সন্তই আজকের রাসলীলার প্রতিষ্ঠাতা। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই লোকআঙ্গিকটির পরিমার্জন-পরিশোধন ক'রে অতি মনোহর এক গীত-নৃত্যবহুল আঙ্গিকের রূপ দিয়েছেন এঁরা। রাসলীলার দুটি ভাগ—একটি রাস বা নৃত্য অন্যটি লীলা বা নাটক। ধর্মশাস্ত্র সমূহে 'রাস' ব্রহ্ম-স্বরূপ এক রহস্যময় স্তরে উপনীত হয়েছে। আর 'লীলা' যদিও দার্শনিক অর্থের দাবীদার তবুও তা মূলতঃ এক ক্রিয়া বিশেষ। ভগবান রাসরূপ বিরাজিত। রসের তিনি আনন্দস্বরূপ। আর 'লীলা' রসসৃষ্টির উপায়। লীলাতেই ভগবানের প্রেমস্বরূপের অভিব্যক্তি। প্রচলিত অর্থে রাসলীলা কৃষ্ণচরিত্রের অভিনয়াত্মক বিবিধ ভাবলীলার দ্যোতক। রাসলীলার অভিনয় বর্তমানে তিন ঘণ্টায় শেষ হয়। এর এক তৃতীয়াংশ রাস বা রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের নৃত্য এবং দুই তৃতীয়াংশ হ'লো লীলা বা নাট্যাভিনয়। এই অংশে দলনেতা বা স্বামী কৃষ্ণ জীবনের একটি অংশ গীতাকারে বর্ণনা করেন এবং দলের অন্যরা কখনো গান গেয়ে কখনো বা গদ্য সংলাপের সাহায্যে সেই কাহিনীকে দৃশ্যাত্মক ক'রে তোলে।

কৃষ্ণের সমগ্র জীবন নিয়ে অনেক রাসলীলা লেখা হ'য়েছে। এর মধ্যে 'দানলীলা', 'নৌকাবিহার' এবং 'উদ্ধব-বৃত্তান্ত' সবচেয়ে জনপ্রিয়। দানলীলায় কৃষ্ণ গোপীদের বিরক্ত করেন, উত্তেজিত করেন দুধ ও মাখন খাওয়ার জন্যে। নৌকাবিহারে দেখা যায় গোপীরা যমুনা পার হ'তে চায় সন্ধ্যা বেলায়। ঘাটে নৌকাও আছে—কিন্তু কোনো মাঝিকে তারা দেখতে পায় না। সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হ'য়ে আসে—এমনি সময়ে এক মাঝি আসে, সে গোপীদের যমুনা পার করাতে রাজি হয়। কিন্তু তার নৌকার অবস্থা ভালো নয়—তাতে আবার সাঁঝবেলা, ফলে অধিক ভারে তার নৌকা ডুবে যেতে পারে। ফলে নদী পার করার শর্ত হিসেবে সে গোপীদের ওজন নিজের হাতেই যাচাই ক'রে নিতে চায়। গোপীরা এই শর্তে রাজি হয়। তখন মাঝি তাদের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথক ভাবে কোমরে ধ'রে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে তাদের ওজন বোঝার চেষ্টা করে। এই সময় গোপীদের বুঝতে আর বাকি থাকে না যে এই মাঝিই তাদের রাধাবল্লভ-কৃষ্ণ। উদ্ধব-বৃত্তান্তে কৃষ্ণ তাঁর বাল্য-বন্ধু উদ্ধবকে গোকুলে পাঠান—সেখানকার গোপীদের কাছে পার্থিব প্রেমের অসারতা সম্পর্কে সজাগ করতে। উদ্ধব সেই মত গোকুলে পৌঁছে গোপীদের নিয়ে সাধারণ ঠাট্টা তামাশার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারেন যশোদার রাগ ও অন্যান্য গোপীদের পার্থিব প্রেম সত্যিকার এক অপার্থিব প্রেমের তাৎপর্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। উদ্ধবের এই সত্যোপলব্ধিই লীলার মুখ্য বিষয়।

রাসলীলা মুখ্যত মন্দির-নাট্য। ফলে ভক্ত দর্শকের প্রাণবন্ত অভিনন্দন ও

প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সম্পন্ন হয় এর অভিনয়। তামাশা, নৌটঙ্কী এবং ভাওয়াই মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ ফলে আমোদ-উপকরণে পরিপূর্ণ। ফলে সমাজের সব-শ্রেণীর মানুষ এই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকে। কিন্তু বৃন্দাবনের গোঁড়া কৃষ্ণভক্তরা কখনো মন্দির প্রাঙ্গনে ছাড়া রাসের অভিনয় করেন না।

অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী এমনকি দর্শকরাও রাসলীলা চলাকালে কখনোই রাধাকৃষ্ণের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াতে বা বসতে পারে না। নৃত্য পরিবেশনের পর গোপীরাও অবশ্যই রাধাকৃষ্ণের দিকে ফিরে দাঁড়াবে।

রাসমঞ্চ দুটি স্তরে বিভক্ত। একটি স্তর সিংহাসন—যা কিনা কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্য স্তরটি সিংহাসনের নীচেকার সাধারণ অভিনয় ক্ষেত্র। সিংহাসনের পেছনে পিছাই বা পিছওয়াই বা পেছনের পর্দাতে আঁকা থাকে একটি পদ্মফুল এবং একটি হাঁসের ছবি। সঙ্গীত-শিল্পীরা দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে অভিনয় ক্ষেত্রের ধার বরাবর অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে আসন নেয়। ভক্ত দর্শকবৃন্দ পায়ের জুতো বাইরে খুলে রেখে জাপড়ে ব'সে লীলা দর্শন করে। জুতো যাতে চুরি না হয় বা হারিয়ে না যায় তার জন্যে একজন লোক এগুলি পাহারা দেয়। আসর চলাকালীন দর্শকরা ধূমপান বা অন্য কোনো খাবার খেতে পারে না। কেননা রাসদর্শকের দৃঢ় বিশ্বাস ধূমপান করলে বা অন্য কোনো খাবার খেলে মুখ অশুদ্ধ (অর্থাৎ এঁটো) হ'য়ে যায়। আর অশুদ্ধ মুখে লীলাভিনয়ের স্বাদ সম্যকরূপে পাওয়া যায় না।

রাসলীলায় সাধারণত চারটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র চারটি হ'ল ঝাঁঝ, করতাল, হারমোনিয়াম এবং সারেঙ্গী। স্বামী বা দলের প্রধান বা সূত্রধার সব যন্ত্র ব্যবহারেই পারদর্শী। স্বামীই সঙ্গীতদলের প্রধান এবং লীলাভিনয়ের সূত্রধার। অন্যান্য সঙ্গীতশিল্পীদের বলা হয় সমাজী। সমাজীরা স্বামীর ধরা গানের শেষ অংশটা গেয়ে দেয় অধিকাংশ সময়ে, ধুয়ো টানে এবং প্রয়োজনে লীলাভিনয়ে অংশও নেয়।

স্বামী সংস্কৃত ভাষা, স্তোত্রপাঠ, শাস্ত্রীয় ও লোকসঙ্গীত, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতি-রেওয়াজ এবং কৃষ্ণ সাহিত্যে খুবই পারদর্শী এক জ্ঞানী পুরোহিত। কোনো গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি অনর্গল প্রাসঙ্গিক শাস্ত্র-উক্তি দিয়ে দিয়ে রাসলীলাকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে উপস্থিত করেন দর্শক সমক্ষে। লীলার চূড়ান্ত আবেগঘন মুহূর্তে দর্শক যখন ভাববিভোর হ'য়ে পড়ে তখন স্বামীর এই বচন ও উপস্থাপনভঙ্গীর চমৎকারীত্ব তাদের উপহার ও সম্মানিক দিতে উৎসাহিত করে। এরকম সময় স্বামী পরিবেশিত লীলা আরো দীর্ঘায়িত ক'রে তোলেন। প্রবল স্মৃতিশক্তি ও আনুষ্ঠানিকতার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশতঃ স্বামী লীলার বুননে ও পরিবেশনে কোনোরূপ শৈথিল্য ঘটতে দেন না।

অভিনয় :

আরম্ভেই দু'জন নেপথ্যকর্মী বা অনেক সময় সমাজী নিজে সিল্কের এমব্রয়ডারী করা পর্দা নিয়ে আস্তে আস্তে এসে মঞ্চে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে নিতেই দেখা যায় সিংহাসনে বসে আছেন রাধাকৃষ্ণ আর তাঁদের তিনদিক ঘিরে সুদৃশ্যভাবে দাঁড়িয়ে আছে গোপীবৃন্দ। সাজানো এই দৃশ্যকে রাসলীলার ভাষায় বলা হয় ঝাঁকি। ঝাঁকি দৃষ্টিগোচর হ'তেই স্বামী ব'লে ওঠেন—"কিষানজীকী জয়'— সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত দর্শকমণ্ডলীও ব'লে ওঠে "কিষানজীকী জয়"। এবারে স্বামী এগিয়ে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের পায়ে নতমস্তকে প্রণাম জানান এবং কৃষ্ণরজ নিজের মুখে চোখে মেখে পেছন ফিরে এসে নিজের আসন গ্রহণ করেন। এবারে সংস্কৃতে ও ব্রজবুলিতে তিনি প্রথমে গুরুর ও পরে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে বন্দনা গান। বন্দনার পর প্রথমে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্তোত্র পাঠ করেন ও পরে যুগল-মূর্তির স্তুতিগান করেন। স্বামীর পর সমাজীরাও একে একে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গানের মাধ্যমে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। এতক্ষণ যাবৎ কৃষ্ণ রাধার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে সিংহাসনে বসে থাকেন।

বন্দনাগীতির পর হয় আরতি। আরতির সময় পেতলের একখানি থালার ওপর ময়দার প্রদীপ ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে দ্রুতবেগে রাধাকৃষ্ণের সামনে সেটি ঘোরাতে ঘোরাতে গোপীরা গান গায়। আরতির পর পেতলের থালাখানি পাঠিয়ে দেয়া হয় দর্শকমণ্ডলীর কাছে। রাধাকৃষ্ণের আশীর্বাদ-স্বরূপ প্রদীপের তাপ হাতে নিয়ে তা কপালে ঠেকিয়ে আশীর্বাদধন্য ভক্ত-দর্শক সেই থালায় সামর্থ্য মত পয়সা দেয় ভক্তি-অর্ঘ্য হিসেবে। আরতির পর একজন হাতজোড় ক'রে কৃষ্ণের সামনে গিয়ে নিবেদন করেন—"হে প্রিয়া-প্রীতম্‌জী! এখন তোমাদের পবিত্র রাসের সময়। অনুগ্রহ ক'রে নৃত্যাঙ্গনে অবতরণ করো'।

গোপীর এই আমন্ত্রণ পেয়ে কৃষ্ণ রাধাকে অনুরোধ করেন আস্থানে আসার জন্যে। রাধা তখন কৃষ্ণের হাত ধ'রে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং হাত ছেড়ে দিয়ে বলেন—"রাস ও মিলনের জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব। গোপীদের সঙ্গে নিয়ে আমরা এখন কুঞ্জে যাবো।"

এই ঘোষণার পর রাধা কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে ধ'রে একই সঙ্গে আস্থানে এসে দাঁড়ান। কৃষ্ণ তখন রাধার দক্ষিণ পাশে ত্রিভঙ্গ মুরারী হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই সময় ছয়জন গোপী প্রথমে এঁদের ঘিরে দাঁড়ায় এবং পরে ধীরে ধীরে গান গেয়ে গেয়ে বৃত্তাকারে রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে ধীরে ধীরে নাচতে থাকে। গান থেমে গেলে গোপীদের নৃত্য দ্রুতান্বিত হ'তে থাকে। এই সময় স্বামী বেশ উচ্চস্বরে নাচের বোল বলে চলেন—তাধিন্ তাধিন্ তত্ তত্ থৈ থৈ। গোপীরা এই বোলের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে নেচে চলে। এই সময় তাদের

পারিধেয়ের নিম্নভাগ বেশ ছড়িয়ে যায়। রাধা ও কৃষ্ণ প্রথমে পৃথকভাবে ও পরে একত্রে নাচতে থাকেন। আবেগঘন মুহূর্তে কৃষ্ণ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে থাকেন। পরমেশ্বরের এই নিবিড় আনন্দ দর্শনে পাগল ভক্ত-দর্শকবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে করতে উচ্চস্বরে ধ্বনি দিতে থাকে—"রাধেশ্যাম কী জয়"। রাসভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যারা এই পবিত্র ধ্বনিতে যোগ না দেবে তারা পরজন্মে বোবা হ'য়ে জন্মাবে এবং নৃত্যের তালেতালে হাততালি না দিলে পরজন্মে নুলো বা ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে জন্মাবে।

কথকের তিনটি বিশেষ অভিব্যক্তি চক্কর, টোরা ও তিহাই। আর কথকের প্রচলন যেহেতু খুব বেশিদিনের নয় তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কথকের প্রারম্ভিক কিছু আঙ্গিকে রাসের বৈচিত্র্যময় নৃত্যের বেশ প্রভাব পড়েছে। কথকের পরণ ও পরামুলে তো রাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব (খুবই) স্পষ্ট। কথককার নাচের প্রারম্ভে বাঁহাত লম্বভাবে মাথার ওপর রেখে এবং ডান হাত কাঁধের সমান্তরালে প্রসারিত ক'রে কনুই থেকে ভেঙে নীচের দিকে ফেলে রাখে। এই সময়ে তার উভয় হস্তই বিশেষ মুদ্রায় অলঙ্কৃত থাকে। রাসেও কৃষ্ণকে এই একই ভঙ্গীতে অনেক সময়েই দেখা যায়।

যাইহোক, যুগল নৃত্য শেষ ক'রে রাধা এবং কৃষ্ণ আবার তাঁদের সিংহাসনে গিয়ে বসেন। আরম্ভের সেই পটী বা পর্দাখানি আবার তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়। শেষ হয় রাস অনুষ্ঠান।

স্বামীজী এরপর ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন—রাধে.. রাধে গোবিন্দ, গোবিন্দ রাধে। সমাজী এবং দর্শকমণ্ডলীও এই গানে যোগ দেয়। শ্মশ্রুগুম্ফ-ময় কোনো সাধুভক্ত কিংবা দাড়িগোঁফ কামানো কোনো পুরোহিত উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করতে করতে পেতলের ঘন্টা বাঁধা ধাতব চিম্‌টা মহোৎসাহে বাজাতে বাজাতে আসরে এসে উপস্থিত হন। তাঁর মন্ত্রোচ্চারণের চমৎকারিত্বে দর্শক-সাধারণ একেবারে মোহিত হ'য়ে যায় এবং সমবেত ভাবে হাততালি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করে। দর্শকের এই সোল্লাস করতলধ্বনিতে সম্বিত হারিয়ে ভক্ত তখন মরিয়া হ'য়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে—ফলে অচিরেই তার ভর হয়। দর্শকেরা এতে ক'রে সম্মোহিত হ'য়ে পড়ে এবং উঠে দাঁড়ায় ও গান ধরে। গানের তালে তালে সকলে একসঙ্গে হাত তুলে হাতে তালি দিতে থাকে। রাসদর্শকের বিশ্বাস এমনি ক'রে ভক্ত ও ভগবানের মিলন সংঘটিত হয়।

সমবেত দর্শক ও অভিনেতার এই আত্মবিভোর মুহূর্তে দু'জন লোক ৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রশস্ত একখানি পর্দা তুলে ধরে। পর্দার আড়ালে ইত্যবসরে সাজিয়ে নেয়া হয় নতুন দৃশ্য—রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। ধীরে ধীরে সেই যুগল-মূর্তি দর্শকের গোচরীভূত হয়। স্বামী তখন আবার ধ্বনি তোলেন—

রাধে-এ-এ···। আর সঙ্গেসঙ্গে পরমাত্মার মিলন আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল ভক্ত দর্শক-মণ্ডলী সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি স্বরূপে সোল্লাসে সমবেতভাবে ব'লে ওঠে স্বা-আ···ম্। এই সময় অভিনয় আসর ভক্ত ও ভগবানের মিলনস্পর্শে সত্যিকারের এক মন্দিরের চেহারা নেয়। রাসলীলার প্রথানুসারে স্বামীর তত্ত্বাবধানে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে বেড়ে ওঠা গোঁফের রেখা দেখা না দেয়া ভক্তচিত্ত বালক দুটিকে—যারা রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছে—তখন ধূপ-ধুনা দিয়ে পূজা করা হয়, দর্শকমণ্ডলীর তরফ থেকে লীলা দর্শনের প্রণামীও দেওয়া হয়।

এর পর বাদ্যযন্ত্রীদের কাছাকাছি পড়ে থাকা পর্দাখানিকে আবার মধ্য মঞ্চে নিয়ে আসা হয় এবং দু'জন মঞ্চকর্মী বা দর্শক তা উঁচু ক'রে তুলে ধরে এবং তারই আড়ালে ক'রে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের নেপথ্যে বা সাজঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সাজঘরে ভক্তেরা রাধাকৃষ্ণের আহারের জন্য ফল, দুধ ও মিষ্টান্ন এনে দেয়। রাধা ও কৃষ্ণ কেবলমাত্র তার অগ্রভাগ গ্রহণ করেন। এই সময় রাধাকৃষ্ণের চরিত্রাভিনেতারা রাস-দর্শকের কাছে সাক্ষাৎ ভগবান-স্বরূপ। তাই স্বামীও তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান এবং তাঁদের উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ভক্ত দর্শক রাধাকৃষ্ণের এই প্রসাদপ্রাপ্তিতে পরম আনন্দ অনুভব করে। এই ফাঁকে গোপীরাও সামান্য আহার ক'রে রাসের কষ্টজনিত ক্ষুধা নিবারণ করে। শেষ হয় রাস অনুষ্ঠান। আড়াই ঘণ্টার রাসলীলায় এই রাস-এ প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা মত সময় কেটে যায়।

সামান্য বিশ্রামের পর শুরু হয় লীলানুষ্ঠান।

লীলা ঃ ঘটনা বৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখতে গেলে কৃষ্ণ জীবনের কোনো তুলনাই হয় না। বৈচিত্র্যময় অজস্র ঘটনার সমন্বয় হ'লো কৃষ্ণ-জীবন। তার প্রায় প্রতিটি ঘটনা নিয়েই লেখা হ'য়েছে লীলা। লীলার তাই কোনো সংখ্যা-পরি-সংখ্যান নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। তবে রসবৈচিত্র্যে এসবের মধ্যে অনুপম হ'লো উদ্ধবলীলা (বা কাহিনী)। এই লীলাখানিতে জীবনবোধের গভীরতা, প্রেম, তার বিভিন্ন অবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট শৃঙ্গার ও করুণ রসের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। উদ্ধবকে যখন গোপীরা তাদের বিরহ বেদনার কথা জানায়, কিংবা যশোদা জানায় কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত মধুর অতীতের কথা তখন প্রেমিক ও মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতায় দর্শক একেবারে অস্থির হ'য়ে ওঠে।

স্বামী তখন অষ্টছাপের কবি কুম্ভনদাসের কাব্যগীতি পরিবেশন করেন। এই গানের প্রতিটি কথায় এবং সুরে গোপীনীদের বিরহ বেদনা একেবারেই মর্মান্তিক বাস্তব হ'য়ে উঠে। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা সসখী শ্রীরাধিকা ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণকে। সম্বিৎ হারিয়ে-যমুনা নদীর কাছেই জিজ্ঞেস করছে তাদের প্রাণ-বল্লভের খবর। মাঝেমধ্যে গোপীদের মধ্যে থেকে কেউ আবার রাধাকে সান্ত্বনা

দেয়ার চেষ্টা করছে—চেষ্টা করছে নিজে শান্ত হ'তে। তখন তাদের সেই আন্তর ব্যাকুলতা চোখের জল হ'য়ে ঝরে পড়ে। তারা গান গায়—গানের বিষয় নিম্নরূপ

কাল বলে কালা গেল মধুপুরে
সে কালের আর কত দেরী। সখীরে···এ,
সখীরে······সখীরে······।

কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসে তাদের। স্বামী অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর স্বললিত কণ্ঠে এই বিরহ ব্যাথা একেবারে বাস্তব ক'রে তোলেন।

পরবর্তী দৃশ্য মথুরার রাজপ্রসাদের। কৃষ্ণ এই দৃশ্যে ব্রজে অতিবাহিত তাঁর বাল্য ও কৈশোরের মধুরতম সব ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন এবং ব্রজ বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হ'য়ে পড়েন। বন্ধু-বান্ধব এসব নিয়ে ঠাট্টা তামাশা ক'রলেও কৃষ্ণের অনুরোধে তাঁরই দূত হিসেবে গোকুলে যান উদ্ধবরূপী স্বামীজী।

উদ্ধবের সমস্ত সংলাপই গেয়। তাই স্বয়ং স্বামীই এই চরিত্রে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণ যখন একাকী তার ব্রজবিয়োগ-ব্যথায় কাতরতা প্রকাশ করতে থাকেন স্বামী তখন সাজঘরে গিয়ে উদ্ধবের সাজে সজ্জিত হ'য়ে মঞ্চে আসেন। উজ্জ্বল হলুদ রঙের উর্দ্ধবাস এবং কমলা রঙের ধুতি এবং এমব্রয়ডারী করা শাল গায়ে দিয়ে উদ্ধববেশী স্বামী কৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনে লিপ্ত হন। কৃষ্ণ ও উদ্ধবের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়—তা অবশ্যই গদ্য। তবে উচ্চারণ ভঙ্গীতে অবশ্যই একটা বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক শব্দকে তার ক্ষুদ্রতম শব্দাংশে ভেঙে ভেঙে টেনে টেনে উচ্চারণ করা হয়। দুই বন্ধুর আন্তর-সংলাপে একাশ পায় ভারতীয় জীবনবোধের গভীরতা। আর শ্রোতার মনে জাগে—'ব্যক্তিক না নৈব্যক্তিকই শ্রেষ্ট'? 'মূর্ত না বিমূর্ত কোন্ রূপে উপাস্য আমাদের আরাধ্য দেবতা?'—প্রভৃতি প্রশ্ন।

কৃষ্ণ উদ্ধবকে দিয়ে যে সংবাদ প্রেরণ করেন তার মধ্যে মুখ্য যশোদা ও রাধার প্রতি তাঁর তাৎক্ষনিক মনোস্থিতি। এই মনোস্থিতি প্রকাশ পায় ব্যাথাতুর গানে। দুই লাইন করে গান গেয়ে গদ্যে তার ব্যাখ্যাও করে দেন। অশ্রু-প্লাবিত বেদনাকাতর মুখে বালক অভিনেতা যখন—তোমার চক্ষের আড়াল হয়েছি বলে তোমার হৃদয়ে পাতা আমার আসনখানি তুলে নিওনা রাধা—গানটি গেয়ে ওঠেন তখন দর্শকের সঙ্গে বন্ধু উদ্ধবও অশ্রুবিগলিত হয়ে পড়ে। সমগ্র আসর তখন কৃষ্ণের বিয়োগ-ব্যথায় যন্ত্রনাকাতর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে যেন।

উদ্ধব এই সংবাদ বহন ক'রে গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কৃষ্ণ অভিনয়স্থল ত্যাগ করার পর উদ্ধব কয়েকবার অভিনয় ক্ষেত্রটি পাক দিয়ে ঘুরে নেয়। এবারে সে যে গোকুলে পৌছালো একথা বুঝতে রাসের দর্শকদের কোনো কষ্টই হয়না। গোকুলে পৌছে উদ্ধব প্রথমে যায় যশোদার কাছে। পুত্রস্নেহে কাতরা যশোদা

অভিনয় ক্ষেত্রের এক কোণে বালক কৃষ্ণের জন্যে অপেক্ষমান। তাঁর ধারনা কৃষ্ণ বুঝি যমুনাতীরে গেছে খেলাচ্ছলে এবং এখুনি ফিরে আসবে। কৃষ্ণ বিহনে আত্মহারা এ হেন কাতর অবস্থায় যশোদাকে দেখে উদ্ধব বিস্মিত হয়—শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম জানায়। উদ্ধব তবুও যশোদার এই বিয়োগ ব্যথার সত্যতা যাচায়ের জন্য আপন আরাধ্য দেব ব্রহ্মার গুণকীর্তন ক'রে যশোদাকে ব্রহ্মার ভজনা করতে অনুরোধ করে। কেননা তিনি সর্ব-জীবে এবং সর্ব-ভূতে অস্তিত্ব-মান। কিন্তু যশোদা কিছুতেই বালক কৃষ্ণের স্মৃতি ভুলতে পারেন না। উদ্ধব বুঝতে পারে কৃষ্ণ ছাড়া যশোদার মনের শান্তি একেবারেই সম্ভব নয়।

যশোদার কৃষ্ণ-প্রাণতায় বিস্মিত উদ্ধব এবার সসখী রাধিকার কুঞ্জে যায়। সেখানে গিয়ে সে কৃষ্ণের বিয়োগ ব্যথায় ব্যাকুল গোপীদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে লৌকিক প্রেম বড়ই নশ্বর এবং দেহাতীত প্রেমই অবিনশ্বর। ফলে পার্থিব রূপের মোহ ত্যাগ ক'রে তাঁর দেহাতীত পরমরূপের ধ্যানে নিমগ্ন থাকাটাই পরম শান্তির। ফলে তাঁর শারীর উপস্থিতি পরিত্যাগ করতে পারাই মঙ্গলের। কিন্তু শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীরা উদ্ধবের এই দেহাতীত ব্রহ্মজ্ঞানে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাদের অকাঙ্খেয় কৃষ্ণকে ফিরে আসার জন্যে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানায়। গোপীদের আন্তরিক প্রার্থনা থেকে উদ্ধব এই সত্য স্বীকার করে যে শারীর-প্রেমই মহত্তর। ফলে কৃষ্ণসখা উদ্ধব তখন কৃষ্ণকে যত তাড়ি সম্ভব গোকুলে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মথুরায় ফিরে আসে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য উদ্ধবের যাতায়াত সম্পন্ন করতে যে মঞ্চ পরিক্রমনের সাহায্য নেয়া হয়—তার সঙ্গে সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের মঞ্চ পরিক্রমণের সাদৃশ্য খুবই নিকটের। যাইহোক, মথুরায় ফিরে উদ্ধব কৃষ্ণকে বিয়োগ ব্যথায় আতুর গোকুলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে এবং এর জন্য দায়ী করে কৃষ্ণকে। লীলাখানির শেষাংশ সত্যিই খুব মর্মস্পর্শী। বিভিন্ন সময়ের ব্রজের সন্ত কবিদের আকর্ষণীয় ও মর্মস্পর্শী সব কাব্যাংশের উদ্ধৃতি সহযোগে স্বামী এই লীলাখানি পরিবেশন করেন। লীলাখানিতে তাই সুরদাস, নন্দদাস এবং উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র রচিত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গীতির সমাবেশ ঘটেছে।

রাসলীলার সম্পদ এর গীতি-মাধুর্য এবং সাহিত্য-সুষমা। পরিবেশন রীতিতে ঝাঁকির নাট্যিক আবেদন বেশি। আগেই বলা হ'য়েছে ঝাঁকি হলো তুলে ধরা পর্দার আড়ালে পরবর্তী দৃশ্য—তার পরিণতির আভাস সহ সাজিয়ে নেয়া। ধীরে ধীরে একপাশে পর্দাখানি সরিয়ে নিতেই এই দৃশ্যখানি দর্শকের গোচরীভূত হয়। এই সব ঝাঁকি বা স্থিরচিত্র অভিনেতাদের যেমন একটু বিশ্রাম নিতে সাহায্য করে, তেমনি এক একটি দৃশ্যের চূড়ান্ত অবস্থা ফুটিয়ে তোলে। তাছাড়া নাচ, গান ও অভিনয়ের একঘেয়েমি দূর ক'রে দর্শকদের ভাবনা চিন্তাকে একমুখিন ক'রে তোলে এবং পরিবেশনে যুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা।

রাসলীলা সম্পূর্ণভাবেই ভক্তিরসাশ্রিত। রাসলীলা দর্শনে দর্শকের অবদমিত ভাবাবেগের মোক্ষণ ঘটে, ফলে দর্শক ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে ব্রহ্ম-স্বাদে সফল হয়। ঝাঁকি, তালবাদ্য, সমবেত জয়ধ্বনি এবং সুললিত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ ভক্তের হৃদয়ে পরম এক ভাবের উদ্ভব ও বিকাশে সাহায্য করে। রাসলীলা পরিবেশনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী যন্ত্র হলো করতাল।

কৃষ্ণের চরিত্রাভিনেতাকে অবশ্যই খুব ভালো গায়ক হতে হয়। তার অভিনয় একেবারেই নাট্যধর্মী। আগেই বলা হয়েছে, প্রচলিত রীতির বিপরীতে কৃষ্ণের বাচনভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য খুবই স্পষ্ট। তাঁর সংলাপের প্রতিটি শব্দাংশ খুবই টেনে টেনে একটা সুরেলা ভঙ্গীতে উচ্চারিত হয়। বারানসীতে রামলীলা প্রচলনের অনেক আগেথেকেই কৃষ্ণজীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বলিত কৃষ্ণলীলার অভিনয় হতো। আজকের বারানসীর রামলীলার সংলাপ উচ্চারণেও এই বিশেষ রীতির স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আনুষ্ঠানিক দিক থেকে রাসলীলা রামলীলার মতই পবিত্রতায় উজ্জল এবং উভয়ই নৈর্ব্যক্তিক। অবশ্য রামেরজীবন কৃষ্ণজীবন অপেক্ষা অনেক বেশী নাটকীয়—ঘটনা গত দিক থেকে তাই রামলীলা রাসলীলা অপেক্ষা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। রাসলীলার আকর্ষণ তার সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্যে। রামলীলার অভিনয় চলে কয়েক রাত্রি ধরে আর রাসলীলার অভিনয়-কাল বড় জোর তিনঘণ্টা। উপস্থাপনগত দিক থেকে রামলীলার অভিনয় হয় প্রাকৃতিক (বা কম্পোজিট) মঞ্চে যার রাসলীলার অভিনয় হয় সাধারণতঃ মন্দিরে, তবে ভক্তজনের বাড়িতেও যে হয়না—এমন নয়।

চোদ্দ বছরের কম বয়সী ছেলেরাই হয় রাসলীলার রাধা, কৃষ্ণ এবং গোপী। গোঁফের রেখা দেখা দিলে কিংবা কণ্ঠস্বর পুরুষালী হয়ে উঠলে ছেলেরা স্বরূপ সাজার যোগ্যতা হারায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে ১১ থেকে ১৩ বছরের মধ্যেকার ছেলেরাই কৃষ্ণচরিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত। কেননা কৃষ্ণচরিত্রের জন্যে অপেক্ষিত শারীরিক দক্ষতা, মানসিক পরিণতি ও আচরণগত বিধিনিষেধের প্রতি নিষ্ঠা কেবলমাত্র এই বয়ঃসীমাতেই সম্ভব। গোপী চরিত্রের জন্যে নির্ধারিত হয় ছয় থেকে ১০ বছরের মধ্যেকার ছেলেরা। রঙিন ধুতি পরে এবং উজ্জল মুখসজ্জা করে নেচে গেয়ে এবং প্রয়োজনীয় রঙ্গ-তামাশা করে তারা আসর একেবারে মাতিয়ে রাখে

কৃষ্ণের পরনে থাকে সাধারণত লেবু রঙের ধুতি—সোনালী পাড়ের রঙিন বক্ষাবরণী, কোমরবন্ধ, গণ্ডদেশে অভ্রের আলপনা, তার থুথনিতে আঁকা হয় লাল রঙের ফুল, আর নাকের ওপর মুক্তাবিন্দুর প্রতিভাস। তাঁর মাথায় থাকে ময়ূরের পেখম লাগানো মুকুট। স্বামী বল্লভাচার্যের অনুগামীরা ময়ূরের পেখমটি ডানদিকে হেলিয়ে পরেন। আর শ্রীভট্টের অনুগামীরা পরেন বামদিকে হেলিয়ে। কেবলমাত্র শির-মুকুট পরার ঢঙেই নয়—এই দুই রাসলীলা সম্পর্কে এদের ব্যাখ্যাও একে

অপরের বিপরীত। যাইহোক, মোহন-মুরলীটি কিন্তু সকল সময়ের জন্যেই কৃষ্ণের হাতে ধরা থাকে। আর একটি বড় ঘেরের ঘাঘরা, হার, ফুলের মালা, মুক্তো বসানো নথ এবং পাড়ওয়ালা তারার নক্সা খচিত ওড়নী রাধার ব্যবহার্য। তাঁর গাল এবং থুথনিতে আঁকা হয় সাদা ও হলুদ রঙের বৃত্তাকার আলপনা।

কৃষ্ণের অন্য এক সখা মনসুখের পোষাক হ'লো ধুতি, বেনিয়ান এবং চাদর। মনসুখের মুখ সাদা প্রলেপনে সজ্জিত ক'রে নেয়া হয়। এই সজ্জায় মনসুখ চরিত্রের দুরন্তপনা, বোকামি ও সর্বক্ষণের জন্যে উদ্বিগ্নতা খুব সহজেই ফুটে ওঠে। সমাজীরা পরে ধুতি এবং হাতা লম্বা বেনিয়ান আর মাথায় বাঁধে পাগড়ী।

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণ ও গোপীর চরিত্র রূপদানকারীদের মন্দিরে এনে রাখা হয়—ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে। সমাজী ও অন্যান্য যন্ত্রীরাও এই সময় থেকে ব্রহ্মচর্য এবং উপবাস পালন করেন।

রাসভক্তদের একদল কৃষ্ণভক্ত, আরেকটি দল রাধাভক্ত। কৃষ্ণভক্তদের বলা হয় তুর্রা এবং রাধাভক্তদের কলগী। তুর্রা ধারায় পরমাত্মা পুরুষ, তাই এই ধারার আরাধ্যদেব কৃষ্ণ এবং কলগী ধারার মতে পরমাত্মা নারী-রূপী—তাই তারা রাধার উপাসক।

সাধারণতঃ রাসলীলার একটি দলে ১৫ জন ভক্ত থাকে। এর মধ্যে যন্ত্রী ৫ জন, মনসুখ, কৃষ্ণ, রাধা, স্বামী এবং গোপী ৬ জন। প্রত্যেক শিল্পীকেই স্বামী পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন। কৃষ্ণের পারিশ্রমিক সবচেয়ে বেশি—মাসে একশো টাকা, রাধা ও মনসুখের ৮০ টাকা আর গোপীদের পারিশ্রমিক মাসে ৪০ টাকা। যন্ত্রীদের মধ্যে তালবাদকরা পায় মাসে ষাট টাকা এবং সারেঙ্গীবাদক পায় ৮০ টাকা। স্পষ্টই বোঝাযায় অর্থ নয়—কৃষ্ণভক্তিই রাসলীলার একটি দল গড়ে ওঠার প্রধান শর্ত। যাইহোক, দলের অন্যান্য সব খরচই কিন্তু স্বামীর।

আজ ব্রজে প্রায় একশোটি পেশাদার রাসলীলার দল আছে। যাতায়াতের খরচ খরচা বাদে পাঁচশ টাকা পেলেই একটি দল বায়না ধ'রে নেয়। আজকের অনেক পেশাদার দল নিজেদের পসার বাড়ানোর জন্যে জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত ও ফিল্মী গীতির সুর ব্যবহার করছে। তবে অধিকাংশ দলই পুরানো ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখায় যত্নবান আছে। ঐতিহ্যের সংরক্ষণে সবচেয়ে তৎপর বোধহয় হরবিন্দ গোস্বামীর দলটি।

আমেদাবাদ, দিল্লী এবং উত্তর-প্রদেশের অন্যান্য বড় বড় শহরের শিল্পপতি এবং সম্পন্ন গৃহস্থরা ধর্মীয় উৎসবে প্রথা অনুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠের পর রাসলীলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। তাছাড়া বিঘ্ননাশক এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও গৃহস্থ তাঁর বাড়িতে রাসলীলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

রাসলীলায় নাটকীয়তা খুবই কম, ফলে অভিনেতার সুযোগ এই আঙ্গিকে প্রায় নেই বললেই চলে। কৃষ্ণের কথাই ধরাযাক, কৃষ্ণ ভালো অভিনয় করুক

আর মন্দই করুক—সকলের কাছে সে কৃষ্ণজ্ঞানেই পূজিত। পালারম্ভের আগে থেকেই তাই সে কৃষ্ণের অনুরূপ পূজা পায়। কৃষ্ণের (অভিনেতার) অভিনয় জীবন বড়জোর চার বছরের। তাছাড়া তার অভিনয় প্রশিক্ষণের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। নাচ ও গানের পরিবেশনে যে সকল সময়ই নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া হয়—তা কিন্তু নয়।

এসব সত্ত্বেও স্বামীর পাণ্ডিত্য ও পরিবেশন নৈপুণ্য, কৃষ্ণের প্রতি দর্শকের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা, সঙ্গীত এবং লীলার সাহিত্যগুণ রাসলীলাকে এখনও জনপ্রিয় ক'রে রেখেছে।

নৌটঙ্কী :

পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের মতে রীতিকালেই ঐহিক শৃঙ্গারের উদ্দাম প্রবৃত্তি রাজদরবার থেকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য রস হিসেবে শৃঙ্গার লোক-মঞ্চে নতুন কিছু নয়। সুদূর অতীতে বিস্তৃত তার শেকড়। ভাণ, স্বাঙ্গ প্রভৃতি রূপে শৃঙ্গার লোকমঞ্চে দীর্ঘদিন থেকেই পোষিত হ'য়ে আসছিল। ভক্তিকালে বিভিন্ন সব ধর্মীয় মতাবলম্বীদের প্রভাববশতঃ লোকমঞ্চের উপকরণ সমূহে যদিও এক ধর্মীয় আবরণ থাকতো তথাপি এর মধ্যে শৃঙ্গারের এমনি এক ধারা প্রবহমান ছিল, যা রাজদরবারের শান্তি ও বিলাসিতার সুযোগ, সুবিধে ও প্রশ্রয় পেয়ে তীব্র এক গতি লাভ করে। এই যুগেই নৌটঙ্কী, স্বাঙ্গ বা নকল ও ভগতে শৃঙ্গার এক চূড়ান্তরূপ লাভ করে, যা বলা যেতে পারে প্রায় অপরিবর্তিতরূপে এখনো টিকে আছে। যাইহোক, পণ্ডিত জয়শঙ্কর প্রসাদের মতে 'নৌটঙ্কী' প্রাচীন 'নাটকী' শব্দেরই অপভ্রংশ। নৌটঙ্কীতে বিশুদ্ধ মানবলীলার প্রাধান্য, আর নাটকীতে প্রাচীন রাস-কাব্য বা গীতি-নাট্যরই স্মৃতিরেশ বিশেষ। রাজশেখরের কর্পূর-মঞ্জরী অনুসারে 'সট্টক' ও 'নাটকী' সমলক্ষণাক্রান্ত, অবশ্য বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে। সুতরাং সট্টক ও নৌটঙ্কীর মতই একপ্রকারের লৌকিক নাটক। ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মনে করেন লোক-মনোরঞ্জনের মাধ্যম হওয়ার জন্যেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকাররা এদের নাট্যশাস্ত্রেও স্থান দিয়েছেন। মূলতঃ শব্দগুলি মনোরঞ্জনেরই দ্যোতক। এসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নৌটঙ্কী কোনো আধুনিক নাট্যমাধ্যম নয়, সুদূর অতীতেও এর প্রচলন ছিল। 'তারিখ এ আদবে উর্দু' নামক গ্রন্থে রামবাবু সাকসেনা লিখেছেন উর্দু কবিতা ও লোকগীতি থেকেই নৌটঙ্কীর উদ্ভব। এই বক্তব্যের সমর্থনে কালিকাপ্রসাদ দীক্ষিত 'কুসুমাকর' মনে করেন—"প্রথমে নৌটঙ্কী ছিল হীর রাঞ্ঝার কাহিনী। বর্তমানেও পঞ্জাবে এই কাহিনীর দারুণ এক সমাদর আছে। অতএব নৌটঙ্কীর আবির্ভাব একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দীর দিকেই। মল্লরাওত ও রঙ্গা মূলতঃ এর প্রতিষ্ঠাতা। তবে রঙ্গার গুরুত্বই অধিক। মূলতঃ তিনিই নৌটঙ্কীর প্রবর্তক। নৌটঙ্কীর অভিনয়ানুষ্ঠানে রঙ্গা-চরিত্রের প্রাধান্য তাই এর প্রবর্তকের প্রতি

কৃতজ্ঞতারই সূচক। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খুসরোর প্রচেষ্টায় নৌটঙ্কীর প্রসার ঘটে। এই সময় সমাজের উঁচু স্তরের মানুষও নৌটঙ্কীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে নৌটঙ্কীর শব্দে ও ছন্দে স্পষ্টরূপে খুসরোর প্রভাব বাড়তে থাকে। এই সময়েই নৌটঙ্কী এক অতি সুঠামো রূপ লাভ করে। আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে নৌটঙ্কী উত্তরভারতের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন সব স্থানীয় লোক-নাট্যের সঙ্গে নৌটঙ্কীর রীতি ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটে, ফলে পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের এই নাট্যরীতিতে বিকৃতি আসে অতি স্বাভাবিক ভাবে।

ভাষাতাত্ত্বিকদের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতি "কর্ণপাত" না ক'রে পঞ্জাবের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের) এই লোকনাট্যের নামকরণের কারণ সম্পর্কে ভিন্ন সব লোককাহিনী প্রচলিত আছে, যেমন—অনেকে মনে করেন পেশাদারী নাট্যদলগুলিকে প্রদর্শনের আগে দক্ষিণাবাবদ নয়টি ক'রে টাকা দিতে হ'ত—সেই থেকেই এর নাম হয়েছে নৌটঙ্কী। আবার অনেকে মনে করেন—এই নাট্যানুষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল নয়টি বাদ্যযন্ত্রের টঙ্কার। আবার ডঃ পদ্মসিংহ শর্মা "কমলেশ" বলেছেন—"নবযুবক ফুলসিংহ ও মুলতানের রাজকুমারী নৌটঙ্কীর প্রেমকাহিনী আশ্রয় ক'রেই নৌটঙ্কীর উদ্ভব হয়েছে। এই কাহিনীতে ফুলসিংহ কর্তৃক নারীর বেশ ধারণের সুন্দর একটি প্রসঙ্গ আছে। নৌটঙ্কীর প্রাথমিক রূপের সঙ্গে তার মিল উল্লেখযোগ্য। যাইহোক, মত মতান্তরের ঘূর্ণাবর্তে পাক না খেয়ে—"মধ্যযুগে ভাটেদের বৃত্তান্তমূলক এবং নাটকীয় ঢঙের গীতি থেকেই নৌটঙ্কী জন্মলাভ করেছে" —বলবন্ত গার্গীর এই বক্তব্য মেনে নিয়ে নৌটঙ্কীর এক সাধারণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

নৌটঙ্কী জনপ্রিয়তর ভারতীয় লোকনাট্য—আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম। পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের বেশ কিছু এলাকায় এই গীতি-নাট্য সাধারণ মানুষের নাট্য-পিপাসা চরিতার্থ ক'রে আসছে সেই মধ্যযুগ থেকেই। নৌটঙ্কীর কাহিনী লৌকিক এবং সাধারণতঃ কোনো ঐতিহাসিক যোদ্ধা, দয়ালু ডাকাত অথবা কোনো প্রিয় প্রেমগাথা নিয়েই গড়ে ওঠে। নৌটঙ্কীর কয়েকটি বিখ্যাত কাহিনী হলো—অমরসিং রাঠৌর, বীর সুলতানসিং, রূপবসন্ত, রাজা হরিশ্চন্দ্র, সিয়াহী পোশ এবং মারু ঢোলা। এর সংলাপ ও গীতি লেখা হয় প্রাদেশিক ভাষাতেই আর গানের সুর মুখ্যতঃ লোক-গীতি নির্ভর। তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব যে তাতে একেবারে নেই এমনটি বলা যাবে না। গ্রামের দিকে এখনো কিশোররাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে। অভিনেতা অভিনয়ের ফাঁকে দর্শকের সম্মুখেই মঞ্চের ওপর বসে পড়ে এবং হুঁকো টানে ও পান খায়। আবার তার দৃশ্য এলে অভিনয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। কখনো স্বয়ং অমরসিং রাঠৌরই দৃশ্যের মাঝে সময় বুঝে হুঁকোয় দুটো টান দিয়ে নেয় এবং সেই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই তার

বীরত্বপূর্ণ সংলাপ বলতে থাকে। দর্শক এই সব অনাটকীয় ব্যাপারে আদৌ ক্ষুব্ধ হয় না বা বিরক্ত হয় না। নাট্যানুষ্ঠানের শৃংখলারও কোনো বিপর্যয় আসেনা এতে ক'রে। প্রথমদিকে চারিদিকে দর্শক বেষ্টিত হয়ে খোলা চত্বরেই নৌটঙ্কীর অভিনয় হতো। পরবর্তীকালে খোলা আকাশেরই নীচে কাঠের তৈরী উন্মুক্ত মঞ্চে নৌটঙ্কীর অভিনয় হতে থাকে। গ্রামের দিকে এখনো স্বয়ং অভিনেতারাই চৌকি জুড়ে জুড়ে মঞ্চ তৈরী ক'রে নেয় এবং দর্শকেরা এর তিনদিক ঘিরে ব'সে পড়ে। অন্যান্য লোকমঞ্চের মত নৌটঙ্কী-মঞ্চের সম্মুখেও কোনো পর্দা থাকেনা। তবে পেছন দিকে একটি রঙিন রেশমের পর্দা টাঙিয়ে তার আড়ালেই কাজ চালানোর মত একটি সাজঘর তৈরী ক'রে নেয়া হয়। নাকাড়া ও সারেঙ্গী নৌটঙ্কীর প্রধান বাদ্যযন্ত্র। যাচ ও খ্যালে ঢোলের যে স্থান, নৌটঙ্কীতে নাকাড়ারও সেই একই স্থান। যন্ত্রীরা বসে মঞ্চের এক কোণে। নাকাড়া-বাদক নাটক শুরুর অনেক আগে থেকেই নাকাড়ায় তার কেরামতি দেখাতে থাকে। পরে পেটিমাষ্টার (সূত্রধার বা রঙ্গা) গান ধরে আর পাঁয়তারা কষতে থাকে সারেঙ্গীওয়ালা। জমে ওঠে আসর। শুরু হয় অনুষ্ঠান।

দলের গুরুকে বলে রঙ্গা। সেই একাধারে নির্মাতা, মঞ্চপরিচালক এবং সূত্রধার। পালার সমস্ত সুরই বাঁধতে হয় তাকে, তাছাড়া মহড়া পরিচালনা করতে হয়, এমনকি অভিনয় চলাকালেও অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থানের ইঙ্গিত দিতে হয়। এসব ছাড়াও অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে গান গেয়ে তার ব্যাখ্যা ক'রে এবং কাহিনীর সূত্র জুড়ে দিয়ে নাটকীয় কার্যের সংহতি ও একাত্মর সাধন করতে হয়। ফলে নৌটঙ্কীয় একটি অনুষ্ঠানে নাট্যের সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞ এই রঙ্গার ভূমিকা যে কত কষ্টসাধ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্টই বোঝা যায়। নৌটঙ্কীতে গীত, পদ্যসংলাপ, টুকরো টুকরো উপকাহিনী এবং নৃত্য—সবই থাকে।

প্রত্যেক নৌটঙ্কীতেই একজন বা দু'জন মখৌলিয়া থাকে। সে বা তারা তথাকথিত সম্মানীয় ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কষাঘাতে জর্জরিত করে এবং হাসি তামাশার মধ্য দিয়ে দর্শক সাধারণকে মাতিয়ে রাখে। যাই হোক, নৌটঙ্কীতে যদিও নাটকীয় কার্য কবিতা ও গানের সাহায্যেই বিকশিত হয় তবুও মখৌলিয়া কিন্তু চলতি গদ্যেই কথা বলে এবং গ্রামের বা সেই এলাকার সরকারী ও বেসরকারী সম্মানীয় সব ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ক'রে সেই এলাকার অন্যায়-অত্যাচার দূর করার চেষ্টা করে।

আজও নৌটঙ্কীর কোনো দল যখন নৌটঙ্কী প্রদর্শনার্থে কোনো গ্রামে যায় তখন গ্রামবাসীরাই উদ্যোগ নিয়ে কোনো ধর্মশালা বা বারোয়ারি বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেয়। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে। দলটি তখন হ'য়ে ওঠে সমগ্র গ্রামেরই অতিথি। ক্ষমতা অনুসারে প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাঁদা তুলে দলটিকে দেয়া হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর গ্রামের কোনো উপযুক্ত স্থানে

নাটক শুরু হয় এবং সারারাত ধ'রে তার অভিনয় চলে। মাঝে মধ্যে কারো নাচ বা অভিনয়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে কোনো দর্শক পুরস্কার-স্বরূপ তাকে কিছু টাকা বা অন্য কোনো উপহার দিলে রঙ্গা দৃশ্যের মাঝেই তা ঘোষণা করে এবং দাতার কর্ম ও পেশার প্রশংসা করে। পুরস্কার-লব্ধ এই টাকা রাখা হয় সারেঙ্গীর পেটে। তারপর পুরস্কার দেবার এক হিড়িক লেগে যায় এবং অচিরেই ভ'রে ওঠে সারেঙ্গীর পেট।

নৌটঙ্কীওয়ালারা—পঞ্জাবী এবং রাজস্থানীতে যাদের রাসধারী বলে—উত্তর-প্রদেশের অনেক বড় বড় শহরে প্রায়ই নাট্য প্রদর্শন ক'রে বেড়ায়। কখনো কখনো তাদের এক একটি দলে প্রায় ত্রিশ জন লোক থাকে। চলচ্চিত্রের অনুকরণে নৌটঙ্কীতে এখন ক্লারিওনেট ব্যবহার করা হ'চ্ছে। যাইহোক, এইসব দল একই শহরের বিভিন্ন অংশে প্রায় মাসাধিক কাল ধ'রে অভিনয় দেখিয়ে বেড়ায়। অবশ্য এরা বিভিন্ন গ্রামে এবং মেলায়ও যায়। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে নৌটঙ্কীতে মেয়েরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় ক'রছে। ১৯৫৯ সালে বেশ্যাবৃত্তিকে আইন ক'রে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকেই পল্লির বিলাসিনীরা নৌটঙ্কীর রঙ্গময়ী হ'য়ে উঠতে থাকে। অবশ্য সাধারণ ঘরের মেয়েরাও আজকাল নৌটঙ্কীর দলে এসে ভীড় জমাচ্ছে। বর্তমানে কোনো কোনো নৌটঙ্কী অভিনেত্রী মাসে প্রায় ২০ হাজারেরও অধিক টাকা আয় ক'রে থাকে। কানপুরে একটি মহিলা নৌটঙ্কীর দলও প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই দলটির অসাধারণ জন-প্রিয়তায় মেয়েরা নৌটঙ্কীর দিকে একটু বেশি মাত্রায় আকর্ষিত হ'চ্ছে।

ব্রজের দিকে সামিয়ানা টাঙানো সুউচ্চ রঙ্গমঞ্চে নৌটঙ্কীয় ঢঙে ভগত প্রদর্শিত হয়। ভগত মূলতঃ নৌটঙ্কীর আরেকটি নাম। ডঃ সত্যব্রতের মতে ব্রজদেশে দুই ধরনের ভগত দেখা যায়—এক আগ্রা থেকে আগত ভগত, দুই—হাথরস থেকে আগত ভগত। হাথরসের ভগত অথবা নৌটঙ্কীর প্রবর্তক নথারাম। নথারামের ভগতের (চৌবোলের) বইও আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। এই চৌবোলগুলির তান বেশ ছোটো। অন্যদিকে আগ্রার ভগতের চৌবোলের তান বেশ দীর্ঘ। আগ্রার নৌটঙ্কীতে 'বাহারে তবীল (দীর্ঘ উর্দু ছন্দ) আছে ব'লেই এর চৌবোলের তান অত দীর্ঘ হ'তে পারে।

ভগতে বিবিধ প্রকারের লীলাও প্রদর্শিত হয়। ভগতের অলঙ্কার ও বেশ-ভূষা খুবই চমকপ্রদ। ভগত-শিল্পীদের বেশ বদলের বা ধারণের নৈপুণ্যও অসাধারণ। কোথাও কোথাও প্রায় সপ্তাহব্যাপী ভগতের অনুষ্ঠান হয় একই মঞ্চে। নৌটঙ্কীতে প্রযুক্ত বীররসের উৎকর্ষ আনার জন্য 'আলহা' ছন্দের প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। ভগত তাই আলহা ছন্দ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। ভগতে মোরধ্বজ, হরিশচন্দ্র প্রভৃতি ধর্মীয় কাহিনী যেমন আছে—তেমনি আছে জান আলম, ভক্ত পূরণমল, সিয়াহীপোশ প্রভৃতি শৃঙ্গারধর্মী কাহিনীও। ভগতে

প্রযুক্ত শৃঙ্গাররসকে হৃদয়গ্রাহীরূপে আকর্ষনীয় ক'রে তোলার ব্যাপারে 'বাহ্‌রে তবীল' বেশ কার্যকরী একটি ছন্দ। কিন্তু কোনো কোনো নৌটঙ্কীতে যুদ্ধাদির বর্ণনায়ও এই ছন্দের প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। হাথরসের ভগতদলগুলি এখন রাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেছে। দুটি লোকনাট্য-আঙ্গিক যেখানে ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরের কাছে এসেছে সেখানেই নতুন এক নাট্য-আঙ্গিকের জন্ম হ'য়েছে। রাস ও নৌটঙ্কীর মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার ফলেই উদ্ভব হ'য়েছে ভগত—এমন ধারণাও আছে অনেকের। আবার কেউ কেউ ব'লে থাকেন ভগত থেকেই নৌটঙ্কীর উৎপত্তি।

উল্লেখিত নথারাম নাথা নামেই পরিচিত। নাথার রামায়ণ নৌটঙ্কীরই সংগোত্রীয়। নাথা প্রায় ২০ খানি নৌটঙ্কী লিখেছেন। অন্যান্য নৌটঙ্কী-কারদের মধ্যে ফারুকাবাদের তিরমোহন, কানপুরের শ্রীকৃষ্ণ, রাধ্যেশ্যাম কথা-বাচক তথা লম্বরদারী বিখ্যাত।

আজকাল বিভিন্ন জায়গায় নৌটঙ্কীর চর্চাকেন্দ্র খোলা হ'চ্ছে। কিন্তু এদের কারো কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই—নিজস্বতা নেই। সমস্ত নৌটঙ্কীদলেরই প্রায় একই অবস্থা। উর্দু থেকে অবশ্য নতুন কিছু কাহিনী নৌটঙ্কীতে এসেছে, যেমন—শীরী ফরহাদ, সুলতানা ডাকু, লয়লা মজনু, ইন্দরসভা প্রভৃতি। শৃঙ্গার রসাত্মক জনপ্রিয় কাহিনীগুলির মধ্যে নীলাকণ্ঠ, প্রেমকুমারী, জওয়ানী কা নশা, আঁখ কা জাদু, ত্রিয়া-চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৌটঙ্কী ওয়ালারা অবশ্য নাথার শাহজাদী উর্ফ আওয়ারী আউরতকেই সেরা নৌটঙ্কী ব'লে মনে ক'রে থাকে।

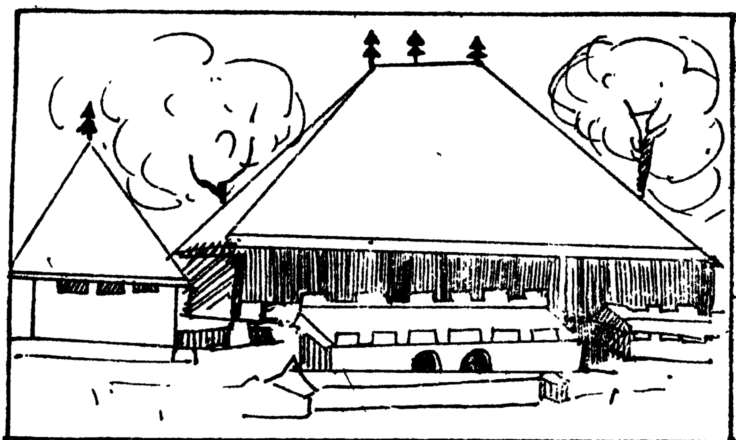
পঞ্জাবের শিখধর্ম যেমন হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতিগত মিলনের পরিচায়ক, তেমনি নৌটঙ্কী এবং তার সঙ্গীত ও অন্যান্য উপকরণও এই দুই সংস্কৃতির আন্তরিক মিলনে গড়ে উঠেছে ব'লে অনেকে মনে ক'রে থাকেন। আজকের নৌটঙ্কীতেও আমীর খুসরোর ভাষার সুস্পষ্ট প্রভাব একথা নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করে যে নৌটঙ্কীতে ইসলাম ধর্মের প্রশ্রয় মিলেছিল।

উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে নৌটঙ্কীর হাথরস, মুজাফ্‌ফরনগর, সাহারাণপুর, কানপুর এবং কনৌজ এই পাচটি ঘরাণায় প্রচলন আছে। এরমধ্যে হাথরস ও কানপুর ঘরাণা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত। হাথরস ঘরাণায় নাটকীয়তা অপেক্ষা রাগসঙ্গীতেরই প্রাধান্য। এর প্রবর্তক ইন্দরমন ও তাঁর শিষ্য নথারাম। অন্যদিকে কানপুর ঘরনায় নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য। এর প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ পাহালওয়ান।

কাহিনী, অভিনয়রীতি, দর্শক প্রদর্শকের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির কারণে নৌটঙ্কী ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্য আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম। যাই হোক, প্রসেনীয়াম থিয়েটার স্বভাবে বাস্তবধর্মী, আর বাস্তবধর্মী রীতিতে রচিত ও পরিবেশিত আধুনিক ভারতীয় নাট্যে গতি-ধর্মী নাটক প্রায়

নেই বললেই চলে। অথচ বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী ক'রে উপস্থিত করার জন্য গীতি-ধর্মী নাটক অনেক বেশী সাফল্য লাভ করতে পারে। মুখ্যতঃ এ কথা মনে রেখেই এই শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকে অনেক নাট্যকার ও নির্দেশক নৌটঙ্কা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আর বলাই বাহুল্য যে, শান্তা গান্ধী, হাবীব তনবীর, বংশী কাউল, গিরিরাজ, অনিল চৌধুরী, রামনারায়ণ অগ্রওয়াল এবং মুদ্রারাক্ষস সে পরীক্ষায় প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেছেন।

কেরলের লোকনাট্য



কুটিয়াট্টম :

কেরলের নাট্য কুটিয়াট্টম ভারতের প্রাচীনতম নাট্য-আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া কুটিয়াট্টম ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যরীতিরই একমাত্র স্মৃতিরেশ বিশেষ।

মন্দিরের সেবক চাকইয়ার এবং নাম্বিয়ার সম্প্রদায়ের লোকেরা এর প্রদর্শন ক'রে থাকে।

কুটিয়াট্টম প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো। কালের নিয়মে অনেক সংস্কার-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে খুব স্পষ্ট ক'রে বলা সম্ভব নয় যে আজকের এই সমৃদ্ধ নাট্যশৈলী তার প্রাথমিক পর্যায়ে কি অবস্থায় ছিল। তবে কুটিয়াট্টমেরই সমধর্মী এক নাট্যরূপ কুতু সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে—তামিল গ্রন্থ 'চিলপতিকরমে' কুতুর উল্লেখ আছে। আর ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, রাজা কুলশেখর বর্মন কুটিয়াট্টমের অনেক সংস্কার করেছিলেন। বর্তমানে কুটিয়াট্টমের যে রূপ আমরা দেখি—তা কুলশেখরের সময় থেকেই চলে আসছে। কুলশেখর আঙ্গিক ও বিষয়গত দিক থেকে কুটিয়াট্টমের এমন এক রূপ

দান করেন যা উঁচু-নীচু সমাজের সবশ্রেণীর মানুষকেই আকর্ষণ করতে সক্ষম। আর এই কারণেই গত হাজার বছর ধরে কুটিয়াট্টম আরব সাগরের তীরবর্তী এই এলাকার সকলশ্রেণীর মানুষের মনোরঞ্জন ক'রে আসতে পেরেছে।

কুটিয়াট্টমের শব্দগত অর্থ হলো দলগত অভিনয়। অন্যদিকে কুতু হ'লো—একক অভিনয়াত্মক। তাছাড়া সেই প্রাচীন কাল থেকেই কুটিয়াট্টমে মহিলা চরিত্রের রূপায়ণে মহিলারাই অংশ নিয়ে থাকে। মন্দির অভ্যন্তরের নৃত্য-নাট্য-শালা বা কুত্তমবলম-এ কুটিয়াট্টমের অভিনয় হয়। কুত্তমবলম সাধারণতঃ আয়তাকার। তবে ডিম্বাকৃতির কুত্তমবলমেরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুত্তমবলম বা কুটিয়াট্টমের রঙ্গমণ্ডপ গঠনগত দিক থেকে নাট্যশাস্ত্রের বিকৃষ্ট নাট্যশালার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুধু গঠনগত দিক থেকেই নয়—প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসন নির্দিষ্টকরণেও নাট্যশাস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মন্দিরের সেবক চাকইয়ার সম্প্রদায়ের লোকেরা বংশ পরম্পরায় এই নাট্যের চর্চা ক'রে আসছে। এরা সকলেই সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং আমাদের পুরাণাদিতে সবিশেষ পারদর্শী এবং কাহিনী পরিবেশনের কৌশলে খুবই নিপুণ। মন্দির অভ্যন্তরে কুত্তমবলমের অবস্থান এমনি যে, কেন্দ্রীয় দেবালয়ের দিকে মুখ ফিরেই অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয়। অভিনয় আরম্ভের আগে কলাগাছ, নারিকেলের ফুল বা মুছি তথা পাতা দিয়ে কুত্তম-বলমটিকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নেয়া হয়। মঞ্চসজ্জার ব্যবহার কুটিয়াট্টমে প্রায় নেই বললেই চলে। আর আলোর যোগান দেয় পেতলের বিশাল একটি প্রদীপ। অভিনয় ক্ষেত্রের সম্মুখভাগে রাখা এই প্রদীপটি দ্বিমুখী। অভিনয় চলাকালে এর একটি মুখ থাকে অভিনেতাদের দিকে, অন্যমুখটি থাকে দর্শকদের দিকে।

বাদ্যযন্ত্রীরা বসে অভিনয় ক্ষেত্রের পেছনের দিকে দুই দরজার মধ্যে। বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে প্রধান হলো দুটি মিজাভু। কলসী-আকৃতির তাম্রপাত্রের মুখে চামড়া বেঁধে তৈরী হয় এই মিজাভু। মিজাভু বাজায় নাম্বিয়ার সম্প্রদায়ের লোকেরা। মঞ্জীরা জাতীয় কুজিথাল বাজায় নাম্বিয়ার সম্প্রদায়ের মহিলা। সে শুধু যে মঞ্জীরা বাজায় তাই নয়—অভিনয়ের প্রয়োজনে গানও গায়। আর সরু কাঠি দিয়ে বাজানো হয় ইড়াক্কা। ইকাম্পা এবং কুরুণকুজল বলে দুটি বায়ুযন্ত্রও আছে। এই বায়ুযন্ত্রীরা দাঁড়ায় মিজাভুর ঠিক পেছনে। কখনো কখনো শঙ্খেরও প্রয়োগ হয়ে থাকে। কুটিয়াট্টমের পরিভাষায় প্রাগুক্ত যন্ত্রসমূহকে বলা হয় পঞ্চবাদ্য। প্রদীপ জ্বালিয়ে কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের পরই শুরু হয় অনুষ্ঠান নাম্বিয়ারের মিজাভুর বাজনা এবং আবাহন সঙ্গীতের সাহায্যে। গণপতি, সরস্বতী এবং কখনো কখনো শিবের স্তুতি ক'রেই গাওয়া হয় এই সঙ্গীত। এই আবাহন সঙ্গীতকে বলা হয় 'গোত্তি'।

কুটিয়াট্টমে রূপসজ্জা এমনভাবে করা হয়, যাতে ক'রে চরিত্রাভিনেতার আসল চেহারা একেবারেই বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। অর্থাৎ অঙ্গরাগ অঙ্গসজ্জা অভিনেয় চরিত্রের একেবারে অনুরূপ হ'য়ে ওঠে। মুখসজ্জায় জোর দেয়া হয় চোখ, ঠোঁট ইত্যাদির ওপর—যাতে ক'রে সে খুব সহজেই সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য হ'য়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে কান, চুল ইত্যাদি আবার ঢেকে দেয়া হয়—তার আসল রূপ দূর করার জন্য। কুটিয়াট্টমের সঙ্গীত যেমন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি আকর্ষণীয় এবং লোকগ্রাহ্য।

কুটিয়াট্টমে অভিনীত নাটকগুলি সবই প্রায় সংস্কৃত নাটক। একটি নাটকের একটি অংককে সম্পূর্ণ নাটকের আকারে বিস্তৃত রূপ দিয়ে অভিনয় করা হয় এই আঙ্গিকে। দীর্ঘ দিন ধ'রে প্রচলিত এক অভিনয়ের ঢঙে সেই ঘটনাকে সম্ভাব্য-রূপে বড় করে অভিনীত করার মধ্যেই এর সার্থকতা নিহিত। বাস্তবধর্মী রীতি এখানে একেবারেই অচল। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কল্পনাশীল অথচ সৃষ্টিধর্মী প্রয়োগের মাধ্যমে খুবই রূঢ় হয়ে পড়েছে এর অভিনয় রীতি। যথেচ্ছ শব্দ-প্রয়োগ বা ব্যবহারের স্বাধীনতা মুখ্যপাত্রের নেই। তবে ঘটনার ব্যাখ্যায়, মুদ্রার ব্যবহারে তার স্বাধীনতায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয় না—বরং এব্যাপারে তার স্বাধীন সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে উৎসাহই যোগানো হয়। মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে মুখাভিব্যক্তি ও অঙ্গসঞ্চালনে সে খুবই পারদর্শী। তবে ঘটনাকে বোধগম্যরূপে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ প্রয়োগের দায়ীত্ব ন্যস্ত বিদূষকের ঘাড়ে। নায়কের বন্ধু হিসেবেই তার মঞ্চাগমন। ফলে নায়ককে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সে যেমন পরামর্শ দেয়—তেমনি প্রয়োজনে তাকে খুবই স্বল্প মাত্রায় মাঝে মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করে। বিদূষক মূলতঃ ভাঁড়। স্থানীয় ভাষায় উল্টোপাল্টা কথা বলে সে তাই দর্শকদের আনন্দ দেয়। কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি চরিত্রে অভিনয় করতে করতে সে প্রায়ই সে চরিত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং দর্শকের সঙ্গে সরাসরি বার্তালাপে নিযুক্ত হয়। তার এই সমস্কার কথাবার্তা যে দর্শকদের আনন্দ দেয়—এ ব্যাপারে কোনো মতদ্বৈধতা নেই। তবে নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করে সে রঙ্গমঞ্চীয় ভ্রম উৎপাদনেও সক্ষম হয়।

কুটিয়াট্টমের একটি অনুষ্ঠানে বিদূষকের ভূমিকা খুবই ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ নায়ক বা অন্য চরিত্রাভিনেতা যে সমস্ত শ্লোক আবৃত্তি করে বিদূষক সরল স্থানীয় ভাষায় তার ব্যাখ্যা ক'রে দেয়। অন্যান্য লোক-আঙ্গিকের বিদূষকের মত কুটিয়াট্টমের বিদূষকও দর্শকের একেবারে নিকটজন। আবার সবশেষে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার ক'রে নিজের গুরুমন্যতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি আদায় করতেও সক্ষম সে। শ্লোক আবৃত্তি করার পর অভিনেতা যখন মুদ্রা ও অন্যান্য উপায়ে তার ব্যাখ্যা দিতে থাকে—বিদূষক তখন শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ

মালায়ালাম পদ্যের প্রয়োগ করে। প্রয়োজনে অনেক সময় তার ব্যাখ্যাও করে। অর্থাৎ বিদূষক তার অকল্পনীয় দক্ষতায় দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতা ক'রে থাকে।

কুটিয়াট্টমের মুখ্য আকর্ষণ কিন্তু ঘটনায় নয়, ঘটনার (প্রায় ঘটনাই দর্শকদের জানা) উপস্থাপন রীতিতে। তবে ঘটনার উপস্থাপন অনেক বেশী পরিমানে মুদ্রা নির্ভর বলে—উপস্থাপন রীতির উৎকর্ষ যাচাই করার জন্য কুটিয়াট্টমের দর্শককে প্রচলিত মুদ্রার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। নায়ক বা অন্য অভিনেতা তার নির্দিষ্ট শ্লোকটি আবৃত্তি ক'রে—আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক, আহার্য্য—এই চতুর্বিধ অভিনয়ের সাহায্যে তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও আকর্ষণীয় ভাবে দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য ক'রে তোলে। কোনো হস্ত বা মঞ্চোপকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে অভিনেতা কেবলমাত্র শারীরিক অভিনয়ের মাধ্যমে স্বর্গীয় বৈভব বা পর্বতের উচ্চতা তার কল্পনার রঙে এমনভাবে স্পষ্ট ক'রে তোলে যে বাস্তবধর্মী রীতিতে তা একেবারেই সম্ভব নয়।

কুটিয়াট্টমে অভিনীত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে ভাসের প্রতিমা নাটক, প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্ন-বাসবদত্তা এবং সবিমারক, হর্ষের নাগনন্দ, শক্তি ভদ্রের আশ্চর্য চূড়ামণি, বোধায়ণের ভাগবদজ্জুকীয় এবং মহেন্দ্র-বিক্রমের মত্ত-বিলাস বিখ্যাত। আগেই বলা হয়েছে সংস্কৃত নাটকের একটি অঙ্ক যেন সম্পুর্ন একটি নাটকের রূপ নেয় এর প্রদর্শনে ব্যাখ্যার অতি-আধিক্য হেতু। সুভদ্রা ধনঞ্জয়মের প্রথম অঙ্ক অভিনয় করতে এগারো দিন লেগে যায়। এই অঙ্কে তিনটি মাত্র চরিত্র—অর্জুন, সুভদ্রা এবং কৌণ্ডিন্য বা বিদূষক।

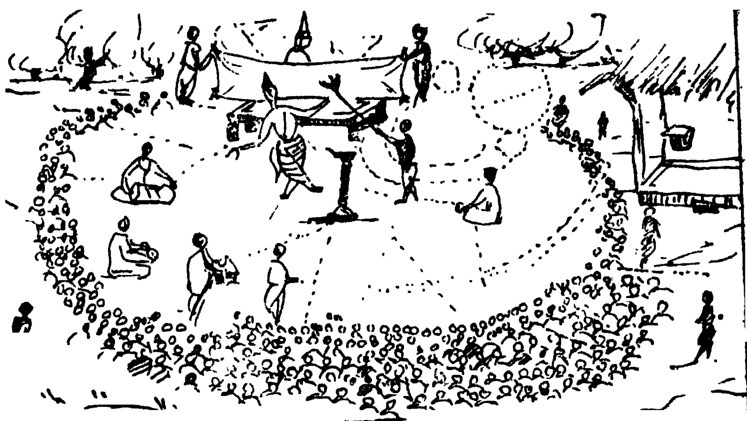
এগারো দিনের জন্য নির্দিষ্ট ক্রমটি নিম্নরূপ :

প্রথমদিন নায়কের মঞ্চাগমন। দ্বিতীয় দিন নায়কের পূর্ব জীবনের বা কাহিনীর বর্ণনা। তৃতীয় দিন নায়কের প্রবেশ থেকে বিদূষকের আগমনের মধ্যকার অংশ। চতুর্থ দিনে কৌণ্ডিন্য বা বিদূষক আসে। তারপর চারদিন সে তার অতীত জীবনের বর্ণনা দেয়। নবম দিনে নায়ক ও বিদূষকের মিলিত অভিনয়। স্পষ্টই বোঝা যায় অষ্টম দিন অবধি মঞ্চে কেবলমাত্র একজন অভিনেতা অভিনয় ক'রে চলে। দশম দিনে অর্জুন ও সুভদ্রার পারস্পরিক অনুরাগ এবং হঠাতই অন্তর্ধান এবং সুভদ্রার অন্তর্ধান-জনিত অর্জুনের বিষাদ দেখানো হয়। একাদশতম দিনে অর্জুন বিলাপ করতে করতে প্রথমে অচেতন হয়ে পড়ে—পরে নিজেকে সামলে নিয়ে সুভদ্রার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

এক এক দিনে একটি দৃশ্যের অভিনয় হয়। অভিনয় চলে প্রায় দু'ঘণ্টা যাবৎ। চতুর্থ থেকে অষ্টম—এই চারদিন মূলতঃ কোনো অভিনয় হয় না। এই চারদিন লাগাতার ভাবে চলে বিদূষকের ভাষণদান—তার অতীত জীবন সম্পর্কে। এই চারদিন কিন্তু দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। কেননা আত্মকথার ফাঁকে

কাকে বিদূষক এই সময় সমকালীন সমাজেরও আলোচনা করে। সমাজের নানাবিধ পতন, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণদের অনাচারই তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই সময় বিদূষক—চতুর্বিধ পুরুষার্থের এক ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে হাস্যাত্মক ভঙ্গিতে। তার মতে পুরুষার্থ হ'লো—ভোজন, বায়ুসেবা, বেশ্যা-বিনোদ এবং ছলনা।

চাকিয়ারদের সতর্কতার কারণে অভিনয়ের এই ক্রম দীর্ঘদিন থেকেই অনুসৃত হ'য়ে আসছে অপরিবর্তিত ভাবে। যদিও মন্দিরনাট্যের আগের সেই মহত্ব আর নেই—তবুও কুটিয়াট্টমের স্বকীয় মহিমা এখনো অটুট।



মুডিয়েট্টু

কেরলের মন্দির নাট্য খুবই সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন। আর মুডিয়েট্টুই বোধ হয় প্রাচীনতম মন্দির-নাট্য। সাধারণতঃ কালীমন্দিরের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হ'লেও মুডিয়েট্টু কিন্তু কেবল মাত্র মন্দির-চত্বরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভক্তজনের মানসিক পূরণার্থে তার বাড়িতে উৎসর্গীকৃত কোনো স্থানেও মুডিয়েট্টুর অভিনয় হ'য়ে থাকে। বাড়ির সংলগ্ন এই পবিত্র স্থানটিকে বলা হয় কুরইশ্বালা।

মুডিয়েট্টুর অভিনয়ের আগে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত এক ধর্মীয় উপাচার সম্পাদিত হ'য়ে থাকে। একে বলাহয় 'কলামেজুত্তু'। এক বিশেষ ধরণের পাতা শুকিয়ে তা গুড়ো ক'রে তৈরী সবুজ, চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী সাদা, ধানের তুঁষ পুড়িয়ে তা গুঁড়ো ক'রে তৈরী কালো, হলুদ গুঁড়ো থেকে তৈরী হলুদ এবং হলুদ ও চালের গুঁড়োর সঙ্গে চুন মিশিয়ে তৈরী লাল রঙ দিয়ে নিয়ম মেনে বড় ক'রে

ভদ্রকালীর একটি মূর্তি সেই পবিত্র স্থানে অর্থাৎ কুরইয়ালায় আঁকা হয়। ভদ্রকালীর চিত্রায়ণে প্রচলিত সব নিয়ম কঠোরভাবে মানা হয়। প্রচলিত এই রীতি পদ্ধতির সংরক্ষক হ'লো 'কুরুপ্পু' সম্প্রদায়। কেবলমাত্র এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই মুডিয়েট্টু পরিবেশন করতে পারে।

প্রথমে কুরইয়ালার মধ্যভাগে পুব-পশ্চিম বরাবর একটি রেখা টানা হয়। রেখাটির পুব মাথায় ভদ্রকালীর মুখের আকৃতিটি চিহ্নিত ক'রে তার ঠিক নীচে আনুপাতিক দূরত্বে স্তুপাকারে ধান ও চাল রেখে ভদ্রকালীর স্তন দুটির অবস্থান নির্দিষ্ট ক'রে নেয়া হয়। ডানদিকের স্তনটি তৈরী হয় ধান দিয়ে আর চাল দিয়ে তৈরী হয় বাম দিকেরটি। ধানের ওপর ছেটানো হয় গুঁড়ো কালো রঙ আর সবুজ রঙের গুঁড়ো ফেলা হয় চালের ওপর। এরপর লাল আবীর দিয়ে উভয় স্তনই রঞ্জিত করা হয়। এরপর ভদ্রকালীর শরীরের অবশিষ্টাংশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আঁকা হয় রঙে ও রেখায়। ভদ্রকালী অষ্টভূজা। তাঁর ডানদিকের চারহাতে থাকে খড়্গ, 'চক্র' কড়থিল (ছোরা) এবং ত্রিশূল আর বামদিকের হাত চারখানিতে থাকে পারীচা (ঢাল), তালকুট্টুম, দারিকেনের ছিন্নমুণ্ড এবং ভট্টক (পেচা)। ভদ্রকালী সবুজবর্ণা। তাই তাঁর মুখ ও শরীরের অন্যান্য অংশে দেয়া হয় সবুজ রঙ। তবে পোষাক ও অলঙ্কার অঙ্কিত হয় ওপরে উল্লেখিত সমস্ত রঙের সুসম বিন্যাসে।

আঁকা শেষ হ'লে তেলের ন'টি জ্বলন্ত প্রদীপ দিয়ে মাকে সাজানো হয়। একটিকে রাখা হয় মাথার ঠিক ওপরে অর্থাৎ পূর্ব দিকে। দু'টি দু'পাশের হাতের মধ্যে একটি ক'রে এবং ছয়টি মূর্তির সঙ্গে সমান্তরালভাবে মূর্তিটির দুপাশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত রেখায় তিনটি ক'রে। কলার পাতায় উৎসর্গীকৃত ধান, নারিকেল, সুপারি, ফুল এবং আগরবাতির নৈবেদ্য সাজিয়ে পার্শ্বপ্রদীপের কাছেই রাখা হয়। এরপর আরম্ভ হয় পূজা—শঙ্খ ও বীকাম বাজিয়ে। একে বলা হয় কলামেপূজা। পূজার পর সম্পাদিত হয় তিরুভূঝীচল। তিরুভূঝীচল হলো একটি দণ্ডের মাথায় রাখা প্রদীপ মায়ের শরীরের ওপরদিয়ে নিয়ে তা দর্শকেদের বেড়ে ঘুরিয়ে আনা—অর্থাৎ দেবীর আশীর্বাদ সকলের নিকট পৌছে দেয়া। এই সময় গাওয়া হয় 'কলামেপাট্টু'। কলামেপাট্টু হ'লো দেবীর আরতিতে তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা দেয়া। কলামেপাটের আবার দু'টি ভাগ। পায়ের দিক থেকে মাথা অবধি অঙ্গের বর্ণনামূলক গানের অংশটি হ'লো 'পদাদিকেশম' আর এর ঠিক বিপরীত পর্যায় হলো কেশাদিপদম্। এর পরের অংশটি হলো তালপোলি। তালপোলিতে মেয়েরা থালায় করে নৈবেদ্য সাজিয়ে ভদ্রকালীর আত্মাকে স্বাগত জানিয়ে প্রবেশ পথে সার বেঁধে দাঁড়ায়। তখন 'তাইধামপাকম্' নামক সঙ্গীত সহযোগে শোভা যাত্রা ক'রে নলবিশিষ্ট ব্রোঞ্জেরপাত্র—জলপাত্র 'কিণ্ডী'তে (কমণ্ডলুতে) ক'রে ভদ্রকালীর আত্মা বয়ে আনা হয়। কিণ্ডীটাকে

রাখা হয় চিত্রিত ভদ্রকালীর ঠিক পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয় কলামেড়ুতু। আসলে কলামেড়ুতুর সাহায্যে ক্ষেত্রটিকে পবিত্র করে নেয়া হয়। এরপর আবাহন করা হয় ভদ্রকালীর, মুডিয়েট্টুর অভিনয়কালে রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকার জন্যে। ভদ্রকালীর সগুণ উপস্থিতিতে মুডিয়েট্টু দেখার জন্য দর্শককে প্রস্তুত রাখার দিক থেকে কলামেড়ুতুর এই বিচিত্র ঘটা খুবই কার্যকরী।

এরপর শুরু হয় কলামেমাঙ্গীকেল—অর্থাৎ ভদ্রকালীর চিত্রটি মুছে ফেলার প্রক্রিয়া। নারিকেলের মুছি অথবা ছোবড়া দিয়ে এই নিখুঁত অথচ বিরাট চিত্রটি মুছে ফেলা হয়। এই মোছারও এক বিশেষ নিয়ম আছে। আর বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা মেনে চলা হয়। প্রথমে মোছা হয় ডান পা, বাঁ-পা মোছা হয় তারপরে। এইভাবে ডান দিক থেকে শুরু ক'রে মুছতে মুছতে ক্রমেই ওপরে ওঠা হয়। মায়ের মুখখানি মোছা হয় কিন্তু হাত দিয়ে। মুডিয়েট্টুতে কালীর সংহার মূর্তিতে দর্শক যাতে মুহূর্তের তরেও একথা বিস্মৃত না হয় যে ভদ্রকালীই বিশ্বজননী—অবোধ সন্তানের প্রতিপালনে তিনি সর্বদাই উদ্‌গ্রীব সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। আর সেই কারণেই তাঁর স্তনদুটিকে অক্ষত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়।

কলামে-মাঙ্গীকেলের পর সুদৃশ একটি দণ্ডের ওপর প্রদীপ জ্বালিয়ে সেটিকে রাখা হয় অভিনয় ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে। মুডিয়েট্টুর অভিনয়ে আলো যোগানোর প্রধান দায়িত্ব এই কেন্দ্র-প্রদীপটির। জ্বলন্ত প্রদীপটিকে তার যথাস্থানে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের শুভারম্ভ ঘোষণার উদ্দেশ্যেই সম্মিলিতভাবে বেজে ওঠে শঙ্খ, চেণ্ডা, বীক্কাম এবং ইলাতালম্। নাটকারম্ভের ঠিক পূর্বেই সম্মিলিত যন্ত্রের এই ঐকতান বাজনাকে বলা হয় কেলিক্কোট্টু।

কেলিক্কোট্টুর ঠিক পরেই কেন্দ্রপ্রদীপটির পেছনে দু'জন লোক একখানি পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে গেলে দর্শক বুঝতে পারে যে নাটক শুরু হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রীরা গেয়ে ওঠে আবাহন-সঙ্গীত। আর সেই সঙ্গীতের তালে তালে পা ফেলে পর্দার দুই পাশ দিয়ে আবির্ভূত হন নারদ ও শিব। সঙ্গীতের তালে তালে তাঁরা একখানা দ্বৈতনৃত্য পরিবেশন করেন। আবাহন সঙ্গীতে বর্ণিত হ'য়ে চলে মঞ্চ-সজ্জা ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদি—জল ছিটিয়ে জায়গাটি পবিত্র করা হ'য়েছে, এক পাত্র ধানও উৎসর্গ করা হ'য়েছে—ইত্যাদিও এই সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত থাকে। মঞ্চসজ্জার বর্ণনা শেষে নাটকের সাফল্য কামনা ক'রে গণপতির বন্দনা করা হয়। এরপর নাট্যঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শুরু করা হয় অভিনয় বা মূল অনুষ্ঠান।

কানে তালা লাগানো সঙ্গীত এবং দৃষ্টিস্থির করা পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে আবির্ভূত হন শিব। পর্দার পেছনে রাখা একখানি টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পর্দার আড়াল থেকে শুধু নিজের মস্তকখানিই তিনি দর্শক সমক্ষে প্রকাশ ক'রে থাকেন। এরপর টুল থেকে নারদকে সঙ্গে নিয়ে পর্দার বাম দিক থেকে মঞ্চাবতরণ করেন এবং কেন্দ্রীয় প্রদীপটি প্রদক্ষিণ ক'রে ডান দিক দিয়ে পর্দার পেছনে চলে যান।

তখন টুলের ওপর দণ্ডায়মান শিবের শরীরের উর্দ্ধাংশ আবার দৃষ্টি গোচর হ'তে থাকে। শিবের গিরিশৃঙ্গ এবং অনুচর নান্দীর প্রতিকৃতি এই পর্দাখানিতে আঁকা থাকে। এই সময়ে নারদ থাকেন পর্দার সম্মুখে। কৌতুক অভিনয়ের সাহায্যে দর্শককে আনন্দ দিতে দিতে তিনি শিবকে লেখা দর্শকের আবেদন-পত্রটি পেশ করার জন্য মঞ্চ পরিক্রমণ করতে থাকেন। শিব সমক্ষে অভিনয় মাধ্যমে দারিকেনের তাবৎ বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দেন তিনি। দারিকেন সৃষ্ট সন্ত্রাসে মর্ত্যবাসী দারুণভাবেই উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত। তাই শিবকে অনুরোধ করেন দারিকেনকে সংহার করাব জন্য। অনুরোধে সাড়া দিয়ে শিব নারদের সঙ্গেই মঞ্চ ত্যাগ করেন।

এবারে পর্দার আড়াল থেকে মঞ্চাবতরণ ঘটে মূর্তিমান বিভীষিকার—স্বয়ং দারিকেনের। সে এবারে প্রলয়-নৃত্য নেচে চলে—মহোল্লাসে। পর্দার পেছন থেকে তার ভয় জাগানো চেহারার আত্ম প্রকাশ ঘটে পরপর তিনবার। তার বীভৎস মুখে আলো ফেলার উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত একটি মশাল উঁচু ক'রে ধরা হ'লে এক ঝটকায় পর্দাখানিকে সরিয়ে নেয়া হয়। মশালচী এবং বাদকেরা ছুটে গিয়ে তার চারপাশে ভিড় করে। দারিকেনকে দেখে ভীতিবিহ্বল তারা দ্রুত ফিরে আসে দর্শকদের মধ্যে। আত্মগোপনের ঐকান্তিক ইচ্ছায়। সমবেত দর্শকমণ্ডলীও তখন ভীত সন্ত্রস্ত। আর দারিকেন তখন মশালচী ও বাদকদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে শেষে দর্শক আসন বেড়ে প্রলয় নাচন নেচে চলে। দারিকেন যে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চলেছে তা প্রত্যক্ষীভূত করার উদ্দেশ্যে এই সময় জ্বলন্ত মশালে নিক্ষেপ করা হয় তেলিপোড়ি বা ধুনো। আর এতে ক'রে মশালের শিখা লকলকিয়ে ওঠে। বিজয়গর্বে দারিকেন এবার রঙ্গস্থলে ফিরে যায় এবং পোষাকের অন্তরাল থেকে দু'খানা ছোরা বের ক'রে মহাক্রোধে দ্বিগুণ বেগে নাচতে শুরু ক'রে দেয়। তারপরে কেন্দ্রপ্রদীপের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। এইরূপে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জন ক'রে সে পুনরায় টুলটির ওপরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং সকলকেই দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে—একে একে চারদিকে ফিরে। যন্ত্রীদের মধ্য থেকে একজন সে হুঙ্কার প্রতিধ্বনিত করে আর বাকিরা তার ধুয়ো টানে—হু-উ-ঈ-ই।

ভদ্রকালী তখন পর্দার পেছন থেকে সে হুঙ্কারের জবাব দেন। কিছুক্ষণ ধরে কালী ও দারিকেনের মধ্যে চলে বাকযুদ্ধ। কোরাস এই সময় কালীর সংলাপের ধুয়োটানে—এই-ই······এই······ই। উভয়েই তখন প্রলয়ঙ্করী নৃত্য নাচতে থাকে—উদ্দাম বাজনার তালে তালে। কালীর হাতে চমৎকায় খড়্গ আর দারিকেনের হাতে ঘোরে ছোরা। এই সময়ে কালী থাকেন পর্দার সম্মুখে। এক সময়ে পর্দাখানিকে হঠাতই সরিয়ে নেয়া হয়। মুখোমুখি হয় পরস্পর বিরোধী দুই শক্তি—একজন বিনষ্টির অপরজন সৃষ্টির; একজন সংহারের—অপরজন

প্রতিপালনের। নাচের তালে তালে এগিয়ে পেছিয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে তারা একে অপরকে আঘাত করার চেষ্টা করতে থাকে। একসময়ে পর্দাখানিকে আবার তুলে ধরা হয়। দারিকেন তখন পর্দার আড়ালে অপসৃত হয়।

এবারে কালী টুলের ওপর উঠে দাঁড়ালে দীর্ঘ দুটি জ্বলন্ত মশাল তাঁর মুখের সম্মুখে ধরা হয়। কালী তখন পরিবেশন করেন তিরানোক্কু। তারপর তিনি পর্দা সরিয়ে দর্শক সমক্ষে এসে দাঁড়ান। দর্শকদের বরাভয় প্রদান করতে মশালচী ও বাদকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি দর্শকদের মধ্যেই চলে আসেন। এই সময়ও মঞ্চ এবং কালীর মধ্যে একখানি পর্দা তুলে ধরা হয়। কালী তখন ছন্দ সহযোগে মঞ্চের বর্ণনা দেন। এবারে পর্দাখানিকে সরিয়ে নিলে কালী প্রলয়নাচন নাচতে নাচতে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন এবং পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা ও মালভূমি অতিক্রম করার অভিনয় করেন। অভিনয় শেষে একখানি টুলের ওরর বসে তিনি চুল আঁচড়িয়ে নেন। তারপরে প্রথমে মধ্যপ্রদীপটির ও পরে চারদিকের চার দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্প অর্পন করেন এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। ধ্যান ভাঙলে তাঁর খড়্গখানি বেশ ক'রে ধার দিয়ে লাফ মেরে উঠে পড়েন এবং প্রলয় নাচন নাচতে নাচতে একে একে মঞ্চের চার দিকে গিয়ে দারিকেনকে মরণ-যুদ্ধে আহ্বান করেন। এই সময়েও তাঁর পেছনে একখানি পর্দা তুলে ধরা হয়। এই পর্দার পেছন দিক থেকে একজন যন্ত্রী দারিকেনের হ'য়ে তারস্বরে চীৎকার করতে থাকে। এক সময়ে হঠাতই পর্দাখানিকে সরিয়ে নেয়া হয় কিন্তু কালী কাউকেই দেখতে না পেয়ে পুনরায় টুলটিতে গিয়ে বসে পড়েন। কেরলের প্রচলিত যোদ্ধবেশে এই সময়ে মঞ্চে আসেন কৈম্পত নায়ার বা কৈম্পতর। ইনি কালীর স্থানীয় প্রতিনিধি কিংবা অভিভাবক। তাঁর এক হাতে থাকে ঢাল, অন্য হাতে তরবারি। যন্ত্রী ও গায়কদের সঙ্গে তিনি হাস্য-রসাত্মক সব সংলাপের অবতারণা করেন। শেষে গণপতির উদ্দেশ্যে একখানি প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কৈম্পতরের মঞ্চপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মুডিয়েট্টু বিষয়গতভাবে অলৌকিক জগত থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে এবং কেরলের সামাজিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে।

এক সঙ্গে এই সময় সমস্ত মশাল ও প্রদীপ জ্বলে ওঠে। ঢোলক বাজিয়েরা দর্শকদের মধ্যে ছুটে যায় কালীর অনুচর কুলীকে আনার জন্যে। কুলী সেখানে গাছের একখানি ডাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে এসে প্রথমেই কালীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। এই সময় কালী ও কুলীর পেছনে একখানি পর্দা খুলে ধরা হয়। পর্দার পেছনে এসে দাঁড়ায় দারিকেন ও তার সহচর দানবেন্দ্রন। ঢোলের বাজনা এই সময়ে তুঙ্গে পৌছায়। পর্দাখানিকে হঠাতই সরিয়ে নেয়া হ'লে বিবদমান দুই পক্ষ মুখোমুখি হয় এবং একে অপরকে আক্রমণ করতে করতে তারা দর্শকদের মধ্যে চলে আসে। যুদ্ধ চলতে থাকে পর্যায়ক্রমে দর্শকদের মধ্যে ও মঞ্চে। ভীষণ

যুদ্ধে এক সময়ে দু'পক্ষই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কালী ও দারিকেন তখন শক্তি-সঞ্চয়ের জন্যে ধ্যানে বসে। কিছুক্ষণ পর তারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণযুদ্ধে। হঠাতই কালী দারিকেনের ভীষণ আঘাতে মূর্ছিতা হ'য়ে ভূতলশায়ী হন। কিছুক্ষণের জন্যে থেমে যায় সমস্ত বাদ্যযন্ত্র। বিষাদের ছায়া নেমে আসে সর্বত্র। কৈম্পতর্ ও কুলী কালীর বিশাল শিরস্ত্রাণ খুলে তাঁর পিঠের পেশী ঠিক করে দেয়। সামান্য সেবা শুশ্রূষার পুণরায় শিরস্ত্রাণটি পরিয়ে দেয়া হ'লে কালী মহাক্রোধে লাফিয়ে ওঠেন। কৈম্পতর্ ও কুলীর সহযোগিতায় ভদ্রকালী দারিকেন ও তার সহযোগী দানবেন্দ্রনকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেন। দারিকেনও কিছু কমে যায় না। ফলে মহাযুদ্ধ বাধে। রঙ্গক্ষেত্র হ'য়ে ওঠে কুরুক্ষেত্র। কেন্দ্রপ্রদীপটি ঘিরে তখন ভয়াল আঘাত প্রত্যাঘাত চলতে থাকে। এক সময় কালী এক ঝটকায় দারিকেনকে ঠেলে পর্দার পেছনে নিয়ে যান এবং ত্বরিতে অন্য দিক থেকে বেরিয়ে আসেন দারিকেনের শিরস্ত্রাণ হাতে করে।

বসন্তের মহামারী এবং শত্রুর আক্রমণ রোধ করার জন্যে এবং ধনসম্পদ বৃদ্ধির কামনাতেই সাধারণতঃ মুডিয়েট্টু পরিবেশিত হয়। রঙ্গস্থলের প্রদীপের ধোঁয়া জীবাণুনাশক। ফলে মুডিয়েট্টুর অভিনয়কালে বসন্ত রোগ না হবার যে ধারনা তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক।

হত্যার এই চমকপ্রদ নাট্যকৌশল একমাত্র মুডিয়েট্টুতেই উপলব্ধ হয়। কালী এবার শিরস্ত্রাণটি শিবের পায়ে অর্পণ ক'রে কমণ্ডুল, নারকেল, তরবারি, প্রদীপ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক উপকরণ একখানি টুলের ওপর রেখে পুজোয় বসেন। এই সময়ে কেন্দ্র-প্রদীপটির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় পুষ্পার্ঘ্য। এবারে কালী একটি জলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে মঞ্চের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। সবশেষে মাথার ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই প্রদীপটি। মায়ের আশীর্বাদে দর্শক-সাধারণ ধন্য হয়। শেষ হয় অনুষ্ঠান।

কৃষ্ণাট্টম

মুডিয়েট্টু, কুটিয়াট্টমের মত কৃষ্ণাট্টমও কেরলের অন্য এক নাট্যপ্রকার। কৃষ্ণাট্টমের প্রবক্তা বা প্রচারক কোজাকোড় বা কালীকটের রাজা মানবেদন। মানবেদন ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর কেরলের এক বিদগ্ধ কবি এবং নিষ্ঠাবান কৃষ্ণ-ভক্ত ও সংস্কৃতি-প্রেমী রাজা। তিনি একরাতে স্বপ্ন দেখলেন—বালক শ্রীকৃষ্ণ গুরুবায়ুরের মন্দির-প্রাঙ্গনে খেলা করছেন। আপন ইষ্ট দেবতাকে দেখে রাজা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে যান। বালককৃষ্ণ রাজাকে এই ভাবে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে অন্তর্হিত হন এবং রেখে যান তাঁর মাথায় শোভিত সুদৃশ ময়ূরের পালক। এই স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে রাজা লিখে ফেললেন তাঁর বিখ্যাত রচনা "কৃষ্ণগীতি"। কৃষ্ণের প্রতি রাজার আন্তরিক

ভক্তিভাবনার অভিব্যক্তি এই গীতি-কাব্যখানিই কেরলে কৃষ্ণাট্টম বা কৃষ্ণ-নাট্টমের প্রচার ও প্রসারের উৎস হয়ে ওঠে।

রাজা কেবলমাত্র কৃষ্ণগীতি লিখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। কৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত অভিনয় করার জন্য তিনি গায়ক এবং অভিনেতাদের আনিয়ে একটি দল গড়ে তুললেন। তিনি স্বয়ং তাদের প্রশিক্ষিত করে তুললেন এবং প্রসাধন, বেশভূষা, মুখোশ ও অন্যান্য অভিনয় উপকরণের ব্যবস্থা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রাভিনেতার জন্য তিনি এক বিশেষ মুকুট তৈরী করালেন। আর সেই মুকুটে সংযোজিত হ'লো সেই ময়ূর-পেখম—যা তিনি গুরুবায়ুরের মন্দির—প্রাঙ্গনে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণচরিত অভিনয়ের সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে গুরুবায়ুরের সেই পবিত্র প্রাঙ্গনে কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় করালেন। সেখান থেকেই কৃষ্ণাট্টম গুরুবায়ুরের মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে রইল।

সেই সময় থেকে অর্থাৎ ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (ঐ বছরে মানবেদনের পিতৃব্য মহাবিক্রম থম্পুরন নিহত হন এবং মানবেদন রাজা হন) কালীকটের কৃষ্ণভক্তেরা গুরুবায়ুর মন্দিরে প্রতি বছরই কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় দেখে আসছে। কালীকটের কৃষ্ণভক্তদের আন্তরিক বিশ্বাস—যারা কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় দেখে তারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কৃপাধন্য হয়। কৃষ্ণাট্টমের কয়েকটি অঙ্ক সমবেত দর্শকমণ্ডীর প্রার্থনামত শ্রীকৃষ্ণকে প্রদত্ত উপহার বা অঞ্জলি-স্বরূপে প্রস্তুত করা হয়; যেমন—নিঃসন্তান দম্পতি মানসিক করে সন্তান হলে তারা অবতারম্ এর অভিনয় করাবে, মেয়ের বিয়ে হলে করাবে স্বয়ম্বরম্ আর কোনো বিশেষ কাজে সফল হ'লে করাবে বাণবধম্।

বিষয়গত ভাবে কৃষ্ণাট্টম তথা রাজা মানবেদনের কৃষ্ণগীতির মূল উৎস যদিও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, তবুও এতে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাবও বড় সামান্য নয়। মানবেদনের পূর্ববর্তী কালে প্রচলিত কেরলের এক প্রাচীন নৃত্যনাট্য অষ্টপদী আট্টম তথা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত নারায়ণ ভট্টের নারায়নাম্-এর প্রভাবও কৃষ্ণাট্টমে লক্ষ্য করা যায়। আর চতুর্বিধ অভিনয়ের দিক থেকে কৃষ্ণাট্টম যে কুটিয়াট্টমের কাছেই ঋণী—এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

বিন্যাসে গত দিক থেকে কৃষ্ণাট্টমের কাহিনী আটটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি ভাগ অভিনীত হয় এক দিনে। প্রদর্শনের ক্রমানুসারে ভাগগুলি হল—অবতারম্, কালীয় মর্দনম্, রাসক্রীড়া, কংসবধম্, বাণযুদ্ধম্ দ্বিবিদ-বধম্ এবং স্বর্গারোহনম্। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে স্বর্গারোহনম্ দিয়ে প্রদর্শনী শেষ করা উচিত নয়। এই কারণে অষ্টম দিনে স্বর্গারোহনমের অভিনয় হ'য়ে যাওয়ার পর নবম দিনে আবার অবতারম্ এর অভিনয় করা হয়। ফলে একটি ভাগ একদিনে অভিনীত হওয়া সত্বেও আটভাগে বিভক্ত কৃষ্ণাট্টমের অভিনয়ের জন্য মোট নয় দিন সময় লাগে। নবম দিনে অবতারমের পুনপ্রর্দশন মূলতঃ কৃষ্ণাট্টমের প্রবর্তক রাজা

মানবেদনের মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনেরই নামান্তর বিশেষ। ফলে এই অবতারম্-এর অভিনয় করা হয় মানবেদনের সমাধির সম্মুখে। মানবেদনের সমাধি গুরুবায়ুরের মন্দিরেরই অনতিদূরে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। কৃষ্ণাট্টমের অভিনেতারা কেবলমাত্র এই নবম দিনেই দক্ষিণমুখী হ'য়ে অভিনয় করে।

কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় হয় মালায়ালাম নববর্ষের শুরুতে, বিজয়াদশমীর উৎসবে। প্রথমদিকে অভিনয় হ'তো মন্দিরের পূর্বদ্বারের কাছে, তবে আজকাল হয় উত্তর-দ্বারের সন্নিকটে। অভিনয় ক্ষেত্রের এই পরিবর্তনের পশ্চাতেও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হ'লো—একবার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সন্তকবি বিল্বমঙ্গল গুরুবায়ুরের মন্দির দর্শনে আসেন। ঐ সময় মন্দিরে কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় হচ্ছিল। কিন্তু বিল্বমঙ্গল দেখলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সময়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে অনুপস্থিত। বিল্বমঙ্গল এতে বিস্মিত হলেন। তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল যখন তিনি দেখলেন কৃষ্ণ মন্দির ছেড়ে গোপীদের নিয়ে (রাস) লীলা করছেন। বিস্ময়াভিভূত বিল্বমঙ্গল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"আমার প্রিয় রাসলীলা হ'চ্ছে এখানে, এমনি সময় আমি কি ক'রে মন্দিরে থাকবো।"

তখন বিল্বমঙ্গলেরই পরামর্শক্রমে কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। এই কাহিনীর পেছনে সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব ক্রিয়াশীল যে অভিনয় চলাকালেও যেন ভক্ত, দর্শক এবং অভিনেতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবাধ-দর্শন লাভে সমর্থ হয়।

গুরুবায়ুর মন্দিরের তিনটি প্রবেশদ্বার। পূর্বদ্বার গোপুরম দিয়ে প্রবেশ করলে দেখা যাবে বিশাল এক প্রাঙ্গন। আর প্রাঙ্গন-প্রান্তের দেয়ালে বড় বড় সব ঘর। ভাগবতপাঠ তথা অন্যান্য উৎসবে এই অংশটি ব্যবহৃত হয়। শ্রীকোবিল বা ভাগবত পীঠের পেছনে আছে ব্রাহ্মণদের ভোজনশালা।

শ্রীকোবিলের চারদিকে কাঠের একটি বেড়া দেয়া আছে। একে বলা হয় চুট্টম্বলম। এই বেড়ার গায়ে লাগানো আছে পেতলের অসংখ্য প্রদীপ, যেগুলি বিভিন্ন উৎসবে জ্বালানো হয়। প্রধান প্রবেশদ্বার বা গোপুরম্ শ্রীকোবিলম্-এর পূর্ব দিকে। গোপুরমে তথা উত্তর প্রবেশদ্বারে বড় বড় দুটি উন্মুক্ত মণ্ডপ আছে। চারটি বেশ উঁচু স্তম্ভের ওপর মণ্ডপ দুটি নির্মিত। মণ্ডপ দুটিকে বলা হয় নটপুর। উত্তর নটপুরেই আজকাল কৃষ্ণাট্টম অভিনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির অনুরূপে অভিনেতাও অভিনয় করে পূর্বাভিমুখী হ'য়ে। মণ্ডপের চারদিক ঘিরে বসে দর্শক। অভিনেতাদের অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হয় ভোজনশালার রান্নাঘরের উপরকার বিশাল কক্ষটি। এটিই কৃষ্ণাট্টমের নেপথ্যগৃহ। সাজসজ্জা হ'য়ে গেলে দর্শকদের মধ্য দিয়েই অভিনেতারা রঙ্গস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়। নেপথ্যগৃহ থেকে অভিনয় স্থলে যাওয়ার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বসে দর্শকবৃন্দ। ভীড় বেশী হ'লে অবশ্য এই রাস্তাটি আর থাকে না। তখন অভিনেতাদের বেশ কষ্ট ক'রে

দর্শকদের মধ্য দিয়ে অভিনয় ক্ষেত্রে গিয়ে পৌছাতে হয়। অভিনয় শেষ হ'লে দর্শক-দের মধ্যকার এই রাস্তাটি দিয়েই অভিনেতারা ফিরে যায়।

মন্দিরের যেকোনো অংশে সঙ্গীত বা কেলি দিয়ে কৃষ্ণাট্টমের অভিনয়ের সূত্রপাত করা হয়। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর প্রদীপ জালিয়ে রঙ্গপূজা আরম্ভ হয়। এই রঙ্গপূজাকে বলা হয় অরঙ্গুকেলি। অরঙ্গুকেলির পর রঙ্গমঞ্চে আনা হয় তিরশিলা বা পটী। এই পটীর আড়ালে থেকে মঞ্চে আসে চারজন গোপী। গণপতি ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে গাওয়া মঙ্গল-গীতের সঙ্গে তারা নৃত্য করে। এই নৃত্যকে বলা হয় তোড্যম্।

এই মঙ্গলগীতের সঙ্গত করে মৃদঙ্গ। মাঝে মধ্যে শঙ্খও বাজে। মঙ্গলগীত সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই মঞ্চে আসে সে দিনের জন্য নির্দিষ্ট অভিনেয় অংশের প্রধান চরিত্র। প্রধান চরিত্রের এই মঞ্চপ্রবেশকে বলা হয় পুরপ্পাড়। প্রধান চরিত্রের দুইপাশে ময়ূরের পেখম দিয়ে তৈরী বড় বড় দুটি গোলাকার বস্তু ধরে রাখা হয়, বস্তুদুটির বহু বিচিত্র বর্ণের ছটা চরিত্রটির দেবত্বের আভাস দেয়। গোলাকার এই বস্তু দুটিকে বলা হয় আলভট। গোলাকার বস্তু দুটি মধ্যে নিয়ে আসার পরপরই সঙ্গীত সঘন এবং তীব্র হয়ে ওঠে। সরিয়ে নেয়া হয় তিরশিলা বা পটী। আরম্ভ হয় অভিনয়। একটি দৃশ্য শেষ হ'লে দুটি লোক দুইপ্রান্তে ধ'রে আবার তিরশিলা নিয়ে রঙ্গক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণাট্টমে এই পটীর পেছন থেকে অন্যান্য পাত্রেরও মঞ্চপ্রবেশ ঘটে। এই পটীর সাহায্যে আসনস্থ অথবা শয়নস্থ অবস্থাতেও কোনো চরিত্রকে মঞ্চে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। যাইহোক, পটীরই সাহায্যে কৃষ্ণাট্টমের সকল চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশ ঘটে।

চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশ বা মঞ্চপ্রকাশ ঘটে মদ্দলম-এর তালে তালে। গৌণ পাত্রের মঞ্চপ্রবেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় ব'লে যে কেউই প্রায় এই সময় মদ্দলম বাজাতে পারে। তবে প্রধান কোনো চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশ সিদ্ধহস্তের মদ্দলম-বাদন ব্যতিরেকে অসম্ভব।

কৃষ্ণাট্টম মূলতঃ নৃত্তপ্রধান, কুটিয়াট্টম সূক্ষ্ম অভিনয় প্রধান কিন্তু কথাকলিতে নৃত্ত ও অভিনয়ের গুরুত্ব প্রায় সমান। কৃষ্ণাট্টমে অভিনেতার পেছনে ব'সে গায়ক সংস্কৃত ভাষায় কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে চলে তার সুললিত কণ্ঠের গানে। আর অভিনেতা হস্তাভিনয়, মুখাভিনয় এবং নৃত্তায়িত পদবিক্ষেপে তাকে অভিব্যক্ত ক'রে চলে। তবে কুটিয়াট্টম বা কথাকলিতে হস্তাভিনয়ের তথা মুখাভিনয়ের যে সূক্ষ্মতা এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, কৃষ্ণাট্টমে তা একেবারেই অনুপলব্ধ। কুটিয়াট্টম বা কথাকলিতে কেবলমাত্র প্রত্যেক শব্দের জন্যেই নয়, প্রত্যয়, কাল, বচন ও লিঙ্গানুসারেও অভিনয়-মুদ্রার ব্যবহার বা প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। আর কৃষ্ণাট্টমে কেবলমাত্র একটি বাক্যকেই (বিবিধ সব) হস্তমুদ্রা তথা অভিনয়ের সাহায্যে অভিব্যক্ত করা হয়। ফলে কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় নৃত্ত অথবা নৃত্য নির্ভর

হ'য়ে পড়ে। তবে চমৎকার নৃত্তের কিছু নিদর্শনও লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে রাসক্রীড়ার অন্তর্গত রাসনৃত্ত, অবতারমের পুবুট্টল (বা মালাগাঁথার দৃশ্য) এবং বালকৃষ্ণের প্রতি গোপিদের আদর আপ্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট নৃত্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অতুলনীয় যুদ্ধদৃশ্যেরও সমাবেশ কৃষ্ণাট্টমে লক্ষ্য করা যায়। এসব ছাড়াও, যদিও পুরুষরাই কৃষ্ণট্টমে নারী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তবুও তারা কয়েকজন মিলে যখন নৃত্ত পরিবেশন করে, তখন সে নৃত্তের সুকুমার সুষমা দর্শকদের একেবারে বিমোহিত ক'রে দেয়। নৃত্তের আধিক্য হেতু কৃষ্ণাট্টমের চরিত্ররা নিজমুখে সংলাপ উচ্চারণ করতে পারে না। ফলে তাদের পেছনে বসে থাকা সঙ্গীতকাররাই তাদের হ'য়ে তাদের সংলাপ উচ্চারণ ক'রে দেয়। এর ফলে নৃত্ত পরিবেশন করা অনেক সহজ হ'য়ে যায়।

কৃষ্ণাট্টমে ব্যবহৃত হস্তমুদ্রাসমূহ মূলতঃ "হস্তলক্ষণ দীপিকা" নির্দেশিত। হস্তলক্ষণ দীপিকা আবার কুটিয়াট্টমে ব্যবহৃত হস্তমুদ্রার ব্যাখ্যাতা। ফলে কৃষ্ণাট্টমে প্রযুক্ত হস্তমুদ্রা যে কুটিয়াট্টমেরই অনুকরণ—এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার অভিনয়ের অনেক উপাদানেও কুটিয়াট্টমের প্রভাব স্পষ্ট। তবে অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জা ও নৃত্তে কেরলের অন্যান্য লোক-আঙ্গিকেরও প্রভাব রয়েছে।

অভিনেতাদের পেছনে বসা সঙ্গীতকাররা সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণাট্টমের কাহিনী গানের মাধ্যমে পরিবেশন করে। ফলে দর্শক এই গান বা তার বিষয় আদৌ বুঝতে পারে না। তবে কৃষ্ণাট্টমে শ্রব্য অপেক্ষা দৃশ্যাংশের প্রাধান্য থাকায়—দর্শক পরিবেশিত কাহিনীর অনুধাবনে সামান্যতম অসুবিধেও বোধ করে না। তাছাড়া কৃষ্ণাট্টমের সঙ্গীত তার নৃত্তেরই যথার্থ অনুষঙ্গ। ফলে ভাষার বাধা এখানে কোনো বাধাই হয়ে দাঁড়ায় না।

কৃষ্ণাট্টম শুরু হয় রাত সাড়ে ন'টায় আর শেষ হয় রাত তিনটের আগেই। কেননা রাত তিনটের সময় শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য গর্ভগৃহের কপাট খুলে দেয়া হয়। যাইহোক, অভিনয়ানুষ্ঠান শেষ হয় কিন্তু মঙ্গল শ্লোকম্ দিয়ে।

কুটিয়াট্টম কেরল তথা সমগ্র ভারতবর্ষেরই প্রাচীনতম অথচ উন্নত এক নাট্য—যাতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের এক বিশেষ আঞ্চলিক প্রয়োগরীতি সংরক্ষিত আছে। কুটিয়াট্টম তাই একদিকে যেমন কৃষ্ণাট্টম বা কথাকলিকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি এই অঞ্চলে প্রচলিত অন্যান্য লোক-নাট্য থেকে সঞ্জীবনী শক্তিও আহরণ ক'রেছে। সম্ভবতঃ কুটিয়াট্টম থেকে প্রথমে কৃষ্ণাট্টমের উৎপত্তি এবং তারপরে কৃষ্ণাট্টমেরই এক শাখা কথাকলিরূপে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষ্ণাট্টমের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কুটিয়াট্টম থেকেই আহৃত। তাছাড়া হস্তাভিনয় ও মুখাভিনয়ের মত—এর অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জাও কুটিয়াট্টম থেকে নিয়ে তাকে আরো সহজ সরল ক'রে নেয়া হয়েছে। কৃষ্ণাট্টমের অঙ্গরাগ সাধারণতঃ দ্বিবিধ উপায়ে করা হ'য়ে থাকে—(১) মিনুক্কু (রক্তাভ-পীত) প্রযুক্ত হয় ব্রাহ্মণ এবং কালযবন

প্রমুখ চরিত্রের জন্যে আর (২) পাচ (হরিৎ) প্রধান এবং উদাত্ত চরিত্রের জন্যে। এদের জন্যে আবার চুট্টিরও প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। চুট্টি হলো চাউলের লেই দিয়ে তৈরী করা একধরণের অর্ধমুখোশ—যা কথাকলি চুট্টিরই সংক্ষিপ্ত রূপ বিশেষ। থুথনি বরাবর এক কান থেকে অন্য কান অবধি এই চুট্টি বিস্তৃত।

শিব এবং বলরামের অঙ্গলেপনে হলুদ রঙের ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে গোপীদের প্রসাধন মিনুক্কু রীতিতে সম্পন্ন হয়। তবে সমস্ত স্ত্রী চরিত্রেরই মুখের রেখা স্পষ্ট করার জন্যে সাদা রেখার সাহায্যে চুট্টির আভাস সৃষ্টি করা হয়। রাধা, সত্যভামা যশোদা প্রভৃতি চরিত্রের প্রসাধন পাচ রীতিতে সম্পন্ন হয় এবং দেবকী তথা রুক্মিনীর প্রসাধন বা অঙ্গরাগ সম্পন্ন হয় মিনুক্কু রীতিতে। কৃষ্ণ ট্টমের প্রসাধনের উপকরণ কুটিয়াট্টম তথা কথাকলিরই অনুরূপ। তবে কথাকলির তুলনায় কৃষ্ণাট্টমের প্রসাধন অনেক সরল এবং সংক্ষিপ্ত।

কৃষ্ণাট্টমের মুখোশ :

কৃষ্ণাট্টমের মুখোশের যেমন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি তা আকর্ষণীয়ও বটে। বিবিধ রঙ এবং আকারের রেখা দিয়ে তৈরী এই মুখোশে যেমন বিকট গোঁফ থাকে, তেমনি থাকে আবার লম্বা লম্বা দাঁত। এসব সত্বেও কৃষ্ণাট্টমের মুখোশ যেমন অলঙ্কৃত, তেমনি তা শিল্পগুণে ভূষিত। মুখোশগুলির নির্মাণে কখনোই যথার্থবাদী রীতি অনুসৃত হয় না। জাম্ববানের মুখোশ সাদা আর জাম্ববানের চরিত্রাভিনেতার পরনে থাকে একেবারেই সাদা পোষাক। অন্যদিকে দ্বিবিদের মুখোশ কালো, সঙ্গে সঙ্গে তার পোষাকও কালো। পুতনার মুখোশটিও কালো রঙের, তবে মাঝে মধ্যে লাল রঙের ছাপ দেয়া থাকে আর থাকে সাদা দু'টি তীক্ষ্ণ অথচ লম্বা দাঁত। মৃত্যুর দেবতা ধর্মরাজের মুখোশ হরিৎ বর্ণের। এই মুখোশেও আঁকা থাকে বিকটাকৃতির দাঁত। নরকাসুরের ভাই মুরাসুরের মুখোশে থাকে পাঁচটি মুণ্ড। হরিৎবর্ণের পটভূমিকায় সাদা রেখার সমাবেশে মুরাসুরের মুখোশটি খুবই আকর্ষণীয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মুখোশে চারটি মুণ্ড। হলুদ ও সাদা দিয়ে ব্রহ্মার মুখোশটি চিত্রিত। বকাসুরের চরিত্রাভিনেতা কালো রঙে তৈরী এক পাখির মুখোশ ব্যবহার করে। কৃষ্ণাট্টমে কেবলমাত্র নরকাসুরই লাল রঙের মুখোশ পরে।

কুমিঝ নামক একধরণের হালকা ও সাদা রঙের কাঠ দিয়ে এই মুখোশগুলি তৈরী করা হয়। মুখোশগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্যে চরম শিল্পোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো চরিত্রের মুখোশ এবং শিরোভূষণ একই কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে নির্মিত। তবে দূর থেকে দেখলে মনে হয় মুখোশ এবং মাথার মুকুট বোধ হয় আলাদা আলাদা ভাবে লাগানো। আজও এমন অনেক মুখোশ ব্যবহার করা হয় যেগুলি তৈরী করা হ'য়েছিল প্রায় তিনশো বছর আগে। কৃষ্ণাট্টমের প্রচলনের সময় থেকেই এই মুখোশগুলি ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে।

বিবিধ অলঙ্কার এবং শিরোভূষণ :

কৃষ্ণাট্টমে ব্যবহৃত অলঙ্কার দুইভাবে তৈরী করা হয়। কোনো কোনো অলঙ্কার নির্মিত হয় কুমিঝ থেকে, আবার কোনো কোনো অলঙ্কার তৈরী হয় সোনালী বা অন্যান্য রঙের মোতী দিয়ে।

কর্ণাভূষণ, বলয়, হস্তকঙ্কণ, ভূজবন্ধ, মেখলা, বক্ষোভূষণ, গ্রীবাভূষণ—এগুলি সব তৈরী কাঠ দিয়ে। এগুলি আবার এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে ক'রে প্রয়োজনীয় অঙ্গসঞ্চালনে কোনো বাধা না আসে। অলঙ্কারগুলির উপরকার কারুকার্য সত্যিই প্রশংসনীয়। অলঙ্কারগুলি সোনার পাত দিয়ে মুড়ে রঙিন কাচের টুকরো আটকিয়ে চটকদার ক'রে তোলা হয়। মোম ও তেল জ্বালিয়ে একধরণের লেই তৈরী ক'রে তা দিয়ে এই কাচের টুকরোগুলি আটকানো হয়। বক্ষোভূষণ তৈরী করা হয় সাধারণতঃ সোনালী মোতী দিয়ে। স্ত্রী-পুরুষ একই বক্ষোভূষণ ব্যবহার ক'রে থাকে। এগুলি বাঁধা হয় মূলতঃ কাঁধেই।

শিরোভূষণ বা মুকুটগুলিতে নানা রকমের ফুলের কারুকার্য করা হয়, মণি, মুক্তো এবং কাচের টুকরো লাগানো হয়। তারপর লাল মখমল দিয়ে কাঠের ফাঁকা অংশগুলি ভরিয়ে তোলা হয়। প্রত্যেকটি মুকুটেরই দুটি অংশ ; একটি উপরের অংশ, অন্যটি পেছন দিককার বৃত্তাকার অংশ। কৃষ্ণাট্টমের মুকুটের এই বৃত্তাকার অংশটি কুটিয়াট্টমের চেয়ে আকারে ছোটো। একে বলা হয় কেশভারম। কর্ণাভূষণের ওপরে বেশ সতর্কভাবে এই মুকুট বাঁধা হয়। মুকুট ব্যবহারে মাথায় যাতে কোনো যন্ত্রণা না হয় তার জন্য মুকুট বাঁধার আগে মাথায় রঙিন কাপড় দিয়ে নেয়া হয়। সব মিলিয়ে কৃষ্ণাট্টমের মুকুট একই সঙ্গে রুচি সম্মত এবং আকর্ষণীয়।

শ্রীকৃষ্ণ তথা বলরামের মুকুট (বা কিরীট) শঙ্কু আকৃতির, এতে ময়ূরের পেখম লাগানো হয়। আর নাচের দিকে ঝলমল ক'রতে থাকে রুপালী তার। কৃষ্ণাট্টমে প্রসাধন এবং অলঙ্কারের পারিপাট্য রক্ষার জন্যে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত থাকেন।

সাজ পোষাক :

সাজ পোষাকের বিভিন্ন উপকরণ এবং রঙ চরিত্রানুসারে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। মখমলের কুর্তা বা জামা কুটিয়াট্টমের উপরের পোষাকেরই সদৃশ। তবে পিঠের দিককার কিছুটা অংশ খোলা থাকে। কৃষ্ণাট্টম এবং কুটিয়াট্টমের নিম্নবস্ত্র একে অপরের থেকে বেশ পৃথক। নিম্নভাগের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্র তৈরী করা হয় রেশম অথবা সুতো দিয়ে। নিম্নবস্ত্রের ঘের কথাকলির নিম্নবস্ত্রের ঘের অপেক্ষা অনেক কম। এর দু'দিকে রেশমী কাপড়ের টুকরো লাগানো থাকে। কৃষ্ণাট্টমে ব্যবহৃত উত্তরীয় কথাকলির অনুরূপ। উত্তরীয় ভাঁজ করা অবস্থায় কাঁধের ওপর ফেলা থাকে।

কৃষ্ণের পোষাকের রঙ কালো, বলরামের লাল এবং জাম্ববানের সাদা। মানবেতর চরিত্রের অধোবস্ত্র অবশ্যই ভিন্ন প্রকারের।

অধোবস্ত্রের ঘের বাড়ানোর জন্যে কয়েক গজ সাদা কাপড় কোমরে বেঁধে তার ওপর একটি পট্টি আটকে দেয়া হয়। অধোবস্ত্রের নিম্নভাগ হাঁটু অবধি বিস্তৃত, নীচের প্রান্তেও কাপড়ের পট্টি (পাড়ের মত ক'রে) লাগিয়ে দেয়া হয়।

কৃষ্ণাট্টমের প্রতিটি চরিত্র উপরে বর্ণিত পোষাক প'রে তার ওপর ব্যবহার করে বিভিন্ন সব অলঙ্কার। যেমন—বাজুবন্ধ, কঙ্কণ, স্কন্ধভূষণ, মালা বা গলার হার, শিরমুকুট প্রভৃতি। কর্ণাভূষণ আকারে বেশ বড়। কর্ণাভূষণ নির্মাণে প্রাচীন মূর্তিতে শোভিত কর্ণাভূষণের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়।

আগেই জানানো হ'য়েছে যে কৃষ্ণাট্টমে স্ত্রী চরিত্রে অবতীর্ণ হয় পুরুষ অভিনেতারা, তবে এদের পোষাক পরিচ্ছদ কুটিয়াট্টমের স্ত্রী চরিত্রের পোশাক পরিচ্ছদ থেকে একেবারে ভিন্ন। মাথার একপাশে একখণ্ড কাপড় দিয়ে উঁচু ক'রে বাঁধা থাকে এদের খোপা। এরা ফুলহাতা ব্লাউজ পরে। এদের অলঙ্কার পুরুষ চরিত্রের অলংকারেরই অনুরূপ, এদের নিম্নবস্ত্র কথাকলির স্ত্রী-চরিত্রের নিম্নবস্ত্রের অনুরূপ।

পুরুষ চরিত্রের অভিনেতারা হাঁটুতে ঘণ্টা (ঝুমুর) লাগানো চামড়ার পটী বাঁধে আর স্ত্রী-চরিত্রাভিনেতারা বাঁধে পায়ের গোছে।

প্রশিক্ষণ :

কৃষ্ণাট্টমে অভিনয়ের জন্য কুটিয়াট্টমের অনুরূপ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। সাধারণতঃ ছয় বছর বয়স্ক বালকরাই প্রশিক্ষণের জন্যে নির্বাচিত হয়। আজকাল বালকৃষ্ণের ভূমিকায় তবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এবং বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে যে সব ছেলে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই-এর জন্যে আসে, প্রয়োজনীয় গুণাগুণের উৎকর্ষের ভিত্তিতে তাদের মধ্য থেকে এক জনকে বেছে নেয়া হয়।

অভিনয়ে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ যেমনি কঠোর তেমনি অধ্যাবসায় সাধ্য। প্রশিক্ষণের জন্য শিল্পীদের রাত আড়াইটের মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়। প্রথমে তারা অভ্যাস করে চোখের বিভিন্ন ব্যায়াম, এর মধ্যে চোখের মণি, পাতা ও ভ্রূযুগলের ইচ্ছামত সঞ্চালনই মুখ্য।

অতি প্রত্যূষে প্রাতঃস্নানের পর পুনরায় অভ্যাস শুরু হয়। এই পর্বের অভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকে অঙ্গাভিনয়—বিশেষ ক'রে হস্তাভিনয়।

বিকেলের জন্য নির্দিষ্ট থাকে চোলিয়াট্টম বা মহড়া। এই পর্বে অভিনেতারা অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জা ব্যতিরেকেই বিভিন্ন দৃশ্যের মহড়া দেয়। চোলিয়াট্টম সংঘটিত হয় বাদ্য ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে। প্রত্যেক চোলিয়াট্টমে বা বিকালের মহড়ায় কাহিনীর অর্ধাংশের অভ্যাস করা হয়।

বর্ষার সময়ে নেত্রাভিনয় অভ্যাসের পর সর্বাঙ্গ তিলের তেল দিয়ে মালিশ করা হয়। তেল মালিশ করার পর শারীরিক সুষমা-বৃদ্ধি ও মানসিক স্ফূর্তির জন্যে নানা রকমের ব্যায়াম অভ্যাস করানো হয়।

কৃষ্ণাট্টমে গানের ভূমিকা অপরিসীম। প্রধান গায়কই অধিকাংশ গান গায়, তবে সহ গায়করাও তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। সঙ্গীতের তাললয় নিয়ন্ত্রণ করে প্রধান গায়ক। কৃষ্ণাট্টমে তালবাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাংসবাদ্য চেঙ্গল। ফলে চেঙ্গলবাদকই প্রধান বাদ্যকর। একতালম নামক যন্ত্রটি যিনি বাজান তিনি সহযোগী বাদ্যকরদেরই একজন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে চেঙ্গল এবং একতালম ছাড়াও থাকে মদ্দলম্। কৃষ্ণাট্টমে আবার দুই ধরনের মদ্দলম্ ব্যবহৃত হয়—শুদ্ধ মদ্দলম্ এবং তোপি মদ্দলম্। দিব্য চরিত্রের প্রবেশকে মঙ্গলময় ক'রে তোলার জন্য বাজানো হয় শঙ্খ। যাইহোক, উপরে উল্লেখিত বাদ্যযন্ত্রগুলি ছাড়া বর্তমানে অন্য প্রায় সব লোকআঙ্গিকের মত কৃষ্ণাট্টমেও হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হ'চ্ছে।

বর্তমানে কৃষ্ণাট্টমের একটিমাত্র দল ক্রিয়াশীল রয়েছে। দল বা মণ্ডলীটির নাম কলানিলয়ম্। দলের সমস্ত শিল্পীই কৃষ্ণাট্টমের চর্চায় নিজেদের উৎসর্গ ক'রেছে। আগে কালিকটের রাজাই ছিলেন এই মণ্ডলীর সঞ্চালক। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কলানিলয়ম্ কাজ ক'রে চলেছে গুরুবায়ুর-দেবস্থানম্-বোর্ডের তত্ত্বাবধানে। গুণাগুণের ভিত্তিতে বোর্ড সমস্ত শিল্পীকে বেতন দেয়।

এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে কৃষ্ণাট্টম ধর্মীয়নাট্য। প্রথম দিকে এই দলটি মন্দিরের বাইরে কোথাও কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় করতো না। তবে রাজপ্রাসাদে বা রাজপ্রাসাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বনেদী ব্রাহ্মণের বাড়িতেও কৃষ্ণাট্টম পরিবেশিত হ'তো। অবশ্য বর্তমানে মন্দিরের বাইরেও কৃষ্ণাট্টমের অভিনয় হ'চ্ছে।

কাশ্মীর, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের লোকনাট্য



কাশ্মীরের লোকনাট্য : ভাঁড় পথর

ভাঁড়পথর :

কাশ্মীরের লোকনাট্য হ'লো ভাঁড়পথর। 'ভণ্ড' ধাতু থেকে এসেছে 'ভাণ'। ভাণ হ'লো ব্যঙ্গরসাত্মক যথার্থবাদী একালাপী সংস্কৃত রূপক। এই ভাণ থেকেই এসেছে ভাঁড়। এর অর্থ হ'লো মসখরাবাজ বা বিদূষক। আর পথর হ'লো সংস্কৃত "পাত্র" (বা নাটকীয় চরিত্র)-এর কাশ্মীরী রূপ। কোথাও কোথাও পথরকে আবার 'পওথর'ও বলা হয়। অর্থাৎ ভাঁড়পথর হ লো ভাঁড়ের দ্বারা চরিত্রাভিনয়। তবে পওথর কিন্তু একালাপী নাটক নয়। তাহ'লো ব্যঙ্গাত্মক পৌরানিক ও সামাজিক কাহিনী সমন্বিত কাশ্মীরের লোকনাট্য। আর যারা এই লোকনাট্য পরিবেশন করে তাদের বলা হয় ভাঁড়।

কাশ্মীরের উপত্যকায় আজকাল এমন গোটা কুড়ি গ্রাম পাওয়া যায় যেখানে 'ভাঁড়পথর' পরিবেশনকারী ভাঁড়েরা বাস করে। এই গ্রামগুলির মধ্যে শ্রীনগর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী অনন্ত গাঁও জিলার অকিন গ্রামের ভাঁড়েরাই অধিক প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের এই ঐতিহ্যবাহী নাট্যকে তারা কাশ্মীর তথা

উত্তরভারতের বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশন ক'রে থাকে। এই ভাঁড়েরা আবার দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর ভাঁড় কেবল বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ায় আর অন্য শ্রেণীর ভাঁড়েরা নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে নাটক পরিবেশন ক'রে বেড়ায়। আমাদের আলোচ্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাঁড় আর তাদের নাটক 'ভাঁড়পথর'।

নাচ, গান এবং কৌতুক ও ব্যঙ্গ-প্রধান অভিনয়ে পটু হওয়ার দরুণ এদের নাটকের প্রভবিষ্ণুতা অসাধারণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে জানা যায়, তিনি এই ভাঁড়েদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কেননা, পুষ্কর বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা করার সময় তিনি এগুলিকে 'ভাঁড়েদের' যন্ত্র থেকে উদ্ভূত ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। ফলে-এ অনুমান করা যেতে পারে যে, নাট্যশাস্ত্র রচনার আগেও ভাঁড়েরা নাট্য পরিবেশন ক'রে বেড়াত।

আজ কাশ্মীরে ভাঁড়পথর কাশ্মীরের বিভিন্ন মেলায় এবং মুসলমান পীরদের নির্বাণ-তিথি লপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সবচেয়ে মনোরঞ্জনাত্মক উপকরণ বিশেষ। এইসব মেলায় হাজার হাজার লোক জড়ো হয় এবং ভাঁড়পথর দেখে আনন্দে বাড়ি ফেরে। কখনো কখনো একই সঙ্গে চার পাঁচটি লাগোয়া গ্রামেও ভাঁড়পথরের একটি দল দিন রাত ধ'রে অভিনয় প্রদর্শন ক'রে বেড়ায়।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই লোকনাট্য পরিবেশন করলেও একে কিন্তু বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। ভাঁড়পথর সম্পর্কে কাশ্মীরীদের এই শ্রদ্ধাভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় নাটকের আরম্ভ ও সমাপ্তিতে। নাটকের একেবারে প্রারম্ভেই অভিনেতারা কিছু সময় ধ'রে নৃত্য পরিবেশন ক'রে থাকে। এই নৃত্য 'শিব-ভগবতী মন্দির'-এর নৃত্য থেকে প্রকৃতিতে ভিন্ন হ'লেও একে চোক নৃত্য বলা হয়। স্বভাবতই দর্শকরা এই নৃত্য খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে থাকে। আর নাটকের শেষে সম্পন্ন হয় "দুআ-এ-খৈর"। দুআ-এ খৈর হ'লো দলনেতা কর্তৃক শুভকামনা প্রকাশ করা। এই প্রথাটি কাশ্মীরে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে। আগে যখন মন্দিরে নাটকের অভিনয় হোতো তখনই নাটকের শেষে এই শুভ কামনা ব্যক্ত করা হোতো। মুসলমানদের আগমনের পর এই লোক-নাট্যেও কথাটি পুনঃপ্রচলিত হ'য়েছে। দুআ-এ-খৈর-এ দেশ ও দেশের মানুষের মঙ্গল কামনা ব্যক্ত করা হয় ব'লে প্রত্যেকেই চায় অভিনয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই শুভকামনার ফললাভ করতে।

চোক নৃত্য দিয়েই 'ভাঁড়পথর' আরম্ভ হয়, একথা আগেই বলা হ'য়েছে। এই নৃত্যে ভাঁড়েরা স্বরনাই (বড় আকারের সানাই)-এর এক বিশেষ সুরে—যাকে ভাঁড়পথরের পরিভাষায় মুকাম বলা হয়—ঢোল, নাকাড়া, থালা ও মঞ্জীরা সহযোগে নৃত্য পরিবেশন ক'রে থাকে। চোক এর পর নাচ-গান ও অভিনয়ের ত্রিবেণী সঙ্গমে কাহিনী এগিয়ে চলে। কাশ্মীরের প্রচলিত সঙ্গীতকে বলা হয়

সুফিয়ান কলাপ। এটি হিন্দুস্থানী ও ইরাণী সঙ্গীতের সংমিশ্রণে তৈরী। প্রায় সাতশো বছর ধ'রে এই সঙ্গীত কাশ্মীরে প্রচলিত আছে—বংশ পরম্পরাগত অনুশীলন-মাধ্যমে। এই ঘরাণার প্রচলিত রাগগুলি হ'লো—জঙ্গোটী, দুগাহ, রাস্ত, তবরোজ সুবহ, কল্যাণ টোড়ী, বাহার, বড়-রঙ্গ, সলাম, খুরব, তুবিচ, নবপন্তী, সলগাহ প্রভৃতি। দীর্ঘদিন ধ'রে কঠোর অধ্যাবসায়ের সঙ্গে স্বরনাই বাদকরা এই সঙ্গীত আজও টিকিয়ে রেখেছে। ফলে সুফিয়ান কলাপের বেশির ভাগ রাগই ভাঁড়পথরে প্রযুক্ত হ'তে দেখা যায়। তবে প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব একটি গায়কীতে এগুলি পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। তালবাদ্য হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করে ঢোলক। নাটকের শুরুতে খুবই ধীর লয়ে বাজতে থাকে এটি কিন্তু নাটক যতই এগিয়ে চলে এর লয়ের গতিও ততই বেড়ে যায়। কাশ্মীরে আগে বিবিধ তালে এটি বাজানো হ'তো, তবে বর্তমানে চর্চার অভাবে তালের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। বর্তমানে কেবল একজন ভাঁড় কাশ্মীরী বোল বলতে পারে। তার বয়স আবার ৮৫ বছর। বাকিরা কেবল ঢোলই বাজায় কোনো তালেরই বোল তারা বলতে পারে না। নাকাড়া ঢোলেরই সঙ্গত করে, ঢোলের আওয়াজ বাড়িয়ে দেয়। পথরে প্রারম্ভিক নৃত্য ছাড়া অন্য কোনো নৃত্যই আর তাললয়-সমন্বিত নয়। খেয়ালখুশিমত হাত পা-ছোঁড়া ব'লেও মনে হ'তে পারে অনেকের। তবে এতে ভাঁড়-পথরের দর্শকদের মনে বিরক্তি আসে না আদৌ।

ভাঁড়পথরের অভিনয়ে চাবুক এবং ছড়ির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ফলে প্রত্যেক পথরেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য। ভাঁঙ্গ-এর লতা দিয়ে তৈরী হয় চাবুক। লম্বা মোটা দড়ির মত দেখায় এটিকে। এর অগ্রভাগে দু'টি মুখ থাকে। যার ফলে এর প্রতিটি বাড়িতে ভীষণ এক শব্দ হয়—তবে আঘাত লাগে না আদৌ। অত্যাচারীর নৃশংস অত্যাচার প্রত্যক্ষীভূত করার উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার করা হয়। তাই অত্যাচারীর ভূমিকাভিনেতা এটি ব্যবহার করে। এটি ব্যবহারের কৌশলও তাদের আয়ত্ত করতে হয়। অত্যাচারিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ভাঁড়েরা। তাদের হাতে থাকে ফাটানো বাঁশের ছড়ি। এটি দিয়ে মারলেও গায়ে কোনো আঘাত লাগে না। ভাঁড়পাথরে চাবুক যে ভূমিকা পালন করে তার ঠিক বিপরীত ভূমিকা পালন করে এই ছড়ি।

ভাঁড়পথরের অভিনয়ে একটা বড় ভূমিকা পালন করে 'কপর চাদর' (কাপড়ের চাদর)। কপর চাদর এই নাট্যে সাধারণতঃ পর্দার কাজ করে। অনেক সময় আবার রাজ-দরবারের দৃশ্যে এই চাদরখানিকে চাঁদোয়ার অনুরূপে রাজার মাথার ওপরে তুলে ধরা হয়। 'কপর চাদর' সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের যবনিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য কুটিয়াট্টম, যক্ষগান, মুডিয়েট্টু, রাসলীলা এবং আঙ্কিয়ানাটেও অনুরূপ পর্দার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ভাঁড়পথরের দলের প্রধানকে বলা হয় মাগুন। মাগুন সম্ভবতঃ সংস্কৃত শব্দ মার্গনঃ তথা 'মহাগুণী'-রই কাশ্মীরী রূপ। ভাঁড়ামি, ব্যঙ্গকৌতুক, বিভিন্নভাষার প্রয়োগ এবং অত্যাচার ভাঁড়পথরের প্রধান প্রাধান আকর্ষণীয় উপকরণ। এমন কোনো পথর-এর কল্পনা করাই প্রায় অসম্ভব—যাতে কোনো ভাঁড় নেই। ভাঁড় পথরাভিনয়ে অপরিহার্য চরিত্র। মাগুন সাধারণতঃ রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় আর ভাঁড় অবতীর্ণ হয় প্রজার ভূমিকায়। ফলে কোনো কোনো নাটকে ৬ থেকে ১২ জন অবধি ভাঁড় থাকে। দলগত ভাবে মাগুন দলের অধিপতি আর ভাঁড় তার অনুগত অভিনেতা। ফলে মাগুন ও ভাঁড়েদের পারস্পরিক সম্পর্ক—দলে ও অভিনয়ে—শোষক ও শোষিতের। দলগত অভিজ্ঞতা ভাঁড় তার অভিনয়েও কাজে লাগায়। ফলে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের ভ্রষ্টাচার মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তিতে দর্শক সমক্ষে উপস্থাপন ক'রতে তাদের কোনোই অসুবিধে হয় না। ভাঁড় ভাঁড়পথরের সূত্রধার বিশেষ। তাছাড়া হাসিঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অফুরন্ত উৎস তার শরীর এবং বাচনভঙ্গী। ফলে সে যদি চুপচাপ মঞ্চে দাঁড়িয়েও থাকে, তাহলেও তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে দর্শক সাধারণ হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ে। এমনি হাস্যকর যে চরিত্র সে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ক'রে যায় পথরের একটি অনুষ্ঠানে—সারাক্ষণই অভিনয় ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে। বিভিন্ন লোকের রূপধারণ ক'রে সে এইসব লোকেদের হাস্যকর অথচ সত্যকার ভণ্ডামি খুবই সহজ ভাবে দর্শক সমক্ষে উপস্থিত করে। ভাঁড়পথরের অভিনয় হয় অভিনয়ের জায়গা পাওয়া যায় এমন কোনো সমতলভূমিতে। জায়গা না থাকলে দর্শকরা অবশ্য পার্শ্ববর্তী বাড়ির ছাদ অথবা গাছের ডালে উঠে অভিনয় দেখে থাকে। দর্শকদের এই আগ্রহের মূলকারণও এই ভাঁড়। কেননা ভাঁড় নাটকে অত্যাচারিত, দুর্বল এবং অসহায় মানুষ। কাশ্মীরের (তথা ভারতবর্ষের) সাধারণ মানুষও তাই। তাছাড়া অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও এই ভাঁড়েরা অত্যাচারের প্রতিরোধে সক্রিয় এবং সফল। দর্শক এক্ষেত্রেও ভাঁড়ের কাজকর্মের মধ্যে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ লক্ষ্য ক'রে খুশি হয়। সূক্ষ্ম ভাবাভিনয় ছাড়াও, ভাঁড়-পথরের ভাঁড় গানেও খুবই দক্ষ। হাস্যরসাত্মক গান গেয়ে সে আসর মাৎ ক'রে দেয়। অন্যান্য চরিত্রের বিকাশেও সে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। ভাঁড়পথরে চারদিক ঘিরে বসে দর্শক। ফলে কোনো অভিনেতাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিনয় করে না, চার দিক ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে।

ভাঁড়পথরে অভিনীত জনপ্রিয় নাটকগুলি হ'লো—বাতল-পথর, বটঅ পথর, রাজঅ পথর, দরদ-পথর, শিকারগাহ, আরমন্য পথর, অংগ্রেজ পথর, বকর-ওয়াল পথর ইত্যাদি। বংশপরম্পরায় শ্রুতি হিসেবে নাটকগুলি এখনকার ভাঁড়েদের হস্তগত হ'য়েছে। আগেকার দিনে বাবাই ছেলেকে এর কাহিনী ও পরিবেশন কৌশলে শিক্ষিত ক'রে তুলতো। বর্তমানে অবশ্য এই ক্রম ব্যাহত

হ'য়েছে। কেননা ভাঁড়েদের ছেলেরা আজকাল নাচ-গান-অভিনয় ত্যাগ ক'রে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হ'চ্ছে। যাইহোক, নাটকগুলি যে কবে রচিত হ'য়েছে, তা সঠিক ক'রে বলা যায় না। কেননা এর ঘটনায়, চরিত্রে, ভাষায় ও সংলাপে যে বিভিন্ন যুগের প্রভাব প'ড়েছে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এর রচনাকালের মূল কাঠামো খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। বাতল পথরের প্রস্তাবনা গাঁতিতে নাট্যামোদী ও সংস্কৃতি-প্রেমী রাজা হর্ষের উল্লেখ থেকে একথা অনুমান করা যায় যে দশম শতাব্দীর কাশ্মীরেও ভাঁড়-পথরের প্রচলন ছিল। মোহনলাল আইমা তাঁর 'Kashmiri Drama' প্রবন্ধে বলেছেন, কাশ্মীরী নাটকের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নাট্যেতিহাসের বিপরীতে অবিচ্ছিন্নও বটে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ভাঁড়েদের নাটক কাশ্মীরের নাট্যেতিহাসের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতেই তার ভীত স্থাপন ক'রেছে কাশ্মীরের গ্রামদেশের লোকসমাজে। যাইহোক, বাতলপথরে শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত 'বাতলদের' আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক জীবন সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে। বাতল পথরের প্রধান চরিত্র নাবদ-বাতল। তার মেয়ে বিবাহযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাত্যহিক কাজকর্মে সে এত ব্যস্ত যে মেয়ের বিয়ের কোনো ব্যবস্থাই ক'রে উঠতে পারে না। ফলে তার স্ত্রী গোপনে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলে। যেদিন বরযাত্রীরা আসবে নাবদ সেইদিনই সমস্ত ঘটনা জানতে পারে তার বৌ-এর মুখ থেকে। ফলে সে খুবই অসহায় হ'য়ে পড়ে। তবুও মেয়ের বাবা সে। ফলে বরযাত্রীসহ জামাইকে অভ্যর্থনা করার জন্য সে প্রয়োজনীয় বা প্রচলিত সব ব্যবস্থা নেয়—মিঠাইওয়ালা, দর্জি, গান-বাজনার দল সবাইকেই ডাকে একে একে। তারা মঞ্চে আসে। এদের নিয়ে যেসব বাগবোচিত সংলাপ এবং হাস্যকর ঘটনা সংঘটিত হয় মঞ্চে তা দেখে ও শুনে ভাঁড়পথরের দর্শকরা হেসে একেবারে লুটোপুটি খায়। বাস্তবভিত্তিক এইসব হাস্যকর পরিস্থিতির জন্যই ভাঁড়পথরের এত জনপ্রিয়তা। ইতিমধ্যে বরযাত্রীরা আসে, প্রথমে আসে চরখা কাঁধে এক গর্ভবতী নারী, আর তার পেছনে বর ও বরযাত্রীরা। বর ঘোড়ায় না চেপে বড় একখানি মুগুরের ওপর বসে বিয়ে করতে আসে। বরসহ মুগুরখানি ঘাড়ে ক'রে আনে দুটি ভাঁড়। বরের চেহারা দেখলেও হাসি আসে। অর্দ্ধনগ্ন এক আট-দশ বছরের বালক সে। প্রায়ক্ষেত্রেই এই বরযাত্রীরা সমগ্র গ্রামটি প্রদক্ষিণ ক'রে সময়মত রঙ্গক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়। নাটকটি কিন্তু শেষাবধি বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ করে এবং বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। তবে সংলাপ, মূকাভিনয় এবং ঘটনা সবদিক থেকেই এটি খুবই কৌতুকপ্রদ।

বাতল পথরের ঠিক বিপরীত ঘটনা দেখা যায় আরমন্য পথরে। এর মুখ্য চরিত্র হ'লো লালজু আরম। লালজু সব্জির চাষী। তারও একটি মেয়ে আছে

এবং মেয়েটির বিয়ের বয়স হ'য়েছে। এদিকে লালঅ আরমেরও বেশ বয়স হ'য়েছে। সজি চাষের জন্ম প্রয়োজনীয় খাটাখাটনি সে ঠিক ক'রে উঠতে পারে না। ফলে সে তার মেয়ের জন্যে এমন একটি ছেলের খোঁজ করে যে ঘরজামাই হিসেবে তার বাড়িতে থেকে তার কাজকর্ম সব ক'রে দেবে। কিন্তু মনের মত পাত্র আর জোটে না। শেষাবধি একটি ছেলে জোটে, তবে সে তার স্বজাতি নয়, উপরন্তু বিদেশী। তবুও লালঅ এবং পরদেশী উভয়েই রাজি হ'য়ে যায় এই বিয়েতে। লালঅ অবশ্য বিয়ের আগে পরদেশীকে দিয়ে সজির চাষ করিয়ে নিতে চায়। কিন্তু ছেলেটি খুবই অলস। নানান অজুহাতে সে কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। শেষে লালঅ ছেলেটিকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে বেগার খাটতে যেতে বাধ্য করে। প্রচলিত ধারণা হ'লো—দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যারা বেগার খাটতে যায়, তারা কেউই জীবিত ফেরে না। কেননা, যারা বেগার খাটায় তারা বেগারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। আর সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা মারা যায়। সকলকে চমকিয়ে দিয়ে এবং অত্যাচারী শোষকবর্গকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ছেলেটি কিন্তু ফিরে আসে। ফিরে এসে তার ব্যথাতুর অথচ বীরত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়। যাইহোক, শেষাবধি লালঅ এরই সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেয়। ফলে খুবই আনন্দজনক পরিবেশে শেষ হয় নাটকটি। স্বরনাই-এ 'আরাধনা' নামক মুকাম বাজিয়ে ঢোলক, নাকাড়ার বাজনার তালে তালে চোক নৃত্য দিয়ে শুরু হয় নাটকখানি। চোক নৃত্যের পরেই দেখা যায় পরদেশীকে। সে একটি তলাহীন খাঁচা মাটিতে রেখে নীচু হ'য়ে তাতে মুখ লাগিয়ে কূপের দেবতার কাছ থেকে জলসিঞ্চনের জন্যে জল তোলার অনুমতি নেয়। ব্যক্তিগত অভিনয়ের জোরে সে এই তলাহীন খাঁচাটিকেই কুয়ো ক'রে তোলে দর্শকের সামনে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় নাট্যধর্মী এই অভিনয় রীতি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এক নাট্যরীতিরই স্মৃতিরেশ বিশেষ। যাইহোক, কোনো কোনো দলের আরমন্ড পথরের শুরুতে দেখা যায় পরদেশী একখানি লাঠির ডগায় একটি ভাঁড় বেঁধে সেটা দিয়ে জল তুলে খেতে জল সিঞ্চনের অভিনয় করছে। এক্ষেত্রে মেয়ের বাপ তার সঙ্গে কিছুতেই তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি না, ফলে সে রাগে ভাঁড়টি ভেঙে ফেলে অন্যত্র চলে যায়।

'রাজঅ পথর' হ'লো 'রাজার নাটক'। এতে বর্ণিত হ'য়েছে কাশ্মীরে সংঘটিত রাজাদের অত্যাচারের কাহিনী। দেড় দু'শো বছর আগে কাশ্মীর শাসন কোরতো পাঠানেরা। সেই সময়কার পাঠান সুবেদারদেরকে ব্যঙ্গ করা হ'য়েছে এই নাটকে। খাজনা দেয়ার জন্যে সব পেশার লোকদেরই সুবেদারের কাছে যেতে হয়। কিন্তু সুবেদারের কাছ থেকে কেউ কোনো পুরস্কার পেলে তার একটা ভাগ 'শাহগাসী' বা দ্বারপালকে দিয়ে দিতে হয়। দ্বারপালের যুক্তি—ঐ পুরস্কারে তার অধিকার আছে, কেননা সেই তো সকলকে সুবেদারের কাছে

যেতে দেয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের বেশে ভাঁড়েরা সুবেদারের কাছে যায়। একে একে সুবেদার তাদের প্রত্যেককে প্রচণ্ডভাবে মারে। এই সময় সুবেদাররা সাধারণ মানুষকে কি নির্মমভাবে অত্যাচার করতো তা মূর্ত হ'য়ে ওঠে—সুবেদার ও ভাঁড়েদের অভিনয়ে। মার খেয়ে কোনো ভাঁড় সুবেদারকে তার বাড়ির মুর্গী খাওয়ানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ভাঁড় তখন তার শঙ্কু-আকৃতির টুপির ভেতর থেকে ছোট্ট একটি মুর্গীর বাচ্চা বের করে। স্পষ্টই বোঝাযায় এজাতীয় ঘটনা আসলে অসহায় কৃষকের বিদ্রোহী মনোভাবেরই পরিচায়ক। আসলে শোষিতরা যে সব কিছুকেই চোখবুঝে সহ্য করছে—এটা ভাঁড়েদের মনঃপুত নয়। ফলে অন্যায় অত্যাচারকে হেলায় তুচ্ছ ক'রে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে তারা।

'শিকারগাহ' নাটকটি মূলতঃ শিশুনাট্য। মুখ্যতঃ শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই এটি পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। এতে পুরুষ অভিনেতা ছাড়া বাঘ, ভালুক, হরিণ, বানর প্রভৃতি পশু চরিত্রও অংশ নিয়ে থাকে। পশু চরিত্রাভিনেতারা পশুর মুখোশ প'রে এতে অংশ নেয়।

ভাঁড়পথরের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক হ'লো 'দরদপথর'। প্রায় সব দলই এটি পরিবেশন ক'রে থাকে। এই নাটকের বিষয় হ'লো—দরদ রাজা বেড়ানোর জন্যে কশ্মীর এসেছে। সে তার মেজাজ ফুটিয়ে তোলার জন্যে অনর্গল কথা বলে ফার্সীতে। মৌজ ক'রে মদ খায়। সঙ্গের প্রেমিকা দু'জনকেও মদ্ খাওয়ায়। ফলে সকলে মিলে বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে। এমনি সময় ভাঁড়েরা এসে তার প্রেমিকা দু'জনকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে রাজার জ্ঞান ফিরে আসে। সে তখন তার প্রেমিকা দু'জনকে খোঁজ ক'রতে থাকে। উপস্থিত ভাঁড়েদের জিজ্ঞাসা করে, তার প্রেমিকা দু'জন কোথায় গেল? কিন্তু ভাঁড়েরা তার ফার্সী ভাষা বুঝতে পারে না। ফলে রাজা তাদের খুব ক'রে চাবকায়। রাজা যখন এই ভাবে উন্মত্তের মত তার প্রেমিকাদের খোঁজ ক'রে বেড়ায়, তখন তার প্রেমিকাদের দেখা যায় দু'ই ভাঁড়ের সঙ্গে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনো দেখা যায় তারা দর্শকদের মধ্য থেকে উঁকি মারছে, আবার কখনো দেখা যায় পার্শ্ববর্তী বাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মারছে। রাজা মঞ্চোপরি ভাঁড়েদের কাছ থেকে তার প্রেমিকাদের কোনো হদিশ না পেয়ে তাদের খুঁজতে স্থানান্তরে যায়। তার প্রেমিকাদের নিয়ে ভাঁড় দুজন এবার মঞ্চে আসে। তারপর তাদের বিয়েও হয়। ঘর গৃহস্থীর নানারূপ ঝামেলটামেলা অত্যন্ত হাস্যপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত ক'রে, এক আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় নাটকটি।

ভাঁড়পথরে সবচেয়ে জমকালো পোষাক পরে রাজার চরিত্রাভিনেতারা। এরা লম্বা চোগা ব্যবহার করে। মাথায় পাগড়ী বাঁধে। গলায় দেয় মণি-মুক্তোর হার আর হাতে নেয় কোড়া বা চাবুক।

ভাঁড়পথরের অভিনয়ে এখনো মেয়েরা অংশ নেয়নি, ফলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করে অল্পবয়সী ছেলেরা। এরা পেশোয়াজ পরে এবং মাথায় বাঁধে তু'পট্টা। ভাঁড়েরা পরে চাদর, গায়ে দেয় শার্ট আর মাথায় দেয় হাস্যকর শঙ্কু-আকৃতির একধরণের টুপি। অন্যান্য চরিত্রাভিনেতাদের পোষাক দৈনন্দিন পোষাকেরই অনুরূপ। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব সাজ-পোষাক থাকে। আর এগুলি থাকে দলনেতা মাগুনের কাছে।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কয়েক বছরে ভাঁড়পথরের প্রচলন খুবই কমে গিয়েছিলো। ছ'য়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভাঁড়েরা আবার নতুন উদ্যমে তাদের এই ঐতিহ্য-মণ্ডিত নাট্য অঙ্গিকটিকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় ক'রে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। অনেক আধুনিক নাট্যকারও এই আঙ্গিকে নাটক লেখেন। ফলে বর্তমানে ভাঁড়পথর সমগ্র কাশ্মীরের গ্রাম-জীবনে খুবই শক্তিশালী এবং প্রভবিষ্ণু এক নাট্য-মাধ্যম। তবে এর শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। সরকারের পক্ষ থেকে তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।



পঞ্জাবের লোকনাট্য : নকল

নকল হাস্যরসাত্মক প্রহসনের উৎকৃষ্টতম নজির। নকল পরিবেশন করে পঞ্জাবের ভাঁড়েরা। তু'জন ভাঁড় মিলেই একটি দল তৈরী করে। উপর থেকে দেখলে বা এদের কথা শুনলে প্রাথমিকভাবে এদের খুব বোকা বলেই মনে হবে। আসলে এরা কিন্তু বোকা নয় বরং খুবই চতুর। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি এবং চাতুর্যের আকস্মিক প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যেই এরা বোকামির ভাণ ক'রে থাকে। এদের পরনে থাকে কম বহরের ধুতি—হাঁটু

অবধি তুলে পরা, গায়ে থাকে ঢিলা হাতা লম্বাশার্ট আর মাথায় থাকে একটু উঁচু করে বাঁধা পাগড়ী। স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করার সময় এরা এই পাগড়ী খুলে ওড়না ক'রে নেয়। কখনো আবার কোমরে বাঁধা অন্য একখানি কাপড—তা গামছাও হ'তে পারে—ওড়না হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওড়না দিয়ে মুখখানি ঢাকা সত্বেও এদের গোঁফ দেখা যায়। তবুও ওড়নার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারে এরা যেকোনো বয়সের যেকোনো স্ত্রীলোকের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে চোখের চরিত্রানুগ কটাক্ষে বা চাহুনি এবং নানাবিধ গ্রীবা ও অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যে। বয়স্ক লোকটিকে নকলের পরিভাষায় বলা হয় ভাইয়া। সেই নানাবিধ প্রশ্ন ক'রে শুরু করে অনুষ্ঠান। আর সঙ্গের ভাঁড়টি—স্ত্রী অথবা পুরুষ বেশী—উল্টোপাল্টা জবাব দিতে দিতে কাহিনীটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় হাসির এমন এক চূড়ান্ত বিন্দুতে যে ভাইয়া (সেও কোনো না কোনো চরিত্র তখন) তার হাতে লাগানো চামড়ার পাপ্পা দিয়ে জোরে জোরে চপেটাঘাত করে সঙ্গীটিকে। আর দর্শকও যে সময় হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে। শেষ হয় নকল। একটি নকল পরিবেশন করতে এদের সময় লাগে মাত্র দশ থেকে বারো মিনিট। ফলে নকলের একটি অনুষ্ঠানে আট থেকে দশটি নকল পরিবেশিত হয়—এক থেকে দেড ঘণ্টার মধ্যে।

সুদখোর মালিক ও তার বকাটে চাকর, বৌ-শাশুড়ি, চোর-পুলিশ, বাপ-বেটি, আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রেছিলাম—এরকম অজস্র 'নকল' আছে ভাঁড়েদের ঝুলিতে। এই সব নকল কিন্তু দীর্ঘদিন ধ'রে প্রচলিত আছে বংশ-পরম্পরায়। তবুও যখন তা পরিবেশিত হয় তখন তা একেবারেই সমকালীন ব'লে মনে হয়।

আসলে ভাঁড়েরা সমাজের ভ্রাম্যমান দর্পণ। হাসির মাধ্যমে সামাজিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে ব্যক্ত ক'রতে হয় তার শিক্ষা এরা লাভ ক'রেছে এদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। তাছাড়া নকল পরিবেশন ক'রে জীবিকা নির্বাহ ক'রতে হয় ব'লে এই বিদ্যায় তারা খুবই পারদর্শী। ফলে যদিও তাদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর, তবুও যখন তারা নকল পরিবেশন করে তখন মনে হয় স্বয়ং সরস্বতী তাদের জিবে ভর ক'রেছেন। রুজিরোজগারের তাগাদা, পুরুষানুক্রমিক অভ্যস্ততা এবং জন্মগত বুদ্ধির জোরেই এই নৈপুণ্য আজ তাদের অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। ফলে পরিবেশিতব্য বিষয়ে সমকালীনতার ছোঁয়াচ লাগাতে এদের কোনো কষ্টই হয় না, ফলে প্রচলিত নকল 'আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রেছিলাম' হ'য়ে দাঁড়ায় 'আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রেছিলাম'। তারপর এমন দক্ষতার সঙ্গে তারা এটি পরিবেশন করে যে দর্শক ধ'রে নিতে বাধ্য হয় যে তারা (বুঝি) সদ্য সদ্য প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রেছে। আসলে মানুষের চরিত্র সম্পর্কে এদের জ্ঞান অসাধারণ। ফলে পোষাকে কোনো

পরিবর্তন না ঘটিয়ে, প্রয়োজনানুগ সামান্য হেরফের ঘটিয়ে খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে যেকোনো চরিত্র এরা পরিবেশন করতে পারে।' এ ব্যাপারে তাদের শক্তি জোগায় তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তাই চলনের গতি বাড়িয়ে কমিয়ে, ধরনটা সামান্য পালটিয়ে লহমায় এরা কৃষক থেকে রাজায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। কৃষকের পাগড়ী তখন দর্শকদের কাছে হ'য়ে ওঠে মূল্যবান রাজমুকুট, আর নোংরা, বহর কম ধুতিখানি হ'য়ে উঠে চোস্ত কিংবা দামী রাজকীয় ধুতি।

ভাঁড়েরা অনাবিল হাসির জোগান দেয় বলে আনন্দে আত্মহারা দর্শকও এদের নিয়ে রঙ্গতামাশা করার লোভ সম্বরণ করতে পারেনা। ফলে অভিনয় চলাকালেই দর্শক তাদের টিপ্পনি কাটে, আর নকলের ভাঁড় নকলচী কিংবা নকলিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তখন যে বুদ্ধিদীপ্ত ও মজার মজার উত্তর দেয় দর্শক তাতে না হেসে আর পারে না।

যাইহোক, স্বাধীন হওয়ার পর নকলচীদের একটা বড় অংশ পাকিস্তান চলে যায়—ফলে নকলের চর্চায় বেশ থামতি দেখা দিয়েছিলো পাঁচের দশকে। কিন্তু বর্তমানে নকল তার পূর্বমর্যাদা ফিরে পেয়েছে। দর্শক-বেষ্টিত সমতল ভূমিতেই এর অভিনয় হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঢোল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে 'নৌটঙ্কী'-কাহিনীর উৎসভূমি হ'লো এই পঞ্জাব। ফলে এখানেও নৌটঙ্কী বেশ জনপ্রিয়। তবে বর্তমানে নৌটঙ্কীর প্রচার-প্রসার ও জনপ্রিয়তা উত্তর-প্রদেশেই বেশি। তাছাড়া এখানকার নৌটঙ্কীর বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য না থাকায় এবং উত্তর-প্রদেশের লোকনাট্য শীর্ষক অধ্যায়ে নৌটঙ্কীর আলোচনা সান্নিবেশিত হওয়ায় এখানে আর তার আলোচনা করা হ'লো না।

হরিয়ানার লোকনাট্য : সাঙ্গ

সাঙ্গ নকল, তামাশা এবং নৌটঙ্কীর পূর্বরূপ। অর্থাৎ সাঙ্গ থেকেই নৌটঙ্কীর বা নকলের উৎপত্তি। সাঙ্গ স্বাঙ্গেরই তদ্ভব-রূপ। সাঙ্গের অর্থ হ'লো রূপ বা বেশ ধারণ করা। সাঙ্গের জন্যে সাংগীত শব্দেরও প্রচলন আছে। যাইহোক, সাঙ্গ হ'লো হরিয়ানার লোকনাট্য। সাঙ্গ গীতাশ্রয়ী দীর্ঘ কাহিনী। অভিনয়ের সাহায্যেই এই কাহিনী পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ সাঙ্গ হরিয়ানার গীতাশ্রয়ী লোকনাট্য। এতে পদ্যেরই প্রাধান্য। তবে মাঝেমধ্যে কাহিনীর সূত্র স্পষ্টরূপে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে গদ্যেরও ব্যবহার হ'য়ে থাকে। সাঙ্গের পরিভাষায় এই গদ্যাংশকে 'বার্তা' বলা হয়। সাঙ্গে হৃদয়ের কথা বলে রাগ-রাগিনী সহযোগে 'গীত'-এর গীতগুলি, আর কাহিনী বিবৃত করে এর বার্তা।

উন্মুক্ত স্থানে কয়েকটি চৌকি সাজিয়ে অথবা সমতল ভূমিতে শতরঞ্জ বিছিয়ে এর অভিনয় হয়। দর্শকরা বসে মঞ্চের বা অভিনয়স্থলের চারদিকে। রঙ্গস্থল

আকারে বেশ ছোট। তবুও ঢোলক এবং সারেঙ্গী বাদক সহ অভিনেতারা সকলেই এই মঞ্চে অবস্থান করে বা ব'সে থাকে এবং যার যখন পালা আসে সে তখন উঠে তার অংশটুকু অভিনয় ক'রে আবার নিজের জায়গায় ব'সে পড়ে। সাঙ্গে এখনো পুরুষরাই স্ত্রী-বেশ ধারণ ক'রে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় করে।

প্রথমে ঢোলক ও সারেঙ্গীর বাজনা সহযোগে প্রার্থনা গীতি অর্থাৎ সারদা এবং শিবের বন্দনা করা হয়। গীতিসহযোগে গুরু পরম্পরারও পরিচয় দেয়া হয়, তারপর বার্তা সহযোগে কাহিনীর প্রস্তাবনা করা হয়। এই সমস্তের পরই নৃত্যগীত ও অভিনয় সহযোগে কাহিনী পরিবেশিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনের দশকে কিশনলাল ভাট এই সাঙ্গের প্রচলন করেন। এর আগে ও এই সময় বেশ্যাদের মুজরা ও নকলচীদের নকল খুবই জনপ্রিয় ছিল হরিয়ানাতে। ঐসময়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে যদি মুজরা কিংবা নকল পরিবেশিত না হ'তো তাহলে বিয়ের আনন্দ মাটি হ'য়ে যেতো। কিন্তু বেশ্যাদের মুজরা ও নকলচীদের নকল স্থূল শৃঙ্গার রসাত্মক হওয়ায় জনমানসে এদের বিরুদ্ধ-মানসিকতা শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে থাকে। ফলে কিশনলাল যখন সাঙ্গের প্রচলন করেন তখন স্বভাবতঃই হরিয়ানার মানুষ সাঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে পড়লো। কাজেই মুজরা বা নকলের অতীত জনপ্রিয়তা আর রইলো না। আবার নকল ও মুজরার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সমাজের রক্ষণশীল মানুষেরা সাঙ্গকেও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ কোরলো না। তবে জনগণ দারুণ ভাবে প্রভাবিত হ'য়ে প'ড়লো এই সাঙ্গ দ্বারা।

কিশনভাটের সাঙ্গে সাধারণতঃ স্ত্রী বেশধারী একজন পুরুষ অভিনেতা এবং সঙ্গে দুই তিনজন অন্য অভিনেতা অংশ নিতো। মশালচী মশাল হাতে অভিনেতার মুখ দৃশ্য ক'রে রাখার জন্য সকল সময়ই নৃত্য সহযোগে ক্রিয়াশীল থাকতো। ঢোলক এবং সারেঙ্গী বাদকও অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাজাতো। কিশনভাটের সাঙ্গে প্রযুক্ত ছন্দ হ'লো চৌবোলা। উচ্চস্বরে গীত এই চৌবোলাই কিশনলালের সাঙ্গকে জনপ্রিয় ক'রে তোলে। কিশনভাট প্রবর্তিত সাঙ্গের পরিচয় এখনো পাওয়া যায় সহারনপুর, মুজফ্‌ফর নগর, মেরঠ প্রভৃতি এলাকায়।

হাথরসের নথারাম গৌড় এই কিশনভাটের সাঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে স্বাঙ্গ রচনায় হাত দেন এবং অচিরেই আজকের হাথরসী নৌটঙ্কীর সূত্রপাত করেন। এই সময় হরিয়ানার সাঙ্গ এতই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলো যে সৈনিকদের ছাউনিতেও তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে বিভিন্ন সাঙ্গীকে (হরিয়ানার মণ্ডলীকে 'সাঙ্গী'ও বলা হয়) নিয়ে যাওয়া হতো।

পরবর্তী কালে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে হরিয়ানার সাঙ্গকে যুগোপযোগী ক'রে তোলার জন্যে এর সংস্কার সাধন করেন দীপচন্দ। দীপচন্দ ছিলেন

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ফলে অভিনেতাদের পেছন পেছন ঢোলক বা সারেঙ্গী ঘাড়ে ক'রে বাজানোর প্রথা তিনি তুলে দিলেন। কেননা এটা যেমন দৃষ্টিকটু, তেমনি রসসঞ্চারেরও প্রতিবন্ধক বটে। তিনি ঢোলক ও সারেঙ্গী বাদকের জন্যে মঞ্চের একপাশে জায়গা নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন। ফলে তাঁর সময় থেকে হরিয়ানার বেশিরভাগ সাঙ্গেই বাদ্যকাররা ব'সে ব'সে বাজনা বাজায়। অবশ্য পুরানো অভ্যেসবশতঃ এবং ঝোঁকের মাথায় কোনো কোনো নাট্যঘন মুহূর্তে এখনো কোনো কোনো ঢোলকবাদক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে। তবে অল্পক্ষণ পরেই আবার নিজের জায়গায় ব'সে পড়ে। বাদ্যকারদের এক জায়গায় ব'সে ব'সে বাজানোর রীতির প্রচলন ছাড়াও দীপচন্দ সাঙ্গের ছন্দও পরিবর্তন করলেন। কিশনলাল ভাটের পর থেকে সাঙ্গে চৌবোলার ব্যবহার হ'য়ে আসছিল। কিন্তু চৌবোলা গাইতে হয় খুব জোরে, অনেকটা চীৎকার ক'রে। এই চীৎকৃত গান যেমন সকলের পক্ষে গাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি তা অনেক সময় রসের হানিও ঘটায়। ফলে চৌবোলার পরিবর্তে প্রচলন করলেন 'কাফিয়া'-র। ছন্দ হিসেবে চৌবোলার চেয়ে কাফিয়া অনেক বেশি মিষ্টি। স্ত্রীচরিত্রাভিনেতার পোষাক-পরিচ্ছদও তিনি অনেক বেশি শিল্পমণ্ডিত ক'রে তুললেন। এদের জন্যে নির্দিষ্ট ক'রেছিলেন কালো রঙের ঘাঘরা, রুপোর অঙ্গিয়া এবং লাল রঙের ওড়না। সবমিলিয়ে দীপচন্দ হরিয়ানার সাঙ্গে এক নতুন জোয়ার নিয়ে এলেন। শোনা যায় প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি হরিয়ানার যুবকদের সেনাবিভাগে ভর্তি হ'তে অনুপ্রাণিত ক'রেছিলেন। আর এর জন্যে সরকার থেকে তাঁকে পুরস্কৃত করা হ'য়েছিলো।

দীপচন্দের পরে তাঁর শিষ্য হরদেবাও সময়ের চাহিদা অনুসারে আপন প্রতিভার স্পর্শে সাঙ্গের সংস্কার সাধন করেন। অঙ্গিয়া তুলে দিয়ে সাধারণ পোষাকের ব্যবস্থা ক'রলেন তিনি। তাছাড়া কাফিয়া ছন্দের পরিবর্তে প্রয়োগ করলেন 'রাগনী'। রাগনী হরিয়ানার লোকগীতি বিশেষ। কিছুদিন উভয়ের রীতি সমান জনপ্রিয়তায় হরিয়ানার সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করলেও শেষাবধি কিন্তু হরদেবার সাঙ্গই টিকে গেল। সাঙ্গ থেকে উঠে গেল 'অঙ্গিয়া' এবং 'কাফিয়া'। অন্যদিকে 'রাগনী' আজকের সাঙ্গেও বেশ জনপ্রিয়। হরদেবা প্রবর্তিত রীতির বিখ্যাত শিল্পীরা হ'লেন 'ভর্তু', 'চতু', 'বাজে' প্রমুখ।

যাইহোক, দীপচন্দ ও হরদেবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাঙ্গ অনেকবেশি জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। আর খুবই স্বাভাবিকভাবে এই সময় সাঙ্গে ঢোলক ছাড়াও নাকাড়ার প্রয়োগ আরম্ভ হ'লো, সংযুক্ত হ'লো সাঙ্গের বিদূষক চরিত্র 'মসখরা'। ব্যবসায়িক দিক থেকেও সাঙ্গ এই সময় বেশ উন্নতি করে।

এই শতাব্দীর তিনের দশক থেকে আবার সাঙ্গের বিরুদ্ধাচরণ করা হ'তে থাকে আর্যসমাজের নেতৃত্বে। আর্যসমাজের তরফ থেকে হরিয়ানার মানুষকে এ

ভয়ও দেখানো হ'লো যে সাঙ্গ দেখলে বা সাঙ্গের আয়োজন ক'রলে সমাজচ্যুত হ'তে হবে। স্বাভাবিক কারণেই সাঙ্গের প্রচলন অনেক কমে যায়। সাঙ্গের এই দুদিনে বিপত্তারণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেন পণ্ডিত লক্ষ্মীচন্দ। লক্ষ্মীচন্দ নিজে অনেকগুলি সাঙ্গ রচনা করলেন। নিজে গান লিখে তাতে সুরও দিলেন। নতুন সেই সুরের জোয়ারে আর্যসমাজের তাবৎ বিরোধ খড়-কুটোর মত ভেসে যায়। সাঙ্গ আবার তার সম্মোহিনী মায়ায় হরিয়ানার আপামর জনসাধারণকে একেবারে নাচিয়ে তুললো। ফলে অনেক প্রতিভাবান মানুষ পুনরায় সাঙ্গের চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। পণ্ডিত যোগেরাম তাঁদেরই একজন। তিনি ছিলেন লক্ষ্মী-চন্দের শিষ্য। যোগেরাম স্ত্রী চরিত্রাভিনেতাদের 'ঘাঘরা' তুলে দিয়ে সালোয়ারের প্রচলন ঘটালেন। সেই থেকে সাঙ্গের স্ত্রী চরিত্রাভিনেতারা সালোয়ার প'রে আসছে। দত্তবাদিকা এবং আজাদমাষ্টার সাঙ্গাভিনয়ে মহিলাদের দিয়ে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় করালেন। ব্যাপারটি হরিয়ানার সাঙ্গ-প্রেমীরা ভালো চোখে দেখলো না। ফলে স্ত্রীলোক দিয়ে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় সাঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

কিশনলাল ভাট থেকে পণ্ডিত যোগেরাম অবধি সাঙ্গের ইতিহাস মূলতঃ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এর ইতিহাস। আর সে লড়াই-এ সাঙ্গ ও তার একনিষ্ঠ সেবকরা যে জয়ী হয়েছেন এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। বর্তমানে তার আবার নাভিশ্বাস উঠেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের যক্ষের হাতের পীড়নে। হরিয়ানার সাঙ্গ আজ যেমন জনপ্রিয় তেমন এক অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। সাঙ্গের আসরে আজ যক্ষের আধিপত্য। ফলে এর লোক-কল্যাণকর রূপ এবং শিল্পের দিকটি বড়ই অবহেলিত। ফলে হরিয়ানার সাঙ্গ আরেকবার, সম্ভবতঃ শেষবার, তার অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। আর তাই হরিয়ানার জনমানসের ঐকান্তিক কামনা আবার কোনো 'চন্দ'-এর আবির্ভাব ঘটুক, যিনি সাঙ্গকে যক্ষের কবল থেকে মুক্ত করে তাকে একই সঙ্গে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর হাতে সমর্পণ ক'রে দি'তে পারবেন। অচিরেই হরিয়ানার মানুষের এই ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ হ'য়ে উঠবে—এই আশা রাখি।

হিমাচল প্রদেশের লোকনাট্য ঃ করিয়ালা

কাহিনী, পাণ্ডুলিপি, পরিচালক, প্রযোজক, মঞ্চোপকরণ এবং পর্যাপ্ত পোষাক-পরিচ্ছদ বা রূপসজ্জা বাদ দিয়ে কি কোনো নাট্যাভিনয় সম্ভব ?—সম্ভব। হিমাচল প্রদেশের করিয়ালা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, আর সেই কারণেই এই নাটক দেখার জন্য নানা বয়েসের নানা রুচির ও মনস্কতার মানুষ রাত জেগে পরম আগ্রহে ব'সে থাকে।

করিয়ালা হিমাচল প্রদেশের লোকনাট্য। করিয়ালাকে "স্বাঙ্গ"ও বলা হয়।

এর অভিনেতাদের বলা হয় 'করিয়ালচী বা স্বাঙ্গী'। আঙ্গিকের সামান্য পরিবর্তন-এর কারণে হিমাচল প্রদেশের এই লোকনাট্যের আরও দুই ভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে—বান্থ্রা এবং ভগত। এখানে হিমাচল প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী এলাকা—কাণ্ডঘাট, সোলন, ধামী, মাহ্লোগ, কোঠার, ভাজ্জী, মাণ্ডী, বিলাসপুর এবং সিরমৌর-এর দিকে প্রচলিত ক্রেলা বা করিয়ালা নিয়েই আলোচনা করা হ'য়েছে।

করিয়ালা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে মত পার্থক্য আছে। কেউ কেউ মনে ক'রে থাকেন নাট্যশাস্ত্রের 'ক্রীডণীয়কম্' ই উচ্চারণ পরম্পরায় করিয়ালা হ'য়ে পড়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন স্থানীয় সুগন্ধি ফুল "করিয়াল" থেকেই এসেছে শব্দটি। রহস্যোদ্ঘাটন অর্থে 'কারেল' ব'লে একটি পাহাড়ী শব্দের প্রচলন আছে। 'কারৈল' ব'লে আরেকটি শব্দ এ প্রসঙ্গ থেকে বাদ দেয়া যায় না। কারৈল-এর অর্থ হ'ল কোনো দেবতার কাছে বিশেষ কোনো কামনা পূর্তির জন্যে প্রার্থনা।

যাইহোক, করিয়ালার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বা পূর্বরঙ্গবিধি ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই সম্পাদিত হ'য়ে থাকে। "চৌমুখ দীয়ত"—অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দিক উজ্জ্বলকারী চতুর্মুখী একটি প্রদীপ জ্বালানো, "ভূমি স্পর্শ"—অর্থাৎ ধরিত্রী মাতার উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানানো, "আখড়া এবং বাদ্য স্পর্শ"—অর্থাৎ ঢোল, নাকাড়া, সানাই, করনাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের পূজা করা এবং "ধিনা পরিক্রমা"—অর্থাৎ অগ্নি (কুণ্ডের) প্রদক্ষিণের মাধ্যমে পরম ব্রহ্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো প্রভৃতি আঞ্চলিক আচার অনুষ্ঠান করিয়ালার পূর্বরঙ্গ বিধিতে অবশ্য পালনীয় সব ক্রিয়াদি।

করিয়ালা আঙ্গিকের উৎস নিয়েও করিয়ালার গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। হিমাচলের ওম চাঁদ হাণ্ডা মনে করেন—অঙ্গিক হিসেবে করিয়ালার প্রাচীনত্ব বিষয়ে নানাপ্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থাকলেও তা খুব বেশী প্রাচীন নয়। তাঁর মতে করিয়ালার উদ্ভবে সপ্তদশ শতাব্দীর ভক্তি আন্দোলনের বড় রকমের একটা প্রভাব আছে। অন্যদিকে হিমাচলেরই শ্রীরামদয়াল নীরাজ মনে করেন—সংলাপবহুল এই লোক-নৃত্য-নাট্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রেরও পূর্ববর্তী। গাধীয়া পার্টির করিয়ালচী শ্রীপরশরাম তোমারও করিয়ালার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান।

করিয়ালার অন্যান্য দিক নিয়ে এবারে আলোচনা করা যাক। করিয়ালার কোনো নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপি নেই—অর্থাৎ লিখিত নাটক করিয়ালাতে নেই। ফলে করিয়ালচী বা করিয়ালার অভিনেতাকে তাৎক্ষণিক ভাবে বিভিন্ন সব ঘটনা পরিবেশন ক'রে উপস্থিত বুদ্ধি ও পরিণতঃ অভিনয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার ব্যাখ্যা ক'রে দর্শক সাধারণকে আনন্দ দিতে হয়। কল্পনা-প্রসূত এই ঘটনার পরিবেশনে তাদের শারীরিক ও বাচনিক প্রকাশ ভঙ্গিকে নিত্যই নতুন নতুন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙ চড়াতে হয়—যাতে ক'রে দর্শক অভিনেতার প্রকাশ কৌশল ও তার

অভিনবত্বে টান টান হ'য়ে বসে থাকতে পারে। সত্তপ্রসূত ঘটনাগুলিকে তারা এমনভাবে উপস্থিত করে—যাতে ক'রে সব ঘটনা মিলে পূর্ণাঙ্গ এক কাহিনীর চেহারা নিতে পারে।

যাইহোক, করিয়ালার অভিনয় শিক্ষার জন্য কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই। অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য ও দক্ষতা যেন করিয়াচীর এক জন্মগত উত্তরাধিকার।

তাল, ছন্দ ও যুক্তিবাদের প্রতি জাতিগত উৎসাহ এই অবিরাম বাস্তবকল্প কাল্পনিক কাহিনী নির্মাণে তাদের সামর্থ্য এনে দিয়েছে। জাতিগত স্বাভাবিক তাল ও মাত্রা জ্ঞানের কারণে করিয়ালচীদের তথা অভিনয়ের প্রতিটি মুহূর্তই তাল-লয় সমন্বিত। ফলে, নটী, তাল প্রভৃতি শব্দ হিমাচলীদের জীবনেরই অনুষঙ্গ হ'য়ে পড়েছে। এই তাল-মাত্রা জ্ঞান করিয়ালার সংলাপ রচনা (তাৎক্ষণিক ভাবে) ও তার উচ্চারণে অভাবনীয় এক সময় জ্ঞানের নজির সৃষ্টি ক'রে অনুষ্ঠানকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ক'রে রাখে। শুধু তাই-ই নয় তাৎক্ষণিক ভাবে—অভিনেতাদের কল্পনাশক্তিতে—রচিত দলবদ্ধ উত্তর-প্রত্যুত্তর অন্ত্যমিল-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ "সাধু কা স্বাঙ্গের" একটি অংশ এখানে তুলে দেওয়া হ'ল।

কঁহা সে তুম জোগী আএ, কঁহা তুমহারা ভাব;
কঁহা তুমহারা বহন ভানজা, কঁহা রখোগে পাঁব?
পুরব সে হাম জোগী আএ, পাচ্ছেম হমারা ভাব,
ধরতী হমরী বহন ভানজী, স্থনী কী ছাতীপে রাখেঙ্গে পাঁব॥

বিদূষক:—আঁও তাহারা বাঁও।

সাধুবাবারা!
কোথা থেকে আসছো তোমরা, কোথায় এখন যাবে?
বোন-বোনঝি আছে কেউ, কোথায় তোমরা রবে?
পুবদেশেতে থাকি মোরা, পশ্চিমেতে যাই।
পৃথিবীটাই ঘর আমাদের, বোন-বোনঝিও তাই।

অমনি বিদূষক টিপ্পনী কাটে—"তোমাদের মাথা আর আমার (ঠ্যাং বা) মুণ্ডু।"

যুক্তি-নির্ভরতা করিয়ালার একটা বড় সম্পদ। তাছাড়া করিয়ালচীরা স্বভাবতঃ অন্তর্দর্শনে খুবই দক্ষ। এই অন্তর্দৃষ্টির জোরে ঠগবাজকে ঠকাতে, স্ববিরোধিতার উন্মীলন ঘটাতে, প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটনে এবং মহত্ত্বের গুণগান করতে তারা খুবই সক্ষম। বলাই বাহুল্য যে এসবই সম্ভব হয় তাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং যুক্তি-প্রবণতার প্রতি আসক্তির জন্যই। কোনো ধরণের ভণ্ডামিতে করিয়ালচীরা বিভ্রান্ত হয় না, এবং ভণ্ডামি বা কপটতা দূর করতেও তারা বেশ সিদ্ধহস্ত। তুচ্ছাতি-তুচ্ছ সব বিষয়ের মধ্যে যুক্তি ও দর্শনের প্রয়োগ ক'রে নানাভাবেই তারা আনন্দ পায় এবং দর্শকদেরও আনন্দ দেয়।

আনন্দোচ্ছল বহুবিধ ঘটনার সমৃদ্ধ করিয়ালা হিমাচল প্রদেশের বৈচিত্র্যময় জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সাহায্যে করিয়ালচীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সব ঘটনা জীবন্ত ও আকর্ষণীয় ক'রে তোলে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মত অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আনন্দোচ্ছল হাসিঠাট্টার মাধ্যমে পরিবেশিত হয় এই করিয়ালায়। ফলে কোনো আধ্যাত্মিক বাণী ও তত্ত্বকথা শুধুমাত্র দর্শকের হৃদয়ের ধন হ'য়েই থাকেনা—অবসর সময়ে পাড়া-পড়শীদের মজলিশে বেশ সরসভাবে তারাও পরিবেশন ক'রে ছড়িয়ে দেয় সেই সব তত্ত্বকথা।

করিয়ালার রঙ্গস্থল : যে কোনো ফাঁকা জায়গা করিয়ালার অভিনয়ক্ষেত্র হ'য়ে উঠতে পারে। তবে ফসল তোলার পর মাটি সমান ক'রে নিয়ে অথবা গৃহস্থের বাড়ীর উঠোনেই সাধারণতঃ করিয়ালার অভিনয় হয়। খোলা জায়গায় দর্শকরা বসে অভিনয়ক্ষেত্রের চারধারে। আর বাড়ীর উঠোনে যখন অভিনয় হয় তখন বাড়ীর লোক ও তাদের আত্মীয় স্বজন সাধারণতঃ বারান্দার যে কোনো জায়গায় ব'সে অভিনয় দেখে। অভিনয়ক্ষেত্রটি চতুষ্কোণ (সংস্কৃত চতুরস্রের সঙ্গে এর দূরতম সাদৃশ্য আছে ব'লে অনেকে মনে করেন)। চার কোণে চারটি কাষ্ঠদণ্ড পুঁতে এর সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়। দণ্ডগুলির গায়ে 'ভলৈতা' কাঠের বেশ কয়েকটি মশাল আটকিয়ে দেয়া হয়। এই মশালের আলোয় অভিনয়ক্ষেত্র আলোকিত হয়। আর ঢোলক ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রীদের কাছে জ্বেলে দেয়া হয় পবিত্র অগ্নিকুণ্ডটি। অবশ্য বর্তমানে কেরোসিন বা গ্যাস এমনকি বৈদ্যুতিক আলোও করিয়ালায় ব্যবহৃত হ'চ্ছে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দর্শক আখড়া বা অভিনয়ক্ষেত্রে ঢুকতে পারে না। তাই কোনো ছলে তারা যাতে অভিনয় ক্ষেত্রে ঢুকে না পড়ে তার জন্য কাষ্ঠদণ্ডগুলিতে দড়ি বেঁধে ঘিরে রাখা হয়

অভিনয়ানুষ্ঠান :

ঢোলও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহযোগে জঙ্গ তালের বাজনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দর্শকদের আমন্ত্রণ জানানো এবং সমবেত হ'য়ে তাদের আসন নেয়ার দিক থেকে করিয়ালার এই পূর্বরঙ্গ-বিধির গুরুত্ব খুব বেশী। যতক্ষণ না পর্যাপ্ত মাত্রায় দর্শক এসে সমবেত হয় ততক্ষণ ধ'রে চলতে থাকে এই অনুষ্ঠান। দর্শক আসন নেয়ার পর শুরু হয় 'পুজাওয়াল' বা কল্যাণময় দেবতা বিজ্জুর প্রার্থনা। হিমাচলপ্রদেশে বিজ্জুর অনেক মন্দির লক্ষ্য করা যায়। দেব 'বিজ্জু' জুব্বে 'বীজেশ্বর' এবং হিমাচল প্রদেশে 'দেওথাল' নামে পরিচিত। মূর্তিরূপে বিজ্জু কুঠার হস্তে ক্রীড়ারত। পুজাওয়ালের পর আরম্ভ হয় চন্দ্রাবলী নৃত্য। এই নৃত্যই করিয়ালার প্রথম অভিনেয় অংশ। চন্দ্রাবলী ও তার প্রেমিকের নৃত্য এখানি। এদের সম্পর্কে নানা মতের প্রচলন আছে। কেউ কেউ বলেন চন্দ্রাবলী ষোড়শ শত গোপিনী-দেরই একজন এবং তার প্রেমিকটি আর কেউ নয় তাদের হৃদয়েশ্বর কানাই।

আবার কেউ কেউ বলেন, চন্দ্রাবলী হ'লেন পার্বতী এবং প্রেমিকটি হলেন শিব। তন্দু. অবধূত অথবা ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে তিনিই নাটকের সূচনা করেন। যেহেতু হিমাচল-প্রদেশ হর-পার্বতীর দেশ, সেইহেতু দ্বিতীয় মতটিই অধিক সমীচীন ব'লে মনে হয়। চন্দ্রাবলীর সঙ্গী অবধূতের বা 'সিদ্ধ'-এর স্থানীয় নাম 'চিরগিয়া'। চিরগিয়ার কাজ আরম্ভ করা বা হাসানো। এমনও হ'তে পারে যে এই অবধূত ছদ্মবেশে নৈর্ব্যক্তিকভাবে আদিম 'তাণ্ডব ও লাস্য' নর্তকদের প্রতিভূ বা স্মৃতিরেশ হ'য়ে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে একেবারে মাতিয়ে রাখে। নাট্যানুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এটা।

বিলম্বিত লয়ে চোদ্দমাত্রার একটি তালে চন্দ্রাবলী নেচে চলে, করিয়ালার পরিভাষায় এই তালটির নাম 'বধাই' তাল। তার ডানহাত খানি থাকে মুখের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উচুঁতে এবং বাঁ হাতখানি অনুভূমিকভাবে তার বুকের ওপর। ঘোমটা টেনে ঘুঙুর না প'রে এই একই ভঙ্গিতে সে আখড়া প্রদক্ষিণ করে। চিরগিয়াও তাকে অনুসরণ করে। তার হাতে থাকে ডমরু বা কুড়ুল। হাস্যকর ভাবে পোষাক প'রে সেও চোদ্দমাত্রার তালের ফাঁকে নানা রূপ অঙ্গভঙ্গী করতে করতে নেচে চলে। নাচের ফাঁকে ফাঁকে সে পবিত্র অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন নিয়ে স্তম্ভের গায়ে বাঁধা মশালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটাকে বলা হয় আসর বাঁধা। বধাই তাল থেকে এই সময় বাজানো হয় জঙ্গ তাল। সবমিলিয়ে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রকে অভিনয়ের উপযুক্ত ক'রে তুলতে এবং দর্শকদের নাটকাভিনয়ের প্রতি আগ্রহী ক'রে তুলতে চন্দ্রাবলী নৃত্যাংশের গুরুত্ব করিয়ালাতে খুববেশী। দশ মিনিট ধ'রে চলে এই নৃত্য।

চন্দ্রাবলীও তার সঙ্গী সিদ্ধ যখন খুব দ্রুতলয়ে করিয়ালা (নামক) লোকতালে নাচতে থাকে তখন আখড়া থেকে একটু দূরে দু'জন নেপথ্যকর্মী কর্তৃক ধৃত একখানি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে বিবিধ সব শ্লোক আবৃত্তি করা হয় —যতক্ষণ না পর্দাখানিকে এক ঝটকায় একদিকে সরিয়ে নেয়া হয়। সাধুরা তখন দর্শকাসনের মধ্যে থেকে, নানা দিক থেকে আখড়ায় এসে হাজির হয়। সাধুদের এই মঞ্চ-আগমন এতই নাটকীয় এবং চমৎকার-দর্শন যে দর্শকরা একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

পর্দার আড়ালে বা নেপথ্যে দাঁড়িয়ে সাধুরা প্রথমে মাতা ভবাণী, তাঁর পুত্র গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের বন্দনা করে। তারপর নানাবিধ শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকে—একথা আগেই বলা হ'য়েছে। যাইহোক, মঞ্চে এসে তারা নাচে গানে আসর একেবারে মাৎ ক'রে দেয়। এই সময় তারা যে গান গায় প্রায় ক্ষেত্রেই তার সাধারণ এবং পরিচিত ধুয়োটি হলো—"সাধো কী নগরিয়া বসে না বে কোঈরে জোঈ বে বসে সাধু হোয়ে।"

অর্থাৎ— "কেই বা আর করে বাস সাধুদের নগরে।
যেই বা করুক বাস, তাকে সাধু বলা হয়রে।"

নাচগান শেষ হ'লে পুছনেওয়ালা সাধুদের নিবাস, দেশ-বিদেশের খবর এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করে। পুছনেওয়ালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সাধারণতঃ গ্রামেরই একজন বয়োবৃদ্ধ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মানুষ এবং এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের নানাবিধ জটিল সংস্থার অবতারণা করা হয় করিয়ালার এই প্রাথমিক নাটিকাভিনয়েই। মনে রাখা প্রয়োজন যে এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। গ্রামের নিরক্ষর ও অপেশাদার শিল্পীদের সমবেত এবং উন্নতমানের নাট্য অভিজ্ঞতারই ফসল এটি। করিয়ালায় পরিবেশিত নাট্যাংশগুলির মধ্যে সাধু কা স্বাঙ্গই দীর্ঘতম। করিয়ালায় ভারতীয় দর্শনের নানাদিক খুবই সরল অথচ জটিল দ্বান্দ্বিকতার মধ্যদিয়ে আলোচিত হয়। ফলে তার প্রতিপাদ্যগুলি খুবই স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে দর্শকের কাছে। উচ্চারণ, শারীরিক অভিব্যক্তি কিংবা গতি সবই যেমন তাল-লয় সমন্বিত তেমনি যুক্তিসিদ্ধও।

করিয়ালার একটি অনুষ্ঠানে যতকিছু শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরিত হয়, তার বেশির ভাগই সন্নিবেশিত এই প্রথম স্বাঙ্গ বা নাটিকাখানিতে। অথচ সাধু কা স্বাঙ্গ কখনোই দর্শকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় না বরং উপস্থাপন ভঙ্গীর চমৎকারিত্বে তারা বেশ আগ্রহভরেই ব'সে থাকে এবং দেখেও। করিয়ালার এই সহজতা ও তজ্জনিত সার্বজনীনতার দরুণ ব্রেশটের বিযুক্তি এবং নাট্যশাস্ত্রের সাত্বিক অভিনয় দু'য়েরই প্রকাশ ঘটে সম্যক মাত্রায়, ফলে দর্শক সাধারণও উৎসাহী হ'য়ে ওঠে পরবর্তী ঘটনার জন্য। এই স্বাঙ্গে বিদূষকের হাতে থাকে বাঁকানো একখানি কাঠের লাঠি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের হাতেও এমনি এক লাঠি থাকে। সিমলার নিকটবর্তী এলাকায় এই বিদূষককে বলা হয় "পুরবিয়া," কাঙ্গরার দিকে দগু এবং বিলাসপুর ও মাণ্ডির দিকে 'বাউরা'। করিয়ালায় দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সব ঘটনাবলী সংস্কৃত শ্লোক এবং উপকাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় ভাষায় অতি প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়, স্পষ্ট করা হয় ভারতীয় দর্শনের মূল সত্যটিকে। তবুও কিন্তু এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য এবং আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত কাহিনী থাকে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় পুছনেওয়ালা এবং সাধুদের মধ্যে সংঘটিত প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে গুরু তাঁর এক শিষ্যকে দাঁতন ও স্নানের জল সংগ্রহ করতে বলেন। এই সময় নৃত্য সহকারে পরিবেশিত হয় একটি গান। গানখানি ঘটনার সঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। সাধু কা স্বাঙ্গ বিষয়গত ভাবে যেমন গম্ভীর তেমনি জ্ঞান-প্রদায়ী। চেলা স্নানের জল আনতে এবং সাধুর জন্যে দাঁতন জোগাড় করতে গেলে পুকুরের মালিক এবং সাধুদের মধ্যে বেধে যায় বিষম এক বিবাদ। কাজে কাজেই শৈথিল্য আসে স্বাঙ্গখানির জ্ঞান-গম্ভীর পরিবেশে।

দর্শক সাধারণও ভিন্নরকমের আস্বাদনে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় এই স্বাঙখানি। অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্বাঙখানির এই আকস্মিক পরিসমাপ্তিও যেন নতুন এক অর্থ বয়ে আনে।

প্রচলিত রীতি অনুসারে সাধু কা স্বাঙই করিয়ালার প্রথম স্বাঙ (বা নাটিকা)। সাধু কা স্বাঙ প্রথমে বা আদৌ পরিবেশিত না হ'লে করিয়ালার একটি আসর যেন সম্পূর্ণতা পায় না, ফলে কুলদেবতা অপ্রসন্ন হন এবং অভিশাপ দেন কুশীলবদের। করিয়ালচীদের কাছে এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে অনুষ্ঠানের শুরুতেই তারা সাধুকা স্বাঙ পরিবেশন করেন। সাধুকা স্বাঙের পরে যেকোনো স্বাঙই পরিবেশিত হ'তে পারে। করিয়ালার একটি অনুষ্ঠানে কখনো কখনো দশ থেকে বারোখানি স্বাঙ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে।

সাধুকা স্বাঙ অত্যন্ত সফলভাবে দর্শক মনে পরিচ্ছন্ন এক প্রভাব বিস্তার ক'রে জীবন ও জগত সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলো। স্বভাবতঃই এমনি সময় প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে আনন্দজনক কোনো উপকরণের। হৈ-হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাতে ক'রে দর্শক সাধারণ একটু ভিন্ন রসের আস্বাদ পায়, তারই জন্যে সাধারণতঃ দ্বিতীয় সঙ হিসেবে পরিবেশিত হয়—"ঝুলনা"।

সাধু কা স্বাঙ যেমন ভারতীয় দর্শনবোধের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা দেয়। তেমনি "ঝুলনা" পরিবেশন করে বিভিন্ন সব ভারতীয় তাল। চার থেকে পাঁচজন ব্যক্তি "হো-হো-হো! হো-হো-হো ক'রে চীৎকার করতে করতে তিন / দুই মাত্রার সমন্বয়ে পাঁচ তালে নাচতে নাচতে মঞ্চে আসে। এই সাদাসিদে ছড়াকাররা সকলেই শয়তান এক ভাঁড়ের শিকার। শয়তানটি শুকনো একটি লাউ বা লাউয়ের বস এদের প্রত্যেকের মাথায় বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলে। স্বাঙখানি বিভিন্ন রুচি ও বয়সের দর্শকের কাছে সমানভাবেই আকর্ষণীয়। শয়তানটি মুখ দিয়ে আগুনের রশ্মি গিলে তা আবার বের করতে পারে। কখনো কখনো সে আবার একদলা কাগজ চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে—কিন্তু বমি ক'রে যখন তা বের করে, তখন তা আর শেষ হ'তে চায় না। নাটকাভিনয় এখানে একেবারে ম্যাজিক হ'য়ে ওঠে নিঃসন্দেহে। আর সাদাসিদে ছড়াকার চারজন বিভিন্ন ছন্দে তাৎক্ষণিক ভাবে ছড়া কেটে চলে স্থানীয় ঘটনা ও মানুষ নিয়ে। সব মিলিয়ে ঝুলনা কৌতুক রসাত্মক, ফলে দর্শক সাধারণ—বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী দর্শকেরা—এই স্বাঙখানি চলাকালে হেসে একেবারে লুটোপুটি খায়।

অঙ্গরাগ :

স্থানীয় উপকরণে চর্চিত করিয়ালচীদের অঙ্গরাগ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। ফলে করিয়ালায় প্রযুক্ত অঙ্গরাগে কোনো খরচই প্রায় হয় না। মেক আপে সাধারণতঃ সাদা, কালো এবং লাল এই তিনটি রঙই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। চালের গুঁড়ো বা ময়দা গুলে তৈরী করা হয় সাদা রঙ, রুটি শেঁকা তাওয়ার তলাকার ঝুলো

কালি গুলে করা হয় কালো রঙ আর লাল রঙটি পাওয়া যায় 'গেরু' নামে স্থানীয় লাল মাটি গুলে। দাড়ি-গোঁফ তৈরী করা হয় সাধারণতঃ পাট দিয়ে। মুখোশ তৈরী করা হয় গাছের ছাল, কাগজের মণ্ড বা বাঁকা কাঠ দিয়ে।

ইংরেজদের ট্রেনে ক'রে সিমলায় প্রবেশে করিয়ালার অধিবাসীদের যে প্রতিক্রিয়া বা বিস্ময়, তা মূর্ত হ'য়ে ওঠে এক নিরক্ষর গ্রাম্য করিয়ালচীর এই ছড়াটিতে—

অংগরেজ, অংগরেজ ইস হম কী বেল, জিনহোনে অজব বনাই রেল ;
গাড়ী জুটে না ঘোড়া জুটে চলে ধুঁয়ে কে গেল
কি শিমলা খুব বনা হ্যায়, শিমলা খুব বনা হ্যায় ॥
হো হো, হো, হো, হো, কি, হো, হো, হো, হো ॥

ঐ চারজন লোক এই ছড়াটি আবৃত্তি করতে থাকে সমবেত ভাবে এবং হো হো হো হো ক'রে শেষ করে। আর ঠিক তখনি দর্শক—বিশেষ ক'রে বাচ্চাদের হাসির গমকে গমকে, বাজনার তালে তালে শয়তানের হাতের লাউয়ের বসখানি বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় একে একে এসে পড়ে ছড়াকারদের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় ঝুলনা স্বাঙ।

প্রায়ক্ষেত্রেই তৃতীয় স্বাঙ হিসেবে পরিবেশিত হয় "সাহেব কা স্বাঙ।" এই স্বাঙখানিতে হিমাচলীদের নাট্য প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাহেবের সংসার, চাকরবাকর ও সাহেবের চরিত্র-চিত্রণ দারুণভাবেই নিখুঁত, ফলে, বিশ্বাসযোগ্য ; সাধুকা স্বাঙে সাধুদের দাড়িগোঁফ ও অন্যান্য সমস্ত কিছুই বাস্তবধর্মী, ঝুলনায় অদ্ভুত প্রকৃতির এবং সাহাব কা স্বাঙে ব্যবহৃত হয় মুখোশ, মেকআপে বৈচিত্র্য আনার জন্যই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অঙ্গ-সজ্জার এই বৈচিত্র্যসাধনের মধ্যে সিমলার গ্রামদেশের নিরক্ষর করিয়ালচীদের নাট্যজ্ঞান সত্যিই বিস্ময় উদ্রেক করে।

এখানে শুধু সিমলার করিয়ালচীদের উল্লেখ করা হ'লো এই কারণেই যে হিমাচলপ্রদেশের কেবলমাত্র সিমলাতেই বসবাস ঘটেছিল ইংরেজদের। ফলে সিমলার মানুষ ইংরেজদের রীতি-রেওয়াজ আদব-কায়দার প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনে সক্ষম হ'য়েছিল। এই জ্ঞান সম্যকরূপে প্রকাশিত এখানকার সাহাব কা স্বাঙে।

সাহাব কা স্বাঙ আরম্ভের আগে আনন্দে দর্শকরা যেন মেলা বসায়। ফলে স্বাঙ শুরু হ'তে না হ'তেই চাপরাশি এসে বলে—"হল্লা গুল্লা বন্ধ করো,—সাহাব আ রহা হ্যায়'। এরপর সাহাব আসেন। তিনি চাপরাশিকে জিগ্যেস করেন "কি ব্যাপার, কি হ'চ্ছে"? চাপরাশি বলে—"মেলা, মেলা বসেছে হুজুর"। সাহাব বলেন—"ঠিক আছে, যাও মেম সাহেব এবং খানসামাকে ডাকে"। তখন তাঁর হম্বিতম্বি দেখে মনে হয়—তিনি যেন ওখানেই সৈন্য মোতায়েন ক'রে শিবির গাড়বেন।

সাহেব এবং তার দলবলকে দেখে গ্রামবাসীরা কেমন বিস্মিত হ'য়ে পড়ে। তাদের এই বিস্ময় মূর্ত হ'য়ে ওঠে রঙ-বেরঙের পোষাক ও শঙ্কু-আকৃতির টুপি পরা অদ্ভুদ দর্শন একটি লোকের হাব ভাবে। এমনি এক নাটকীয় মুহূর্ত থেকে, দর্শকের চিন্তাকে ঘটনা থেকে বিযুক্ত করার জন্য পরিবেশিত হয় সমবেত সঙ্গীত এবং দ্বৈত নৃত্য। দ্বৈত-নৃত্যে অংশ নেয় সাহেব এবং মেম। আর সমবেত সঙ্গীতে অংশ নেয় মলন ও অন্যান্য শিল্পীরা। তারা গায়—পিএলিয়েঁ মিম লাল সাহিবে—অর্থাৎ হলুদ মেম এবং লাল সাহেব, ইত্যাদি।

বিদেশীদের প্রতি করিয়ালচীদের দৃষ্টিভঙ্গি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির, কোনো বিদেশী করিয়ালচীদের গ্রামে এলে করিয়ালচীরা তাদের নানা ভাবে উত্যক্ত ক'রে অহঙ্কার প্রকাশ ক'রে থাকে। বিদেশী অভ্যাগমে হিমাচল প্রদেশের সমস্ত গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়ারই প্রতিমূর্তি চরিত্রটিকে বলা হয় "সন্যি"। আমরা আগেই সন্যির বর্ণনা দিয়েছি। করিয়ালার বিভিন্ন স্বাঙ্গের ভাঁড় বা বিদূষকের সঙ্গে সন্যির চরিত্রগত সাদৃশ্য খুব সহজেই ধরা যায়। সাধুকা স্বাঙ্গের পূরবিয়া কিংবা ঝুলনার অগ্নিভক্ষক বিকট দর্শন শয়তান—এরা সকলেই সন্যির নিকট আত্মীয়। প্রত্যেকটি স্বাঙ্গে একজন ক'রে ভাঁড় অবশ্যই থাকে। তারা একাধারে হাস্যরসের সাহায্যে যেমন দর্শকদের আনন্দ দেয়—তেমনি স্বাঙ্গ খানির পরিচালনা ও পরিবেশনে বেশ বড় একটা ভূমিকা পালন করে। শেক্সপীয়ারের মিড্ সামারস্ নাইটস্-এর বটম এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে করিয়ালার ভাঁড়রা তুলনীয়।

যাইহোক, 'সাহাব কা স্বাঙ্গ'—এর বিদূষক সন্যির মুখ্য কাজ হ'লো উল্টো-পাল্টা সব কথা ব'লে সাহেবের গুরুমন্যতা ক্ষুন্ন করা। এর ফলে সাহেবের সঙ্গে তার একটা সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সাহেব ও দর্শকের সঙ্গে তার একটা সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সাহেব ও দর্শকের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ স্থাপনের পথ অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে।

সাহাব কা স্বাঙ্গে হাস্যরসের উৎস হ'লো-একাধিক অর্থ-দ্যোতক শব্দের ছন্দময় প্রয়োগ, বিশপদের চার্চ বা গীর্জা সম্পর্কে বক্রোক্তি এবং ব্যবহার বিধির শ্রীহীনতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা।

করিয়ালচীরা প্রায় সকলেই গ্রামের সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরিবেশিত হাস্যরস স্থূলতা বা অশ্লীলতায় পঙ্কিল নয়। এদিক দিয়ে করিয়ালাই বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রমী লোকনাট্য, যদিও বর্তমানে কোনো কোনো জায়গায় তার নির্মল হাস্যরস স্থূল অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হ'য়ে পড়েছে।

পরিবেশনের সময়ের দিক থেকে সহাব কা স্বাঙ্গ যেমন বিরক্তি-উৎপাদন করে না, তেমনি তা আবার দর্শকের চাহিদা অপূর্ণ রেখেও পরিসমাপ্ত হয় না। তাছাড়া এই স্বাঙ্গখানি অন্যান্য স্বাঙ্গের মতই আবার স্থিতিস্থাপক বা নমনীয়,

পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অদ্বিতীয়। করিয়ালা লোক-নাট্যের প্রাণ-রস হ'লো দর্শক-অভিনেতার পারস্পরিক এবং হার্দিক যোগসূত্রতা। দর্শকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই করিয়ালাকে টি. ভি,-ফিল্মের দৌরাত্ম্যের সময়েও অত্যন্ত জনপ্রিয় ক'রে রেখেছে।

করিয়ালা বিষয়গতভাবে সামাজিক, তাই পুরাকাহিনী বা ইতিহাসের জানা কোনো গল্প এতে সাধারণতঃ পরিবেশিত হয় না আবার এর বিষয় লিখিত বা নির্দিষ্টও থাকে না। অভিনেতাই এর বিষয়ের স্রষ্টা। আর যেহেতু লিখিত নাট্যের পরিশীলিত সংলাপের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয় না, সেইহেতু করিয়ালচীরা একেবারেই স্বাধীন। অভিনয়-দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তিই করিয়ালচীদের মূলধন।

মৃত্যু নিয়ে রঙ্গ-তামাশা ও করিয়ালায় হাস্যরসের অন্যতম জোগানদার। মৃত্যু সম্পর্কিত সরল রসিকতাও দর্শকের মৃত্যুভীতি দূর করতে সাহায্য করে।

সঙ-পরিবেশনের বিবিধতা :

এতক্ষণে আলোচিত সঙগুলি সাধারণভাবে সিমলার দিকেই অধিক প্রচলিত। করিয়ালাতে চন্দ্রাবলী নৃত্য ও সাধুকা স্বাঙ-এর পরবর্তী সঙগুলির ক্রমিক প্রদর্শনে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তবে চন্দ্রাবলী নৃত্য ও সাধুকা স্বাঙ সব জায়গায় করিয়ালাতে অবশ্যই প্রদর্শিত হ'য়ে থাকে। সিমলার বাইরে অন্যান্য দিকে বানথ্রা, ভক্ত, রান, হোরিন প্রভৃতি লোক-আঙ্গিকের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, সিমলাতে আগে সাহাব কা স্বাঙ্গের পরে অনুষ্ঠিত হ'তো নবাব কা স্বাঙ। বর্তমানে এই স্বাঙ্গখানির খুব একটা প্রচলন নেই। এই স্বাঙ্গের নবাব অবধের নবাবের অধীনস্থ। নফরকে নিয়ে তিনি হিমাচলেই থাকেন। মঞ্চে এসে তিনি নফরকে একজন নাপিত ডাকতে বলেন। নফর তখন হাঁক দেয়—'কোনো নাপিত আছো কি ?' তখন এক গ্রাম্য ভাঁড় নাপিত সেজে মঞ্চে আসে এবং বলে একটি চুলের চেয়ে সামান্য মোটা বা 'বালভর' নাপিত হ'লে যদি কাজ চলে—তাহ'লে বান্দা হাজির।

ছন্দোবদ্ধ শ্লেষালঙ্কার করিয়ালার প্রাণ। এটা তারই একটা নজির। বাংলা নাপিত, উর্দুতে হাজ্জাম। যাইহোক, হাজ্জাম মস্ত এক কুড়ুল হাতে গান গাইতে গাইতে মঞ্চে আসে। কুড়ুলখানিই তার ক্ষৌরযন্ত্র। স্পষ্টই বোঝা যায় যে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই অবাস্তবিক হস্তোপকরণের প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। যাইহোক দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল সৃষ্টি ক'রে হাজ্জাম যে গানটি গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করে তা হ'লো—"জামত করছা কি না আ মেরে টরড়ুয়া নাইয়া'—অর্থাৎ জানেনই তো আমার হাতের কাজের কোনো তুলনাই হয় না অর্থাৎ কামাই ভালো—ফলে খুবই ব্যস্ত তবে একটু খুঁতখুঁতে এই যা, এর পরে তার সেই বিরাট কুড়ুলখানি দিয়ে সে নবাবের দাড়ি কামাতে থাকে।

সামান্ত কামানোর নবাবের সুচালো নাকখানি দেখে তার মনে হয় যেন ছোটো খাটো একটা পাহাড় সত্ত মাথা উঁচু করে ঠেলে উঠছে। তখন সে খুবই বিস্মিত হয় এবং নফরকে জিগ্যেস করে দাড়ি কামানোর আগে বিকট এই নাকটি কেটে নবাবের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী সুন্দর এক নাকের আকৃতি দেবে কিনা। এই রকম সব ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং দাম্ভিক কথাবার্তা বলতে বলতে সে নবাবের দাড়ি কামানোর অভিনয় করতে থাকে। দর্শক সাধারণও হেসে একেবারে লুটোপুটি খায়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'লো এই যে হিমাচলের নাট্য পিপাসু সাধারণ-জন অতি অল্প ব্যয়ে করিয়ালার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে সমস্ত রাত ধ'রে আনন্দ করতে পারে। এমনকি আজও যখন সমস্ত কিছুই দুর্মূল্য, তখন নাম মাত্র দক্ষিণার বিনিময়ে করিয়ালচীরা সানন্দে স্বাঙ্গ পরিবেশনে ক'রে থাকে আয়োজকরা সামান্য কটা টাকা এবং অভিনয় রাত্রির ও তার পরের দিনের দুপুরের আহারের বিনিময়ে তাই আজও করিয়ালার প্রদর্শন ক'রে থাকে।

আজও যে এটা সম্ভব তার কারণ হ'লো করিয়ালচীরা পেশাদার নয়। কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার পর অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে তাদের ভেতরের শিল্পী-সত্তা প্রকাশের জন্য ছটফট্ ক'রে ওঠে। অন্তরের সেই তাগাদাতেই তারা একত্রিত হয় এবং দল বাঁধে। করিয়ালচীরা জাত-পাত মানে না। করিয়ালার প্রত্যেকটি দল তাই গড়ে ওঠে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে—গণতন্ত্র এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। তবে অনুকরণ, কৌতুক এবং মনমাতানো সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী শিল্পীরা দক্ষতার ভিত্তিতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দলে স্থান পেয়ে থাকে।

নবার কা স্বাঙ্গের পরেও সময় থাকে। দর্শকরা তখন নাচ-গান ও নটীর অভাব বোধ করতে থাকে। ফলে পরিবেশিত হয় 'কাঞ্চনী কা নাচ'। কাঞ্চনী একজন নৃত্যশিল্পী বা নটী। কখনো কখনো দু'জন নৃত্যশিল্পীও থাকে। তারা দুজনেই মহিলা বা একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা হ'তে পারে। করিয়ালায় সাধারণতঃ পুরুষরা—বিশেষ ক'রে অল্পবয়সী বালকরাই—স্ত্রীচরিত্রের বেশ ধারণ করে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অবশ্য মহিলারাও অংশ নিচ্ছে। নারী-সুলভ চেহারা, মিষ্টিগলা ও নৃত্য নৈপুণ্য যাচাই ক'রে ছেলেদের মহিলা চরিত্রের জন্য নির্বাচিত করা হয়। কাঞ্চনী কা স্বাঙ্গ-এ সাধারণভাবে করিয়ালচীদের কিছু করার থাকে না, অভিভূত দর্শকমণ্ডলীর কাছ থেকে পয়সা তোলা ভিন্ন। সত্যি কথা বলতে কি এই স্বাঙ্গখানি মূলতঃ পয়সা তোলারই একটি অবসর বিশেষ। দর্শকরাও তাদের অনুগ্রহ দানে খুশি করে শিল্পীদের, খুশি হয় নিজেরাও, নিজেরাও এই কারণে যে করিয়ালচীরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে কে কত পয়সা দিচ্ছে তা ঘোষণা করে। এতে ক'রে তারা কি পরিমাণে ধনী তা জনসমক্ষে স্বীকৃত হয়, ফলে এক ধরনের আনন্দ লাভ করে তারা। সঙ খানিকে পরিবেশিত নাচ ও

গানের আনন্দজনকত্ব সংশয়াতীত। তবে দর্শক বা তাদের মধ্যেকার প্রত্যক্ষ অনুগ্রহদাতারা অধিক প্রীত হয় তাদের নাম এবং দেয় অর্থের সার্বজনীন স্বীকৃতিতে। কাঞ্চনীর বেশধারী বালকরা বেশ আকর্ষণীয় ঢঙে নেচে নেচে নীচের পদখানি গেয়ে বেশ কৌশলের সঙ্গেই অনুগ্রহ দাতার নাম ও দেয় অর্থের উল্লেখ করে। পদখানি হ'লো—

জয় জননী জ্বালামুখী, খুব রচায়েঁ৷ খেল।
এক রূপইয়া শ্রীনথ্‌জী নে দিয়া, উনকী বধাওয়ে বেল॥

অর্থাৎ

কত খেলা দেখালে মা, জয় জননী, জ্বালামুখী।
একটা টাকা নাথুজী দিয়া অব করো বংশবৃদ্ধি॥

আগেকার দিনে কবিয়ালার প্রধান এবং অন্যতম বাদ্যযন্ত্র ছিল ঢোল। সমস্ত অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল এই ঢোলের। কবিয়ালা লোকনাট্যে ঢোলের এই একাধিপত্য এখন ক্ষুন্ন হ'চ্ছে হারমোনিয়াম এবং তবলার অনুপ্রবেশে। কাঞ্চনীর বেশধারী বালকদের পায়ের ঘুঙুরও কবিয়ালার ঐতিহ্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।

কাঞ্চনী কা নাচ এর বিশেষত্ব হ'লো এই স্বাঙে দর্শক অভিনেতার প্রত্যক্ষ সহযোগ। এই স্বাঙের অন্তর্ভুক্ত নটীনৃত্যে দর্শকরাও অংশ নেয়। দর্শকের ফরমায়েশ মত গান বা নাচ পরিবেশনেরও রীতি আছে। ফলে নাচনী বালিকার বেশধারী বালকদের বিভিন্ন ধরণের ও রুচির নাচ গান আয়ত্ত ক'রে রাখতে হয়। এব্যাপারে বর্তমানে অবশ্য ফিল্মীগীতি এবং ভজনেরই চাহিদা বেশী।

কাঞ্চনী কা নাচ এর পর (সাধারণতঃ) পরিবেশিত হয় "জোগী জোগন"। এখানি সম্পূর্ণ ভাবেই গীতিনাট্য। যোগী ও যোগিনীর মধ্যে পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় এই স্বাঙখানি। যোগী সৌম্যদর্শন এক কঠোর তপস্বী, ভগবত-প্রেমে পাগল। সে গ্রামে এসেছে। আর যোগিনী এই গ্রামেরই সুন্দরী নারী। সে বিবাহিতা। স্বামীর প্রতি তার ভালবাসারও কোনো খামতি নেই। তবুও যোগীর প্রেমে পড়ে সে। যোগিনী যোগীকে বলে তাকে এখান থেকে নিয়ে অন্য কোথাও বাসা বাঁধতে। তখন যোগী বলে—

পর নারী পৈনী ছুরি, কভী ন লাইয়ে অঙ্গ
দস শীশ রাবণ কে কটে, পর নারী কে সঙ্গ

অর্থাৎ—

পরনারী ধারালো ছুরি, না ছোঁয়াই ভালো।
ক'রে এমন সঙ্গ, রাবণের দশ মাথাই গেলো।

যোগিনী তখন বলে—

নারী নিন্দা মত করো, নারী নর কী খান।
নারী সে নর হোত হ্যায়, ধ্রুব প্রহ্লাদ সমান।

অর্থাৎ—

নারী-নিন্দা কোরো না গো, নারী নরের খনি
নরের জন্ম দেয় নারী,—ধ্রুব প্রহ্লাদ যেমনি।

এইভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে যতক্ষণ না যোগী যোগিনীকে তার স্বামীর মাথা কেটে আনতে বলে। যোগীর ভয়ে যোগিনী শেষ পর্যন্ত তার স্বামীর মাথা কেটে আনে।

করিয়লায় যে কোনো ধরনের স্থূলতা, হিংসাত্মক ও ভীতিপ্রদ ঘটনাবলী এবং দৃশ্য-প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তাই "জোগী জোগন"-এর স্বামীর কর্তিত শির প্রদর্শনের দৃশ্যটি করিয়ালার ঐতিহ্য অনুযায়ী কৌতুক মিশ্রিত উপায়ে প্রদর্শিত হয়। এই সঙগানিতে যোগী ও যোগিনী উভয়েই তাদের একের প্রতি অপরের বিশ্বস্ততা যাচাই করতে চায়। যাইহোক, যোগিনী তার স্বামীর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে নিয়ে এলে তা দেখে যোগী পালিয়ে যায়। কর্তিত মুণ্ড প্রদর্শনের ব্যাপারটি দেখানো হয় সুন্দর এক নাট্যকৌশলের সাহায্যে। একখানি চৌকিতে ক'রে স্বামীর ধড় সহ মুণ্ডটি নিয়ে আসা হয়। এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই কারসাজি উপরের ছবিটি দেখলে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। চৌকিদার ঘটনাটি দেখে, কিন্তু খুন এর বদলে 'উন' উচ্চারন ক'রে গ্রামের চৌকিদার পুলিশ অফিসার ও তার সাঙ্গ পাঙ্গদের চিন্তায় ফেলে দেয়। অপরাধ নিরূপণে তাদের চূড়ান্ত ব্যার্থতার মধ্য দিয়ে সঙখানি শেষ হয়।

এর পরবর্তী স্বাঙখানি হ'লো "দাগ আউর দাউন" অর্থাৎ ডাইনী এবং যাদুকর। হিমাচল প্রদেশে ডাকিনী বিদ্যা এবং যাদুর প্রচলন খুব বেশী। বিশেষ ক'রে গ্রাম্য এলাকায় ও আদিবাসী অঞ্চলে। এমনকি হিমাচল প্রদেশের সবচেয়ে উন্নত সিমলাতেও এর প্রচলন এবং প্রতিপত্তি আজও আছে। এখানকার বয়স্ক মহিলারা এখনও দাগাইলি ব্রত উদ্‌যাপন করে। দাগাইলি বর্ষাকালের একটি দিন। দিনটি একদিকে যেমন অশুভ বিনাশক, তেমনি জাদু ও ডাকিনী বিদ্যার পক্ষে খুবই অনুকূল। এইদিনে বৃদ্ধারা তাদের গৃহ এবং পরিবারটিকে ডাকিনীদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য গৃহের প্রবেশদ্বারে গোবর ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু কেবলমাত্র বাড়ীটিকে ডাকিনীদের প্রভাব মুক্ত ক'রলে ত চলে না। কেননা বাড়ীর লোকদের গৃহের বাইরেও যেতে হয় নানান কাজে, তাই বাড়ীর ছেলেদের হাতের কব্জিতে 'রক্ষাসূত্র' বাঁধা থাকে।

'দাগ আউর দাউন' এর আরম্ভ নেপথ্যগৃহ বা সাজঘরে। এখানে প্রথমে সমবেত সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় এই সঙখানি। গানের প্রথম লাইনটি হলো—

আঙ্গি আঙ্গি রে হো, কিলে কাঁগড়ে পী ডাঙ্গি,

অর্থাৎ—

সাবধান! সাবধান! কাঁগড়া দুর্গের ডাকিনী এসেছে।

গান শেষ হ'লেই মঞ্চে আসে 'দাগ'। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে মঞ্চে এসে সে তার জাদুদণ্ডটি কয়েকবার ঘুরিয়ে অদৃশ্য হয়। দাগ চলে যাওয়ার পর গ্রামের দুজন বয়স্ক মানুষ মঞ্চে আসে। মঞ্চের ওপর তারা প্যাঁচার নখ, মড়ার মাথা, মানুষের চুল প্রভৃতি সন্দেহজনক ও ভয়ঙ্কর জিনিষ এদিক ওদিক পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে যে ডাইনী এসেছিল। তারা এও বুঝতে পারে যে অপদেবতারা এখনো আশে পাশেই আছে। খুব শিগগিরই জানা যায় যে তাদের একজনের মেয়ে হঠাৎই মৃগী রোগাক্রান্ত হ'য়ে বমি ক'রছে। তখন তাদের বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, এটা ডাইনীরই অপকীর্তি। বিপদ বুঝতে পেরে তারা ভূতের রোজা বা ওঝাকে ডাইনীর সন্ধান করতে পাঠায়—যাতে ক'রে অচিরেই তাদের এই কু-প্রভাব নষ্ট হ'য়ে যায়।

এমনি সময় কিম্ভুত-দর্শন সব ভাঁড়েরা ওঝার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে মঞ্চে আসে। ঘটনার বিষাদাচ্ছন্নতা এদের রঙ্গভঙ্গিতে লঘু হ'য়ে আসে। দর্শকরাও হালকা মেজাজে হাসিতে ফেটে পড়ে। হঠাৎই ডাইনীর শক্তির প্রভাবে ওঝারা সব বিবশ হ'য়ে পড়ে। একই সঙ্গে রোগিনীর অবস্থাও বেশ আশঙ্কাজনক হ'য়ে ওঠে। তখন কেউ একজন এই দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে গ্রাম্য-দেবতার আবাহন করতে পরামর্শ দেয়। গ্রাম্য দেবতার আবাহন ক'রলে তিনি তাঁর স্যাকরেদ দেঁওনের শরীরে ভর ক'রে ঘটনাস্থলে আসেন। নাগারার উত্তেজক তালে তালে তিনি ধীরে ধীরে দেঁওনের শরীরে ভর ক'রে ডাইনীর অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাকে ঘটনাস্থলে আসার নির্দেশ দেন। ডাইনী অর্থাৎ 'দাগ' এসে দেবতার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা প্রার্থণা করে। ডাইনী আর কখনো অকাজ করবে না-এই প্রতিশ্রুতি দিলে তবে ছাড়া পায়। এরপর স্থূল হাস্যরস পরিবেশন ক'রে স্বাঙখানি শেষ হয়। ডাইনীর ভয় থেকে মুক্ত হ'য়ে দর্শকও খুশিতে বিভোর হ'য়ে ওঠে।

উপরের স্বাঙগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে করিয়ালা—লোকনাট্য অভিনয়ের স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। ফলে দর্শক-অভিনেতার মধ্যেকার এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটা খুবই গভীর এখানে। অবশ্য দর্শক-অভিনেতার মধ্যকার এই পারস্পরিক বোঝাপড়া আমাদের লোক-নাট্যের এক অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। করিয়ালার কাহিনী গঠিত হয় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে। ফলে হিমাচল প্রদেশের সরকার তার উন্নয়নের উপযোগী সমস্ত বিষয়গুলি জনসাধারনকে জানানোর উদ্দেশ্যে করিয়ালা লোকনাট্যের সাহায্য নিচ্ছেন। এবং দেখা গেছে সরকার এ ব্যাপারে বেশ সাফল্যও অর্জন ক'রেছে। কেননা কোনো বিষয়কে জনসাধারণের রুচি ও চাহিদা অনুসারে পরিবেশন করার ক্ষমতা খুবই বেশী এই লোকনাট্যের।

করিয়ালায় শিক্ষালাভের জন্য পৃথক কোনো শিক্ষণ ব্যবস্থা নেই। মূল অভিনয় দেখেই তা আয়ত্ত করতে হয়। আর যেহেতু অনুষ্ঠান বা নাটকের কোনো কিছুই লিখিত নয়, সেইহেতু এই আঙ্গিকটি আয়ত্ত করা খুবই কঠিন। তবে এইভাবে দেখে ও শুনে শিখতে শিখতে তাদের জ্ঞান ও কল্পনাশক্তি আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। আগে হিমাচলের সামন্ত প্রভুরা করিয়ালা লোকনাট্যের প্রতিযোগিতার ব্যাবস্থা করতেন। এই জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্যে কোঠার, ধামী, ভাগত, কুনিহার, জঙ্গ এবং মালহোর প্রসিদ্ধি আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এইসব প্রতিযোগিতায় উদ্যোক্তা রাজার বিরুদ্ধেও খোলাখুলি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার চল ছিল। সামন্ত প্রভুরা এইভাবে নিজেরা পয়সা খরচ ক'রে নিজেরা উপহসিত হতেন। আর এর পেছনে তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতো, তা হ'লো নিজেদের দোষ ত্রুটিগুলো জেনে নিয়ে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। নিজেদের চরিত্র শুদ্ধির প্রয়োজনেই রাজারা করিয়ালার প্রতি তাদের আনুকূল্য প্রদর্শনে কোনো কার্পণ্য করেননি। করিয়ালার প্রচার প্রসারে এই রাজাদের ভূমিকা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিমাচল প্রদেশে আজ এমন অনেক করিয়ালার দল বর্তমান যারা প্রায় একশ বছরেরও বেশী সময় ধ'রে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছে।

অন্যান্য লোকনাট্যের মত করিয়ালা যদিও দলগত প্রচেষ্টার ফসল, তবুও একজন অভিজ্ঞ [illegible] নির্দেশনায় এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। তিনিই সূত্রধার, করিয়ালার [illegible] করিয়ালট্‌।

পরিবেশনার [illegible] দিক থেকে বলা যায়—করিয়ালা মূলতঃ স্বভাবসিদ্ধ হাসির ছলে দেবতার প্রতি স্বাঙ্গীদের আত্মিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ঢোলের বাজনার তালে তালে দেবতা বিজ্জুর আরতি এবং পূজা দিয়ে করিয়ালার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত। লোক বিশ্বাস মতে বিজ্জু দেবতাও প্রসন্নচিত্তে, উদ্যোক্তা, অভিনেতা ও দর্শকদের আশীর্বাদ করেন। এর ফলে এরকম অনুমান করাটাও খুব একটা অসত্য হবে না যে,—করিয়ালা ধর্মীয় যজ্ঞেরই এক প্রকার বিশেষ।

সাধারণ মানুষের আনন্দের জন্য বর্তমানে প্রচলিত সব গণমাধ্যমগুলির কারণে জনসাধারণের রুচি পরিবর্তিত হচ্ছে খুবই দ্রুততার সঙ্গে। ফলে মানুষের [illegible] তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে করিয়ালায় নানাবিধ পরিবর্তন এসেছে। সবকিছু [illegible] করিয়ালা আঙ্গিক ও বিষয়গত কারণে একেবারেই আধুনিক, যেমন—

(১) অভিনয়ের স্থান ও কালের সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার এক অতুলনীয় ক্ষমতা আছে করিয়ালার।

(২) জাঁক-জমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ বা মেকআপ না থাকায়, খুব অল্প সময়েই এর অভিনয় সম্ভব। বড় কোনো হস্ত বা মঞ্চোপকরণ না থাকায়

দলগুলির স্থানান্তর গমনও বেশ সহজ। সব মিলিয়ে করিয়ালা আবার প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতিরও সমর্থক।

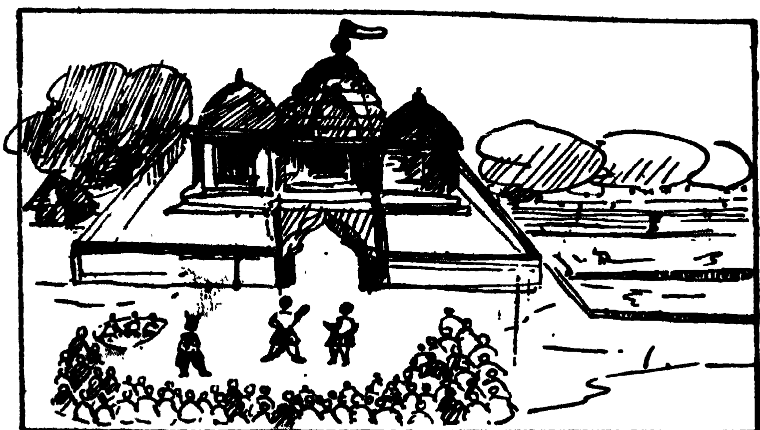
(৩) প্রদর্শনী-মূল্য নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট করা, হল ভাড়া, স্টেজ, লাইট, প্রচার ইত্যাদিতে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা করিয়ালাতে নেই, নেই প্রসেনিয়াম মঞ্চের দর্শক অভিনেতার বিযুক্তি-জনিত অভিশাপ (কিংবা) অভিনেত্রী-বিভ্রাট বা সংকট। ফলে খুব সহজেই যে কোনো জায়গাতেই এর অভিনয় সম্ভব।

(৪) করিয়ালা সম্পূর্ণভাবেই অভিনেতাদের নাটক। ভারতীয় নাট্যের এটা একটা অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। একক বা দলগত অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যের, সৃজনশীল কল্পনাশক্তির ওপরই করিয়ালা একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাই একজন করিয়ালচীকে নাচে গানে, তালে, উপস্থিত বুদ্ধিতে এবং প্রয়োজন মত সংলাপ রচনায় পারদর্শী হ'তে হয়।

(৫) অন্য সব লোকশিল্পীদের মত করিয়ালচীদেরও দর্শকের নাড়ীজ্ঞান অসাধারণ। এই জ্ঞানের দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা—অভিনয় চলাকালীন দর্শকের চাহিদা ও রুচি অনুসারে সাড়া দিতে পারে। ফলে সমস্ত রাত ধ'রে অভিনয় করলেও দর্শক সাধারণ মুহূর্তের জন্যে ক্লান্তি বোধ করে না। আধুনিক যুগ তার নিজস্ব উপকরণের কারণেই খুবই জটিল। আর এই জটিলতার জন্যেই নানাবিধ উদ্বেগ-আশঙ্কা আধুনিক মানুষের নিত্যসঙ্গী। এই উদ্বেগ-আশঙ্কা দূর করার মহৎ ও কঠিনতম দায়িত্ব করিয়ালচীদের। কিন্তু বাস্তবধর্মী রীতিতে এটা সম্ভব নয়। তাই হাস্যরসই তাদের প্রধান অস্ত্র। অন্যদিকে প্রথা বা ঐতিহ্য রক্ষায় হিমাচলবাসীরা সদাসতর্ক। তাই পরিবেশনের রীতিতে কোথাও কোনো বিকৃতি দেখতে পেলে করিয়ালার দর্শক তৎক্ষণাতই অভিনেতাদের সতর্ক ক'রে দেয় এই ব'লে—জকরৈলা না করোরে দেখ ভাই। অর্থাৎ—উল্টো পাল্টা কিছু কোরো না। যেমন নিয়ম তেমনি চলো। আধুনিক অভিনয় রীতির প্রায় কোনো নীতিই করিয়ালাতে অনুসৃত হয় না। প্রায় সব কিছুই প্রচলিত অর্থে নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধন থেকে মুক্ত, যদিও তাল লয় সমন্বিত এবং দর্শকের রুচি ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দর্শকের ইচ্ছানুক্রমেই এর সূত্রপাত বা আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি। অনাবিল হাসির জোয়ারে ভেসে যায় আধুনিক অভিনয় রীতির তাবৎ মূলসূত্রগুলি।

(৬) আড়ম্বরহীনভাবে দর্শকের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে পড়ার ব্যাপারেও করিয়ালার জুড়ি মেলা ভার। হিমাচল প্রদেশের পাঙ্গীদের এই গুণটি যে সর্বতোভাবে আধুনিক এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈধতা থাকতে পারে না। সামান্যভাবে উপভাষার ব্যবহার হ'লেও করিয়ালার ভাষা সকলের বোধগম্য সহজ হিন্দুস্থানী। বাচিক এবং শারীরিক ভঙ্গীতে এমনকি মুখজ ভাবপ্রকাশে বা মেকআপে কোথাও কোনো Stylisation-এর প্রভাব নেই। সহজ স্বাভাবিকতাই করিয়ালার মুখ্য অবলম্বনীয় বিষয়। তাই দর্শকের সঙ্গে এদের যোগ খুবই ঐকান্তিক। ফলে দর্শক অভিনেতার পারস্পরিক বোঝাপড়াই করিয়ালার সার্থকতার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি।

কর্ণাটকের লোকনাট্য



যক্ষগান :

যক্ষগান শব্দটি কানে এলেই মনে হয়—তাবুঝি এক ধরণের গান। আসলে যক্ষগান খুবই সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত এক ধরণের সাঙ্গীতিক নৃত্য-নাট্য। কাহিনীর প্রয়োজনে অবশ্য এতে মাঝে মধ্যে চলতি গদ্যেরও ব্যবহার হ'য়ে থাকে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধ'রে এই ঐতিহ্যময় গীতি-নাট্য কর্ণাটকের তটবর্তী এলাকা এবং মালনাড় জিলার সাধারণ মানুষের নাট্যরস পিপাসা মিটিয়ে আসছে।

যক্ষগানের বিষয় সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ থাকে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের মধ্যেই। আর এই পৌরাণিক বিষয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট তাৎপর্য ব্যক্ত করার জন্যে সাহায্য নেয়া হ'য়ে থাকে সঙ্গীতের। সূত্রধার বা যক্ষগানের পরিভাষায় 'ভাগবত' মন্দীরা, মৃদঙ্গ অথবা মাদলের সহযোগিতায় এইসব গীত তাঁর সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন ক'রে থাকেন। সূত্রধার দ্বারা পরিবেশিত এইসব গীত আরও স্পষ্ট করার জন্যে চরিত্রের দ্বারা সংলাপ আকারে ব্যক্ত করা হ'য়ে থাকে। অভিনেতারা মদ্দল অথবা মৃদঙ্গের তালে তালে পদ সঞ্চালন ক'রে চলে। যুদ্ধের দৃশ্যে অথবা বীররস প্রধান কাহিনীতে অভিনেতার দৃঢ় পদবিক্ষেপের সঙ্গত করে 'চণ্ডে' নামক অন্য এক তীক্ষ্ণ আওয়াজের চর্মবাদ্য।

যক্ষগানে প্রযুক্ত নৃত্য এখনো কোনো স্পষ্ট এক নৃত্য-আঙ্গিকের মর্যাদায় উন্নীত হ'তে না পারলেও, নিজস্ব এক তাল-লয়ের সমন্বয়ে তা খুবই সমৃদ্ধ। এই নৃত্যের আকর্ষণীয় শারীরিক ক্ষিপ্রতা এবং তীব্রগতি সমন্বিত পদবিক্ষেপ দর্শক সাধারণকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে দেয়। অন্যভাবে তাই বলা যায়, যক্ষগানের আকর্ষণের মূলে আছে—'লয়'। লয়-ই যক্ষগানের প্রাণ। যক্ষগানে লাস্যের প্রয়োগ দেখা যায় কেবলমাত্র স্ত্রী-চরিত্রের সুললিত দেহ ভঙ্গিমায়।

যক্ষগানে লঘু বিষয়ের অবতারণা করে 'কোডঙ্গী' বা বিদূষক। যেহেতু যক্ষগানের কাহিনী আবর্তিত হয় দেব-দানবের দ্বন্দ্ব-সংকুল জীবন ঘিরে, সেইহেতু এর (চরিত্রাভিনেতাদের) অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জা এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যাতে ক'রে তা কাহিনীর অন্তর্গত ফ্যান্টাসীর জগতকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যক্ষগানের অঙ্গরাগ-অঙ্গসজ্জা তাই ভারতের অন্য যেকোনো লোকনাট্যের তুলনায় অনেক বেশী জাঁকজমকময়, চটকদার এবং আকর্ষণীয়।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলামঞ্চে অভিনীত এই যক্ষগান শীতের প্রারম্ভ থেকে বর্ষারম্ভ—এই ছয় মাস কর্ণাটকের গ্রামদেশে সমস্ত রাত ধ'রে অভিনীত হ'য়ে চলে। অন্যদিকে সরকার এবং নিষ্ঠাবান সংস্কৃতিকর্মীর সযত্ন প্রশ্রয়ে গত দুই দশকের মধ্যে প্রায় এক ডজন ব্যবসায়িক দল নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণায় সক্ষম হ'য়েছে। এইসব দল এখন অস্থায়ীভাবে নির্মিত ঘেরা প্রেক্ষায় প্রয়োজনীয় প্রদর্শনীর বিনিময়ে যক্ষগান পরিবেশন ক'রে চলেছে।

আজও তাই যক্ষগান কর্ণাটকের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকনাট্য।

বয়ালাটা অথবা যক্ষগান অভিনীত হয় সমস্ত রাত ধরে। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যক্ষগানের আসরে বেজে ওঠে 'চণ্ডে', মদ্দলে প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে এই বাজনা আশে পাশের গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেয়—যক্ষগান আরম্ভ হ'তে চলেছে,—ফলে আপনারা রঙ্গস্থলে চলে আসুন। পালা আরম্ভের আগেকার এই বাজনা তাই এক প্রকারের আমন্ত্রণ বিশেষ—যা কিনা দর্শকের কানে পৌঁছায় হাওয়ায় ভর ক'রে। আর সেই আমন্ত্রণ পেয়ে নিকটবর্তী এলাকার রসিক সাধারণ কালবিলম্ব না ক'রে এসে হাজির হয় সেই আসরে। সমস্ত রাতই তাদের এখানে কাটাতে হবে—তাই প্রয়োজনীয় আসন ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে সমস্ত রাত্রির জন্যেই বেরিয়ে পড়ে সহৃদয় সামাজিক। গান শেষ হ'লে তবেই তারা ঘরে ফেরে। মাঝরাতে নাটক শেষ হওয়ার কোনো চল নেই, কেননা মাঝরাতে দূর দূর গ্রামের মানুষের ঘরে ফেরা একরকম প্রায় অসম্ভব। গান শেষ হয় তাই পরের দিনের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ফলে মাঝরাতে কোনো পালা শেষ হ'লে, নতুন পালা আরম্ভ করতে হয়, দর্শক সাধারণেরই সুবিধার্থে, যাতে ক'রে তারা পরের দিনের সূর্যোদয় অবধি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারে। ফলে যক্ষগানের কোনো কোনো আসরে অনেক সময় একাধিক পালা পরিবেশিত হয়। একই

কারণে—অর্থাৎ রাতভোর অভিনয় চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় বলেই—যক্ষগানের অধিকাংশ পালায় মূল কাহিনীর চেয়ে প্রাসঙ্গিক কাহিনী অধিকতর বিস্তৃত।

সাধারণতঃ বয়ালাটা আরম্ভ হয় 'সভালক্ষণ' দিয়ে। 'সভালক্ষণ' যক্ষগানের এক অতি-আবশ্যকীয় পূর্ব-রঙ্গবিধি। অনেক দিন আগে থেকে যথেষ্ট যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই পূর্বরঙ্গ-বিধি প্রযুক্ত হ'য়ে আসছে। সংস্কৃত নাটকে নটী এবং সূত্রধারের যে ভূমিকা এবং গুরুত্ব, যক্ষগানের এই সভালক্ষণের গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি।

কোনো সমতল ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অংশে একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের (১৫´ × ১৫´) চার কোণায় চারটি খুঁটি পুঁতে নিলেই তা যক্ষগানের জন্য উপযুক্ত এক রঙ্গক্ষেত্র হ'য়ে ওঠে। রঙ্গক্ষেত্রের চারদিকেই বসে দর্শক। রঙ্গক্ষেত্রের একদিকে ভাগবত তার সহযোগী যন্ত্রীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়লে অবশ্য পেছনের দিকে রাখা একখানি চৌকিতে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়। এই চৌকির সামনে রাখা হয় আরেকটি চৌকি। কাহিনীর রাজা মহারাজারা বসেন এই চৌকির ওপর। তখন নিরালঙ্কৃত এই চৌকিখানিই হ'য়ে ওঠে রাজসিংহাসন। প্রচলিত রীতি অনুসারে নর্তক এবং অভিনেতারা ভাগবতের দুই পাশ দিয়ে মঞ্চে যাতায়াত করে। কোনো মন্দির-প্রাঙ্গণে যক্ষগান পরিবেশিত হ'লে, মন্দিরের দিকে মুখ ক'রেই চিহ্নিত হয় রঙ্গক্ষেত্র। তবে অন্যত্র তিথি অনুসারে রাহু যেদিকে থাকে সেদিকে পেছন ফিরে নির্দিষ্ট হয় মঞ্চ।

যক্ষগানের মঞ্চ প্রায় ক্ষেত্রেই ১৫ ফুটবর্গ। আবার কোথাও কোথাও ২০´× ৩০´ আয়তনের রঙ্গস্থলও দেখা যায়।

চারকোণায় পোঁতা খুঁটি চারটিই এই বর্গাকারক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ ক'রে দেয়। খুঁটি চারটির মাথায় একখানি চাঁদোয়া টানটান ক'রে বেঁধে দেয়া হয়। এটাই প্রচলিত নিয়ম। এই রঙ্গক্ষেত্রে আলোর যোগান দেয় দুটি মশাল। প্রচলিত রীতি অনুসারে দু'জন মশালচী এই মশাল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অভিনেতা মশালরেখা ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে এলে, অভিনেতার মুখ ও তার ভাব স্পষ্টরূপে দেখাবার জন্যে মশালচী অভিনেতার সম্মুখে এসে তার মুখের সামনে তুলে ধরে হাতের মশাল। আজকাল অবশ্য গ্যাসলাইট অথবা ইলেক্‌ট্রিক আলো মশালের কাজ ক'রে চলেছে। কখনো কখনো বা কোনো কোনো আসরে পুরানো দিনের স্মৃতিচারণার্থেই সম্ভবতঃ মশাল এবং মশালচীর ব্যবহার হ'য়ে থাকে। আগেকার দিনে অঙ্গরাগ ও এই মশালের আলো মনোমুগ্ধকর এক পরিবেশ সৃষ্টি কোরতো। সে সময়ে মুখে লাগানো হ'তো অরেদাল বা এক ধরণের হলুদ রঙ। এখনকার বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের আলোর তীব্রতা অনেক বেশী ফলে অঙ্গরাগের রঙেও অনেক পরিবর্তন সাধন করতে হ'য়েছে। যক্ষগানের পোষাক-পরিচ্ছদ একেবারেই কাল্পনিক। উন্মুক্ত প্রান্তরের গাঢ় অন্ধকার এই

কাল্পনিক পোষাকের রহস্যময়তা অনেক বাড়িয়ে দেয়—আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নেয় মশালের নরম আলো। আলোক স্বল্পতা দর্শকের মনকে বাস্তব জগত থেকে অতি সহজেই এক রহস্যময় জগতে পৌছে দেয়। আর ঠিক এই একই কারণে মন্দির অভ্যন্তরের অল্প আলো ভক্তজনের একাগ্রতা বাড়িয়ে দেবলোকে পৌছে দেয়। গ্যাস বা বিদ্যুতের আলো যক্ষগানের রহস্যময় কল্প-লোকে সত্যি সত্যিই এক উৎপাত বিশেষ।

প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যক্ষগান বা বয়ালাটার মঞ্চ বা রঙ্গস্থল ১৫ ফুট বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে এটি হওয়া উচিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি। সভালক্ষণের একটি শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

পঞ্চহস্তেণ বিস্তীর্ণ দশ হস্তেণ উন্নতং।
অর্ধ-চন্দ্র প্রমাণেন নিষ্ঠতে রংমণ্টপম॥

শ্লোকটি যেন নাট্যশাস্ত্রের খুবই সন্নিকট প্রতিধ্বনি। যক্ষগানের নেপথ্যগৃহ—গ্রীণরুমকে বলা হয় চৌকি। রঙ্গস্থল থেকে একটু দূরে আয়তাকারে বেড়া দিয়ে তৈরী হয় এই চৌকি। অভিনেতারা রাত্রির খাওয়া হ'য়ে গেলে অভিনেয় চরিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিছিয়ে প্রথমেই পূজা দেয় গণেশ বাবাজীর। তারপরে মেকআপ ক'রে সাজ পোষাক গুছিয়ে রঙ্গাবতরণ করে।

রাক্ষস চরিত্রের মেকআপকে বলা হয় "বন্নদবেশ"। কানাড়া ভাষাতে রঙকে 'বন্ন' বলা হয়। তাই রাক্ষস চরিত্রের মেকআপে খুব বেশী রঙ ও রেখার সংযোগ ঘটে ব'লে একে 'বন্নদবেশ' বলা হ'য়ে থাকে। রাতে অনুযায়ী এই বন্নদবেশের জন্যে কখনো কখনো দু'তিন ঘণ্টাও লেগে যায়।

যক্ষগানের শুভারম্ভ কিন্তু নেপথ্যগৃহে অর্থাৎ চৌকীতে। প্রথমে গনেশের স্তুতি করা হয়। তারপরে তার পুজো। গনেশের মূর্তির সামনে মুকুট, পায়েল, পান, নারিকেল ও প্রয়োজনীয় ফলফুল রাখা হয়। তখন হনুমনায়ক অর্থাৎ হাস্য-গার গনেশের আবতি করে। এই সময় দলের অন্যান্য সদস্যরা ভজন গায়। ভজন শেষ হলে সব অভিনেতা আরতির প্রত্যক্ষ স্পর্শে ধন্য আশীর্বাদ নিয়ে মঞ্চে আসার জন্যে প্রস্তুত হয়।

যক্ষগানের অঙ্গরাগ-অঙ্গসজ্জা খুবই জটিল। রাজা ও রাক্ষস চরিত্রাভিনেতা মাথায় যেমন কিরীট পরে, তেমনি পরে মুণ্ডাসু। 'মুণ্ডাসু'-গুলি পদ্মপাতার অনুরূপ দেখতে। মাথার চুল চূড়া ক'রে বেঁধে তাতে নানারঙের ফিতে জড়িয়ে জড়িয়ে অভিনেতারা নিজেরাই এই 'মুণ্ডাসু' তৈরী করে বা বাঁধে। 'মুণ্ডাসু'-র জন্য অভিনেতাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে হয়। 'মুণ্ডাসু' বাঁধতে দুশো থেকে তিনশো গজ ফিতে লাগে।

দেবতাকে যে অর্ঘ্য দেয়া হয় তা নিয়ে দু'জন কোডাঙ্গী ভাগবতের সঙ্গে স্তুতিগান করতে করতে মঞ্চে আসে এবং সম্মিলিত দর্শক সাধারণের স্তুতিগান

গায়। সুধীসামাজিকের দোষগুণও বর্ণনা করা হয় এই গানে। কাকে বলা হবে ভালো গায়ক, প্রতিভাবান নাট্যকারই বা কে, সুধী দর্শকই বা কাকে বলা হবে—তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয় এই গানে। এখানেও নাট্যশাস্ত্রের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

গণেশের পূজা করা হয় সবচেয়ে আগে। তারপর একে একে মহাদেব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রমুখ দেব-দেবীর প্রশস্তি গাওয়া হয়। প্রত্যেক দেবদেবীর জন্যে নির্দিষ্ট গীতির প্রচলন আছে—যা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে অবিকৃত অবস্থায় পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। দেব-দেবীর প্রশস্তি-গীতির সময় বেশ জোরে জোরেই উচ্চারিত হয় মৃদঙ্গের বোল। আর এই মৃদঙ্গের বোলের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে পাত্রধারী। এরপরে যেই মঞ্চে আসুক না কেন তাকে আগে ভাগবত ও পরে রঙ্গস্থলের বন্দনা ক'রে তবেই মঞ্চে আসতে হয়। সর্বপ্রথম মঞ্চপ্রবেশ ঘটে যক্ষগানের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং দলের অন্যতম দক্ষশিল্পী হাস্যগার অথবা বিদূষকের। হাস্যগারের সঙ্গী দু'জনকে বলা হয় কোডাঙ্গী। বেশ কয়েক শতাব্দী আগে সম্ভবতঃ 'হুনুম' শব্দটি 'কোড়গ'-এ রূপান্তরিত হ'য়ে প'ড়েছিল, পরে এই কোড়গই কোডাঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'য়েছে। আরো পরে এই কোডাঙ্গী-দের নেতাকে হুনুমনায়ক নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। রঙ্গমঞ্চে হুনুমনায়কের অবাধ স্বাধীনতা সর্বজন—স্বীকৃত। স্বয়ং ঈশ্বর থেকে শুরু ক'রে যেকোনো মানুষ এবং যখন মঞ্চে কোনো চরিত্র উপস্থিত না থাকে তখন বেচারা মশালচীই হুনুমনায়কের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হ'য়ে পড়ে। ভাগবত বা সূত্রধার অবশ্য সকল সময়ই তাকে উত্তেজিত রাখে। হুনুমনায়কের সঙ্গীদ্বয় অর্থাৎ কোডাঙ্গীর কিন্তু বিশেষ কোনো পোষাকের প্রচলন নেই। তবে দেহের বিভিন্ন জায়গায় গাছের পাতা গুঁজে এবং পায়ে ঘুঙুর বেঁধে অনেকক্ষণ ধ'রে এরা মঞ্চে নাচানাচি করে। আসলে ভবিষ্যতের যক্ষগান শিল্পীদের গোড়াপত্তন হয় এই কোডাঙ্গীর ভূমিকাভিনয়ে। কিশোর অভিনেতাদের নাচ শেখার সুযোগ মেলে এই ভূমিকাতেই। ভাগবতও এদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা চালায়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ভাগবত-কোডাঙ্গীর এই কথাবার্তার সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো যোগই থাকে না। তবে পরবর্তী অভিনেতাদের বিশ্রামদানের এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জনার্থে এই সংলাপ অংশের নাটকীয় গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। ভাগবত ও কোডাঙ্গীর সংলাপের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হ'লো—

১ম কোডাঙ্গী। পড়েছে রে পড়েছে!
ভাগবত । কি পড়লো?
১ম কোডাঙ্গী। শ্রীমান রামা ভট্টজীর বাগানে একটি কাঁঠাল।
২য় কোডাঙ্গী। গেল রে গেল!
ভাগবত । কি গেল?

২য় কোডাঙ্গী। রাখালদের লাল্লু কুত্তাটা পালিয়ে গেল।
১ম কোডাঙ্গী। ঢুকলো রে ঢুকলো!
ভাগবত । কি ঢুকলো?
১ম কোডাঙ্গী। গবুর সেই কালো কুকুরটা রামরায়াজীর রান্নাঘরে ঢুকলো।
২য় কোডাঙ্গী। নিয়ে গেল রে নিয়ে গেল!
ভাগবত । কি নিয়ে গেল?
২য় কোডাঙ্গী। রামা ভট্টজীর ঘর থেকে তেলের কেঁড়ে নিয়ে গেল।
১ম কোডাঙ্গী। লাগলো রে লাগলো!
ভাগবত । কি লাগলো?
১ম কোডাঙ্গী। যজমান সংকপ্পাজীর গায়ে নর্দমার জল লেগে গেল।
২য় কোডাঙ্গী। হ'য়ে গেল রে হ'য়ে গেল!
ভাগবত । কি হ'য়ে গেল?
২য় কোডাঙ্গী। পরশু রাত্রির জন্যে আমাদের দলের বায়না ঠিক হ'য়ে গেল।

কোডাঙ্গী ও ভাগবতের এই জাতীয় সংলাপের পর মঞ্চপ্রবেশ ঘটে বাল-গোপালের। দু'জন কিশোর এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাল-গোপালদ্বয় যে কারা তা নিশ্চিতরূপে জানানো হয় না। সম্ভবতঃ এরা গোকুলের কৃষ্ণ-বলরাম। আর সেই কারণেই এঁদের বলা হয় বাল-গোপাল। এদের নাচ, বেশ-বিন্যাস—সবই শাস্ত্রসম্মত এবং প্রচলিত রীতি অনুসারী। বাল-গোপালের বেশেই এরা কাহিনীর পরবর্তী অংশে অভিমন্যু, বৃষসেন প্রমুখ কিশোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে থাকে। প্রচলিত রীতি অনুসারে এই গোপ-বালকদ্বয়ের নৃত্যের পর মঞ্চে আসে স্ত্রী বেশধারী দু'জন অভিনেতা। এরা কৌতুক নৃত্য পরিবেশন করে। কোথাও কোথাও এদের 'আদদ্ সুলে' বা মঞ্চ-বেশ্যাও বলা হ'য়ে থাকে। এদের কাজের সঙ্গে কিন্তু প্রচলিত এই নামের কোনো সামঞ্জস্যই নেই। শিবরাম কারন্ত অবশ্য এঁদের বলেছেন রুক্মিনী-সত্যভামা। আসলে রঙ্গপূজাই এদের কাজ। কর্ণাটকী সঙ্গীতের "এক তাল"-এর সহযোগে সুললিত পদবিক্ষেপে—"চন্দ্রভামা ও চন্দ্রভামা" প্রভৃতি গান গাইতে গাইতে এরা মঞ্চে আসে। ভাগবত তখন এদের উদ্দেশ্য ক'রে বলে—

হে চন্দ্রবদনা! শোনো। শোনো চন্দ্রভামা।
চন্দন সাগরি শোনো। শোনো চন্দ্রভামা।
গোপনন্দের কন্যা—হে চন্দ্রভামা!
চন্দ্রের সুষমা দেখাও হে চন্দ্রভামা।
বরিজাক্ষের বন্দনা করো হে চন্দ্রভামা।

এখানে স্পষ্ট যে রঙ্গপূজাই এদের কাজ। উপরোক্ত গানে এদের গোপ-বালিকাও বলা হ'য়েছে। উপরোক্ত সম্বোধন গীতির পরে ভাগবত এদের

সম্বোধন ক'রে "হে অল্পবয়সী, বালিকা চতুরা!" অথবা "চোখ বুঁজে আছি হে সুন্দরি; এসো, যা বলার বলে নাও।" প্রভৃতি গান শোনায়। ভাগবতের গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই স্ত্রীবেশধারীরা লাস্যনৃত্য পরিবেশন ক'রে চলে। এ সবের সঙ্গে "স্ত্রীকে বিশ্বাস করে যে সে পৃথিবীতে সবচেয়ে বোকা" জাতীয় পরিহাস ভরা গানও গাওয়া হ'য়ে থাকে।

এই সব হাস্য-রসাত্মক বর্তালাপ চলতে চলতে সকলের অলক্ষ্যেই ঘণ্টা দু'য়েক সময় কেটে যায়। ইতিমধ্যে গ্রামের সব উৎসাহী শ্রোতাই আসরে এসে উপস্থিত হয় এবং মূল কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রাভিনেতাদের ও অঙ্গরাগ-অঙ্গসজ্জা সম্পন্ন হয়। এরপর ভূমিকাগীতি দিয়ে শুরু হয় মূল গান বা পালা।

রামায়ণাশ্রিত কাহিনী পরিবেশিত হ'লে প্রথমে মঞ্চে আসে রাম এবং লক্ষ্মণ। আর মহাভারতের কাহিনী পরিবেশিত হ'লে প্রথম মঞ্চ-প্রবেশ ঘটে পঞ্চ-পাণ্ডবের: কাহিনীর একেবারে শুরুতেই এই বিশেষ চরিত্রসমূহের সমাবেশ এবং পরিচিতি দান সত্যিই খুব আকর্ষণীয়। এই সময় ছোটো একটি পর্দা বা পটীর ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। লালরঙের একখণ্ড সাধারণ কাপড়ই এই পটীর কাজ করে। পটীর ওপর শুধুমাত্র লেখা থাকে দলের নাম। যক্ষগানের দলকে বলা হয় "মেল"। যাইহোক, দু'জন লোক এই পটী ধ'রে ভাগবতের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

পঞ্চ-পাণ্ডবের মঞ্চাবতরণের সময় সর্বপ্রথমে মঞ্চে আসে সহদেব। সহদেব এসে পটীর পেছনে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যায়। এই সময় কেবলমাত্র তার মাথার মুকুটই দর্শকরা দেখতে পায়। চরিত্রাভিনেতা ভূমিস্পর্শ ক'রে একই সঙ্গে ভাগবত এবং রঙ্গস্থলের বন্দনা করে। তারপরে পটীর পেছনে করে নৃত্য। এই সময় ইচ্ছামত পর্দাখানি ধ'রে কখনো শরীরের পার্শ্বভাগ, কখনো বা মুখের পার্শ্বভাগ এবং সব শেষে সম্পূর্ণ অবয়ব দর্শকদের দেখিয়ে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। এরপর একে একে নকুল, ভীম, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির মঞ্চে এসে একই ভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। এরপর পঞ্চপাণ্ডব একসঙ্গে এসে পটীর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং আগের মতই একই সঙ্গে শরীর ও মুখের পার্শ্বভাগ এবং শেষে শরীরের সম্মুখভাগ দর্শকের গোচরীভূত ক'রে তাদের একেবারে আত্মবিভোর ক'রে তোলে। এরপরে আবার আগের মতই একে একে পঞ্চ-পাণ্ডব পটী ছাড়াই মঞ্চে আসে এবং লয়াত্মক নৃত্যভঙ্গীর দ্বারা নিজেদের প্রতাপ প্রতিপত্তির পরিচয় দেয়। এইভাবে একে একে এসে দর্শকের কৌতূহল জাগিয়ে তারা মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

পঞ্চ-পাণ্ডবের সভার দৃশ্যে ভাগবত হনুমনায়ককে ডেকে আদেশ করে দর্শক সাধারণকে দৃশ্যের পরিচয় দিতে। সঙ্গে সঙ্গেই সর্বকার্যে কুশলী বাচাল হনুমনায়ক কথায় ও কাজে নিজের কেরামতি দেখিয়ে চলে। কখনো দারোয়ান, কখনো

দূত, আবার কখনো বা বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে সে তার ঘাড়ে ন্যস্ত সমস্ত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গেই পালন ক'রে চলে। রাজসভায় সমবেত রাজন্যবর্গের গুণকীর্তন করা তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন ও ভীমের প্রশস্তি খুবই আকর্ষণীয় হ'য়ে ওঠে।

রাজসভায় হনুমনায়ক যে কেবলমাত্র দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তা কিন্তু নয়। কখনো সে পঞ্চ-পাণ্ডবকে নানাবিধ উপদেশও দিয়ে থাকে। সব মিলিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে সভা বেশ জমে ওঠে।

বিশেষ কোনো চরিত্রাভিনেতাকে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে আসর জমিয়ে রাখতে দেয়া ঠিক নয়। ফলে অচিরেই ভাগবত হনুমনায়ককে ছুটি দেয় এবং স্বয়ং মঞ্চোপরি চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু ক'রে দেয়, যেমন—আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? এখানে আসার কারণ বা উদ্দেশ্য কি? বাড়ী কোথায়?—ইত্যাদি। এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন ক'রে চরিত্রকে তার নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করতে বাধ্য করে ভাগবত। প্রচলিত এই রীতির সাহায্যে ভাগবতও অনেক সময় কাহিনী বা প্রসঙ্গের অবিচ্ছেদ্য এক ব্যক্তিত্বে উন্নীত হয়। কাহিনীর অগ্রগতিতে কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন অন্যতম চরিত্রের তাদের সংকটাপন্ন মনোস্থিতির অংশীদার করতে চায় কাউকে। নাটকে স্বগত ভাষণই চরিত্রের এই উদ্দেশ্য পূরণ ক'রে থাকে। কিন্তু যক্ষগানে স্বগত ভাষণের কোনো চল নেই। বিপরীতে তারা সরাসরি ভাগবতের সঙ্গে কথা ব'লেই তাদের সেই আবেগ-বেদনাকে প্রকাশ ক'রে থাকে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হওয়ার আগেও তারা ভাগবতের কাছ থেকেই পরামর্শ নিয়ে থাকে। এইভাবে ভাগবত অনেক চরিত্রের বন্ধু ও পরামর্শদাতা হ'য়ে ওঠে।

যক্ষগানের আসরে রাক্ষস চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশ বোধ হয় সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। রাবণের রাজসভার দৃশ্য হ'লে তো আর কোনো কথাই থাকে না—সভাকার্য ও তার পরিচয় দান সম্পন্ন হয় খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে। শূর্পনখা এবং কুম্ভকর্ণের অঙ্গরাগ-অঙ্গসজ্জা সত্যিই খুব চমৎকার। এই জাতীয় চরিত্রের মঞ্চপ্রবেশের আগে দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধি করবার জন্যে কয়েকটি প্রচলিত রীতির প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। এদের মঞ্চপ্রবেশের আগে 'চৌকী' বা নেপথ্য গৃহ থেকেই এদের অট্টহাসপূর্ণ চীৎকার শোনা যায়। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায় প্রায়-সারাক্ষণের জন্যে বাজতে থাকা চণ্ডেমদ্দলের বাজনা। থেমে যায় সমবেত দর্শক মণ্ডলীর কোলাহল। কেবল শোনা যায় সেই বিকট অট্টহাসি। রাত্রির অন্ধকারে তখন ঘনিয়ে আসে এক অভিযানবীয় রহস্য। বিকট চীৎকার করতে করতে এরা যখন রঙ্গস্থলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তখন পথ-পার্শ্বে সঞ্চিত লতা-পাতায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। সেই আগুনের লাল আভায়

রাক্ষস চরিত্রের বীভৎসতা বিশ্বাসযোগ্য মাত্রায় উন্নীত হয়। এছাড়া বরাহ, নরসিংহ, চণ্ডী প্রমুখ অতি ক্রুদ্ধ দেবদেবীরা বেশ দূর থেকে, আশপাশের কোনো জঙ্গল থেকে মশাল হাতে রে রে ক'রে ছুটে আসে মঞ্চের দিকে। তবে রাক্ষস এবং ক্রুদ্ধ দেবদেবীর এ জাতীয় মঞ্চপ্রবেশের চল আজকাল কমে আসছে। এখন তো এঁরা মঞ্চে এলে তবেই মশালচী মশাল এগিয়ে ধরে এদের মুখের কাছে। রাক্ষস তখন একহাতে সেই মশাল ধ'রে অন্যহাতে ধুনো বা ঐ জাতীয় অন্যকোনো দাহ্য পদার্থ ছুঁড়ে মশালের শিখাকে বাড়িয়ে দেয়। সমবেত দর্শক তখন রাক্ষসের দোর্দণ্ড প্রতাপ চাক্ষুষ ক'রে একেবারে বিমোহিত হ'য়ে পড়ে।

মঞ্চে এসে রাক্ষস প্রথমে পটার পেছনে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। তারপর একে একে পার্শ্বমুখ, পার্শ্বশরীর ও শেষে সম্মুখভাগ দর্শকের গোচরীভূত করে। এই সময় হাত ও মুখের অতি পরিচিত কিছু মুদ্রার ব্যবহার করে সে এবং দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া ও অনুরূপ সব প্রাত্যহিক কাজ সম্পন্ন করে। এসবের মাঝে সে রাক্ষসোচিত অট্টহাসিতে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় দর্শকের। এসমস্তের পর তবেই তার সত্যিকার মঞ্চপ্রবেশ ঘটে। চরিত্রের প্রবেশরীতি ও রাজসভার স্বাতন্ত্র্য অনুসারে মদ্দলের পৃথক পৃথক বোল নির্দিষ্ট আছে।

সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে মঞ্চে মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা করা যায় না। যক্ষগানে কিন্তু অনুরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নেই মুখ্যতঃ বিষয়গত কারণে। যুদ্ধই যে নাটকের প্রধান অবলম্বন, সেখানে কাউকে না কাউকে হারতে হবে এবং মরতেও হবে। এরকম সময় মৃত ব্যক্তিকে ধরাধরি করে বাইরে অর্থাৎ চৌকীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে যেসব কাহিনীতে পরাজয় বা মৃত্যু বারবার ঘটে, সেখানে যে পরাজিত হবে তাকে যুদ্ধরত অবস্থাতেই তাড়িয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে বৃষসেনের মত বীরের, যার মৃত্যুর পর মৃত লাশ ঘিরে স্ত্রী-পুত্রের শোকদৃশ্য থাকে তার—মৃত্যু রঙ্গস্থলেই সংঘটিত হ'য়ে থাকে। এরকম দৃশ্যের পর দু'জন লোক শবের সামনে পটা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পটার আড়ালে ক'রে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে চৌকীতে চলে যায়।

কখনো কখনো মূল কাহিনীর প্রতীক্ষা করতে করতে দর্শক সাধারণ ক্লান্ত হ'য়ে নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে এবং আলস্যভরে হাই তুলতে থাকে। কিন্তু যেই রাজসভার দৃশ্য আসে অথবা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শুরু হ'য়ে যায়—তখন চণ্ডে এবং মদ্দলের সম্মিলিত রণধ্বনিতে তাদের নিদ্রাঘোর কেটে যায়। কাহিনী যখন দ্রুততার সঙ্গে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে তখন সমগ্র পরিমণ্ডলটাই বেশ গরম হ'য়ে ওঠে —ফলে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে দর্শক সাধারণও। যেসব আসরে একাধিক কাহিনী পরিবেশিত হয়—সেখানে সবশেষে পরিবেশিত হয় মীনাক্ষীকল্যাণ (মীনাক্ষী পরিণয়) বা কর্ণার্জুন যুদ্ধের মত চিত্তাকর্ষক পালা। কখনো শুয়ে, কখনো বা অর্ধনিমীলিত চক্ষে দর্শক যক্ষগান দেখতে থাকে। এরকম সময় দর্শক যেন কোনো

এক স্বপ্নলোকে বিরাজ করতে থাকে। আর চণ্ডী, বরাহ, নরসিংহের রৌদ্র ও বীভৎস রসাত্মক অভিনয় দর্শকের চোখে মাসাধিক কাল জীবন্ত থাকে।

রাতের অন্ধকার যখন পাতলা হ'য়ে আসে, পুব আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে আসে, তখন সমগ্র আসরে বিরাজ করতে থাকে বিদায়ের সুর। যদি বোঝা যায় যে, যে-কাহিনী চলছে, তা সূর্যোদয়ের আগে শেষ হবে না—তাহলে তার অভিনয়ের স্বাভাবিক গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়, কখনো কখনো কিছু কিছু অংশ বাদও দেয়া হ'য়ে থাকে। তবে গতি যতই বাড়ানো হোক না কেন যুদ্ধের দৃশ্য অবশ্যই দেখানো হ'য়ে থাকে, দেখানো হয় পরিণয় দৃশ্যের সমাপ্তিও। আর কাহিনীর শেষে ভাগবতকে সমাপ্তিগীতি গাওয়ার জন্যে বলা হয়। সমাপ্তি গীতির পর আগের সেই স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা দু'জন পুনরায় মঞ্চে আসে এবং ভাগবতকে পান-সুপারি দিয়ে নমস্কার জানায়। আর প্রসন্নচিত্তে ভাগবত তা গ্রহণও করে। পান-সুপারির মধ্যে সেদিনের মজুরি এবং পরের অনুষ্ঠানের বায়নাও নির্দিষ্ট থাকে। পান-স্বীকারের পর হনুমান প্রমুখ দেবতার প্রশস্তি গাওয়া হয়। সবশেষে রঙ্গস্থলের আরতি করা হয়। এরপর রঙ্গকর্মে নিবৃত্ত হ'য়ে দলের সমস্ত সদস্যই ভাগবতসহ নেপথ্যগৃহে চলে যায়। চৌকিতে পৌঁছে ভাগবত—'রাম-কৃষ্ণ এসেছেন, দ্বার খোলো'। কিংবা "কামধেনু এসেছে আনন্দ করো"—প্রভৃতি গান গায়। চৌকিতে ইষ্ট দেবতার আরতির সঙ্গে সঙ্গে সে রাত্রের রঙ্গকর্ম সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়। সমাপ্তিগীতিতে স্পষ্ট হয় যে প্রারম্ভের সেই বালগোপাল আর কেউ নন স্বয়ং বলরাম এবং কৃষ্ণ। দলের সকলে একথাও স্পষ্টরূপে স্বীকার ক'রে নেয় যে পালা তাঁর বা সেই পরমকর্তারই সৃষ্টি আর সেই সৃষ্টির জগতেই তারা সমস্ত রাত কাটিয়েছে।

যক্ষগান তাই—প্রচলিত বিশ্বাসমতে—ভাগবতের পরিচালনায় দশাবতারের অভিনয় এবং পরমেশ্বরের মহিমা-কীর্তন।

খুবই স্বাভাবিক কারণে যক্ষগান আজ বিপর্যয়ের মুখে। কেননা, এর এক একটি প্রযোজনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাছাড়া সিনেমা, টেলিভিশন্ আজ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অস্তিত্বের সংকটে যক্ষগানের রক্ষণাবেক্ষণে ও প্রচার প্রসারে এগিয়ে এসেছেন উডুপীর যক্ষগান কেন্দ্রের শিক্ষাগুরুগণ, কর্মকর্তারা। এঁদের বিশ্বাস সব রকমের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যক্ষগান তার প্রচার প্রসার অব্যাহত রাখতে পারবে।

দোড্ডাট :

কর্ণাটকের লোকনাট্য দুইভাগে বিভক্ত, একটি হ'লো—মূডলপায় বয়লাট, অন্যটি হ'লো—পডুবলপায় বয়লাট। মূডল মানে পূব, পায় মানে পদ্ধতি বা রীতি আর বয়লাট মানে উন্মুক্ত ময়দানে অভিনেয় নাটক। অর্থাৎ মূডলপায় বয়লাট

হ'লো উন্মুক্ত ময়দানে পূর্ব-রীতিতে অভিনেয় নাটক, আর পড়ুবণপায় বয়লাট মানে হ'লো দক্ষিণ অথবা পশ্চিমী রীতিতে উন্মুক্ত ময়দানে অভিনীত নাটক। যক্ষগানকে তাই বলা হয় পড়ুবণপায় বয়লাট, পড়ুবণপায় বয়লাটের তুলনায় মুডণপায় বয়লাট অনেক বেশী অবহেলিত।

কর্ণাটকের সুধীসমাজের অবহেলা সত্ত্বেও উত্তর কর্ণাটকের গ্রামাঞ্চলে কয়েক প্রকার মুডণপায় বয়লাট জন-সাধারণের নাট্যরস পিপাসা মিটিয়ে চলেছে। যেমন দোড্ডাট, রাধানাট, সন্নাট। এদের মধ্যে দোড্ডাট অন্যতম। দোড্ড মানে বড় (অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি ব্যাপি অভিনেয়) আর আট মানে নাটক। অর্থাৎ দোড্ডাট হ'লো সমস্ত রাত্রিব্যাপি অভিনেয় নাটক।

সাধারণতঃ বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত গ্রামীণ মেলায় দোড্ডাটের অভিনয় হ'য়ে থাকে। ধারওয়াড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে এমন কুড়িটি দলের সন্ধান পাওয়া যায় যারা বিভিন্ন মেলায় এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে দোড্ডাটের অভিনয় ক'রে বেড়ায়। দোড্ডাটের কাহিনী সাধারণতঃ মহাভারত থেকে নেয়া হয়। কাহিনীগুলির অধিকাংশই বীররসাত্মক। তবে সহযোগী রস হিসেবে শৃঙ্গারও সন্নিবেশিত হয় পর্যাপ্ত মাত্রায়। মহাভারতের নির্বাচিত কাহিনী বেছে নিয়ে তার নাট্যরূপ দেয় গ্রামেরই কোনো লেখাপড়া জানা মানুষ। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষকই এই কাজ ক'রে থাকেন। নাটক লেখা হ'য়ে গেলে অভিনেতা নির্বাচন করা হয়। অভিনেতা নির্বাচনের সময় চরিত্রানুকূল চেহারার দিকেই নজর দেয়া হয়ে থাকে। যাইহোক, অভিনেতার নির্বাচন হয়ে গেলে তাদের চরিত্রলিপি দিয়ে দেয়া হয়। তখন তারা নিজেদের সংলাপ মুখস্থ ক'রে নেয়। অভিনেতাদের সংলাপ আয়ত্ত করতে প্রায় মাস ছয়েক সময় লেগে যায়। নাটকাভিনয়ের একমাস আগে অভিনয় স্থলে বিধিপূর্বক একটি স্তম্ভ পোঁতা হয়। এই স্তম্ভটি একমাস ধ'রে ঐ স্থানে দোড্ডাট অভিনয়ের প্রচারের কাজ ক'রে থাকে। ফলে আশপাশের গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে অমুক অমুক স্থানে (যেখানে যেখানে বিধিপূর্বক স্তম্ভ পোঁতা আছে) দোড্ডাটের অভিনয় হবে। আর যে গ্রামে দোড্ডাটের অভিনয় হবে সেই গ্রামের মানুষ আশপাশের গ্রামে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লিখে (বা লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে) আমন্ত্রণ জানায় দোড্ডাট দেখার জন্যে। যারা দোড্ডাট দেখতে ইচ্ছুক তারা পায়ে হেঁটে কিংবা গরুর গাড়ীতে চেপে এক-দু'দিন আগেই এসে পৌঁছে যায় সেই গ্রামে।

মঞ্চ-নির্মাণে গ্রামের সকল মানুষই বেশ উৎসাহভরে অংশ নিয়ে থাকে। মঞ্চ বেশ বড় এবং তিনদিক খোলা। অবশ্য সাধারণ একখানা চৌকি ফেলে চাঁদোয়া টাঙিয়েও দোড্ডাটের অভিনয় হ'য়ে থাকে। যাইহোক, মঞ্চের তিনদিক ঘিরে নিজ নিজ আসন বিছিয়ে দর্শক আসন নিয়ে থাকে। যারা আসন আনে

না—তারা মাটিতে বসেই অভিনয় দেখে। দোড্ডাটের অভিনয়ে মাইকের প্রচলন এখনো হয়নি। কেননা অভিনেতারা এত জোরে সংলাপ উচ্চারণ করে যে রাত্রির শান্ত পরিবেশে খুব দূর থেকেও তাদের কথা ভালোভাবেই বোঝা যায়। গ্যাসের আলোই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। বীররসাত্মক কাহিনীর সমস্ত চরিত্রই নাচতে নাচতে মঞ্চে আসে। ফলে মঞ্চ নির্মাণ করা হয় মজবুত ক'রে। চরিত্রগুলি যতক্ষণ মঞ্চে থাকে কোনো না কোনো ভাবে নাচতে থাকে। ফলে মঞ্চ মজবুত না হ'লে চলে না।

মঞ্চের অনতিদূরে খুবই সাধারণ ভাবে সামান্য আড়াল দিয়ে তৈরী করা হয় সাজঘর। সাজঘরেই অভিনেতারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মেকআপ ক'রে নেয়। দোড্ডাটের সাজসজ্জা বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। প্রধান প্রধান চরিত্রের মাথায় শোভা পায় আকর্ষণীয় সব কিরীট আর কব্জিতে, বাহুতে, গলায়, কানে পরা হয় উপযুক্ত অলঙ্কার। পুরুষ চরিত্রাভিনেতারা কন্নার নামক একধরণের চটকদার রেশমের শাড়ি ধুতির মত ক'রে পরে নেয়। দোড্ডাটে এখনো অভিনেত্রীরা যোগ দেয়নি। পুরুষরাই স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করে। স্ত্রীচরিত্রের শরীরে থাকে নানাবিধ গহনা। স্ত্রী-চরিত্রাভিনেতারা নারীসুলভ আচরণে এতই দক্ষ যে কখনো কোনোরূপ সন্দেহ দেখা দেয় না। নারী সুলভ চলা, বলা, ও অঙ্গভঙ্গিতে এইসব অভিনেতারা বাস্তব জগতের মহিলাদের হার মানিয়ে দিতে সক্ষম। রাক্ষস ও অন্যান্য অসৎ চরিত্রের জন্য লাল, কালো ও হলুদ রঙের মেকআপ ব্যবহার করা হয়। এদের মেকআপ খুবই আকর্ষণীয়। নৃত্য প্রধান হওয়ার দরুণ অভিনেতারা প্রত্যেকেই ঘুঙুর প'রে থাকে।

নাচ এবং গান দোড্ডাটের প্রধান অবলম্বন। গানের ভাষা আঞ্চলিক, তবে গদ্য সংলাপ খুব বেশী মাত্রায় সংস্কৃত প্রধান। সমস্ত সংলাপই অনুপ্রাস-বদ্ধ। এর দরুণ সংলাপ উচ্চারণে জোর দিতে সুবিধা হয় অভিনেতাদের। আর জোরে উচ্চারণ না করলে যেমন তা দূর থেকে শোনা যাবে না, তেমনি ঢোলের জোর বাজনাকেও অতিক্রম করতে পারবে না। তবে সব শব্দ বোঝা না গেলেও কাহিনীর অনুধাবনে দর্শক সাধারণ কোনো অসুবিধা বোধ করে না। কেননা, প্রায় সব কাহিনীই দর্শকের কাছে পরিচিত। আর যেহেতু কাহিনী বীর রসাত্মক, সেইহেতু দোড্ডাটের মঞ্চে বীর চরিত্রের আনাগোনা অধিক। আর বারত্ব প্রকাশের জন্য বীর চরিত্ররা তাদের সংলাপ উচ্চারণের আগে বিকট এক হুঙ্কার ছেড়ে নেয়। উপরন্তু মঞ্চস্থিত কোনো চরিত্র যখন কথা বলে তখন তার প্রতিটি বাক্যের শেষে যে শোনে সে ক্রমাগত হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে যায়। এই সময় অভিনেতা নাচ ও অভিনয়-জনিত ক্লান্তি দূর করার অবসর পায়। প্রায় সব চরিত্রই সংলাপের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎই দুই একটি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার ক'রে ফেলে। বলাই বাহুল্য দোড্ডাটের দর্শক এই জাতীয় শব্দ শোনায় অভ্যস্ত।

ঢোল বাজনার পর সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতী এবং গণেশের স্তুতি গাওয়া হয়। এই স্তুতিগান দোড্‌ডাটের অভিনয়ে অবশ্য পালনীয় এক পূর্বরঙ্গ বিধি। স্তুতি গানে প্রধান ভূমিকা পালন করেন সূত্রধার। দোড্‌ডাটের পরিভাষায় তিনি ভাগবত বা ভাগবতর। দোডডাটের গায়ন-বাদনকে বলা হয় হিম্মেক। ভাগবত এই হিম্মেকের প্রধান বা নেতা। গান শুরু করেন তিনি। বাকি সকলে সমবেত ভাবে কখনো বা অবসর মতো তার সঙ্গে গলা মেলায়। বাজনদার বসে মঞ্চের এক কোণে আবার কোথাও কোথাও মঞ্চের এক ধার বরাবর আপন আপন বাদ্য যন্ত্র সহ। ঢোলই দেড্‌ডাটের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমেনিয়াম, তবলা এবং বেহালা অন্যতম।

ভাগবত কর্তৃক গণেশ পূজা ও সরস্বতী বন্দনার সময় গণেশ ও সরস্বতী মঞ্চে এসে নৃত্য করেন। আর এমনি সময়ে তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসার অভিনয় ক'রে মঞ্চে আসে সারথী। দোড্‌ডাটের অভিনয়ে সারথীর ভূমিকা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। নাটক ও চরিত্রের পরিচয় দিয়ে এবং নানাবিধ হাস্য-রসের যোগান দিয়ে সে এক দিকে কাহিনীর একঘেয়েমি দূর করে অন্যদিকে দর্শকের স্বাভাবিক সব প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করে। সারথী যেন দর্শকেরই প্রতিভূ। মঞ্চে এসে সে দর্শকের নানাবিধ কৌতূহল প্রকাশ ও তার চরিতার্থতায় অত্যন্ত সদর্থক এক ভূমিকা পালন করে। যাইহোক, মঞ্চে এসে সারথী প্রথমে ভাগবতকে প্রশ্ন করে।

সারথী—গ্রামের মধ্যে হৈ-চৈ করছো কেন?

ভাগবত—কোথায় হৈ-চৈ করছি? আমরা তো ভাগবত কাহিনী দেখাতে যাচ্ছি।

সারথী—আমাকে তোমাদের দলে নেবে?

ভাগবত—কেন নেবো না? তোমাকে আমি রাজদূতের ভূমিকা দেবো।

সারথী—যে টাকা পয়সা পাবে তা দিয়ে কি করবে?

ভাগবত—নস্যি কিনে নাকে দিয়ে হাঁচবো।.........এইভাবে (হাঁচে)।

সারথী এবং ভাগবতের মধ্যে হাসিঠাট্টা সহযোগে যখন এইভাবে অভিনয়ের প্রস্তাবনা চলে তখন কাহিনীর নায়ক মঞ্চে এসে তার আরব্ধ কাজে লিপ্ত হ'য়ে যায়। সারথী তখন ভাগবতকে ছেড়ে নায়ককে নিয়ে ব্যস্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? কি কাজ আছে এখানে? এমনি সব নানাবিধ প্রশ্ন। নায়কও সে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে। সারথী তখন আগের মত ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং পুনরায় মঞ্চে এসে চরিত্রের পরিচয় দান ও ঘটনার অগ্রগতি সাধনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। তবে পরবর্তী সময়ে সারথীর সঙ্গে মঞ্চে আসে গোড্ডী—দোড্‌ডাটের বিদূষক। দোড্‌ডাটের অভিনয়ে সারথীর মত গোড্ডীর

ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান চরিত্র নাচতে নাচতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে নিজের সংলাপ আর ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না। এরকম সময় সারথী ও গোষ্ঠী মঞ্চে এসে দর্শকদের হাসায়। ফলে সামান্য বিশ্রাম পায় পরিশ্রান্ত সেই চরিত্রাভিনেতা। কখনো কখনো প্রধান কাহিনীর মধ্যে মধ্যে ছোটো খাটো প্রহসনও দেখানো হয়। এরও মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকদের একঘেয়েমি দূর করা এবং চারিত্রাভিনেতাদের বিশ্রামের সুযোগ ক'রে দেয়া। প্রহসন অভিনয়ের সময় ভাগবত একেবারেই নীরব থাকে। এই সময় গান ও সংলাপ—এই উভয়বিধ কাজে অংশ নিয়ে থাকে গে ড্ড (বা আডোসোগু)।

যাইহোক, সারথী প্রধান-চরিত্র ও তার কাজের পরিচয় দেবার পর গান, গদ্য সংলাপ, অভিনয় ও নাচের সাহায্যে দোড়্ভাটার কাহিনী এগিয়ে চলে। গানের মত নাচের ভূমিকাও দোডডাটায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঝে মধ্যে সামান্য গদ্য সংলাপের প্রয়োগ হলেও দোডডাটার কাহিনী পরিবেশনে গানই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই গানের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রাভিনেতারা বিরামহীন ভাবে নৃত্য ক'রে চলে। নাচ যেন দোড়্ভাটারই অপর নাম। তার ফলে সাধারণ মানুষ কখনেই কোনো অভিনেতাকে জিগ্যেস করে না "আপনি কোন চরিত্রের অভিনয় করেছেন", জিগ্যেস করে—'তুমি কোন চরিত্রে নাচছো?' কেননা দোড়্ভাটার অভিনয় সমস্ত চরিত্রাভিনেতাই সকল সময়ই নাচতে থাকে। এমনকি গণেশপূজার সময় স্বয়ং গণেশও মঞ্চে এসে শুঁড় উঁচিয়ে নাচতে থাকেন।

দোড়্ভাটায় প্রযুক্ত নাচ অবশ্যই কোনো শাস্ত্রীয় নৃত্যের পর্যায়ে পড়ে না। তবে ভরতনাট্যমের অনেক জনপ্রিয় পদাঘাত অপরিচিত রূপে দোড়্ভাটায় উপলব্ধ হয়। দারীলোরূব কুণিত (রাস্তা দেখানোর নাচ) হূ কোয়যুব কুণিত (ফুলপাড়ার নাচ) নীর তুম্বুব কুণিত (কলসীতে জলভরার নাচ), সুগ্গি কুণিত (ফসল নৃত্য) প্রভৃতি দোড়্ভাটায় ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যায়। তবে এই সব নৃত্যের কোনো শাস্ত্রীয় বিধান না থাকায় গ্রাম্য মানুষ দেখে অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই নৃত্য আয়ত্ত ক'রে থাকে। পুরুষ চরিত্রাভিনেতারা সকল সময়ই শৌর্যে-বীর্যে অনুপম। কৃষ্ণ তো তার চক্রে [illegible] পদ্মর পাড়ার চাকা ঘোরানোর অভিনয় করে। এই সময় অতিভারী [illegible] কয়েক জন লোক উঁচু ক'রে ধ'রে রাখে। তবে স্ত্রীচরিত্রাভিনেতা[illegible] অভিনয় ও নৃত্য অবশ্যই লালিত্যপূর্ণ, পক্ষান্তরে পুরুষ চরিত্রাভিনেতার অভিনয় ও নৃত্য ভাবলেশহীন শক্তির দ্যোতক।

অন্যান্য লোকনাট্যের মত দোডডাটায়ও শুভের জয় এবং অশুভের পরাজয় দেখানো হ'য়ে থাকে। দোড়্ভাটা জনতা দ্বারা জনতার জন্যেই অভিনীত এক লোকনাট্য। দর্শক অভিনেতার পারস্পরিক সম্পর্কও এই আঙ্গিকে খুবই ঘনিষ্ঠ। ফলে দেবতা গণেশও যদি তার শুঁড় ঠিকমত না আটকিয়ে মঞ্চে আসে তো

দর্শক চিৎকার ক'রে ওঠে "ঠিক ক'রে লাগিয়ে দাও, নইলে খুলে পড়ে যাবে"। এই জাতীয় ঘটনা শহরের বা থিয়েটারের দর্শকদের বিরক্ত করবে নিঃসন্দেহে কিন্তু দোড্ডাটার দর্শকরা এতে খুবই মজা পায়। আসলে অন্যান্য লোক-নাট্যের মত দোড্ডাটার দর্শকও অনেক কিছুই নিজেদের কল্পনার রঙে বাড়িয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কোনো দৃশ্যে হয়তো কোনো চরিত্র জানালো—এবার সে দারুণ সেজেগুজে অমুক জায়গায় অমুক কাজে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল যে কোনো বেশ পরিবর্তন না করেই সে পরের দৃশ্যে এসেছে। দর্শক কিন্তু ধ'রে নেয় সে খুব সেজেগুজেই এসেছে। বেশ-পরিবর্তন বা পটদৃশ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা না থাকায় লোক-নাট্যের অনেক কিছুই নির্ভর করে দর্শকদের কল্পনাশক্তির ক্রিয়াশীলতার ওপর।

জনশিক্ষার প্রসারে উত্তর কর্ণাটকের এই অবহেলিত লোক-নাট্যটির পুনরুদ্ধার করা খুবই প্রয়োজন, কেননা এই সিনেমা-টি.ভির ব্যাপক প্রসারের যুগেও দোড্ডাটার সঙ্গে ঐ অঞ্চলের মানুষের আত্মিক যোগ খুবই নিবিড়।

অসমের লোকনাট্য



অঙ্কিয়ানাট ভাওনা

অসমীয়া ভাষায় ভাওনা শব্দের অর্থ নাট্যোপস্থাপনা। তবে সমস্ত রকমের নাট্যোপস্থাপনাকে ভাওনা বলা হয় না। কেবলমাত্র বৈষ্ণব প্রভুদের দ্বারা প্রবর্তিত অঙ্কিয়ানাটের উপস্থাপনার সঙ্গেই শব্দটি প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে।

অঙ্কিয়ানাট অসমের লোকনাট্য। শাস্ত্রীয় সংস্কৃত নাটক বাস্তব কারণেই ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলে বৈষ্ণব প্রভুরা তাঁদের ধর্মের প্রচারার্থে জনজীবনে প্রবাহিত নাট্যের ধারাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। অঙ্কিয়ানাট-ভাওনা এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অঙ্কিয়ানাটের অভিনয়কে বলা হয় অঙ্কিয়া-ভাওনা। ষোড়শ শতাব্দীতে অসমে—বিশেষ ক'রে কামাখ্যামন্দিরের চারপাশে তন্ত্র সাধনা ও শক্তিপূজার অন্তসার পন্থার আড়ালে যেসব গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল, অসমের জনমানসিকতাকে তা থেকে মুক্ত করতে শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় অসমের প্রায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের আখড়া 'সত্র'। সত্রয় অনুষ্ঠিত সাধন-ভজনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই অঙ্কিয়ানাট-ভাওনার উদ্ভব এবং কালানুক্রমে তার প্রচার প্রতিষ্ঠা। শঙ্করদেব ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তাই তার প্রবর্তিত এই নাট্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক নাট্যেরও বেশ প্রভাব পড়েছে।

শঙ্করদেব নিজে তাঁর ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে নাট্যকেই বেছে নেন। ফলে বেশ কয়েকখানি নাটক (অঙ্কিয়ানাট) তাঁকে লিখতে হ'য়েছিল। গঠন-রীতির দিক থেকে তাঁর লেখা নাটকে যেমন পূর্বসূরিদের প্রভাব রয়েছে তেমনি রয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তিমপর্বের সংস্কৃত নাটকের প্রভাবও। তাঁর নাটকের সন্ধি শিথিল-বন্ধ। উপরন্তু সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন ও বোধগম্যতার দিকে লক্ষ্য রাখায় তাঁর প্রবর্তিত নাট্যে স্থানীয় রামায়ণ-গীতি, বৃন্দগান এবং ধুলিয়া ও ওজাপালী নৃত্যের সমাবেশ ঘটেছে। শঙ্করদেবের নাটকগুলি তাই সংস্কৃত—বিশেষ ক'রে সঙ্গীতক, উপরূপক এবং প্রাদেশিক নাট্য-ঐতিহ্যের সম্মিলনে গঠিত নাট্যধারার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে এর ভাষা ব্রজবুলি। আজও অঙ্কিয়ানাটের ভাষায় অসমীয়া ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত ব্রজবুলিরই প্রাধান্য। শঙ্করদেবের নাটকগুলি (১) নাট্যগুণে সমৃদ্ধ অঙ্কিয়ানাট, (২) গীতিধর্মী কীর্তন এবং (৩) কাব্যধর্মী বড়গীতি—এই তিন ভাগে বিভক্ত। তবে এদের প্রত্যেকটির মঞ্চোপস্থাপনীয়তার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য খুবই স্পষ্ট।

অঙ্কিয়ানাটের প্রবর্তকরূপে খ্যাত হ'লেও শঙ্করদেব কিন্তু কোথাও তাঁর নাট্য-শৈলীর নামকরণের উদ্দেশ্যে 'অঙ্কিয়ানাট'-এর উল্লেখ করেননি। পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করেছেন—যাত্রা, নাটক, নৃত্য, এমনকি 'নট' প্রভৃতি শব্দ। তাঁর অনুসারীরা—বিশেষ ক'রে রামানন্দ এবং রামচরণ শঙ্করদেবের নাটকের বর্ণনা প্রসঙ্গে অঙ্কিয়ানাটের প্রয়োগ করেছেন। আবার শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব তাঁর নাটকের অভিনয়কে 'ঝুমর' নামে অভিহিত করেছেন। যাইহোক, শঙ্করদেব এবং তাঁর প্রধান শিষ্য মাধবদেব এই রীতির প্রবর্তন করেন যে প্রত্যেক সত্রর প্রধানকে তাঁর সংবর্ধনা সভায় নিজের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে। এর ফলে অঙ্কিয়ানাট লেখা এবং ভাওনার অভিনয় সত্র এবং নামঘরের ক্রিয়াকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হ'য়ে ওঠে। নামঘরের অনুষ্ঠানে কীর্তন, বিশেষ ক'রে অসমের বড়গীতির জনপ্রিয়তা অপরিসীম। তবে ভাওনার গুরুত্বও খুব কম নয়। শঙ্করদেব এবং মাধবদেব সেই সব বৈষ্ণব প্রভুদের অনুসরণ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার। এঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন কালঝাড় সত্রর প্রতিষ্ঠাতা গোপাল মোতা এবং রামানন্দ দ্বিজ। যাইহোক, আজকের অঙ্কিয়ানাট এবং ভাওনার ইতিহাস কিন্তু তাই অসমের বিভিন্ন সব সত্র এবং নামঘরের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

বৈষ্ণবধর্ম স্বভাবে গণতান্ত্রিক। তাই সত্রর অধিকারীরা ব্রাহ্মণ বা যেকোনো বর্ণেরই হ'তে পারেন। ভাওনার অভিনয়েও যেমন সত্রর অধিকারীরা অংশ নেয় তেমনি গ্রামের সাধারণ মানুষেরও এতে সমান অধিকার। অঙ্কিয়ানাট বা ভাওনা তাই অসমের সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের নিজস্ব মাধ্যম।

সত্রর অধিকারীদের সদিচ্ছায় প্রবর্তিত হওয়ায় এই নাট্য বৈষ্ণব সাধন-

ভজনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'য়ে ওঠে এবং সত্রর উপাসনাগৃহে বা নামঘরেই-এর অভিনয় হয়। সত্রর তিনটি অংশ—উপাসনাগৃহ বা নামঘর, মণিকুট বা অলঙ্কার-গৃহ এবং বৈষ্ণব ভক্ত এবং প্রভুদের বাসগৃহ বা হাতি। ভাওনার অভিনয়ে অবশ্য হাতির কোনো প্রয়োজন হয় না। বাঁশ বা নলখাগড়ার বেড়া দেয়া বাঁশের কিংবা কাঠের খুঁটির ওপর দাঁড় করানো টিনের বা খড়ের আটচালার ২০০ হাত লম্বা এবং ৪০ হাত চওড়া নামঘরে বা রভায় এর অভিনয় হয়। তাই একে ভাওনা-ঘরও বলা হ'য়ে থাকে। অভিনয়ের আগে কাঠের খুঁটিগুলি নানারকমের কাজ করা রঙিন কাপড় দিয়ে সুন্দর ক'রে মুড়ে দেয়া হয়। অভিনয়ের সময় অবশ্য পাশের বেড়াগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে নামঘরের স্থাপত্য-কর্ম কেরলের কুত্তমবলমের মত জটিল না হ'লেও তার সঙ্গে এর এক নিকট সম্পর্ক অবশ্যই আছে।

যাইহোক, নামঘরের সংলগ্ন অংশকে ব'লে মণিকুট। একে সিংহাসনও বলা হয়। নামঘরের একপ্রান্তে এটির অবস্থান। ভাওনা অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন সব শুভলক্ষণ সংক্রান্ত জিনিসপত্র এখানে রেখে রঙিন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। নামঘরের একপাশে, কখনো কখনো বা মধ্যেই ছোটো একটি অংশ ঘেরা থাকে। একে বলা হয় ছো-ঘর। ছো-ঘরই যে গ্রীনরুম বা নেপথ্যগৃহ তা বলাই বাহুল্য। ছো-ঘর সম্ভবতঃ সাজঘর বা ছদ্মগৃহেরই অসমীয়া রূপ। মুখোশ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং 'ভাওনার' যাবতীয় মঞ্চোপকরণ—মঞ্চসজ্জায় ব্যবহৃত পাহাড়, পর্বত, রথ ও জীবজন্তুর মডেল—এই ছো-ঘরেই সংরক্ষিত থাকে।

নামঘরের ঠিক মধ্যভাগে লাল ঝালরের একটি চাঁদোয়া খাটানো হয়। চাঁদোয়ার তলার অংশটিই হ'লো অভিনয় ক্ষেত্র। এর যেদিকে মণিকুট থাকে ঠিক তার উল্টোদিকে বসে মৃদঙ্গ, খোল ও মঞ্জীরা বাদক। অভিনয়ের সময় বাজনদাররা যাতে সকল সময়ই পবিত্র মণিকুটের ওপর চোখ রাখতে পারে তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। চাঁদোয়ার নীচেকার অভিনয় ক্ষেত্রের চারপাশেই কলাগাছের কাণ্ডে মাটির তৈরী প্রদীপ লাগিয়ে দেয়া হয়। একে বলা হয় অগ্নিগদা।

এই প্রদীপের মৃদু আলোয় অভিনয় সংঘটিত হয়। তবে চরিত্রের প্রবেশ প্রস্থান নাটকীয় ক'রে তুলতে ও অন্যসব নাটকীয় মুহূর্তে একধরণের বহনযোগ্য মশাল ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় অগ্নিঘেরা। অগ্নিগদা এবং অগ্নিঘেরাই ভাওনা অনুষ্ঠানে আলোর যোগান দেয়। অভিনয়ক্ষেত্রের চারপাশেই বিছানো মাদুরের ওপর দর্শকরা আসন নেয়। একেবারে শেষ প্রান্তের দর্শকরা কখনো কখনো দাঁড়িয়েও থাকে। নাট্যাভিনয় সকল শ্রেণীর মানুষেরই উপভোগ্য—ভাওনায় খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ভরতের এই বাক্য মেনে চলা হয়। তবে মণিকুটের

নিকটবর্তী আসনগুলি মন্ত্রের অধিকারী এবং গ্রামপ্রধানদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকে। দূরবর্তী অংশে অন্যদের অর্থাৎ সাধারণের আসন্। মহিলা দর্শকদের জন্যেও এলাকা নির্দিষ্ট থাকে। রামলীলা-রাসলীলার মত কিছু প্রারম্ভবিধি ভাওনাতেও অবশ্য পালনীয়। এরমধ্যে অন্যতম হ'লো উপবাস যাপন। অভিনেতারা—বিশেষ ক'রে রাম, কৃষ্ণ এবং সূত্রধারের চরিত্রাভিনেতাকে অভিনয়ের দিন অবশ্যই উপবাসী থাকতে হয়। এছাড়া অভিনয়ের পূর্বে সারাদিনের সমবেত নামসংকীর্ত্তনে অংশগ্রহণও এক অবশ্য পালনীয় পূর্বরঙ্গ বিধি।

প্রথমে মঞ্চপ্রবেশ ঘটে গায়ক ও বাজনদারদের। সাদা আড়কাপড় বা পর্দার আড়ালে দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে এরা মঞ্চে আসে। সমবেত দর্শক মণ্ডলীও মহোৎসাহে "জয় হরিবোল" "জয় রায়না বোল"—প্রভৃতি ধ্বনি তুলতে থাকে। মঞ্চে এসে বাজনদাররা অভিনয় ক্ষেত্রের দুই পাশে অথবা একে অপরের সামনে পিছনে বসে পড়ে। অঙ্কিয়ানাটের পরিভাষায় এদের বলা হয় গায়ন ও বায়ন বা সংক্ষেপে গায়ন-বায়ন। এদের আগমন ও আসন গ্রহনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে অগ্নিঘেরার অগ্নিক্রিয়া—যা খুবই মনোমুগ্ধকর। গায়ন-বায়নের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে আসে একজন ভাঁড়। গায়ন-বায়নের গৌরচন্দ্রিকা এবং ভাঁড়ের ভূমিকাদান চলতে থাকে একই সঙ্গে। ভাওনার ভাঁড়ের সঙ্গে যক্ষগানের কোদাঙ্গী এবং ময়ূরভঞ্জ ছো এর মৌবামৌবীর এক নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, ভাওনার এই পূর্ব রঙ্গ-বিধির নাম হ'লো 'ধেমালী'। বিভিন্ন সব সত্রয় ধেমালীর বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। ডঃ মহেশ্বর নিয়োগ ১২ প্রকারের ধেমালীর উল্লেখ ক'রেছেন। সংস্কৃত নাটকের পূর্বরঙ্গের সঙ্গে এই ধেমালীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

খোল, মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা সহযোগে গীত বিভিন্ন সব ধেমালী (বড়-ধেমালী, ন-ধেমালী অথবা নট-ধেমালী)-র অব্যবহিত পরেই ঘটে প্রথম নাট্য-চরিত্রের মঞ্চ-প্রবেশ। মঞ্চে প্রবেশ করে সূত্রধার। সূত্রধার ও অন্যান্য চরিত্রের মঞ্চে আসাকে বলা হয় 'পাত্র-প্রবেশ'। মঞ্চে এসে সূত্রধার প্রথমে নৃত্য করে, পরে নান্দী গায়। নান্দীর মাধ্যমে সে অভিনেতব্য বিষয়ের সূচনা দেয়। এর সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত প্ররোচনার বেশ মিল আছে। নান্দীর পর সূত্রধার আবার নৃত্য করে এবং 'ভাতিমা' গেয়ে কাহিনার বর্ণনা দেয় ও চরিত্রের পরিচিতি দান করে। এরপরে গায় প্রবেশগীতি—যা নায়কের আগমন সূচনা করে। গীতির তালে তালে মঞ্চ পরিক্রমণ ক'রে সে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শেষে নায়কের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ে। অনুরূপে সমস্ত প্রধান পাত্র মঞ্চে আসে এবং তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ে। এরপর শুরু হয় নাটক। সূত্রধার কিন্তু সারাক্ষণই মঞ্চে উপস্থিত থাকে এবং নাচ গানের সাহায্যে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে সমাপ্তিতে পৌছায়।

অবশ্য সমস্ত নাটকেই নান্দী কিংবা ভাটিমা থাকে না। উদাহরণ-স্বরূপ শঙ্করদেবের পত্নীপ্রসাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে সমস্ত অঙ্কিয়ানাটেই বর্ণনাধর্মী গদ্য, আবৃত্তিযোগ্য পদ্য, গান এবং নাটকীয় সংলাপ থাকে। আর বিষয়ের হেরফেরে এদের গুরুত্বের হ্রাসবৃদ্ধিও ঘটে। যেমন রাসলীলার রাসকা প্রভাবিত পত্নীপ্রসাদে কৃষ্ণকে ঘিরে বৃত্তকার নাচ এবং মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত লক্ষ্য করা যায়। এই নাচ আবার বিশুদ্ধ (নৃত্ত) এবং ভাবদ্যোতক (নৃত্য)—এই দুই ভাগে বিভক্ত। তবে নৃত্যেরই প্রাধান্য। 'পারিজাত হরণে' গানই বেশী। আবার 'রুক্মিনী হরণে' এর সবই সমমাত্রায় বিদ্যমান। মাধবদেবের নাটকগুলি আবার রীতিমত মাত্রায় অপেরাধর্মী। তাঁর নাটকে নাট্যধর্মিতা অপেক্ষা গীতিধর্মিতারই প্রাধান্য এবং সংলাপের ভাষা বৈচিত্র্যহীন হওয়ায় এগুলির অভিনয়-সম্ভাবনাও খুব বেশি নয়। অন্যদিকে শঙ্করদেবের নাটকগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সযত্ন প্রশ্রয়। সাধারণ মানুষের রুচি ও বোধগম্যতার ব্যাপারে তিনি যে খুবই সতর্ক ছিলেন এ থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। যাইহোক, অঙ্কিয়ানাটে এত যে নাচ এবং গান তা কিন্তু কখনই প্রক্ষিপ্ত বা আরোপিত বলে মনে হয় না। অন্যান্য এদেশের লোকনাট্যের মতই ভাওনাতেও নাচ এবং গান নাটকেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভাওনার নাচ ও গানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাব অবশ্যই আছে, তবে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও কিছু কম নয়।

শঙ্করদেব অথবা অন্যান্যদের বড়গীতির একটি নিজস্ব সুর আছে। কাঠামোগত দিক থেকে ধ্রুবনাদ অথবা 'প্রবন্ধ'-র সাথে এর এক নিকট সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় বড়গীতির চারটি অংশ,—ধ্রুব, (২) অন্তরা, (৩) সঞ্চারী এবং (৪) আভোগ। একটি বিশেষ তালে (বিভিন্ন সব চামড়ার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অথবা ব্যতিরেকে, তবে খোল এবং মঞ্জীরা আবশ্যিক) এগুলি গাওয়া হয়। ভাটিমার কোনো নির্দিষ্ট তাল বা রাগ নেই। ভাটিমার সুরও আবৃত্তি এবং গানের মধ্যবর্তী পর্যায়ের। তবে সামগ্রিক ভাবে প্রত্যেকটি অঙ্কিয়ানাটেরই তাল-রাগ-সমন্বিত একটি বিশেষ ছন্দ আছে। শঙ্করদেব এবং মাধবদেব তাঁদের নাটকে প্রায় ৩৪টি রাগের ব্যবহার ক'রেছেন।

ভাওনার মনমাতানো নাচে অন্যান্য প্রাদেশিক নাচের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। শঙ্করদেব তাঁর ভাওনার জন্যে মাধবহরি বিজয়-মন্দিরের নটী-নৃত্য, মনসাপূজার দেওধানীনৃত্য এবং বিভিন্ন আদিবাসী-নৃত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে এক বিশেষ ধরনের অসমীয়া নৃত্যের প্রচলন করেন। ভাওনার নাচ চরিত্রের নামানুসারে তিনটি ভঙ্গীতে বিভক্ত—(১) সূত্রভঙ্গী, (২) কৃষ্ণভঙ্গী এবং (৩) গোপীভঙ্গী। সূত্রভঙ্গী আবার দু'ভাগে বিভক্ত—(১) স্থিত অঙ্গের লাস্য-ধর্মী সূত্রভঙ্গী এবং (২) স্ফুরিত অঙ্গের তাণ্ডবধর্মী বড়ভঙ্গী। নান্দী এবং ভাটিমা গানের সময়ই সূত্রভঙ্গী প্রযুক্ত হয়। প্রবেশগীতিতে যখন কৃষ্ণ এবং রামের প্রবেশ ঘটে তখনই

প্রযুক্ত হয় কৃষ্ণভঙ্গী। ব্রজরাস, মনিপুরীরাস এবং বঙ্গগানের কৃষ্ণের নাচ থেকে ভাওনার কৃষ্ণভঙ্গী একটু স্বতন্ত্র। ভাওনার রাসদৃশ্যে গোপীদের নৃত্যকে বলে গোপীভঙ্গী। শঙ্করদেবের রাসক্রীড়ায় তিনজোড়া গোপ-গোপী কৃষ্ণকে মধ্যে রেখে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। সূত্রভঙ্গী, কৃষ্ণভঙ্গী এবং গোপীভঙ্গীকে সাধারণ-ভাবে নৃত্যভঙ্গীও ব'লা হ'য়ে থাকে। ভাওনার নৃত্যভঙ্গীর অনুরূপ আরেক ধরনের নাচ আছে, একে বলা হয় চালি। চালি নৃত্যকে নাট্যভঙ্গী বা নাটুয়া নাচও বলা হয়।

মনিপুরী ভঙ্গী-পরেঙ্গা, কথকের টোরাটুকরা এবং ভরতনাট্যমের তিরমানম্এর সঙ্গে নাটুয়া নাচের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে নাটুয় নাচ এক স্বতন্ত্র নৃত্যশৈলীরূপেও অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। এতে ক'রে বোঝা যায় ভাওনা আসামে আজও কত জনপ্রিয়।

ভাওনায় ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন জাঁকজমকপূর্ণ তেমনি ঐতিহ্যবাহী এবং উৎপত্তির কাল বা সময় নির্দেশক। ছৌ-এর মৌবাংশীবাদের মত ভাওনার সূত্রধারও পায়ের পাতা অবধি বিস্তৃত ধবধবে সাদা আলখাল্লার উপর হাতালম্বা কোট পরে। এর উপর ব্যবহার করে জরি লাগানো কোমর-বন্ধ। আলখাল্লাকে বলে ঘুরি, কোটটাকে ফতুয়া এবং কোমরবন্ধকে করধনী বা 'ঘুনচ-জরি'। এরা মাথায় পরে সামনের দিকে নোয়ানো উপবৃত্তাকার পাগড়ী। মোঘলী প্রভাবের জন্য এটি 'মোঘলীটুপি'-নামে পরিচিত। যে সমস্ত বালক নাটুয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তারাও অনুরূপ পোশাক পরে। শুধু তারা যে মহিলা-চরিত্র রূপদান ক'রছে—এটা বোঝানোর জন্যে টুপির উপর মেখলার সাহায্যে ঘোমটার আভাস সৃষ্টি ক'রে নেয়। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পোশাকও বেশ সুন্দর এবং ব্রজরাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এদের পরনে থাকে ধুতি এবং গায়ে বুটি বসানো বুকওয়ালী। কৃষ্ণের পিঠওয়ালী হলুদরঙের আর বলরামেরটি নীলরঙের। এরা উভয়েই মাথায় পরে ময়ূরের পেখমযুক্ত উঁচু পাগড়ী। তবে রাজা, যোদ্ধা এবং অন্যান্য মানব চরিত্রাভিনেতাদের পোশাক মাত্রাতিরিক্ত ভাবে জাঁকযমকপূর্ণ এবং চকচকে বা ঝকঝকে। এরা সরু পাজামার উপর হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত কুঁচি দেয়া জামা পরে। এর উপর থাকে বিভিন্ন ধাতুর বুটি বসানো ফতুয়া। আর মাথায় থাকে পাগড়ী। স্ত্রী-চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতাদের কেশ-নৈপুণ্য সত্যিই বিস্ময়কর। কৃত্রিম বক্ষ, বিভিন্ন অলঙ্কার, কাজল, সিঁদুর ও কাপড় এবং মেখলা প'রে তারা যখন মঞ্চে আসে তখন ভাবাই যায় না যে তারা পুরুষ। ভাওনায় মুখোশেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। রাবণ, ব্রহ্মা, গরুড়, মারীচ এরা কাপড় ও কাঠে তৈরী মুখোশ ব্যবহার করে। চুন, হলুদ, নীল, প্রদীপের কালী এবং সিঁদুর দিয়ে চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য খুবই সুন্দর রূপে অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়। সত্রের সুদক্ষ খনিকাররা বংশপরম্পরায় এই সব মুখোশ তৈরী ক'রে আসছে।

অঙ্কিয়ানাট-ভাওনার প্রবর্তক শঙ্করদেবের মহতী প্রতিভার প্রকাশ কিন্তু নাট্যে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি চিহ্নযাত্রার অভিনয় করেন। এই চিহ্নযাত্রা কিন্তু লেখা হয়নি, পরিবেশিত হ'য়েছিল। রচনা ক'রেছিলেন শঙ্করদেব। পরবর্তীকালে জীবনের অন্বেষণে যেমন তাঁর অধ্যাত্মবোধ পূর্ণতা লাভ করে তেমনি পরিণতি লাভ করে তাঁর নাট্যপ্রতিভা। অঙ্কিয়ানাট সেই পরিপূর্ণ নাট্যব্যক্তিত্বেরই সৃষ্টি।

যাইহোক, অঙ্কিয়ানাট ও ভাওনার গঠন বৈশিষ্ট্যে এবং উপস্থাপন ভঙ্গীতে শাস্ত্রীয় নাট্যের কিছু প্রভাব থাকলেও তা যে অসমে প্রচলিত নাট্যধারার অনিবার্য ফলশ্রুতি এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আজও অসমের আপামর জনসাধারণ অঙ্কিয়ানাট ভাওনা দর্শনে অনাবিল এক আনন্দ লাভ ক'রে থাকে। অসমের এই নাট্যমাধ্যমের যথোচিত ব্যবহারে যে সেখানে এক সত্যিকারের ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যের বিকাশ সম্ভব তা বলাই বাহুল্য।

অসমের অন্যান্য লোকনাট্য :

আমরা আগেই দেখেছি পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও তাঁর অনুসারীরা যে অঙ্কিয়ানাটের প্রচলন করেন, তাই-ই আজকের অসমের প্রতিনিধি-স্থানীয় লোকনাট্য। কিন্তু আরো অনেক লোকনাট্য-আঙ্গিক অসমের বিভিন্ন এলাকায় আজও বেশ জনপ্রিয়। তুলনামূলকভাবে অল্পমাত্রায় বিকশিত এই লোকনাট্য-আঙ্গিকগুলির মধ্যে ওজাপালি, ঢুলীয়া, পুতলানাচ এবং পচতি অঙ্কিয়ানাটের উদ্ভবে প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ সরবরাহ ক'রেছিল। অনেকে তো এ-পর্যন্তও মনে ক'রে থাকেন যে শঙ্করদেব প্রবর্তিত অঙ্কিয়ানাট ওজাপালীরই উন্নত এবং বিকশিত রূপ। যাইহোক, উপরে উল্লেখিত লোকনাট্য আঙ্গিকগুলি ছাড়াও অসমে আরো অনেক লোকনাট্য-আঙ্গিক বর্তমানে প্রচলিত আছে। এখানে সেই লোকনাট্য আঙ্গিকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'লো।

লোকনাট্যের মুখ্য উপকরণ হ'লো নাচ, গান এবং অভিনয়। এই তিন উপকরণের সুসম সমন্বয়েই কোনো লোকনাট্য-আঙ্গিক পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হ'য়ে ওঠে। অঙ্কিয়ানাট অসমের এইরূপ এক বিকশিত লোকনাট্য আঙ্গিক। বাকিগুলিতে এক বা দু'টি উপকরণের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত তিন উপকরণের সংশ্লেষণ-ভেদে অসমের লোকনাট্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) নৃত্যগীত প্রধান, (২) অর্ধনাটকীয় এবং (৩) যাত্রা। নৃত্যগীত-প্রধান লোকনাট্যের মধ্যে পড়ে ওজাপালি, ঢুলীয়াভাওনা পুতলানাচ, জয়ঢুলীয়া, খুলীয়া ভাওনা, আপীওজা, কুশান গান, দোতরা গান, ভারীগান, বাঁশী পুরাণ গান, ময়নামতী, নয়ানশরী প্রভৃতি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ভাওরীয়া, পচতি; নাম ভাওনা, চড়ক পূজার গীত, কাতি পূজার গীত, মদন কামরে গীত, হুদুম পূজার গীত, সোনারায় পূজার গীত, মথনী প্রভৃতি। আর তৃতীয় শ্রেণীর

মধ্যে পড়ে যাত্রা, মনাইযাত্রা, ভাসানযাত্রা প্রভৃতি। এক্ষণে এই তিন শ্রেণীর লোকনাট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'লো।

১। ওজাপালি॥

ওজাপালির উদ্ভব কবে তা সঠিক ক'রে জানা না গেলেও এটি যে শঙ্করদেবের আগে থেকেই অসমে প্রচলিত আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওজাপালির অর্থ হ'লো গুরু (ওজা) এবং শিষ্য (পালি)। অর্থাৎ গুরু ও শিষ্য মিলে যে নৃত্য-গীতাভিনয় পরিবেশন করে তাই-ই হ'লো ওজাপালি। ওজাপালির প্রচলন কামরূপ এবং দরংয়ের দিকেই অধিক। এখানকার সত্র-সমূহে ওজাপালি এখনো বেশ জনপ্রিয়। ওজাপালির একটি দলে একজন গুরু এবং পাঁচ ছয়জন শিষ্য থাকে। গুরু (বা ওজা) নৃত্য-গীতে খুবই পারদর্শী। গুরুই দোহার সহযোগে কাহিনীর সূত্রপাত ক'রে বিভিন্ন রাগে সেই কাহিনী বিবৃত ক'রে চলে আর পালিরা তার তাল-লয় সঙ্গত করে, কখনো কখনো ধুয়োও টানে এবং হাতের বিবিধ মুদ্রা সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করে। পালিরা সকলেই ধুতি এবং চোলা পরে, ওজার পোশাক অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের। পালিদের মধ্যে একজন প্রধান পালি থাকে। তাকে বলা হয় ডাইনা পালি। সে ওজার সহকারী এবং সুরসিকও বটে। ডাইনা পালি যেমন অন্যান্য পালিদের সঙ্গে দোহারকিদারের কাজ করে, তেমনি আবার ওজার সঙ্গে কথোপকথনের ছলে ওজার গাওয়া আখ্যান-গীতির সরল ও সহজবোধ ব্যাখ্যা প্রদান করে। ওজার সঙ্গে ডাইনাপালির হাস্যরসাত্মক কথোপকথনই দর্শকের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয়। ওজার সঙ্গে ডাইনা-পালির এই সরস কথোপকথন এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক অঙ্গাভিনয় নৃত্য-গীতাত্মক ওজাপালিকে লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত ক'রেছে। তবে অঙ্কিয়া ভাওনার অনুরূপ কোনো আড়কাপড় বা মঞ্চ ওজাপালির অভিনয়ে প্রযুক্ত হয় না। দর্শকের মাঝে, দর্শকের একই তলে খোলা জায়গায় ওজাপালির অভিনয় হয়।

ওজাপালি আবার তিনরকমের, যথা—(১) সুকনারায়ণীগোয়া ওজাপালি, (২) ব্যাসগোয়া ওজাপালি এবং (৩) রামায়ণগোয়া ওজাপালি। ব্যাস এবং রামায়ণ গোয়া ওজাপালি বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে এবং সুকনারায়ণী মনসাপূজার সংগে সংশ্লিষ্ট। ওজাপালির এই শ্রেণী বিভাগ আবার সর্বত্র একরকম নয়। যেমন মঙলদৈতে ব্যাসগোয়া এবং রামায়ণগোয়া ওজাপালির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবার বরপেটা অঞ্চলে প্রচলিত ওজাপালিতে কীর্তন ঘোষার পদ পরিবেশিত হওয়ায় একে বৈষ্ণবী ওজাও বলা হয়।

সুকনারায়ণী গোয়া ওজাপালি: সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণের পদ পরিবেশিত হয় বলে এই ওজাপালিকে সুকনারায়ণী বলা হ'য়েছে। সাধারণতঃ একে সুকনান্নী ওজা বলা হয়। সুকবি নারায়ণদেব জনসাধারণের মুখে সংকুচিত হয়েই সুকনান্নী হ'য়েছে ব'লে অনুমান করা হ'য়ে থাকে। সুকনান্নী ওজাপালিতে

সুকবি নারায়ণদেব ছাড়াও দুর্গাবর এবং মনকর রচিত পাঁচালীও পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। যাইহোক, পদ্মাপুরাণের বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীই এর মুখ্য বিষয়। সাধারণতঃ মনসা এবং মারৈ পূজা উপলক্ষ্যে এর আয়োজন করা হ'য়ে থাকে। মারী ও মড়কের নিবারণার্থে অনুষ্ঠিত বা আয়োজিত হয় ব'লে একে মারৈ গোয়া ওজাও বলা হ'য়ে থাকে. বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী গীতি ও অভিনয়ের সাহায্যে এতে পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। এই পরিবেশনে মুখ্য আকর্ষণীয় বিষয় হলো দেওধানী নৃত্য। দেওধানী নৃত্যের নাটকীয় প্রয়োগের জন্যেই সুকনারায়নী গোয়া ওজাপালি দর্শকের কাছে আজও খুবই আকর্ষণীয়। গোয়ালপাড়া জিলার কোথাও কোথাও একধরনের বাঁশী বাজিয়ে পদ্মাপুরাণ পরিবেশিত হয় ব'লে এখানে সুকনান্নী ওজাকে বাঁশী পুরাণগান বলা হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এর অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করে।

ব্যাস গোয়া ওজাপালি: ব্যাসদেব বিরচিত পুরাণ এবং মহাভারতের পদ গাওয়া হয় ব'লেই একে ব্যাস গোয়া ওজাপালি বলা হয়। চলতি ভাষায় একে বলা হয় বিয়াহের ওজা। বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাসের ওজাপালি অসমে, বিশেষ ক'রে মঙলদৈতে দুর্গাপূজার সময়েও পরিবেশিত হয়। ব্যাস গোয়া ওজাপালির সাজপোশাক সুকনারায়ণী ওজাপালির চাইতে অনেক বেশিমাত্রায় আড়ম্বরপূর্ণ। ব্যাসের ওজা পায়ে নূপুর পরে, সুকনান্নীর ওজা পায়ে নূপুর পরে না বা ব্যাসের ওজার মত কানে, গলায় ও হাতে কোনো অলঙ্কার পরে না। খুটিতাল উভয়েরই বাদ্যযন্ত্র, তবে বাজনার ধরনটি পৃথক পৃথক। তাছাড়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ব্যাসের ওজার দক্ষতা সুকনারায়ণীর ওজার চাইতে অনেক বেশি।

রামায়ণ গোয়া ওজাপালি: মাধব কন্দলী, এবং অন্যান্য কবির রামাখ্যানের পদ গাওয়া হয় ব'লেই একে বলা হয় রামায়ণ গোয়া ওজাপালি। চলতি ভাষায় একে বলা হয় রাইমানের ওজা। মাধব কন্দলীর রামায়ণকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার জন্যেই কবি দুর্গাবর গীতি-রামায়ণ রচনা ক'রেছিলেন। কোথাও কোথাও এই গীতি-রামায়ণের পদ পরিবেশিত হয় ব'লে একে দুর্গাবরী ওজাও বলা হ'য়ে থাকে। রামায়ণ গোয়া ওজার সাজপোশাক এবং পরিবেশন পদ্ধতির সঙ্গে ব্যাস গোয়া ওজার সাদৃশ্য খুব বেশি। তবে রামায়ণ গোয়ার বৈশিষ্ট্য-এর নাটকীয়তা এবং অভিনয়ের হাস্যরসাত্মকতায় আর ব্যাস গোয়ার বৈশিষ্ট্য সাজপোশাক এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চমকারিত্বে। রামায়ণ গোয়া ওজাপালি হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের জন্যে ভাইরা বা ভাওরীয়া ওজা নামেও পরিচিত।

প্রাচীন অসমে লোকশিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল এই ওজাপালি। শঙ্করদেব তাই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারার্থে এই ওজাপালির সাহায্য নিয়েছিলেন। ফলে শঙ্করদেব-পরবর্তী যুগে অসমের অনেক সত্রে ওজাপালি পরিবেশিত হ'য়ে আসছে।

সত্রসমূহে যে-ওজাপালি পরিবেশিত হয়—তা মুখ্যতঃ ব্যাস গোয়া ওজাপালি। স্পষ্টই বোঝাযায়, ওজাপালির সংরক্ষণে বৈষ্ণব সত্র-সমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত লোকের অনাদর, সরকারী পৃষ্টপোষকতার অভাব এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলার দরুণ শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতে সমৃদ্ধ এই প্রাচীন লোকনাট্য আঙ্গিকটির চর্চা দারুণভাবে কমে গেছে।

২। আপী ওজা ॥

কামরূপে কিশোরীদের কয়েকটি ওজাপালির দল আছে। কামরূপ উপভাষাতে কিশোরীদের বলা হয় আপী। তাই মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত উৎসব বা পার্বণে পরিবেশিত কিশোরীদের এই ওজাপালি আপী ওজা নামে পরিচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আপী ওজা মহিলাদের (কিশোরীদের) দ্বারা পরিবেশিত হলেও মহিলা লোকনাট্য নয়, যেমন কেবলমাত্র মহিলা শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত যাত্রা (কলিকাতা, মনিপুর) এবং নৌটঙ্কী (কানপুর)-ও মহিলা লোকনাট্য নয়। কেননা আপী ওজা এবং ওজাপালির পরিবেশন রীতি একই। ওজাপালির মত আপী ওজাতে ওজা, ডাইনাপালি এবং পালি থাকে, থাকে নাচ, গান, হাস্যরসাত্মক অভিনয়, কাহিনীর ব্যাখ্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ওজা ও ডাইনাপালির কথোপকথন। আপী ওজা তাই মূলতঃ ওজাপালি, স্বতন্ত্র কোনো মহিলা লোকনাট্য নয়।

৩। ঢুলীয়া ভাওনা ॥

ঢুলীয়া ভাওনা দীর্ঘদিন ধ'রে অসমের মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসছে। কামরূপ এবং দরঙ-এর ঢুলীয়া তো সমগ্র অসমেরই আদরের বিষয়। কৃষ্টী এবং দৈনন্দিন জীবনের পেশাগত নানা কাজ প্রদর্শিত হয় ঢুলীয়া ভাওনায়। ঢুলীয়া ভাওনার একটি দলে চার পাঁচজন থেকে কুড়ি পঁচিশজন শিল্পী থাকে। ঢুলীয়ার দলে কয়েকজন ঢোলী থাকে। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ঢোলের বাজনার তালে তালে নানাবিধ ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন ক'রে মানুষকে আনন্দ দেয়া হয়।

অন্যান্য লোকনাট্যের মত ঢুলীয়াতেও নৃত্য-গীত এবং অভিনয়ের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এতে প্রথমে ঢোল বাজানো হয়, তারপর ঢোলের বাজনার তালে তালে নৃত্যাশ্রিত গীত পরিবেশন করা হয়। আর এই নাচ-গানের পর সকলের পরিচিত কোনো কাহিনী অভিনীত হয়। এই অভিনয়াংশে কোনো কোনো দল আবার সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ছোটো ছোটো ব্যঙ্গচিত্র তুলে ধরে। এই অভিনয়ে ঢুলীয়ারা কিন্তু কোনো লিখিত নাটকের সাহায্য নেয় না। ফলে এগুলি সম্পূর্ণভাবেই ঢুলীয়াদের তাৎক্ষণিক কল্পনায় স্থানীয় ভাষায় রচিত এবং দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে এগুলি খুবই আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করা হয়। ঢুলীয়ার এই অভিনয়ে ঢুলীয়াদের অভিনয় ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

যেসব ঢুলীয়ার দল মুখ্যতঃ বিষ্ণু ভক্তদের নিয়ে গঠিত এবং যারা বিষ্ণুর পূজা উপলক্ষ্যে ঢুলীয়া প্রদর্শন ক'রে থাকে তাদের বলা হয় বড়ঢুলীয়া। বিষয় ও পরিবেশনের দিক থেকে বড়ঢুলীয়া এবং ঢুলীয়া ভাওনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ঢুলীয়া অভিনয়ের জন্যে বিশেষ কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। দর্শক পরিবেষ্টিত সমতল ভূমিতেই এর অভিনয় হয়। আর কোনো পৃথক মঞ্চোপকরণও ঢুলীয়াতে ব্যবহৃত হয় না। তবে প্রয়োজনে সিংহাসন বা অনুরূপ কোনো জিনিষের প্রয়োজন মেটায় একমাত্র বাদ্যযন্ত্র ঢোল। ঢুলীয়ার সাজপোশাকেও কোনো আড়ম্বর নেই। দৈনন্দিন জীবনের ধুতি এবং জামা পরেই ঢুলীয়ারা অভিনয়ে অংশ নিয়ে থাকে। তবে বড়ঢুলীয়ায় প্রয়োজন অনুসারে মুখোশের ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।

গোয়ালপাড়া জিলায় প্রচলিত জয়ঢুলীয়ার গীতেও ঢুলীয়া ভাওনার সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নৃত্য-গীত, অভিনয় এবং অন্যান্য ক্রিয়া কৌশলের দিক থেকে জয়ঢুলীয়ার গীত ঢুলীয়া ভাওনারই সমধর্মী। এতেও ঢুলীয়ার অনুরূপে নৃত্য-গীত পরিবেশন করা হয়। তবে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনা এতে অভিনীত হয় না। এর বিষয় পৌরাণিক, নেয়া হয় রামায়ণ কিংবা মহাভারত থেকে। জয়ঢুলীয়ার গীতে প্রয়োজনে মুখোশেরও ব্যবহার করা হয়। ঢুলীয়া ভাওনা ও জয়ঢুলীয়ার গীতের প্রধান পার্থক্য হ'লো এই যে ঢুলীয়াতে ঢোলের একটি দল থাকে আর জয়ঢুলীয়ায় থাকে দু'টি দল।

এতকাল অবধি অসমের সাংস্কৃতিক জীবনে ঢুলীয়া ভাওনার বিশেষ সমাদর ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢুলীয়া ভাওনার পরিবেশন ছিল অপরিহার্য এক সামাজিক বিধি। কিন্তু বর্তমানে ঢুলিয়া ভাওনার সে সমাদর আর নেই। ফলে ঢুলীয়ারা এখন জীবিকা-নির্বাহের জন্য অন্যান্য পেশায় আত্মনিয়োগ ক'রছে।

ঢুলীয়ার অনুরূপ খুলীয়া ভাওনারও প্রচলন আছে দরং এবং কামরূপের দিকে। বেশ কয়েকজন শিল্পী নিয়ে খুলীয়া ভাওনার একটি দল গঠিত হয়। দলের প্রধানকে বলা হয় ওজা। চামর হাতে নিয়ে তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ওজা ছাড়া দলে একজন বায়ন, কয়েকজন খোলী, দু'জন করতালি এবং কয়েকজন ভাওরীয়া বা অভিনেতা থাকে। খুলীয়া ভাওনায় নৃত্য এবং অভিনয়ের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। খুলীয়াতে পরিবেশিত হয় রামায়ণ এবং মহাভারতের কাহিনী নির্ভর গীতিনাট্য। অভিনয় আরম্ভের পূর্বে খোলীরা বিভিন্ন ঢঙে নেচে নেচে খোল বাজায়। এই বাজনার পর ওজা প্রথমে বন্দনা গায়। বন্দনার পরে অভিনেতব্য কাহিনীর চরিত্র-সমূহের পরিচয়জ্ঞাপক একখানি গীতি পরিবেশন করে। এরপর গান ও চরিত্রসমূহের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। খুলীয়া ভাওনার অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র

হ'লো এর বিদূষক বহুয়া। বহুয়া জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনার ও আচরণের অভিনয় ক'রে দর্শকের মনোরঞ্জন করে। বলাই বাহুল্য যে, বহুয়ার কৌতুকাভিনয় খুলীয়া ভাওনার প্রধানতম আকর্ষণ। অঙ্কিয়া ভাওনার মতই খোল এবং করতাল খুলীয়া ভাওনার প্রধান দুই বাদ্যযন্ত্র। বর্তমানে কামরূপে খুলীয়ার প্রচলন কমে এসেছে। তবে দরং-এর দিকে এখনো এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। খুলীয়া ভাওনায় অভিনীত গীতিনাট্যের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ক'রলে জানা যাবে যে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয়। আসলে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শঙ্করদেব প্রবর্তিত অঙ্কিয়া ভাওনার গুরুগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়, তখন যেসব জায়গায় অধিকতর জনপ্রিয় উপাদান-সমূহ সংযুক্ত করা হয়েছিল, সেখানেই এই ঢুলীয়া বা খুলীয়া ভাওনার প্রচলন হ'য়েছে। অঙ্কিয়া-ভাওনা থেকে উদ্ভূত এরকম আর কয়েকটি নাট্য-আঙ্গিক হ'লো গায়ন বায়ন, বাঙালী ভাওনা বা ধুরা ভাওনা এবং বারেচহরীয়া ভাওনা।

৪। পুতলা নাচ ॥

অসমের পুতলা নাচের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। শঙ্করদেব তাঁর অঙ্কিয়া-নাট্যের প্রচলন করার সময়ে এই পুতলা নাচ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ক'রেছিলেন। তাই অসমীয়া লোকনাট্যের ক্ষেত্রে পুতলা নাচের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থে পুতুলনাট্যের আলোচনা করার ইচ্ছা থাকায় এখানে আর পুতলা নাচের আলোচনা করা হ'লো না।

৫। কুশান গান ॥

গোয়ালপাড়া জিলায় প্রচলিত কুশান গান অসমের জনপ্রিয় আঞ্চলিক লোকনাট্যগুলির মধ্যে অন্যতম। নৃত্য, গীত, সংলাপ এবং অভিনয়ে পরিপুষ্ট এই লোকনাট্য জনপ্রিয়তার দিক থেকে ব্রজের রামলীলা, রাসলীলা বা কর্ণাটকের যক্ষগানের সঙ্গে তুলনীয়।

কুশান গানের বিষয় পৌরাণিক। এর কাহিনীর উৎস রামায়ণ এবং মহাভারত। তবে রামায়ণের কাহিনীই অধিকতর জনপ্রিয়। ফলে কুশান গানের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে রামায়ণের কাহিনীই পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। লবকুশ রামায়ণের কাহিনী গানের মাধ্যমে পরিবেশন ক'রত—এ তথ্য আমরা বাল্মীকির রামায়ণেই পাই। লব-কুশের কুশ থেকেই সম্ভবতঃ এই রামকাহিনীর পরিবেশন পদ্ধতির নাম হ'য়েছে কুশান গান।

যাইহোক, ১৫ থেকে ১৬ জন শিল্পী নিয়ে কুশান গানের একটি দল গঠিত হয়। দলের প্রধানকে বলা হয় মূল অথবা গীতাল। মূলের একহাতে থাকে একটি একতারা। স্থানীয় (থলুয়া) ভাষাতে এই একতারাটিকে বলা হয় 'বেনা'। ওজাপালির ওজার অনুরূপে মূলও পদ গায় এবং সেই পদের সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেনাতে সুর তোলে। মূল ছাড়া দলে থাকে একজন দোয়ারী,

দু'জন বায়ন এবং কয়েকজন নর্তকীবেশী ন'রা—স্থানীয় (ধনুয়া) ভাষাতে এদের বলা হয় চ্যাংড়া অথবা ছোকরা। কুশান গানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে দোয়ারী। ওজাপালিতে ডাইনা পালি যে ভূমিকা পালন করে সেই একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় কুশান গানের দোয়ারী। কুশান গানের একটি অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভরশীল এই দোয়ারীর ওপর। দোয়ারী যেমন নৃত্যগীতে অংশ নেয় তেমনি আখ্যানভাগে মূল এবং অন্য দুই একজন পালির সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হ'য়ে কাহিনীর অগ্রগতি সাধন করে। এই সময় সে পরিস্থিতি অনুসারী ভাব-প্রকাশক অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে কাহিনীর জটিল অংশের সরল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। ছোকরার নৃত্যাংশেও সে যোগ দিয়ে দর্শকের মনোরঞ্জনও সাধন করে। বায়নদের কাজ হ'লো নৃত্য-গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাদ্যযন্ত্র বাজানো। অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতেও এরা ঐক্যতান বাদনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। পালিরা তাদের নির্দিষ্ট আসনে ব'সে মূলের গাওয়া গীতের শেষাংশের ধুয়ো টানে। বিরতির সময় এরা দোয়ারীর সঙ্গে অভিনয়েও যোগ দেয়। আর চ্যাংড়ারা যেমন আখ্যান-গীতে যোগ দেয়, তেমনি আখ্যানভাগের সঙ্গে সম্পর্করহিত মনোরঞ্জক-গীতও পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকে শেষাবধি দর্শকের মনোরঞ্জন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই চ্যাংড়াদের। আর যেসব চ্যাংড়া স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, রঙ্গে রসে তারা আসর একেবারে মাৎ ক'রে দেয়। বর্তমানে মেয়েরাই স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'চ্ছে। এইসব স্ত্রী-চরিত্রাভিনেত্রীদের বলা হয় ছুকরী।

কুশান গানের পরিবেশনে বিশেষ কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। রভার উৎসবের সময় রভার মধ্যে কোনো সমতল জায়গায় আসন পেতে গোলাকারে ব'সে পড়ে বায়ন এবং পালিরা। এই বৃত্তাকার অংশটিকে বলা হয় আসর। বিরতির সময় অন্যান্য শিল্পীরাও এই আসরে ব'সে থাকে। আসর থেকে চারিদিকে সমান দূরত্বে বৃত্তাকারে বসে দর্শক। দর্শকও আসরের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার ফাঁকা জায়গাতেই মূল, দোয়ারী এবং চ্যাংড়ারা ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত ও অভিনয় পরিবেশন ক'রে থাকে। উত্তরবঙ্গ ও অসমের কয়েকটি আঙ্গিকে এই জাতীয় মঞ্চ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। রাজস্থানের রাসধারী ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোনো নাট্য-আঙ্গিকে অনুরূপ মঞ্চ-ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। যাইহোক, কুশান গানের শুরুতে গাওয়া হয় দু'খানি বন্দনা-গীতি। একখানি সরস্বতীর উদ্দেশ্যে এবং আরেকখানি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে। বন্দনা-গীতির পরে নৃত্য-গীতের সাহায্যে এগিয়ে চলে কাহিনী। মুখ্যতঃ দর্শকদের উদ্দেশ্য ক'রেই কুশান গানে কয়েকটি বিরতির ব্যবস্থা করা হয়। বিরতিগুলির কয়েকটি খুবই অল্প সময়ের এবং আর কয়েকটি অধিকতর দীর্ঘ সময়ের। অল্প সময়ের বিরতিতে মূল এবং দোয়ারীর মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে আর দীর্ঘ সময়ের বিরতিতে

মূল, দোয়ারী এবং চ্যাংড়ারা মিলে কোনো নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। এই অভিনয়াংশে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে দোয়ারী নানাবিধ হাস্যকর বিষয়ের অবতারণা করে। দোয়ারী পরিবেশিত এই হাস্যরসকে স্থানীয় ভাষায় 'চড দেখুওয়া' বলা হয়। এসব ছাড়াও দর্শকের মনোরঞ্জনার্থে আখ্যানভাগের মধ্যে মধ্যে কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন গানও পরিবেশন করা হয়। কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন এই গান আবার দু'রকমের—'পয়ার' এবং 'খেমটা' বা 'চটকা'। পয়ার হ'লো আদি-রসাত্মক গান। পয়ার পরিবেশন করে একজন (বা একটি) চ্যাংড়া। পয়ারের সঙ্গে কখনো কখনো কাহিনীর ক্ষীণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খেমটার সঙ্গে কাহিনীর কোনোই সম্পর্ক থাকে না। স্থূল-রসাত্মক এই খেমটা গীত হয় দ্রুত লয়ে। রামকাহিনীর গাম্ভীর্যে ক্লান্ত দর্শকবৃন্দকে সাময়িক আনন্দ দেবার জন্যেই এই গান গাওয়া হ'য়ে থাকে।

কুশান গানের সাজ-পোশাক একেবারেই আড়ম্বরহীন। মূল ধুতি পরে ও গায়ে দেয় চোলা এবং ঘাড়ে ফেলে রাখে একখানি চাদর। দোয়ারীও ধুতি পরে এবং বেনিয়ান গায়ে দেয়। বেনিয়ানের ওপর দিয়ে দোয়ারী একখানি গামছা মাজায় বেঁধে রাখে। অভিনয় অংশে ছেঁড়া কাপড় প'রে সে বহুয়ার রূপ ধারণ করে। অন্যান্য পালিরাও ধুতি এবং বেনিয়ান পরে। চ্যাংড়াদের পরনে থাকে ঘাঘরা, গায়ে ব্লাউজ এবং মাথায় পাতলা কাপড়ের ওড়না। এছাড়া কৃত্রিম খোপা এবং নানাবিধ অলঙ্কারও সে প'রে থাকে।

কুশান গানে প্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি হ'লো বেনা, খোল এবং করতাল। মূল কর্তৃক বেনার ব্যবহার কুশান গানের অতি চমকপ্রদ একটি বিষয়। কুশান গানকে তাই বেনা-গানও বলা হ'য়ে থাকে। বর্তমানে কুশান গানে হারমোনিয়াম এবং অন্যান্য আধুনিক বাদ্যযন্ত্রও প্রযুক্ত হ'চ্ছে।

আগে কুশান গান পরিবেশিত হ'ত স্থানীয় থলুয়া ভাষায়। পরবর্তীকালে কুশান গানে উত্তরবঙ্গের প্রভাব পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জিলাতেও কুশান গানের প্রচলন আছে। অতীতে কোচবিহার অসমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাইহোক, কালক্রমে চবুরীয়া অঞ্চলের কুশান গানের দলগুলি বাংলা রামায়ণের আখ্যান গ্রহণ করে। অবশ্য অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশে স্থানীয় ভাষা ও বিষয়ের প্রাধান্য থেকে যায়। বঙ্গীয় প্রভাবের আরো একটি কারণ আছে, আর তা হ'লো—বঙ্গীয় জমিদারদের বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও তার পৃষ্ঠপোষকতা। এক সময়ে গোয়ালপাড়া জিলার জমিদারী বাঙালীদের আয়ত্তে আসে—তারাও গোয়ালপাড়ার সংস্কৃতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। ফলে কুশানগানে বাংলা রামায়ণাশ্রিত কাহিনী পরিবেশিত হ'তে থাকে। এইসব কারণে অসমবাসীরা গোয়ালপাড়ার সংস্কৃতিকে বিজাতীয় জ্ঞান ক'রে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বর্তমানে সে মনোভাব অনেকটা দূর হ'য়েছে। ফলে কুশান গানের মূলোদ্ধার অচিরেই সম্ভব হবে ব'লে আশা করা যায়।

গোয়ালপাড়াতে 'খারাতাল' এবং 'সত্যপীর' নামে আরো দুটি লোকনাট্যের প্রচলন আছে। কিন্তু খারাতাল বা সত্যপীরের সঙ্গে পরিবেশনগত দিক থেকে কুশান গানের কোনো পার্থক্য নেই। তবে কুশান গানে মূলের হাতে থাকে একতার বিশিষ্ট বেনা আর সত্যপীর বা খারাতালে মূলের হাতে থাকে দুই তার বিশিষ্ট দোতারা। তাছাড়া কুশান গানের কাহিনী কেবলমাত্র পুরাণাশ্রিত, অন্যদিকে সত্যপীর বা খারাতালের কাহিনী পৌরাণিক বা লৌকিক দুই-ই হ'তে পারে।

৬। দোত্‌রা গান।

গোয়ালপাড়া জিলার কুশানগান ছাড়া অন্য সমস্ত লোকনাট্যেই দোতারা ব্যবহার করা হয়। তবে দোত্‌রা গানে দোতারার ব্যবহার একেবারে অনিবার্য। আর মুখ্যত: সেই কারণেই এর নাম হ'য়েছে দোত্‌রা গান। কুশান গানের মত এতেও মূল, পালি এবং গায়ন থাকে। কিন্তু বিষয় ও পরিবেশন-পদ্ধতির দিক থেকে এদু'য়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। যেমন কুশানগানের বিষয় মুখ্যত: রামকাহিনী, কিন্তু দোত্‌রা গানের বিষয় লোককাহিনী আশ্রিত। লোককাহিনী বিষয় হওয়ার দরুণ দোতরা গানকে কেচ্ছাবন্দী বা পালাবন্দীও বলা হ'য়ে থাকে। তবে দোত্‌রা গানে কেবলমাত্র গানের সাহায্যেই কাহিনী বিবৃত হয়।

৭। ভারী গান।

দক্ষিণ গোয়ালপাড়া জিলাতে ভারীগানের প্রচলন আছে। ভারীগানকে ভাওগানও (ভাবগান) বলা হ'য়ে থাকে। রামায়ণ থেকেই ভারীগানের কাহিনী আহৃত হয়। ভারীগানেও কুশান গানের মত একজন প্রধান গায়ক বা মূল এবং একদল পালি থাকে। তবে কুশান গানের মূলের বিপরীতে ভারীগানের মূল হাতে একখানি চামর নিয়ে নেচে নেচে গান গায় আর পালিরা এক জায়গায় বসে খোল করতাল বাজিয়ে তার গানের সঙ্গত করে। দোত্‌রা গানে শারীরিক অভিনয় নেই, কিন্তু ভারীগানের মূল গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাটকীয় অঙ্গভঙ্গীও করে থাকে। 'সীতা হরণ' এবং 'রাম-রাবণের যুদ্ধ' ভারী গানে খুবই জনপ্রিয়। ভারীগানের অভিনেতারা চরিত্রানুযায়ী মুখোশ ব্যবহার ক'রে থাকে। দর্শকের কাছে ভারীগান এখনো যে বেশ জনপ্রিয় তার কারণ এই মুখোশ। কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র রাম এবং সীতা কোনো মুখোশ ব্যবহার করে না। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় তীর-ধনু। রাম লক্ষ্মণ বানরের পিঠে চ'ড়ে যুদ্ধ করে। এই সময়ে মূল এবং পালি গান গেয়ে কাহিনী ব্যক্ত ক'রে চলে। অভিনয়াংশে পৌরাণিক চরিত্র ছাড়াও ভারীগানের নিজস্ব একটি চরিত্র (স্টক ক্যারেকটার) অংশ নিয়ে থাকে। চরিত্রটির নাম হলো কেতুয়া। কেতুয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য দর্শককে আনন্দ দেয়া। কেতুয়া এই উপলক্ষ্যে একক অভিনয়ও

প্রদর্শন ক'রে থাকে। বলাই বাহুল্য যে, মূল কাহিনীর সঙ্গে কেতুয়া পরিবেশিত এই অভিনয়াংশের কোনো সম্পর্কই থাকে না।

৮। খারা পুরাণ।

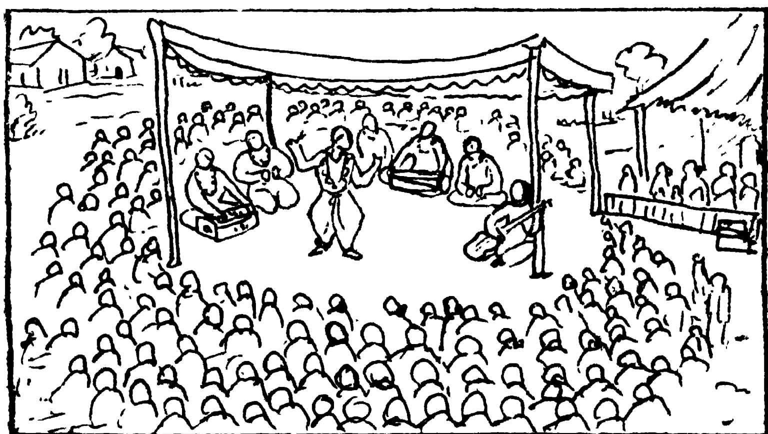
গোয়ালপাড়া জিলায় কুশান গানের অনুরূপ আরেকটি জনপ্রিয় লোকনাট্য আঙ্গিক হ'লো খারাপুরাণ। ঐ একই পদ্ধতিতে পরিবেশিত হয় নয়ানশরী এবং ময়নামতীর গান।

৯। ভাওরীয়া।

কৌতুককর সংলাপ এবং হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী ক'রে একশ্রেণীর মানুষ অসমের সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন থেকেই আনন্দ দিয়ে আসছে। এদের বলা হয় ভাওরীয়া। বহুয়ার সঙ্গে ভাওরীয়ার মিল থাকলেও অনেক বিষয়েই অমিল আছে, যেমন—বহুয়া হাস্যকর সব সাজ-পোষাক প'রে উদ্ভট অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মানুষকে হাসিয়ে থাকে। অন্যদিকে ভাওরীয়া পরিবেশিত হাস্যরস মূলতঃ সংলাপ নির্ভর। তবে ভাওরীয়া কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সংলাপ মুখস্থ ক'রে রাখেনা। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে সে এই সংলাপগুলি রচনা ক'রে থাকে। ভাওরীয়া পরিবেশনে বিশেষ কোনো মঞ্চেরও প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পোষাকেই ভাওরীয়ারা অভিনয় ক'রে থাকে।

উপরে উল্লেখিত নাট্য আঙ্গিকগুলি ছাড়াও অসমে পচ্তি, কাতি-পূজার গীত, চড়ক পূজার গীত, মথনী, গোয়ালনী যাত্রা, মনাইযাত্রা এবং ভাসানযাত্রার প্রচলন আছে।

বিহারের লোকনাট্য



(ক) কীর্তনীয়া।

সমকালীন ভারতীয় লোকনাট্যের আলোচনায় ও আলোচনাগ্রন্থে বিহারের কীর্তনীয়ার উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে মিথিলায় বা বিহারের কোথাও কীর্তনীয়ার কোনো দল বা অভিনয় দেখা যায় না। কীর্তনীয়া এখন শুধু ইতিহাস। অথচ লিখিত ভারতীয় লোকনাট্যের আদি-পর্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে লিখিত লোকনাট্যের বিকাশে কীর্তনীয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করেছিলো। তাই এখানে খুবই সংক্ষেপে কীর্তনীয়ার এক ইতিহাসসিদ্ধ পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

মৈথিলী সাহিত্যে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে মিথিলায় নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল কি না এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। মিথিলায় খণ্ডবলাকুল রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাট্যাভিনয়ের তথ্যাদি এখন উপলব্ধ। ঐ রাজ্যের মহারাজ মহেশ ঠাকুর (১৫৫৭ খ্রীঃ থেকে ১৫৭১ খ্রীঃ) একাধারে ছিলেন সুশাসক, কলাবিদ এবং অভিনয়-শিল্পের অনুরাগী। নাচ এবং অভিনয়-সংক্রান্ত বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। ফলে এই সময় মিথিলাবাসী একনিষ্ঠভাবে নাট্যাভিনয়ের চর্চা শুরু করে। বর্তমানে উপলব্ধ মৈথিলী নাটকগুলির অধিকাংশই খণ্ডবলাকুলের ঠাকুর রাজবংশের সময়েই লিখিত ও অভিনীত হয়েছিলো। অবশ্য

এই সময়ের হাটী, লগমা, অলপুর, গন্ধবারি এবং শেরপুরায়ও নাট্যাভিনয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এইসব জায়গার বেশ কয়েকটি নাটকের দল ও তার পরিচালকের নাম পাওয়া যায়।

এই সময়ে যেসব নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার অভিনেতাদের বলা হত 'জমাতি'। সূত্রধারকে বলা হ'ত নায়ক। আর এই নায়কই সাধারণতঃ সূত্রধার এবং প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। মহিলা চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হত পুরুষ জমাতিরাই। রাজানুকূল্যে পরিবেশিত এই সব নাট্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরই যোগ দেয়ার অধিকার স্বীকৃত ছিলো। দলের নায়ক বা সূত্রধারই ছিলেন দলের নাট্যগুরু। নাট্যশিক্ষা দেয়ার জন্যে তিনি পৃথক পারিশ্রমিকও নিতেন। বিবাহ, উপনয়ন, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানে এইসব নাটকের অভিনয় হ'ত।

এইসব অভিনেতারা যে সে সময়ে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো তার মুখ্য কারণ হ'লো এই যে এই সময়কার জনপ্রিয় লোকগীতি মান, নাচারী এবং তিরহুত পরিবেশনে, ছিল এদের অসাধারণ দক্ষতা। আসরে তারা যখন নৃত্য পরিবেশন ক'রত তখনও তারা কোনো না কোনো চরিত্রের অভিনয় করত। কিন্তু এদের এই নৃত্যাভিনয় এদের গানের অনুরূপ প্রভবিষ্ণু হ'য়ে উঠতে পারেনি। সব কাহিনীই তারা পরিবেশন ক'রত প্রচলিত নিয়মে।

নাট্যাভিনয়ের উপরে উল্লেখিত পটভূমিতেই মিথিলায় বেশ কিছু সংখ্যক অভিনেতার সমন্বয়ে গ'ড়ে ওঠে বা প্রচলিত হয় কীর্তনীয়া নাটক ও তার অভিনয় রীতি। কীর্তনীয়া নাটকের অভিনেতাকেও বলা হ'ত কীর্তনীয়া। কীর্তনীয়ারা নিজেদের ইষ্ট দেবতার সামনেই কীর্তনীয়া নাটকের অভিনয় ক'রত। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকরে কীর্তনীয়ার কোনো উল্লেখ না থাকায়—এ অনুমান করাটা অযৌক্তিক হবে না যে কীর্তনীয়ার প্রচলন হ'য়েছে বর্ণরত্নাকরের পরবর্তী কালে।

প্রথম দিকে কীর্তনীয়ায় পরিবেশিত হ'ত শিব ও কৃষ্ণ সম্বন্ধিত কাহিনী। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে উমাপতি উপাধ্যায়ই কীর্তনীয়ার প্রবর্তক। কীর্তনীয়াতে তৎকালীন বাংলা যাত্রা ও কীর্তনের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কীর্তনীয়া পরিবেশিত হ'ত রাত্রিতে, দর্শক পরিবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রে। প্রথমেই হ'ত নান্দীপাঠ। নান্দীপাঠ হ'য়ে গেলে বিশেষ এক সাজ-পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে সূত্রধার মঞ্চে আসত। নায়কের গায়ে থাকত জামা, নীমা (ফতুয়া ধরনের অন্তর্বাস) এবং পাজামা। নায়কের মাথায় থাকত মিথিলার প্রচলিত পাগড়ী আর পায়ে থাকত জুতো। আর সূত্রধারের হাতে থাকত একখানি ছড়ি। একে বলা হ'ত ফুলহত্‌থা। সূত্রধারের সঙ্গে কোনো নটী থাকত না। সে একাই মঞ্চাবতীর্ণ হ'য়ে নান্দীর শ্লোকের আবশ্যকতা, ব্যাখ্যা ইত্যাদির

মাধ্যমে সমাসবদ্ধ গদ্য সংলাপের সাহায্যে খুবই আকর্ষণীয়ভাবে নাট্যকলার প্রদর্শন করত।

কীর্তনীয়ার একটি নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুব বেশি হ'ত না। প্রবেশগীতির পর নায়ক, নায়িকা, তার দু'জন কি তিনজন সখী [illegible] নারদ অথবা ঘটক এবং [illegible]ূষক অথবা বিপটা—সাধারণতঃ এদের দ্বারাই পরিবেশিত হ'ত এক একখানি পালা। অভিনয় নির্দেশনায় সংস্কৃত এবং প্রাকৃত দুই-ই ব্যবহৃত হ'ত। এছাড়া ভাবের অভিব্যক্তির জন্য প্রযুক্ত হ'ত মৈথিলী গীতি। কীর্তনীয়াতে (সূত্রধার কর্তৃক নান্দীর শ্লোকব্যাখ্যা ব্যতিরেকে) গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হ'ত না! আর কাহিনীতে যুদ্ধাদি ঘটনা প্রদর্শন অনিবার্য হ'য়ে উঠ'লে তা শুধুমাত্র মৈথিলী-গীতির সাহায্যেই বিবৃত হ'ত। সাধারণতঃ পণ্ডিতদের মধ্য থেকেই কীর্তনীয়ার অভিনেতা নির্বাচন করা হ'ত। তাছাড়া অভিনয়ের পূর্বে দীর্ঘ পূর্বাভ্যাসেরও প্রচলন ছিল। কীর্তনীয়ার অভিনয় শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—হর্ষনাথ ঝা, গণনাথ ঝা, রঘুনন্দন দাস, যদুনন্দন ঝা, কপিলেশ্বর ঝা প্রমুখ।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কীর্তনীয়া দেখার সুযোগ পেত এবং দেখত কেবলমাত্র আনন্দ-পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। দলের অভিনেতাদের দিকে নজর রেখেই তখন নাটক লেখা হ'ত। তাছাড়া নাটক লেখা ও তার পরিবেশনের সময় জনসাধারণের, বিশেষ ক'রে মহিলা দর্শকদের রুচি এবং চাহিদার দিকেও নজর রাখা হ'ত। নাটক লেখার পশ্চাতে সহজে ও অল্পসময়ে সফলভাবে অভিনয় করার চিন্তাও ক্রিয়াশীল থাকত। অর্থাৎ কীর্তনীয়ার নাটক একই সঙ্গে সাহিত্য-গুণ ও দর্শকের মনোরঞ্জন ক্ষমতার পরিপোষক। কীর্তনীয়ার নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য পেয়েছিল উমাপতি উপাধ্যায়ের পারিজাত হরণ।

মৈথিলী পণ্ডিতদের মধ্যে 'কীর্তনীয়া নাটক, না নাচ?'—এ নিয়েও মতভেদ আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডঃ জয়কান্ত মিশ্র কীর্তনীয়াকে নাটক ব'লেই অভিহিত ক'রেছেন। আবার রমানাথ ঝা বলেছেন যে মধ্যযুগের মিথিলায় নাটকের খুবই অভাব ছিল তবে নাচের প্রচলন অবশ্যই ছিল। জয়কান্ত মিশ্র এও ব'লেছেন যে এই সময়ের নাটকগুলি কীর্তনীয়ায় অভিনয় করার জন্যেই লেখা হ'য়েছিল। অন্যদিকে রমানাথ ঝা এইসব নাটকের অভিনয়কে 'কীর্তনীয়া নাচ' ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। রমানাথ ঝা-র মতে—কীর্তনীয়ারা প্রচলিত মৈথিলী-গীতি সহযোগে প্রচলিত মৈথিলী নাচই পরিবেশন করত। আর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি স্বচক্ষে দেখা হাটী এবং গন্ধবারীর দু'টি কীর্তনীয়া মণ্ডলীর আলোচনা ক'রেছেন। তাঁর দেয়া বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কীর্তনীয়ায় অংশগ্রহণকারীরা অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষাবধি একই পোষাক প'রে মঞ্চে অবস্থান করত। সাধারণতঃ সাজপোশাকের কোনো পরিবর্তন করা হ'ত না। তবে কখনো কখনো কাহিনীর প্রয়োজনে নায়কের পাগড়ির ওপরই রূপোর মুকুট

পরিয়ে দেয়া হ'ত। পাত্র-প্রবেশ বা নিষ্ক্রমনেরও কোনো উল্লেখ নেই। এথেকেই অনুমান করা যায় যে অভিনেতারা অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষাবধি মঞ্চেই অবস্থান করত। কীর্তনীয়ায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে প্রযুক্ত হ'ত মৃদঙ্গ এবং করতাল।

মিথিলা এবং নেপালের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে জগদীশ চন্দ্র মাথুরের অভিমত হ'লো—মিথিলা এবং নেপালের উপত্যকায় উদ্ভূত বা প্রচলিত ভাষা-সঙ্গীতক ততদিন অবধিই প্রচলিত ছিল, যতদিন এই অঞ্চলে প্রভাবশালী হিন্দু রাজারা রাজত্ব ক'রেছিল। দ্বারভাঙা জিলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাবধি কীর্তনীয়া অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে কীর্তনীয়ার যেমন কোনো দল নেই, তেমনি কীর্তনীয়ার পুনঃপ্রচলনেরও আর কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। মাথুরের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে কীর্তনীয়া মূলতঃ নাট্যাভিনয়। ফলে কে মেহদীকে অনুসরণ ক'রে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ডঃ জয়কান্ত মিশ্রের অভিমতই অধিক যুক্তিযুক্ত, অর্থাৎ মধ্যযুগের মিথিলায় নাটকের অভাব ছিল না।

(খ) বিদাপত নাচ।

বিহারের পূর্ণিয়া জিলায় হরিজন কৃষকদের মধ্যে বিদাপত নাচ নামে এক লোকনাট্য প্রচলিত আছে। বিদাপত নাচে মধ্যযুগীয় মিথিলার কীর্তনীয়া এবং অসমের অঙ্কিয়া নাটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬০ সালে শ্রী ফণীশ্বর নাথ রেনু আকাশবাণী পাটনা-কেন্দ্র থেকে প্রচারের জন্য পূর্ণিয়া জিলার ঝিরওয়া গ্রামের "পারিজাত হরণ" নামক একটি নাটকের কিছু অংশ রেকর্ড করেন। এর ফলে "বিদাপত-নাচ" সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় বিহারের সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হলো—বিদ্যাপতির নাম সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও পারিজাত হরণ কিন্তু বিদ্যাপতির রচনা নয়। যতদূর জানা যায় ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে উমাপতি উপাধ্যায় নাটকখানি রচনা করেন। সেখান থেকেই নাটকখানি মিথিলা ও নেপালের কীর্তনীয়াতে অভিনীত হ'য়ে আসছে। অসমের শঙ্করদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে একই নামের আরেকখানি নাটক লেখেন। পরের নাটকখানি অভিনয় শাস্ত্রের নিরিখে অধিকতর সমৃদ্ধ। ঝিরওয়া গ্রামের জনকদাসের দল নাট্যকারের নাম বলতে পারেনি। কিন্তু তাদের অভিনীত নাটকখানি শুনে বোঝা যায় যে তাতে উভয় (পারিজাত হরণ) নাটকেরই সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে অভিনয় শৈলীতে মিথিলার কীর্তনীয়ার প্রভাব আছে কি-না তা জানা যায় না—কেননা কীর্তনীয়ার অভিনয় ধারা আজ প্রায় বিলুপ্ত। তাই পূর্ণিয়া জিলার এই পারিজাত হরণ সেই কীর্তনীয়ারই এক স্মৃতিরেশ এরকম অনুমান করাটা অসঙ্গত হবে না।

ঝিরওয়ার এই নাট্যদলের প্রধান বা নেতাকে বলা হয় মূলগাইন। ১৯৬১

সালে এই দলটির মূলগাইন ছিল জনকদাস। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অসমের অঙ্কিয়ানাটের প্রধান গায়ককেও মূলগাইন বলা হয়। মূলগাইন-এর সঙ্গীদের বলা হয় সমাজী।

বিদাপত-নাচে অভিনেতারা যেখানে সাজ সজ্জা করে সেই জায়গাটিকে বলা হয় সাজঘর। অঙ্কিয়া-নাটে এই সাজঘরকে বলা হয় ছঘর বা ছদ্মগৃহ।

নাটক আরম্ভের আগে বাজনার সাহায্যে দর্শক আহ্বান করা ভারতের প্রায় সব লোক নাট্যেরই এক অনিবার্য পূর্বরঙ্গ-বিধি। বলাইবাহুল্য, বিদাপত-নাচেও এই পূর্বরঙ্গ-বিধির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ঝিরওয়ার লোকেরা একে বলে জমীনিকা। জমীনিকায় ব্যবহৃত হয় দু'টি বাদ্যযন্ত্র। বাদ্যযন্ত্র দুটি হ'লো খোল এবং মৃদঙ্গ। জমীনিকার অর্থ ভূমিকা। আর নিশ্চয়ই যবনিকা-উত্থানের জন্যে যে ঐক্যতান-বাদন প্রযুক্ত হয় তাকেই এই এলাকার লোক জমীনিকা নামে অভিহিত ক'রেছে।

জমীনিকার পর বন্দনা। প্রথমে ভগবতীর ও পরে অন্যান্য দেবতার। ভগবতী-বন্দনা বিদ্যাপতি-রচিত। আর প্রত্যেক অভিনয় যেহেতু ভগবতী-বন্দনা দিয়ে শুরু হয় সেইহেতু এই এলাকার মানুষ এই নাট্যাভিনয়কে বিদাপত নাচ ব'লে থাকে। বন্দনাংশের নেতৃত্ব দেয় মূলগাইন। বন্দনার সময় মৃদঙ্গ প্রায় মৌনই থাকে—ফলে কানে ভেসে আসে কেবল বন্দনার কথাগুলি। ভগবতী বন্দনার পর গুরু ও লক্ষ্মী বন্দনার চল আছে। বর্তমানে উপলব্ধ লোকগীতি অপেক্ষাও বন্দনার সুর অধিকতর উন্নত।

বন্দনার পর খুবই সংক্ষেপে 'পারিজাত হরণ নাটকের' পরিচয় দেয়া হয়। এই পরিচয় দানে অংশ নেয় নায়ক এবং বিকটা। বিকটা হ'লো বিদূষক। নায়ক ও বিদূষক পারস্পরিক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এই পরিচয়-দান সম্পন্ন করে। নায়ক বিদূষককে বলে যে আমরা কিন্তু ভাঁড়ামি করতে এখানে আসিনি। আমরা এসেছি 'পারিজাত হরণ নাটক'-খানি অভিনয় করার জন্যে। পারিজাত-অর্থে বিদূষক মনে করে পরজাত। ফলে সে নায়ককে বলে "ও! তোমরা তাহলে আমাদের জাত মারতে এসেছো?

এইভাবে সামান্য হাসিঠাট্টার মধ্যদিয়ে নাটকের পরিচয় দেয়া হ'য়ে গেলে পাওয়া হয় 'গণেশ সুমিরণ' অর্থাৎ বিঘ্নহরণ দেবতা গণেশের স্তুতি। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে ভারতবর্ষে প্রায় সব অঞ্চলের লোক-নাট্যেই গণেশ-স্তুতির চল আছে।

"গণেশ সুমিরণ" হ'য়ে গেলে বিকটা ঘুঙুরের শব্দ শুনে কারা আসছে জিগ্যেস করাতে নায়ক জানায় যে শ্রীরাধিকা আসছেন তার সখীদের নিয়ে। পারিজাত-হরণ নাটকে সসখী শ্রীরাধার আগমন বার্তা শুনে বিকটার মত দর্শকরাও বেশ আশ্চর্য হ'য়ে যায়। তখন নায়ক জানায় আমাদের সব নাটকাভিনয়েই রাধা-

নৃত্যের অবতারনা করা আবশ্যক, আর রাসনৃত্য তো কেবলমাত্র শ্রীরাধিকা ও তার সখীরাই করতে পারে। কাজে কাজেই সসখী শ্রীরাধার মঞ্চাগমন ঘটে। দুইখানি পদ গাইতে গাইতে তাঁরা একখানি দলগত-নৃত্য পরিবেশন করেন। পদ দু'টির একটি আবার বিদ্যাপতির রচনা। বর্তমানে প্রচলিত হোলির গানের সঙ্গে এই পদদু'খানির সুরগত সাদৃশ্য সকলেরই দৃষ্টিগোচর হ'য়ে থাকে।

এই রাসনৃত্যের সঙ্গে অন্য একটি রাসনৃত্যেরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আর সে ধারাটি হ'লো জয়দেবের গীত-গোবিন্দে বর্ণিত রাস-নৃত্যের ধারা। ঝিরওয়ার এই গ্রাম্য শিল্পীরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে গীত-গোবিন্দের রাস নৃত্য-ধারাকে প্রবহমান রেখেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় বিদাপত-নাচে বিদ্যাপতির (পদ ও) নাম, জয়দেবের বৃন্দগান এবং অসমের অঙ্কিয়া-নাট তথা মিথিলার কীর্তনীয়ার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

যাইহোক, সসখী শ্রীরাধিকা পরিবেশিত রাস-নৃত্যের পরেই পারিজাত-হরণ নাটকের মূলকাহিনীর অভিনয় শুরু হয়। প্রথমেই মঞ্চে আসে শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর একটু পরেই আসে নারদ। এদের প্রবেশের সূচনা দেয়া হয় কবিতার সাহায্যে। নারদের মাথা ন্যাড়া, পরনে ধুতি। আর হাতে লুকিয়ে রাখা একটি পারিজাত-ফুল। কৃষ্ণের পিছু পিছু জরির শাড়ী প'রে রুক্মিনী ইতিমধ্যেই মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়। সংলাপ চলে পদ্যে, মাঝে মধ্যে গদ্যেও।

কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করে যে এমন চমৎকার দৈবী-সুগন্ধ আসে কোথা থেকে। নারদ তখন মুঠি খুলে পারিজাত ফুলটি দেখায়। এই সময় পারিজাত-পুষ্পের গুণ বর্ণনা ক'রে একটি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। গান শেষে নারদ কৃষ্ণকে সেই ফুলটি দিয়ে দেয়। কৃষ্ণ বলেন—এখন এই ফুল আমি কাকে দিই। নারদ তখন বলে—সত্যভামা ফুলটি চেয়েছিল কিন্তু যেহেতু রুক্মিনীজী এখানেই উপস্থিত আছেন সেইহেতু ফুলটি তাকে দেয়াই ভালো।

কৃষ্ণ তখন সেই ফুলটি রুক্মিনীর হাতে সমর্পণ করেন। পারিজাত-পুষ্প পেয়ে রুক্মিনীজী নিজেকে ধন্য মনে করেন। গানের সাহায্যে কাহিনী এগিয়ে চলে। এমনি সময়ে হঠাৎ ঘটনাস্থলে এসে পড়ে সত্যভামার দাসী। ফলে তার কানে যায় যে (পারিজাত)-ফুলটি রুক্মিনীকে দিয়ে দেয়া হ'য়েছে।

নাটকে রুক্মিনী শব্দের উচ্চারন করা হ'য়েছে 'রুকিনী রূপে'। প্রসঙ্গত: স্মরণযোগ্য যে অসমের অঙ্কিয়া নাটের কোনো কোনো গীতেও রুক্মিনী-স্থলে 'রুকুনি-র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

সত্যভামা আসে। অশুভ আশঙ্কায় তার গতি বাধাগ্রস্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মন্থরা সদৃশ দাসীটি এসে তাকে পারিজাত-বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত করে এবং নানাবিধ কুমন্ত্রণা দেয়।

সত্যভামা ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে নারদকে ডাকে। নারদ সেখানেই উপস্থিত

ছিল। আপন স্বভাববশতঃ সে বিষয়টাকে আরো জটিল ক'রে তোলে। সত্যভামাকে সে বলে—এ সমস্তই কৃষ্ণের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ফল। রুক্মিনীকে এ ফুলটি দেয়া উচিত হয় নি। এতে ক'রে সত্যভামা আরো ক্রুদ্ধ হয় এবং কোপ-ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কৃষ্ণ পুণরায় মঞ্চে এলে নারদ তাঁকে সব জানিয়ে ফুলটি সত্যভামাকে দিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানায়, কেননা সত্যভামা ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে কোপ ভবনে আশ্রয় নিয়েছে। কৃষ্ণ অসহায় ভাবে রুক্মিনীর দিকে তাকালে রুক্মিনী ফুলটি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে।

রঙ্গস্থলের একপাশে সত্যভামা কোপ-ভবনে ব'সে আছে। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার অলঙ্কারাদি। মূলগাইন তখন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে গানের সাহায্যে সত্যভামার মান ও কৃষ্ণ কর্তৃক সে মান-ভঞ্জনের প্রাণবন্ত বর্ণনা দেয়। পারিজাত হরণ নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হ'লো—'কৃষ্ণ-সত্যভামা' সংলাপ। এই সংলাপ অংশটির প্রথমাংশ অভিনীত হয় গদ্য-সংলাপ সহযোগে আর শেষ অংশটি অভিনীত হয় গানের সাহায্যে।

কৃষ্ণ এই সময় প্রতিজ্ঞা করেন তিনি সত্যভামাকে সম্পূর্ণ একটি পারিজাতের গাছ এনে দেবেন। কৃষ্ণের এই প্রতিশ্রুতিতে সত্যভামা খুবই খুশি হয়। সে খুলে ফেলা সব অলঙ্কার আবার একে একে পরতে থাকে এবং (গয়না) পরতে পরতেই সে মাতা-ভবানীর বন্দনা করে। রাজস্থানী লোক-গীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এই বন্দনার সুরে।

বন্দনার পর শ্রীকৃষ্ণ সরল গদ্যে নারদকে আদেশ করেন স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে জানাতে পারিজাত-বৃক্ষটি দিয়ে দেয়ার জন্যে। নারদ প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করলেও কৃষ্ণ বার বার বলাতে সে স্বর্গের পথে যাত্রা শুরু করে।

নারদের কাছে সব শুনে ইন্দ্র বেশ ক্রুদ্ধ হন এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔদ্ধত্যের জন্য তাকে তিরস্কার করেন। ইন্দ্র নারদকে এ পর্যন্তও জানিয়ে দেন যে তিনি কোনো অবস্থাতেই পারিজাত বৃক্ষটিকে স্বর্গ ছাড়া করবেন না।

নারদ অগত্যা কৃষ্ণের কাছে ফিরে আসে। কৃষ্ণ কি হ'লো জানতে চাইলে নারদ বলে সে কথা না বলাই ভালো। কেন ?—না—ইন্দ্র তোমার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবে ব'লেছে।

এই সময় মূলগাইন গানের সাহায্যে কৃষ্ণের ক্রোধ বর্ণনা করে। এই বর্ণনা-গীতির সঙ্গত করে খোল। মৃদঙ্গ এই সময় ব্যবহৃত হয় না।

গান শেষে কৃষ্ণ গরুড়কে আদেশ দেন সৈন্য প্রস্তুত করার জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে এসে উপস্থিত হয় শ্রীকৃষ্ণের সেনাদল। মূলগাইন এই সময় কৃষ্ণের সৈন্যদলের বর্ণনা দেয় সরল-গদ্যে। এই বর্ণনাদানের সঙ্গে অঙ্কিয়ানাটের সূত্রধারের বর্ণনার খুব মিল লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণের সৈন্যরা সব মুখোশ পরিহিত। অঙ্কিয়ানাটে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা অনুরূপ মুখোশ ব্যবহার ক'রে থাকে। দক্ষিণ ভারতীয় নাট্যেও কোনো কোনো চরিত্র অনুরূপ মুখোশ ব্যবহার ক'রে থাকে। এই সময়ে সমাজীরা গান গেয়ে সেনাদলের শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেয়। 'মার্চিংগ সং' তথা বৈশালীর জেলেদের গানের সঙ্গে এর সুরলয়ের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই সময় মঞ্চে নিয়ে আসা হয় একটি গাছের ডাল। এই ডালটিই নন্দন-কাননের পারিজাত বৃক্ষ। মুখোশ পরা এক সৈনিক গাছটির রক্ষনাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়। কৃষ্ণের সৈন্যরা তাকে আক্রমণ করে। অচিরেই সে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। গিয়ে উপস্থিত হয় ইন্দ্রের কাছে, এবং তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবহিত করে। ইন্দ্র তখন তাঁর সেনাদল নিয়ে পারিজাত-বৃক্ষের অধিকারস্বত্ব কায়েম রাখতে নন্দনকাননের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে চ'লেন শচীমাতা।

এবারে মঞ্চের একদিকে দেখা যায় সৈন্যসহ ইন্দ্র ও শচী এবং অন্যদিকে সৈন্যসহ কৃষ্ণ এবং সত্যভামা। মূলগাইন গন্থে দর্শককে জানিয়ে দেয় যে এবার আপনারা দেখুন শচী সত্যভামার লড়াই।" ইন্দ্র ও কৃষ্ণের যুদ্ধের অব্যবহিত আগে শচী ও সত্যভামার এই লড়াই বিদাপত-নাচের এক অতি আকর্ষণীয় অংশ। এই সময় মঞ্চে মিথিলার গ্রাম-দেশে নিত্য-সংঘটিত লড়াই যেন মূর্ত হ'য়ে ওঠে।

এরপর উপযুক্ত এক সঙ্গীত সহযোগে শুরু হয় ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের যুদ্ধ। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মুখে লাগানো থাকে মুখোশ।

ইন্দ্রের বজ্র বিফলে যায় ফলে ধ্যানস্থ হ'য়ে শঙ্করকে ডাকেন। শঙ্কর ময়গণদের নিয়ে রঙ্গস্থলীতে আসেন। রঙ্গস্থলীতে এসে মুখোশ পরিহিত গণ 'শঙ্কর ভোলে' এই গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আকর্ষণীয় এক নৃত্য পরিবেশন করে।

শঙ্করের ডমরুধ্বনিতে থেমে যায় সে নৃত্য। তিনি এখন ইন্দ্র উপেন্দ্রকে বলেন—তোমরা ভায়ে ভায়ে কেন বিবাদ করো? ইন্দ্র বলেন কৃষ্ণ আমাকে ভাই ব'লে স্বীকার করে না। শঙ্কর ইন্দ্রকে বলেন—দোষ তোমারই, তুমি মাফ চেয়ে নাও। তিনি সত্যভামা এবং শচীকেও বোঝান। তখন, শঙ্করের নির্দেশমত ইন্দ্র ও কৃষ্ণ একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। মূলগাইন তখন মঙ্গলগান করে এবং বলে যারা এই 'পারিজাত হরণ শুনবে তাদের জীবন সার্থক হবে'। শঙ্করদেবের অঙ্কিয়ানাটের শেষোক্ত পদের সঙ্গে এই মঙ্গল-গানের তুলনা করা চলে। ঐ পদেও উপস্থিত সামাজিককে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলা থাকে।

উপরে বর্ণিত নাট্যাভিনয় থেকে বোঝা যায়—

(১) ঝিরওয়া গ্রামের বিদাপত-নাচ কোনো বাঁধা মঞ্চে অভিনীত না হ'য়ে অভিনীত হয় দর্শক-বেষ্টিত লীলাস্থলী বা রঙ্গস্থলীতে। দর্শকরা আসন নেয় এই রঙ্গস্থলীর দুই পাশে। আর সাজঘর থাকে রঙ্গস্থলী থেকে একটু দূরে।

(২) প্রযুক্ত গীতগুলি উৎকৃষ্ট এক সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ, গানে প্রযুক্ত রাগেও

বৈচিত্র্য আছে। তাছাড়া নাটকীয় মুহূর্ত ও ঘটনার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহৃত হয় নানাবিধ তাল।

(৩) গ্রাম্য শিল্পীরা অবশ্যই জানেনা নাটকখানি কার লেখা, তবে নাটকের পদগুলি যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারারই ফসল—এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

(৪) প্রযুক্ত গদ্যাংশের কিছুটা পরম্পরাগতভাবে অবিকৃত অবস্থায় চলে আসছে আর কিছু অংশ একেবারেই বর্তমান কালের। অবস্থা বিশেষে মূলগাইন যখন দর্শকদের উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলে—তখন পরম্পরাগত গদ্যের ব্যবহার হ'য়ে থাকে, যেমন কৃষ্ণের সেনা আগমনে মূলগাইন সেনাবাহিনীর শৌর্যবীর্য-পরাক্রমের বর্ণনা দেয় এই গদ্যে। আর ঘটনা যখন নতুন দিকে মোড় নেয় তখন প্রযুক্ত হয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত গদ্য। উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক নারদকে ইন্দ্রপুরী প্রেরণের দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে গদ্য মূল কাহিনীর গতি দ্রুতায়িত ক'রতে সাহায্য করে।

(৫) যুদ্ধ অথবা গভীর কোনো ভাবনার উন্মেষের ক্ষেত্রে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে খুব জোরে জোরে মৃদঙ্গ বাজানো হয়, যেমন নারদের কথা শুনে ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠেন তখন জোর মৃদঙ্গের বাজনা দর্শককে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রতে অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই পদ্ধতিটি প্রায় সমস্ত প্রকার লোক-নাট্যেই অনুসৃত হয়। নৌটঙ্কীতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ-বাহুল্য প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রই অবগত আছেন। আর নাটকারম্ভের প্রস্তাবনা, বন্দনা এবং শেষে মঙ্গলগানের প্রচলন সংস্কৃত নাটকাভিনয়েও ছিল। সে যাইহোক, সব মিলিয়ে বিদাপত-নাচের অভিনয়ে মিথিলার কীর্তনীয়া এবং অঙ্কিয়ানাটকের ধারা যে বিকৃতরূপে হ'লেও অনুস্যূত, এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

(গ) বিদেসিয়া

পশ্চিম বিহারের 'বিদেসিয়া' ভোজপুরী ভাষার এক অনবদ্য লোক-নাট্য। বিদেসিয়ার স্রষ্টা ভিখারী ঠাকুর। সারণ জিলার এই নিরক্ষর মানুষটি ছিলেন ভোজপুরী সঙ্গীতের একচ্ছত্র সম্রাট। রামলীলা, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী, বিদেসিয়া, সোরঠী-বৃজভান, তোতা-ময়নার কিস্সা এবং আলহা উদলের মত কাহিনী ও লোকপ্রচলিত গল্প তিনি লোকগীতিতে অভিনয়াত্মক ঢঙে যখন পরিবেশন করতেন তখন তাঁর অভিনয়ের সহজ-স্বাভাবিকতা এবং সুরেলা কণ্ঠের চমৎকারিত্বে শ্রোতৃ-মণ্ডলী একেবারে আত্মহারা হ'য়ে পড়তেন। ফলে বিদেসিয়া প্রণেতা ভিখারী ঠাকুরের নাম বিহারের সর্বত্র—এমনকি উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার যেখানেই ভোজপুরী ভাষীরা আছে সেখানেই অত্যন্ত আদরের সঙ্গেই সমাদৃত।

আসলে ভিখারী ঠাকুর প্রতিভাবান মানুষদের এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন;

গ্রাম্য এবং নিরক্ষর এই মানুষটি ভোজপুরী এলাকার লয়-তালে অনুপ্রাণিত সত্যিকারের এক চারণকবি। তাঁর রচিত বিদেসিয়া প্রচলিত লোকগীতির আধারে বিধৃত এমনি একটি কাহিনী—যা পশ্চিম তথা সমগ্র বিহারের সাধারণ মানুষের দাম্পত্য জীবন, তার রূঢ় বাস্তবতার প্রতিবিম্ব এবং কালিদাসের মেঘদূত থেকে আধুনিক যুগ আধি বিরহিনী নায়িকার, তার নায়কের উদ্দেশ্যে প্রেরিত দুঃখপরম্পরায় এক অপূর্ব সম্মিলন। বিদেসিয়ার প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তার অনেকগুলি কারণ আছে, যার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা এবং ঝুমর, সোহর, পুবী-খেমটা, ঝঁতসারী, কবিত্ত প্রভৃতি লোকগীতি ও লোকসাহিত্যে প্রচলিত ছন্দের প্রয়োগ, শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য এবং অভিনেয়তা অন্যতম। তবে এই প্রসিদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ এর কাহিনী। সমকালীন পশ্চিমবিহারের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির নিজস্ব সমস্যা নিয়ে রচিত এর কাহিনী। ফলে কাহিনীর চরিত্রগুলির সঙ্গে বিহারের সাধারণ মানুষ খুবই একাত্ম হ'য়ে ওঠে। পুরাকথা রাজারাজড়ার জীবনী বা পুরাণের প্রেমকাহিনীর প্রচলিত পথ অনুসরণ না ক'রে গীতাভিনয়ের জন্যে তার চারপাশের ঘটমান বাস্তবকে বেছে নিয়ে নিঃসন্দেহে ভিখারী ঠাকুর যুগপৎ অদম্য সাহস এবং যুগান্তকারী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভোজপুরী এলাকার হাজার হাজার সাধারণ মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে নিজেদের বিবাহিত স্ত্রীদের বাড়িতে রেখে বিদেশে যেত। বলাই বাহুল্য যে, কোলকাতা, বোম্বাই বা দিল্লী এদের কাছে বিদেশ। বিদেশে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই তারা বেশ্যাদের খপ্পরে প'ড়ে ভুলে যায় আপন স্ত্রীকে। অসহায় পত্নী তখন প্রিয় বিরহে ছটফট করতে থাকে। সময়-সুযোগ মত লোক-মারফৎ খবরও দেয়। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু এ বিচ্ছেদ দূর হয় না। দূর হয় না প্রিয়-বিচ্ছেদ-জনিত বিরহ-ব্যথা। কেননা তার স্বামী দীর্ঘদিন বাদে বাড়ি ফিরলেও থাকতে পারেনা বেশি দিন। পেটের তাগাদায় তাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হয়। বিরহিনীর প্রিয়-মিলনের সুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় তাই ক্ষণিকের। ভিখারী ঠাকুর প্রণীত বিদেসিয়ার অবলম্বিত সমস্যা এটিই।

বিদেসিয়ার কাহিনীটি নিম্নরূপ—

এক যুবক দ্বিরাগমনের পর তার নববিবাহিত যুবতী স্ত্রীকে ঘরে আনে এবং অল্পদিন বাদেই বিদেশ যাওয়ার তোড়জোড় করতে থাকে। নববধূ তখন তার যৌবন ও ভালবাসার দোহাই পেড়ে তাকে বিদেশ যেতে বারণ করে। কিন্তু যুবকটি নতুন ডিজাইনের বাংলা কাপড় কিনে আনার লোভ দেখিয়ে চলে যায় রেঙ্গুন। রেঙ্গুনে গিয়ে সে এক বেশ্যার খপ্পরে প'ড়ে ভুলে যায় তার পত্নীকে। পত্নী এদিকে পতি-বিরহে কাতরা। এমনি সময়ে অন্য এক বিদেশী রেঙ্গুনে যাওয়ার পথে বিরহিনীর গ্রামে আসে। ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে বিরহিনীর পরিচয় ঘটে যায়। বিরহিনী তাকে তার দুঃখের কথা ব'লে অনুরোধ করে

তার স্বামীকে জানাতে। বিদেশী যাতে তার স্বামীকে চিনতে পারে তার জন্য বিরহিনী এই বিদেশীর কাছে তার স্বামীর রূপ বর্ণনা করে নিস্পৃহ ভাবে। বিদেশী দূত তখন রেঙ্গুনে যায়। খুঁজে বের করে সেই যুবককে এবং তাকে তার পত্নীর শোচনীয় অবস্থার কথা জানায়। স্বীয় পত্নীর শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে যুবকটি আর থাকতে পারে না। সে তখন তার পেমিকাকে মিথ্যে বাহানা দিয়ে ঘরে ফেরে। দীর্ঘ বিরহের পর মিলিত হয় পতি-পত্নী। পতি-পত্নীর এই মিলন ভিখারী ঠাকুরের মুখে চিরকালীন মিলনকাব্যের উৎকৃষ্ট নজির হ'য়ে ওঠে—

প্রেম মগন মন বহুত হোত হায় দেখি কে চরণ তুম্হারে।
শোক ধার মেঁ বহল জাত রহলীঁ, খীঁচি কে কইল কিনারে॥
বহুত দিনন পর দর্শন দিহল হে প্রতিপ্রাণ অধারে।
কহেঁ ভিখারী জয় গঙ্গাজী বহুরল সেনুরা হমারে॥

বিদেসিয়া ভিখারী ঠাকুর-সৃষ্ট এক গীতিনাট্য। একে ভোজপুরী ভাষার প্রথম গীতি নাট্যও বলা যেতে পারে। বিদেসিয়ার পর অন্য অনেকে গীতি-নাট্য লিখেছেন। স্বয়ং ভিখারী ঠাকুরও আরো কয়েকখানি পালা লিখেছেন। কিন্তু কোনো নাটকই আর বিদেসিয়ার অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

বিদেসিয়ার কয়েকটি জায়গায় চিত্রধর্মী বর্ণনা এবং বিয়োগিনী নায়িকার গভীর মনোস্থিতির যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভিখারী ঠাকুরের রচনায় তা বিস্ময় উদ্রেককারী কাব্য প্রতিভার এক উৎকৃষ্ট নজির। সমগ্র ভোজপুরী সাহিত্যে সেসবের আর কোনো জুড়ি নেই।

এরকম কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হোলো। বিদেসিয়া (যুবক)-কে চেনার জন্যে বিদেসিয়ার বিয়োগিনী পত্নী রেঙ্গুন-যাত্রীর কাছে তার স্বামীর রূপ বর্ণনা ক'রে বলে—

হমরা বলমুজী কে বড়ী-বড়ী অঁখিয়া সে।
চোখে চোখে বাড়ে নয়না কোর্ রে বটোহিয়া॥
ওঁঠওঁয়া ত বাড়ে জইসে কতরল পনওঁয়া সে।
নকিয়া সুগনওয়া কে ঠোর রে বটোহিয়া॥
দঁতওয়া ত শোভে জইসে বিজুরিয়া সে।
মোছিয়ন ভঁওরা গুজারে রে বটোহিয়া॥
মথওয়া মেঁ শোভে রামা টেঢ়ী কালী টোপিয়া স।
রোরী বুঁদা শোভেলা লিলার রে বটোহিয়া॥

লোক-জীবন থেকে আহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং প্রতিবিম্বের মাধ্যমে নায়িকা যে কেবল তার স্বামীর রূপ বর্ণনা করে তাই নয়, সে রেঙ্গুন-যাত্রীকে একথাও জানিয়ে দেয় যে তার স্বামী অতীব সুন্দর। ভিখারী ঠাকুরের এই

রূপবর্ণনা হিন্দী সাহিত্যের যেকোনো মনোরম রূপবর্ণনার সঙ্গে একাসনে বসবার উপযুক্ত। অনুরূপ আরেকটি রূপবর্ণনার নিদর্শন বিদেসিয়াতে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বটোহী বিদেসিয়ার কাছে তার বিয়োগ-ব্যথাতুর বিরহিনী-স্ত্রীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দেয়।

বটোহী বিদেসিয়াকে জানায়—

তোর ধনী বাড়ী রামা, অঁগওয়া কে পতরী সে।
লচকেলি ছতিয়া কে ভার রে বিদেসিয়া॥
কেসিয়া ত বাড়ো জইসে কালী রে নগিনিঁয়া সে।
সেনুরা সে ভরল বা লিলার রে বিদেসিয়া।
অঁখিয়া ত হউয়ে জইসে অমওয়া কী ফঁকিয়া সে॥
গলওয়া সোহেলা গুলেনার রে বিদেসিয়া।

গ্রামীণ নায়িকার উদ্ধত যৌবন এবং অপরূপ রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা করা হয়েছে গ্রামীণ সব উপমানের সাহায্যে। দীঘল, কৃশকায়া রমণীর কালো কেশ যেন কালসাপের মতই। তার চোখ যেন কাটা আমের এক ফালির মতই রসে টলমল। আর তার গাল যেন ডালিম ফুলের মত লাল। প্রাণবল্লভ বিদেশে যাওয়ায় এমনি এক রূপবতী নায়িকার যে কাতর অবস্থা ভিখারী ঠাকুরের ভাষায় তা নিম্নরূপ—

তোর ধনী ভইলী রামা বন কী কোইলিয়া সে।
কুহুকত ফিরে চারু ওর রে বিদেসিয়া॥

প্রাণপ্রিয় পতির বিরহে নায়িকা বনের কোকিলের মত আর্তনাদ করে বেড়ায়। সে তখন তার মনের বাস্তবিক অবস্থার সত্যকার বর্ণনা দেয় বটোহীর কাছে।

চঢ়লী জওনিয়াঁ বৈরিন ভইলী হমরী সে।
কে মোরা হরিহৈঁ কলেশ রে বিদেসিয়া॥
দিনওয়াঁ বিতেলা সৈয়াঁ বটিয়া জোহত তোরা।
রাতিয়া বিতেলী জাগি জাগি রে বিদেসিয়া॥
আধী রাতি গইলে, পহর রাতি গইলে সে।
ধধকে করেজওয়া মেঁ আগি রে বিদেসিয়া॥

প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় তার কাটে দিন, কাটে নিদ্রাহীন সব রাত। প্রতিরাতেই একবার করে তার সহৃদয় বুকখানি যেন (বিরহের) আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। পরে তাই সে খুবই পরোক্ষভাবে প্রতীকাত্মক ঢঙে তার এই বিরহানলের বর্ণনা দিয়ে ক্ষণস্থায়ী যৌবনের এক অনুপম করুণ প্রতিবিম্ব রচনা করে।

অমওয়াঁ মোজরি গইলে, লগলে টিকোধা সে।
দিন পর দিন পিয়রালা রে বিদেসিয়া॥
এক দিন বহি জইহেঁ জুলুসী বয়রিয়া সে।
ডার পাত জইহেঁ ভহরাঈ রে বিদেসিয়া॥

একদিন মূর্তিমান উৎপাত-স্বরূপ বার্ধক্য-ঝড় এসে রূপ লাবণ্যে ভরা এই যৌবন বৃক্ষের ডালপালা সব ভেঙে দেবে। সে ঝড় বার্ধক্যের না হ'য়ে উন্মত্ত বাসনারও হ'তে পারে, যা ছিন্ন ক'রবে নৈতিকতার বেড়াজাল। তখন আর কি থাকবে আমার! ফলে নিদারুণ যন্ত্রনায় নায়িকার মনে শঙ্কা জাগে বাসনার কাছে পরাভবের। আর সে নিদারুণ পরাভব-আশঙ্কা সব বিরহিনী নারীর হ'য়ে তার মুখে ভাষা পায়—

তোহরে কারণ সইয়াঁ ভভূতি রসইবো রে।
ধরবো জোগিনিয়াঁ কে ভেস রে বিদেসিয়া॥

নায়িকার এই আশঙ্কায় ভীত বটোহী দ্রুত রেঙ্গুন গিয়ে বিদেসিয়াকে বলে

অইসন টিরিয়বা সুধি বিসখলে সে।
তোহরা কে হবে ধিক্কার রে বিদেসিয়া॥

ভিক্ষারী ঠাকুরের বিদেসিয়ার এমন অনেক অংশ কেবলমাত্র গ্রামীণ রসিক-দেরই নয়, সাহিত্যের মর্মজ্ঞ পণ্ডিতকেও বিস্ময়-বিমুগ্ধ ক'রে দেয়। আসলে উপযুক্ত সংলাপ, বর্ণনাত্মক দৃশ্যবিধান এবং অভিনয়ের সযত্ন পৃষ্ঠপোষকতা বিদেসিয়াকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিহার তথা বাংলা ও উত্তর-প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার অন্যতম এক লোকনাট্য-অঙ্গিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকার নাট্যরসিকের মুখে আকছারই শোনা যেতে থাকে—

গওয়ানা করাই সইয়াঁ ঘর বৈঠওয়ালে সে।
অপনে গেইলে পরদেস রে বিদেসিয়া॥

ভিখারী ঠাকুরের নাম এবং বিদেসিয়া অচিরেই এমন এক যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় যে নিজের দল নিয়ে ভিখারী ঠাকুর যেখানেই গেছেন সেখানেই হাজার হাজার মানুষ সমবেত হ'য়ে তাঁর পরিবেশিত পালা দেখে আনন্দিত হ'য়ে তাঁকে এবং তাঁর দলকে উৎসাহ জুগিয়েছে।

বিদেসিয়ার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো মঞ্চ-বিধান বা মঞ্চরীতি নেই। সাধারণতঃ খোলা জায়গায় কয়েকখানি চৌকি অথবা তক্তা জোড়া দিয়ে অথবা ইট সাজিয়ে বিদেসিয়া অভিনীত হ'য়ে থাকে। কোথাও কোথাও উপরে একটি সামিয়ানাও টাঙানো হয়। তবে মুক্তাকাশী অভিনয়-ক্ষেত্রই যেন বিদেসিয়ার পক্ষে অধিক উপযোগী।

সাজ-পোষাক এবং মেক-আপে আঞ্চলিকতার প্রভাব খুবই স্পষ্ট। বস্ত্র এবং

অলঙ্কার খুবই সাধারণ এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্যানুসারী। পুরুষ চরিত্র সাধারণ ভোজপুরী ক্ষেত্রের গ্রাম্য সাধারণ মানুষের মত ধুতি এবং কামীজ ব্যবহার করে। স্ত্রী চরিত্র সাধারণভাবে শাড়ী ব্লাউজ এবং বারাঙ্গনারা ঝকমকে ও চটকদার ঘাঘরা এবং ব্লাউজ পরে। রেঙ্গুন-যাত্রী বিদেশী, যে বটোহী নামে পরিচিত সে পরে শহুরে পোষাক। আর বিদেসিয়া কেবলমাত্র পায়ে জুতো পরে; অন্য কোনো চরিত্র জুতো পায়ে দেয় না। দৈনন্দিন পোষাকই সাধারণত ব্যবহার করা হয়, কেননা তা কাহিনীকে গ্রামীণ মানুষের কাছে অনেক বেশি বাস্তবকল্প এবং বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতে সাহায্য করে।

ভিখারী ঠাকুর নিজে গায়ক-নায়ক এবং সূত্রধারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তেন। ফলে আজও নায়কই বিদেসিয়ার মূল গায়ক এবং সূত্রধার। তবে অন্যান্য লোক নাট্যের মত বিদেসিয়াতে স্বতন্ত্র কোনো বিদূষক নেই।

ঢোলক, সারেঙ্গী এবং হারমোনিয়াম বিদেসিয়ার অন্যতম প্রধান বাদ্যযন্ত্র। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে ডুগি-তবলা, ঝাল, বাঁশি এবং গোপীযন্ত্র। বিদেসিয়ার পরিভাষায় বাদ্যযন্ত্রীদের বলা হয় সমাজী। যতক্ষণ নাটক চলে সমাজীরা মঞ্চেই উপস্থিত থাকে। সমাজীরা বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করা ছাড়াও অভিনেতার মুখোচ্চারিত কিছু কিছু বোল নিজেরাই অভিনয় ক'রে দেখায়। বাদ্যযন্ত্রীদের এই অভিনয়াত্মক ভূমিকা লীলা নাটক থেকেই বিদেসিয়াতে এসেছে। বিদেসিয়াতে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষরাই অবতীর্ণ হয়। বিদেসিয়ার চরিত্রগুলি দৈনন্দিন সমাজ-জীবনেরই চরিত্র, ফলে এর অভিনয় খুবই স্বাভাবিক। হাস্যরস যেটুকু আছে —তাও কোথাও স্থূল রঙ্গ তামাশায় পরিণত হয় না।

সবশেষে বিদেসিয়া সম্পর্কে আরেকটি কথা না বললেই নয়, আর তা হ'লো এই যে, সমসাময়িক এক সামাজিক সমস্যার আড়ালে বিদেসিয়ার কাহিনীতে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ প্রশ্রয় পেয়েছে। কেননা বিদেসিয়া রচনার আগে ভিখারী ঠাকুরের মন আন্তর-সম্পর্ক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত কাহিনীটি হ'লো—(বিদেসিয়া রচনার আগে) ভিখারী ঠাকুর একবার সুরদাসের "ভ্রমরগীতি" পড়ছিলেন। তখন ভ্রমরগীতির "মোর মাধো কাহে বিলসী বিদেস মেঁ রহে" তথা "কহ কোঈ পরদেস কী বাত"—এই পঙক্তি দু'টি তাঁকে ভীষণ-ভাবে আলোড়িত করে। পরবর্তীকালে বিদেসিয়া রচনায় এই পঙক্তি দুটি প্রেরক শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে। ভ্রমরগীতিতে প্রবাসে থাকার দরুণ কৃষ্ণকে পরদেশী বলা হ'য়েছে। কেননা গোপীনীদের কাছে দ্বারকা পরদেশ বিশেষ। ভিখারী ঠাকুরের গ্রামবাসীও কোনো বড় শহরকে পরদেশ বলতো। কোলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহর তাই তাদের কাছে ছিল বিদেশ। ফলে ভিখারী ঠাকুর যখন বিদেসিয়া লিখলেন তখন তাঁর কাহিনীতে তিনি ভ্রমরগীতির অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ আরোপ করার চেষ্টা ক'রলেন। আর সে চেষ্টাকে সফল

ক'রতে তিনি চারটি বাস্তবকল্প চরিত্রের সাহায্য নিলেন। চরিত্র চারটি হ'লো—(১) বিদেসিয়া (কৃষ্ণ) (২) প্যারী সুন্দরী (রাধা) (৩) বটোহী (উদ্ধো) এবং বেশ্যা (কুবরী)। অন্যভাবে বললে বলা যায়, বিদেশী হ'লেন ব্রহ্ম, প্যারী সুন্দরী জীব, বটোহী ধর্ম এবং বেশ্যা হ'লো মায়া। এবারে বিদেসিয়ার মানুষের শরীরেই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা অবস্থান করেন। প্যারী ও বিদেসিয়া তাই বিবাহিত দম্পতি। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্ভব নয়—কেননা তাদের মধ্যে মায়ার জাল (এখানে বেশ্যা) বিস্তৃত। তবে ধর্মের সাহায্যে এই মায়াজাল ছিন্ন করা সম্ভব হয়, সম্ভব হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন। এখানেও বটোহীর চেষ্টায় বিদেসিয়া বেশ্যার খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্যারীর সঙ্গে মিলিত হয়।

স্পষ্টই বোঝা যায় বিদেসিয়া কেবলমাত্র সমকালীন এক সমাজ-সমস্যারই প্রতিবিম্ব নয়, তা আমাদের সনাতনী জীবন দর্শনেরও দর্পণ বিশেষ। তাই ভিখারী ঠাকুরের বিদেসিয়া ভোজপুরী ভাষীদের মত সমগ্র ভারতবাসীরই আশা-আকাঙ্খা এবং আত্ম-অন্বেষণের তৃপ্তি যোগায়।

বিদেসিয়া তাই আজ আর কেবলমাত্র একটি নাটক নয়, সমগ্র এক নাট্য-আঙ্গিক। ফলে ভোজপুরী ভাষার অন্যান্য অনেক নাটকের মত ভিখারী ঠাকুরের অন্যান্য নাটকগুলিও আজ বিদেসিয়া নামে পরিচিত

নেপালের রমখেলিয়া ॥

নেপালের তরাই অঞ্চলে রাজবংশী, থারু, আহিরী প্রভৃতি জাতির বাস। এদের মধ্যে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়তম লোকনাট্য হ'লো রমখেলিয়া। রমখেলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের জীবন সম্বলিত। তাই রামলীলার মত কয়েক রাত ধ'রে একটানা চলে এর অভিনয়। তবে রামলীলায় পরিবেশিত কাহিনীর আধার হ'লো বাল্মীকি ও তুলসীদাসের রামায়ণ এবং রামচরিতমানস। আর রমখেলিয়ার অবলম্বন হ'লো কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বেশ কয়েকশো বছর আগে বাংলা ও অসম থেকে এসে রাজবংশী, গণগাই তজপুরিয়া প্রভৃতি জাতির লোক এখানে বসবাস শুরু করে। এদের বোলচালের ভাষা কিন্তু নেপালী বা মৈথিলী নয়, পরিবর্তিত এক বাংলা। রমখেলিয়ারও ভাষা রাজবংশী এবং তজপুরিয়া, ফলে বাংলারই নিকট আত্মীয়। তবে ঝাপা-মোরঙ্গ-এর থারু এবং আহিরদের মধ্যে প্রচলিত যে রমখেলিয়া তার ভাষা আবার মৈথিলী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বাংলা ও মৈথিলী সমগোত্রীয়। সে যাইহোক, থারু এবং আহিররা রমখেলিয়ার আমদানি ক'রেছে রাজবংশীদের কাছ থেকে। ফলস্বরূপে মৈথিলী রমখেলিয়ায়ও রাজবংশীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাষাগত ভিন্নতা ব্যতিরেকে রাজবংশী ও মৈথিলী রমখেলিয়ার মধ্যে অন্য কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। এ দু'য়ের বিষয়বস্তু, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং অভিনয়ের

সমস্ত উপকরণই এক। অতএব রমখেলিয়া যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ অবলম্বন ক'রেই প্রচার প্রসার লাভ ক'রেছে—এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য থাকতে পারে না এবং নেইও।

রামের বনবাস থেকে রাবণ-বধ অবধি রামায়ণের সমস্ত কাহিনীই রমখেলিয়ায় পরিবেশিত হয়। রমখেলিয়ার একটি অনুষ্ঠানে রামায়ণের এক একটি কাহিনী পরিবেশিত হয়। অভিনীত এই অংশটিকে বলা হয় পালা, যেমন—রামের বনবাস, সীতাহরণ, সেতুবন্ধন, রাবণ বধ প্রভৃতি। রামকাহিনীই ক্রমানুসারে পরিবেশিত হয় ব'লে এই লোকনাট্যের নাম হ'য়েছে রমখেলিয়া।

আকাশের নীচে বিস্তৃত এক উন্মুক্ত ক্ষেত্রে চতুর্দিক খোলা এক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় রমখেলিয়া। রমখেলিয়া পরিবেশনের জন্য বেশ বড় একটি রঙ্গভূমির প্রয়োজন হয়। কেননা রাবণ পরে ৪ ফুট বিস্তৃত একটি কাঠের মুখোশ। তাছাড়া বিরাটকায় এক রথে চড়ে সে মঞ্চে আসে এবং সীতাকে অপহরণ ক'রে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে সেই রথেই আবার লঙ্কায় ফিরে যায়। আর সীতা তখন—"আমার হরিয়া জাছে পাপিষ্ঠ বারণ" ব'লে বিলাপ ক'রতে থাকে। রমখেলিয়ায় অনুরূপ সব আকর্ষণীয় দৃশ্যের ছড়াছড়ি। সে যাইহোক, রমখেলিয়ায় রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা ব্যতিরেকে সমস্ত চরিত্রই মুখোশ পরে। কাঠমাণ্ডুর, দেবীনাচ, মহাকালী নাচ এবং হ্যাপু নাচ বা নাটের মত রমখেলিয়ার মুখোশেরও প্রাচীনত্ব এবং সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য বেশ স্পষ্ট। কেননা প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেবদেবী তথা অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ঐকান্তিক কামনায়ই মানুষ মুখোশ পরত।

রমখেলিয়ায় অভিনয় আরম্ভের পূর্বে দশদিকের দেবতা কিংবা দিকপালদের বন্দনা করা হয়। তারপর মূল গায়েন সংক্ষেপে পালার পরিচয় দিয়ে শঙ্খ বাজায়। প্রবেশ করে অভিনেতারা। আরম্ভ হয় অভিনয়। মূল গায়েনই হ'লো রমখেলিয়ার সূত্রধার। আমরা জানি যে সূত্রধারই ভারতীয় লোকনাট্যের প্রাণস্বরূপ। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর রাশ টেনে ধ'রে সূত্রাধার কখনো কখনো অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হ'য়ে থাকে। রমখেলিয়ার মূলগায়েনও সারাক্ষণ মঞ্চে উপস্থিত থেকে অভিনেতা ও অভিনেয় কাহিনী নিয়ন্ত্রিত করে। করুণ দৃশ্যের শেষে, তা সে নাটকের মধ্যে বা একেবারে শেষে যেখানেই হোক না কেন, আরতি করা রমখেলিয়ার এক অনিবার্য বিধি।

অভিনেতারা রঙ্গস্থল থেকে দূরবর্তী বাসঘরে তাদের সাজ-সজ্জা করে। এই বাসঘরই হ'লো রমখেলিয়ার সাজঘর বা গ্রীনরুম। সাজ-সজ্জা হ'য়ে গেলে মূল গায়েনের নির্দেশে অভিনেতারা নিজ নিজ কণ্ঠে গীতিধর্মী সংলাপ পরিবেশন করে। সংলাপে গীতেরই প্রাধান্য। এই কারণে রমখেলিয়াকে গীতিনাট্যও

বলা যেতে পারে। যাইহোক, রমখেলিয়ার সংলাপ যেমন সরল, তেমনি আকর্ষনীয়ও বটে।

লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, থারুদের থেকে রাজবংশীদের রমখেলিয়া অনেক বেশি সমৃদ্ধ। পুরাণ-মহাকাব্য যেমন এদের কাব্যের মুখ্য অবলম্বন তেমনি আবার সামাজিক ঘটনাবলী আশ্রয় ক'রেও রমখেলিয়া পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো কঙ্কনমারী, উজিয়লমারী এবং মূলমারী। যাইহোক, রাজবংশীতে এগুলিকে সাধারণভাবে ভুলকি নাচ বলা হ'য়ে থাকে। এইসব ভুলকি নাচে সামাজিক দুরাচারকে নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হ'য়ে থাকে। অবশ্য ভুলকি নাচের প্রচলন ধীরে ধীরে কমে আসছে। কাহিনী হিসেবে কালীবিলাস বা তিলোত্তমা এখনো বেশ জনপ্রিয়। এসব থেকে বোঝা যায় যে রাজবংশীদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক লোকনাট্যের খুবই সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যশালী এক ধারা দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত রয়েছে। যাই হোক রমখেলিয়ায় নাচ, গান এবং অভিনয়ের ভূমিকা এবং গুরুত্ব প্রায় সমান। বিশাল উন্মুক্ত মঞ্চে বড় বড় মঞ্চ ও হস্ত উপকরণ, জমকালো জমকালো সব পোষাক এবং অঙ্গসজ্জার সাহায্যে রাজবংশীরা সেই মধ্য যুগ থেকেই নেপালের সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন ক'রে আসছে।

তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের লোকনাট্য



তামিলনাড়ুর লোকনাট্য □ তেরুকুত্তু

ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ লোকনাট্যকে সুনজরে দেখেন না। তামিলনাড়ুও এর ব্যতিক্রম নয়। শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যেমন এখানে সমাদৃত, তেমনি অবহেলিত এখানকার লোকনাট্য। শাস্ত্রীয় নৃত্য ও সঙ্গীতকে মাথায় রেখে এঁরা লোকনাট্যকে পায়ে ঠেলেছেন। ফলে তেরুকুত্তুর মত দীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন ও শক্তিশালী এক লোকনাট্য আজ বিলুপ্তির পথে। তবুও সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষণায় মাদ্রাজের বস্তী এলাকায় এখনো প্রায় ৫০টির মত তেরুকুত্তুর দল টিকে আছে এবং শহরের বস্তী এলাকায় এবং গ্রামদেশে এরা বেশ নিয়মিত ভাবেই তেরুকুত্তুর অভিনয় ক'রে বেড়ায়। তেরুকুত্তুর অভিনেতাকে বলা হয় কুত্তাড়ী। এদের বেশির ভাগই থাকে তিরুপ্পাম্বরা গ্রামে এবং খাস জমিতেই এদের বসবাস। অর্থাৎ এদের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। যাইহোক, সুধী নাগরিকেরা কিন্তু এদের কোনো খবরই রাখে না। অথচ তেরুকুত্তুর ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের এবং এর ইতিহাসও কয়েক শতাব্দীর।

যাইহোক, তেরুকুত্তু শব্দটি ভাঙলে আমরা পাই তেরু এবং কুত্তু।

তেরু হ'লো পথ আর কুত্তু হ'লো নাটক। অর্থাৎ তেরুকুত্তু বললে বোঝায় পথনাটিকা। চৌরাস্তার মোড়ে রাস্তার সমতলেই ১৪ ফুট বাহু বিশিষ্ট এক বর্গাকার ক্ষেত্রে এর অভিনয় হয়। দর্শক বসে অভিনয় ক্ষেত্রের তিনদিক ঘিরে। আর চতুর্থ দিকে রাখা হয় অপেক্ষাকৃত উঁচু কাঠের একটি পাটাতন বা বেঞ্চ। এটি রাখা হয় পিনপট্টুর জন্য। পিনপট্টু হ'লো নেপথ্য সঙ্গীত। স্বভাবতঃই সংস্কৃত বিকৃষ্ট মঞ্চের কুতপ-সংস্থানের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানেও কুতপের অবস্থান রঙ্গশীর্ষ এবং নেপথ্যগৃহের মাঝে অর্থাৎ অভিনয় ক্ষেত্রের পেছন দিকে। যাইহোক, চারটি খুঁটির সাহায্যে ১৫ ফুট × ১৭ফুট একটি সামিয়ানা টাঙিয়ে তেরুকুত্তুর এই অভিনয় ক্ষেত্রটি নির্দিষ্ট করা হয়। মঞ্চের যেদিকে পিনপট্টু থাকে সেই দিকেই পিনপট্টুর পশ্চাতে খুবই সাধারণ ভাবে একটি সাজঘর ক'রে নেয়া হয়। বাঁতির স্বল্পালোকে অভিনেতারা নিজেরাই নিজেদের অঙ্গরাগ অঙ্গসজ্জা ক'রে নেয়। উপরে অভিনয় ক্ষেত্রের যে পরিমাপ উল্লেখ করা হ'য়েছে, তা কিন্তু অপরিবর্তিত নয়। কেননা কোথাও কোথাও ২০ × ৩০ বর্গফুট আয়তনের আয়তাকার রঙ্গক্ষেত্রও দেখা যায়। তাছাড়া আগেই বলা হ'য়েছে যে মঞ্চের তিনদিক ঘিরেই বসে দর্শক এবং সাধারণভাবে দর্শকের কোনো শ্রেণী-বিভাগ নেই। তবে কোথাও কোথাও গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তিদের বসার জন্যে পিনপট্টুর বিপরীত দিকে রঙ্গক্ষেত্রের গা ঘেসে ৫০ × ৫০ বর্গফুট অঞ্চলে ধব্ধবে সাদা কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়। বলাই বাহুল্য যে প্রথানুসারে গ্রামের ধোপারাই সাধারণতঃ সামিয়ানা, অভিনয়ে প্রযুক্ত পর্দা এবং সম্মানীয়দের বসার জন্য বিছিয়ে দেয়া এই কাপড়ের জোগান দিয়ে থাকে।

গায়ক এবং কুরুকুঞ্জল (নাগেশ্বরমের অনুরূপ এক বায়ুযন্ত্র), থুত্তি (ব্যাগপাইপ) মদ্দলম্ (ড্রাম), তালম (করতাল) প্রভৃতি যন্ত্রের বাদকদের নিয়েই পিনপট্টু। তেরুকুত্তুর প্রধান গায়ককে বলা হয় ভাগবতার। যাইহোক, বর্তমানে সুর ধ'রে রাখবার জন্য হারমোনিয়ামের ব্যবহার খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগে অবশ্য এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'ত একধরণের ব্যাগপাইপ (বা থুত্তি)। তেরুকুত্তুর গায়কদের গলা সবসময়ের জন্যেই সপ্তমে বাঁধা থাকে। আগেকার দিনে গায়কদের এই তীক্ষ্ণগলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করতাল নির্বাচিত হ'ত। করতাল তখন একই সঙ্গে গানের সুর ও লয়ের সঙ্গত করত।

বর্তমানে তেরুকুত্তুর অভিনয় শুরু হয় গণেশ-আরতি দিয়ে। তীক্ষ্ণস্বরে সমবেত গায়ক মণ্ডলী গণেশের আবাহন সঙ্গীত আরম্ভ করলে পেটমোটা এক অভিনেতা হাতীর শুঁড়ওয়ালা মুখোশ প'রে মঞ্চে আসেন। ইনিই তেরুকুত্তুর গণেশ। মঞ্চে এসে গণেশ বাবাজী গায়কদের গানের তালে তালে নাচতে থাকেন। নাচ শেষ হ'লে মঞ্চের পেছন দিকে রাখা বেঞ্চে ব'সে পড়েন। তখন পুরোহিত তাঁর আরতি করেন। গায়ক মণ্ডলী এই সময় একে একে

শিব, মীনাক্ষী, দক্ষিণীমূর্তি ও সরস্বতীর বন্দনা গায়। আর সব শেষে গাওয়া হয় ত্রিমূর্তির, অর্থাৎ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বন্দনা। খুবই সংক্ষিপ্ত এই পূর্বরঙ্গ-বিধির পর দু'জন লোক একটি পর্দা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব লোকনাট্যেই চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থান সংঘটিত হয় অনুরূপ ছোটো ছোটো পর্দার সাহায্যেই। যাইহোক, লোক দুটি এসে পর্দা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার পরপরই পর্দার পেছন দিক থেকে গান গেয়ে মঞ্চে আসে কট্টিয়াকরণ-অর্থাৎ-মঞ্চাধ্যক্ষ বা সূত্রধার। কট্টিয়াকরণের পরনে থাকে জেব্রা ডিজাইনের পাজামা, গায়ে থাকে বেশ বড় ঘেরের এবং নীচের দিকটা ফোলানো একটি ফুলহাতা জামা আর জামার ওপরে সিল্কের কোমরবন্ধের সঙ্গে একখানি তরবারি বাঁধা থাকে। তরবারি খানি সাধারণতঃ কাঠেরই হয়, অনেক সময় সে এটি হাতেই ধরে রাখে। যাইহোক, তার হাতে থাকে কব্জিবন্ধ, গলায় নানাবিধ হার আর মাথায় শোভা পায় রাজকীয় মুকুট। মঞ্চে এসে প্রথমে সে প্রথম পুরুষ, অর্থাৎ third person-এ নিজের পরিচয় দেয়, পরে নাটকের নাম ঘোষণা করে, বিভিন্ন দৃশ্যকে একসূত্রে বাঁধে এবং নাট্য ঘটনার উপর নিজের মন্তব্য পেশ ক'রে দর্শককে রসমগ্ন রাখে। নাটকের নাম ঘোষণা ক'রে গায়ক ও বাদকদের তৈরী হ'তে ব'লে নায়কের প্রশস্তি গীতি গাইতে শুরু করে। বলাই বাহুল্য যে গান শেষ হ'লেই নায়ক মঞ্চে আসে, পর্দারই সাহায্যে। নায়কও মঞ্চে এসে প্রথমে Third person-এ নিজের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। তারপর আপন ব্যক্তিত্ব, প্রতাপ, এমন কি পোষাক ইত্যাদিরও বর্ণনা দিয়ে কট্টিয়াকরণকেই নিজের কর্মচারী হিসেবে নানাবিধ আদেশ দেয়।—কুট্টিয়াকরণও তার আদেশ মত হাঁক ডাক শুরু ক'রে দেয়। তখন একে একে মঞ্চে আসে নাটকের অন্যান্য চরিত্র। কাহিনী এগিয়ে চলে। তেরুকুত্তুর ভাঁড় বা বিদূষককে বলা হয় কোমালী। কোমালীর মঞ্চ প্রবেশ খুবই চমকপ্রদ। সে কখনো পার্শ্ববর্তী ঘরের চাল বা গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে, কখনো বা খড়ের গাদা থেকে ডিগবাজি খেয়েও নেমে আসতে পারে। আবার কখনো বা চড়-চাপড় কিংবা কাপড়ের চাবুক দিয়ে দর্শকদের মারতে মারতে তাদের মাথার উপর দিয়ে লাফ দিতে দিতে মুখ থুবড়ি খেয়ে এসে পৌঁছায় মঞ্চে বা রঙ্গক্ষেত্রে। মঞ্চে এসে সে গান গেয়েই আত্ম-পরিচয় দেয় এবং সরল গদ্যে সূক্ষ্মতম সব কৌতুক পরিবেশন করে, ভাওয়াই-এর জুঠন মিঞার অনুরূপে। তবে নাট্য ঘটনায় ও তার পরিবেশনে কোমালীর গুরুত্ব জুঠনের চাইতে অনেক বেশি। কেননা সে অনেক সময় কট্টিয়াকরণের ভূমিকাও পালন ক'রে থাকে। কিন্তু তার বাচালতায় নাট্য ঘটনা ভিন্ন দিকে মোড় নিতে শুরু ক'রলে কট্টিয়াকরণ আবার স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে নাট্য ঘটনাকে সংহত এবং সূত্রবদ্ধ করে। কোমালী তখন জটিল জটিল সব প্রশ্ন,

নানাবিধ ধাঁধা, বিভিন্ন সব সমস্যা এবং সহজ সংস্কারচ্ছলে কট্টিয়াকরণকে একেবারে পর্যুদস্ত ক'রে দেয় এবং অবস্থাটি বেসামাল হ'য়ে উঠলে নিজেই রণে ভঙ্গ দেয়। নাটকের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য স্পষ্টীকরণে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম।

দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত নৃত্য এবং নাট্যে দু'জন পর্দা বাহকের হাতে ধরা ছোটো ছোটো পর্দার গুরুত্বও খুবই বেশি। কেননা, যক্ষগান, কুচিপুড়ি, কথাকলি, ভাগবত মেলা, কুটিয়াট্টম এবং মুডিয়েট্টুর প্রধান প্রধান চরিত্রের রহস্যময় এবং নাটকীয় সব মঞ্চাবতরণ ঘটে এই পর্দারই সাহায্যে। ঐ সব আঙ্গিকে অভিনেতারা মঞ্চোপকরণ হিসেবে এই জাতীয় পর্দার যথেচ্ছ ব্যবহার ক'রে থাকে। অভিনেতারা কখনো এর উপর দিয়ে উঁকি মারে কিংবা প্রয়োজনীয় ও প্রচলিত সব মুখভঙ্গি করে, কখনো পর্দাটাকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে তার মনোভাব প্রকাশ করে আবার কখনো বা এর পেছন থেকেই নাচতে নাচতে মঞ্চে প্রবেশ ক'রে আপন চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ক'রে দেয়। ক্রুদ্ধ রাক্ষস কিংবা কোনো ক্ষমতালোভী শয়তান যখন এই পর্দার পেছন থেকেই আড়চোখে চেয়ে গর্জন ক'রে ওঠে তখন দর্শক ভয়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে যায়। অন্যান্য আঙ্গিকে সিল্কের নকশাদার পর্দার ব্যবহার হ'লেও তেরুকুত্তুতে সাদা কাপড়ের লম্বা একখানি পর্দা ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। তবে সবক্ষেত্রেই পর্দার বিস্তার এমন হয় যাতে ক'রে অভিনেতার হাঁটু থেকে চিবুক অবধি ঢাকা পড়ে এবং পা ও মুখ দেখা যায়। অন্যান্য আঙ্গিকের মত তেরুকুত্তুর অভিনেতা এই পর্দার আড়াল থেকেই নাচে, গায় এবং মঞ্চাবতারণের মাধ্যমে আপন গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। আমরা আগেই দেখেছি যে তেরুকুত্তুর চরিত্র—কট্টিয়াকরণ, কোমালী, নায়ক এবং অন্যরাও মঞ্চে এসে প্রথমে আত্মপরিচয় দেয়। তবে প্রচলিত রীতি অনুসারে First person-এ সে আত্মপরিচয় দেয় না, দেয় third person-এ। third person-এ এই পরিচয় দান যেমন কিছুটা মাত্রায় বিমূর্ততার আভাস সৃষ্টি করে তেমনি অভিনেয় চরিত্র থেকে অভিনেতা ও দর্শককে বিযুক্ত ক'রে দেয়। বিযুক্ত ক'রে দেয় আবার সাময়িকভাবে, এবং তখন দর্শকের মনে হয় অন্য কেউ এসে যেন চরিত্রটির পরিচয় দিচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঈপ্সিত বিযুক্তি আনার জন্য এপিক নাটকে ও তার অভিনয়ে এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। আত্মপরিচয় দানের সময় যে গান গাওয়া হয় তার কথা ও সুর চরিত্রের মেজাজানুরূপই হ'য়ে থাকে। চরিত্রের নিজের দ্বারা আত্ম পরিচয় দানের এই রীতি প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। ঐতিহ্য-বাহী পিকিং অপেরাতেও চরিত্র নিজেই নিজের পরিচয় দেয়, দেয় আবার third person-এ। তবে সে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে First person-এ। জাপানের কাবুকিতেও তাই। তবে তেরুকুত্তুর বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে চরিত্র

তার নিজের পরিচয় দেয় third person-এ এবং অন্যদের সঙ্গে কথা বলে First person-এ। তবে কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে আবার third person-এ ফিরে আসে। অর্থাৎ এখানে চরিত্র নিজেই নিজের সমালোচক। তেরু-কুত্তুর প্রতিটি চরিত্র তাই খুব সহজেই দু'টি মাত্রা লাভ করে। দ্বিমুখী পথেই বিকাশ ঘটে তার সত্তার।

তেরুকুত্তুর প্রতিটি চরিত্রই প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এর অভিনয় ক'রতে গেলে অভিনেতাকে তাই শারীরিক দিক থেকেও শক্তিশালী হ'তে হয়। কোনো নারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর এই কারণে তেরুকুত্তুর অভিনয়ে পুরুষই নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকে। একটি চরিত্র মেজাজের দিক থেকে কতটা শান্ত, কতটা হিংস্র বা ক্রুদ্ধ তা তার আগমনের বিশেষ ভঙ্গীটিতেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। আর তার সামাজিক মর্যাদা বা গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যায় কট্টিয়াকরণের সঙ্গে তার ব্যবহারের ধরণ থেকে। গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ অধিকতর স্পষ্ট এবং গতিময় ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে কট্টিয়াকরণ তার সংলাপের প্রধান প্রধান অংশের পুনরাবৃত্তি করে। এ ব্যাপারে অবশ্য কোমালীও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। কেননা, হাস্যরসের জোগান দিয়ে হলেও সে চরিত্রকে তার গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পুনরায় উচ্চারণ ক'রতে বাধ্য করে। তেরুকুত্তু স্বভাবে অপেরাধর্মী। তবে এর ৬০ শতাংশ গদ্য সংলাপ তাও আবার তাৎক্ষণিকভাবে বানিয়ে নেয়া। কোমালী ও কট্টিয়াকরণের প্রশ্নেই এই জাতীয় গদ্যের ব্যবহার হ'য়ে থাকে। তেরুকুত্তুর বেশ কিছু সংখ্যক গান শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুরূপ—কিছু অংশ তালহীন আবার কিছু অংশ তাললয়ে সমন্বিত। তবে প্রতিটি গানের আগে ভাগবতার বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে সুর ভেঁজে নেয়। একে বলা হয় বিরুথাম।

তেরুকুত্তুর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় মহাকাব্য, পুরাণ এবং লোককাহিনী থেকে। তবে মহাভারতের কাহিনী-নির্ভর পালাই অধিক জনপ্রিয়। ক্ষিপ্ত দুর্যোধন, কুচক্রী এবং পাপী দুর্যোধন, মহান ধর্ম, গর্বী কীচক এবং বীর ভীম ব্যতিরেকে তেরুকুত্তুর অভিনয় যেন জমতেই চায় না। পঞ্চপাণ্ডবের ঘরনী দ্রৌপদী তেরুকুত্তুর অতি জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী নায়িকা। দ্রৌপদী মাদ্রাজে দেবীরূপেই সমাদৃতা। পঞ্চস্বামীর এই ঘরনীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাঁরই জীবন-বৃত্তান্ত নির্ভর আট-খানি পালা তাঁরই মন্দিরের সম্মুখে অভিনীত হ'য়ে থাকে। পরপর আট রাত্রিরে প্রতিহিংসা ও হিংস্রতায় ভরা এই পালা কয়খানি অভিনীত হয়। নবম দিনে ভীম দুর্যোধনের ঊরু ভেঙে তবে নিজের ক্রোধ শান্ত করেন এবং দ্রৌপদী তখন নিজের প্রতিজ্ঞামত দুর্যোধনের রক্তে ভিজিয়ে তাঁর চুল বাঁধেন। এক বাস্তবকল্প পরিবেশে এই শেষ পালাখানির অভিনয় হয়। যুদ্ধসাজে সজ্জিত বিশালকায় এক মাটির দুর্যোধন নির্মাণ করা হয় মন্দি

প্রাঙ্গণে। প্রথা অনুসারে ভীম তাঁর ভীমকায় গদার আঘাতে সেই দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করেন, ছিটকে বেরোয় কৃত্রিম রক্ত। মহোল্লাসে গর্জন করতে করতে ভীম তখন মন্দির প্রাঙ্গণ পরিক্রমন ক'রতে থাকেন। এই সময়ে তাঁকে মূর্তিমান প্রতিহিংসা ব'লেই মনে হয়। আর উপস্থিত দর্শক এই সময়ে দুর্যোধনের ওপর নৃত্য করতে থাকে। তাদের ক্রোধে মাটির সঙ্গে মিশে যায় মাটির এই দুর্যোধন। সবশেষে দ্রৌপদীর পূজা করা হয়। পূজা শেষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। বাল্লিকালায়ানাম বা বাল্লিদেবীর বিয়ে এবং মীনাক্ষী আম্মাই পালা তেরুকুত্তুর অন্য দুই জনপ্রিয় পালা।

দুর্যোধন, ধর্ম, ভীম, হিরণ্যকশিপু প্রমুখ পৌরাণিক যুগের নায়কেরা মাথায় পরে রঙ বেরঙের কাচের বুটি বসানো মুকুট। এই মুকুটগুলি খুবই হালকা কাঠ পুন্না থেকে তৈরী হয়। লাল, সবুজ ও সোনালী রঙে রঞ্জিত গম্বুজাকৃতির একটি চূড়া মধ্যভাগে অবস্থিত থেকে খিলানাকৃতির এই মুকুট গুলির শোভা ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে। বিরাট আকৃতির স্কন্ধসজ্জা দূর থেকে ডানা কাটা পাখীর ভ্রম উৎপাদন করে। চড়া শেড্ দেয়া চোখের নীচে আঁকা হয় লাল ও কালো রঙের অর্ধচন্দ্র। আর কপালে যেমন তেমন ক'রে এঁকে দেয়া হয় রূপালী একটি চিক। আর বক্ষাবরণ, বাজুবন্ধ, কোমরবন্ধ প্রভৃতি অলঙ্কারেও চোখ ঝলসানো রঙ বেরঙের বুটি বসানো থাকে।

সাদা ও কালোর ওপর লাল ফুটকি দিয়ে খল চরিত্রের মুখ রঞ্জিত করা হয়। ভীমের অঙ্গলেপন করা হয় কালো এবং লাল রঙ দিয়ে, আর কৃষ্ণের রঙ সবুজ। গণেশ ও নরসিংহ যথাক্রমে হাতী ও সিংহের মুখোশ পরে। তেরুকুত্তুর অভিনেতাদের প্রত্যেককেই কোনো না কোনোভাবে নাচতে হয়, তাই তাদের পায়ে বাঁধা থাকে ঘুঙুর। খুবই উজ্জ্বল এবং কালো গোঁফ দাড়িওয়ালা দুঃশাসনের কপালে তিনটি রেখা আঁকা হয়। মুখের অন্যত্র দেয়া হয় লাল ও সাদা ফুটকি। দুঃশাসন মাথায় পরে গোলাকার সোনালী টুপি, লাল ও সবুজ রঙের কারুকার্য করা থাকে তাতে। পরনে থাকে পায়ের সঙ্গে সাঁটানো জেব্রা ডিজাইনের পাজামা. আর গায়ে থাকে ফুল হাতা জামা, নীচের দিকটা যার ঘাঘরার মত ফোলানো। দেড় ফুট দীর্ঘ সাজারুর কাঁটার মত চারদিকে ছড়িয়ে থাকা এক ধরনের কোমরবন্ধের সাহায্যেই জামার নিম্নভাগ এমনভাবে ফোলানো হ'য়ে থাকে। যাইহোক, অন্যান্য চরিত্রের মত দুঃশাসনেরও পায়ে থাকে ঘুঙুর এবং হাতে থাকে কাঠের একখানি তরবারি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তেরুকুত্তুর কোনো চরিত্রের পায়েই জুতো থাকে না।

পুরোহিতের কানে ঝোলানো হয় বড় বড় কুণ্ডল, কপালে আঁকা থাকে চন্দনের সমান্তরাল তিনটি রেখা। তার গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা এবং যজ্ঞোপবীত আর পরনে থাকে সিল্কের ধুতি। ডান হাতের একটি আঙুলে থাকে

পেতলের পবিত্র একটি আঙটি আর বামহাতে কমণ্ডলু। কোমালীর মাথায় থাকে শঙ্কু আকৃতির টুপি, পরনে ফোলানো পাজামা, অবশ্য কখনো কখনো ধুতি ও ঐভাবে প'রে নেয়া হয়। তার পেটটা হয় নাদাপনা আর সরু এক ধরনের সুতো দিয়ে তৈরী হয় হাওয়ায় ওড়া তার দাড়ি। কোমালীর ভ্রূ কিন্তু বেশ ঘন। তার মুখে লাগানো হয় লাল কালো অজস্র ফুটকি আর কপালে দেয়া হয় U-এর অনুরূপ একটি চিহ্ন।

দর্শক কি চায় কোমালী তা ভালোভাবেই জানে। সহজ সরল রসিকতার দ্বারা অতি সহজেই সে দর্শকের খুবই কাছের মানুষ, আত্মার আত্মীয় হ'য়ে উঠতে পারে। তেরুকুত্তুতে কোমালীর জনপ্রিয়তা তাই অপরিসীম। পৌরাণিক নাটকে সে ধর্মীয় বিশ্বাসের গুঁড়ি ধ'রে ঝাঁকিয়ে দর্শককে এনে দাঁড় করায় একেবারে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি। এসব ক্ষেত্রে সে ব'লে চলে—"আমি শিবের কাছে একটি বর চাই। কেননা আমার স্ত্রী তেরোমাস ধ'রে গর্ভিনী। বাড়িতে জল আনার মত কেউ নেই। ফলে, হে বরদ্ শিব! দয়া কর। শীঘ্র এসে তাকে সাহায্য কর"। তেরুকুত্তুর একটি আসরে দর্শক-অভিনেতা সকলের কাছেই সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় চরিত্র হ'লো যোগী এবং ঋষিরাই। কিন্তু কোমালীর অধিকার আছে তাদের সঙ্গে মস্করা করার। সে মুক্ত পুরুষ। তাই সমস্ত প্রকারের বাধা নিষেধের বাইরের মানুষ সে। তেরুকুত্তুর আসরে জীবন ও মৃত্যু নিয়ে সে সমান আনন্দে মস্করা ক'রে চলে।

তেরুকুত্তুর সূত্রধার কট্টিয়াকরণ সারাক্ষণই মঞ্চে উপস্থিত থাকে। নাটকে সংগঠিত নিপীড়ন ও হিংস্রতার মধ্যস্থতা করে সে। কট্টিয়াকরণ যেমন গান গায়, তেমনি আবার শুদ্ধ তামিল এবং আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে তৈরী সুন্দর এক গদ্যেও কথা বলে। অভিনয়ে যাতে কোনরূপ ছন্দপতন না ঘটে তার জন্য সে সদা সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকে। আর বলাই বাহুল্য যে, কোমালী জোগান দেয় হাস্যরসের। অতুলনীয় তার অভিনয় নৈপুণ্য। কট্টিয়াকরণের কাজটাকে সে সহজ ক'রে দেয়। পরিশ্রান্ত কট্টিয়াকরণকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে কখনো কখনো সে নিজেই কট্টিয়াকরণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তবে কট্টিয়াকরণের তুলনায় তার সংলাপ একই সঙ্গে অমার্জিত, সাদাসিধে এবং গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। বিবিধ সব প্রশ্ন ক'রে প্রত্যেক চরিত্রকে এমনকি কখনো কখনো কট্টিয়াকরণকেও সে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। তাদের সে বাধ্য করে গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ পুনরায় উচ্চারণ ক'রতে। গুরুত্বপূর্ণ সংলাপের এই দ্বিরুক্তির ফলে অসাবধানী অন্যমনস্ক এমনকি প্রায় বধির-বয়স্ক তেরুকুত্তুর দর্শকের কাছে তা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সংলাপের এই পুনরুক্তি সুধী দর্শকের কাছে অনেক সময় বিরক্তিকর মনে হ'তে পারে কিন্তু বক্তব্যের স্পষ্টীকরণে এই পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। উদাহরণ স্বরূপে ভীম-জটাসুর যুদ্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত হ'লো,—

এক জায়গায় এক সাধু খুবই চিন্তিত, ফলে গান গেয়ে কোরাস তাঁকে জিজ্ঞাসা করে—

"হে মহান যোগী আপনি এত উদ্বিগ্ন কেন ?

কট্টিয়াকরণ—আপনি কি জানেন, ওরা কি জিজ্ঞাসা ক'রছে ?

সাধু—কি ?

কোমালী—জিজ্ঞাসা ক'রছে আপনি এত উদ্বিগ্ন কেন ?

সাধু—কারণ—

কোমালী—ব'লে দিন, আপনি উদ্বিগ্ন।

উপরের অংশটিতে সাধুর উদ্বেগের ব্যাপারটি তিনবার উচ্চারিত হ'য়েছে, এতে ক'রে বিষয়টির নাটকীয় গুরুত্ব যে অনেক বেড়ে যায়, এব্যাপারে কোনোই সন্দেহ থাকে না। এইভাবে পুনরুক্তিসাধন তেরুকুত্তুর পরিবেশন পদ্ধতিরই নিজস্ব এক চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য। ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ভাগবতার গান শেষ ক'রলে অভিনেতা তা পুণরায় গায়। অনেক সময় আবার এতেও হয় না, ফলে অভিনেতা এগিয়ে গিয়ে কট্টিয়াকরণের কাছে সরল গদ্যে তা আবার বিবৃত করে।

আগেই বলা হ'য়েছে যে মাদ্রাজের বস্তী এলাকায় কম ক'রে হ'লেও ৫০টি তেরুকুত্তুর দল এখনো আছে, কিন্তু শহরের বিদগ্ধ মহলে এদের পরিচিতি খুবই কম, একেবারে নেই বললেও চলে। কোনো বাড়ির উঠোনে, চৌরাস্তায় অথবা কোনো ফাঁকা জায়গায় অল্প কয়েকজন দর্শকের সামনে তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে তেরুকুত্তুর অভিনয় হয়। দল চালাবার জন্যে প্রত্যেক অভিনেতাকেই কিছু না কিছু চাঁদা দিতে হয়। তবে নায়ক-নায়িকাকে দিতে হয় তুলনামূলকভাবে অন্যদের চাইতে বেশী। এইভাবে সংগৃহীত চাঁদা নতুন একটি পালার প্রযোজনায় খরচ করা হয়। আর কট্টিয়াকরণ—যে কয়েকমাস ধ'রে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে সকলকে শিখিয়ে পড়িয়ে পালাটি অভিনয়োপযোগী ক'রে তোলেন, পারিশ্রমিক হিসেবে তাঁকেও কিছু দিতে হয়।

কৃষক, জেলে এবং কুলি-মজুরদের নিয়ে তেরুকুত্তুর একটি দল তৈরী হয়। একটি দলে ১৫ থেকে ২০ জন শিল্পী থাকে। নিজেরা আনন্দ পেতেই সাধারণতঃ এরা দল গড়ে এবং অভিনয় করে, অর্থাৎ এরা তেরুকুত্তুর চর্চা করে মূলতঃ শৌখিন ভাবে। ফলে আজও মাত্র ১০০ থেকে ৩০০ টাকার বিনিময়েই তেরুকুত্তুর একটি ভালো প্রযোজনা দেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। প্রাপ্ত টাকার সবটাই চ'লে যায় আলো, পোষাক, মেকআপ এবং গুরুপ্রণামী দিতে। ফলে দলের আর কিছুই থাকে না। এ থেকে বোঝা যায় যে তেরুকুত্তুর বর্তমান ব্যবস্থা অতি খারাপ।

তেরুকুত্তুর নাম করা দলগুলির সবই গ'ড়ে উঠেছে দক্ষিণে, অর্থাৎ কেরালের সংলগ্ন জিলাগুলিতে। ফলে কথাকলির প্রভাব এই আঙ্গিকে খুবই বেশি। উত্তর

আরকোট জিলার পুরুবাই গ্রামের রাঘব তাম্বিরাণের দলটি খুবই বিখ্যাত। দলটির বর্তমান পরিচালক রাজু তাম্বিরাণ এবং নটেশ তাম্বিরাণ। নটেশ তাম্বিরাণ দুঃশাসনের অভিনয়ে খুবই খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। ফলে মাদ্রাজ তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকটি পুরস্কার তিনি লাভ ক'রেছেন। বর্তমানে তাই দলটি নটেশ তাম্বিরাণের দল ব'লেই পরিচিত। এই নটেশ তাম্বিরাণের দল ছাড়া অন্য কোনো দলে তেমন কোনো ভালো অভিনেতা নেই। সকলেই প্রায় অনভিজ্ঞ। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য এবং লোক-নাট্যাভিনয়ের জন্য অপেক্ষিত মজ্জাগত জ্ঞান এদের নেই। তাই আজকের দিনে উপলব্ধ তেরুকুত্তুর অভিনয় দেখে তেরুকুত্তু যে কতটা চিত্তাকর্ষক তা আর আন্দাজ করা যাবে না। অথচ অপেরাধর্মী এর গানের শক্তিও অপরিসীম। আর নাটকীয় চরিত্র হিসেবে কট্টিয়াকরণের ভূমিকা তো যেকোনো বিদেশী দর্শককেও চমকে দিতে পারে।

অন্ধ্রের লোকনাট্য □ বুর্রাকথা

অন্ধ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকনাট্য হ'লো বুর্রাকথা। পশ্চিমবঙ্গের গম্ভীরার মত যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েও নিজের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য বজায় রাখার ক্ষমতাই বুর্রাকথাকে এত জনপ্রিয় ক'রে রেখেছে। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার ও সরকার বিরোধী মতের প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বুর্রাকথার এই জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে গেছে।

নাচ, গান ও অভিনয়ের সমন্বয়ে পরিবেশিত এই বুর্রাকথা ভারতবর্ষে আদর্শ লোকনাট্য আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম। বুর্রাকথার গান, বিশেষ ক'রে তার সুর এতই হৃদয়গ্রাহী যে শোনামাত্রই দর্শক-শ্রোতার মন আনন্দে একবারে নেচে ওঠে। বুর্রাকথার শিল্পীদের কোনো পূর্বাভ্যাসের প্রয়োজন নেই। কেননা কথা পরিবেশনের দক্ষতা তাদের সহজাত। ফলে পূর্বাভ্যাসহীন অভিনয়েও প্রচলিত রীতি থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা যায় না। সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা তারা খুবই আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন ক'রে থাকে। বুর্রাকথায় করুণ ও হাস্যরসেরই প্রাধান্য। তবে এর দর্শক নবরসের কোনো একটি থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় না। তবে নায়ক-নায়িকার অসহায়তা এবং মৃত্যু-জনিত শোকে দর্শক একেবারে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে।

কোনো কোনো পণ্ডিত অবশ্য মনে করেন যে বুর্রাকথায় মুখ্যরূপে দক্ষ-

গানের সম্মিলন ঘটেছে। তবে শ্রীনাথ রচিত 'ক্রীড়াভিরামম্'-এ প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বুর্রাকথা পরিবেশন ক'রতো একজন মহিলা শিল্পী। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনজন মহিলা শিল্পী দলগত ভাবে এর প্রদর্শন ক'রতে থাকে। এই মহিলা শিল্পীরা আকর্ষণীয় ভাবে সেজে গুজে 'গম্ভীতা' (ধাতু কিংবা মাটির তৈরী ঢোল) বাজাতে বাজাতে নৃত্য পরিবেশন ক'রতো। এদের হাতে থাকত মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরীয় আর পায়ে থাকতো ঘুঙুর। এদের বলা হ'ত 'জক্কুলু'। এই 'জক্কুলু' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত যক্ষ শব্দ থেকে।

বুর্রাকথার শিল্পীরা সমগ্র কাহিনী পরিবেশন করে লয়বদ্ধ সঙ্গীত এবং মুন্সিয়ানার ভাব-ভঙ্গিমার সাহায্যে। পরিবেশিত কাহিনীতে সমুচিত অন্তরাল বজায় রাখার জন্যে লয়বদ্ধ সঙ্গীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন ক'রে থাকে। এসব থেকে মনে হয় যে বর্তমানে যে বুর্রাকথার প্রচলন আছে তা প্রাচীন যক্ষগানেরই এক পরিবর্তিত রূপ বিশেষ।

সমগ্র অন্ধ্রে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে শৈবধর্ম খুবই প্রসারলাভ করে। এই সময়ে 'জঙ্গম' নামে পরিচিত লোকশিল্পীরা গানের মাধ্যমে শিবকাহিনী পরিবেশন ক'রে সমস্ত দেশে ঘুরে বেড়াতো। জঙ্গমরা পরিবেশন কোরতো ব'লে এই-সব শিব-কাহিনী জঙ্গম কাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সময়ে সাধারণতঃ একজন শিল্পীই এই জঙ্গম কাহিনী পরিবেশন ক'রে বেড়াতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পরিবেশিত কাহিনীকে আরো আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্য দু'জন বা তিনজন শিল্পীও অংশ নিতে থাকে। তারাও অবশ্য পরিবেশনের প্রচলিত রীতি পালন ক'রে চলতো। প্রথম দিকে জঙ্গম কাহিনী পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে শৈব ধর্মের ব্যাখ্যা করারও একটা চল বা প্রথা ছিলো। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ধর্মীয় গুরুদের প্রচার প্রসার খুব বেড়ে যায়। ধর্মীয় গুরুরাও এই সময়ে শৈবমতের ব্যাখা ক'রে বেড়াতেন। ফলে জঙ্গম কাহিনীতে পরিবেশিত শৈব ধর্মের ব্যাখা অংশটির জনপ্রিয়তা বেশ ক'মে যায়। কাজে কাজেই জঙ্গম শিল্পীরা অন্যান্য মতাবলম্বীদেরও আকর্ষণ করার জন্যে পরিবেশিত কাহিনীকে বিভিন্ন মতানুসারে রূপান্তরিত ক'রতে আরম্ভ করে। 'বীরতাপর্বম' 'দেবযানী' 'সিঙ্গরাজু' প্রভৃতি কাহিনী এই সময়েই তাদের প্রদর্শনীতে সংযোজিত হয়। উপরন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও এই সময় তারা প্রদর্শন ক'রতে থাকে। বিষয় বৈচিত্র্য অধিক মাত্রায় দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হয়। এই সময়ে বুর্রাকথায় সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে কাহিনী পরিবেশনের এক নতুন রীতির প্রচলন হয়।

প্রাচীন যক্ষগান এবং আজকের বুর্রাকথার মধ্যে জঙ্গম-শিল্পীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা মুগগুরু মারাখিল্যা, কম্ভোজ বজ্জু কথা, বত্তলাবজ্জু কথা,

সিরিয়ালা কথা, সব্বই পাপাভী কথা, বিরাট-দ্রোণ-পব এবং রামায়ণ প্রভৃতি অনেক ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ পালা রচনা করে। এর মধ্যে ভেগুকোণ্ডা ভেঙ্কটেশ রচিত 'বীরভাপর্বম' এবং ভেঙ্কটরঙ্গেয়া রচিত 'দ্রোন-পর্ব' সূত্রধারের ভূমিকা ও অভিনয়ের গুরুত্ব এবং সঙ্গীত-বাদ্যের প্রয়োগ সম্ভাব্যতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া দর্শক আকর্ষণের দিক থেকেও এই কাহিনী দু'টির জুড়ি মেলা ভার। ফলে প্রধানতঃ এই কাহিনী দু'টির আকর্ষণ ক্ষমতা এবং পরিবেশনে সঙ্গীত-বাদ্য ও অভিনয়ের শিল্প-সম্মত বাহুল্য বুর্রাকথাকে খুবই জনপ্রিয় ক'রে তোলে।

জঙ্গম কাহিনীগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে অন্ধ্রের গ্রামদেশে। অন্ধ্রের গ্রামদেশে বুর্রাকথার ঐ সব কাহিনী এখনো আগের মতই প্রভাবশালী র'য়েছে। সাধারণ ভাবে জঙ্গম শিল্পীরা তাদের বৌদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই সব কাহিনী পরিবেশন ক'রে বুর্রাকথার গ্রামীন জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে। বুর্রাকথার সম্পূর্ণ একটি কাহিনীর পরিবেশনে দুই তিন দিন সময় লেগে যায়। প্রদর্শনী চলা কালে দর্শকরা যা সামান্য পয়সা দেয় তাই দিয়েই জঙ্গম শিল্পীদের জীবিকা নির্বাহ হয়। আগে দলের মেয়েরা যে গ্রামে বুর্রাকথার প্রদর্শনী চলত সেই গ্রামের বাড়ি বাড়ি যেয়ে পয়সা চেয়ে নিত। কিন্তু বর্তমানে এ প্রথা প্রায় উঠে গেছে।

বর্তমানের বুর্রাকথা প্রাচীন জঙ্গম কাহিনীরই এক পরিমার্জিত সাঙ্গীতিক রূপ। বুর্রাকথার শিল্পীরা অবশ্য বুর্রাকথাকে 'দক্কী কথা' বলতে অভ্যস্ত। অন্ধ্রে মাটির তৈরী একধরণের ঢোলককে বলা হয় দক্কী। কাহিনী পরিবেশনে এই দক্কী প্রযুক্ত হয় ব'লেই একে দক্কীকথা বলা হ'য়ে থাকে। আবার লাউ-এর বসে চারটি তার দিয়ে তৈরী একধরণের তারযন্ত্রকে বলা হয় বুর্রা। আর এই বুর্রা সহযোগে পরিবেশিত হয় ব'লেই একে বলা হয় বুর্রাকথা। অনেক জায়গায় একে আবার বন্দানাকথাও বলা হ'য়ে থাকে। তবে দক্কীকথা বা বন্দানা কথা বলা হ'ত মুখ্যতঃ জঙ্গমদের দ্বারা পরিবেশিত কাহিনীকে। বুর্রাকথা এর পরবর্তী রূপ।

অন্ধ্রের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকেরাই বুর্রাকথা পরিবেশন ক'রে বেড়ায়। বুর্রাকথার শিল্পীরা যদিও পেশাদারী তবুও কেবলমাত্র বুর্রাকথা প্রদর্শন ক'রেই এদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। ফলে অন্য সময়ে তারা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত থাকে। তবে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী কেবলমাত্র বুর্রাকথা পরিবেশন ক'রেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ ক'রে থাকেন। এঁদের মধ্যে শায়ক নজর, জুনিয়র নজর, লক্ষীকান্ত মোহন এবং নিথালা বন্ধু অন্যতম।

বুর্রাকথার অন্যতম জনপ্রিয় এবং প্রতিভাবান শিল্পী শায়ক নজরের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বুর্রাকথা সঙ্গীত ও সাহিত্যের দিক থেকে তার স্থূলতা এবং

গ্রাম্যতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে কন্দারধা গীত, এবং সমুদ্র মন্থনের মত কাহিনী সংযুক্ত হ'য়ে বুর্রাকথায় আবার এক নতুন জোয়ার এসেছে। তাছাড়া এর সঙ্গীতাংশেও সংযুক্ত হ'য়েছে কীর্তন। বুর্রাকথার প্রসিদ্ধ শিল্পী ধেন্তবেকোণ্ডা ভেঙ্কয়া কর্ণাটকী সঙ্গীতের সঙ্গে মহাভারতের কাহিনী পরিবেশনেরও রীতি প্রচলন ক'রেছেন। এসব ছাড়াও বুর্রাকথার পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনে নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হ'চ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, অতীতে জঙ্গম কাহিনী থেকে শুরু ক'রে জমুকু তথা সারদাকথাও বিভিন্ন রূপে বুর্রাকথায় পরিবেশিত হ'য়েছে, এখনো হ'চ্ছে এবং আজকের বুর্রাকথা তথা জঙ্গমকথায় কর্ণাটকী সঙ্গীতের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। এই সঙ্গীত শুনে প্রথমে মনে হয় যে এতে মহারাষ্ট্রের পাওয়াড়া এবং লাবণীর প্রভাব প'ড়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়। তবে একথা ঠিক যে পাওয়াড়ার বীরগাথা দলগত ভাবে দাঁড়িয়ে বা ব'সে গাওয়ার প্রথা এই তিন আঙ্গিকেই লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ পুরুষরাই পাওয়াড়া পরিবেশন করে। এটি পরিবেশনের সময় অবিরাম একটি ধুয়ো চলতে থাকে 'দি দি' শব্দে। মহিলা শিল্পীরা কখনোই এটি পরিবেশন করে না। তাছাড়া বুর্রাকথার পরিবেশনে গানের সঙ্গে নৃত্য ও ভাবের প্রয়োগ হ'য়ে থাকে, যা পাওয়াড়াতে কখনোই প্রযুক্ত হয় না।

কর্ণাটকে লাবণীর প্রচলন ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। লোককাহিনী পরিবেশনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা থাকায় অচিরেই এর প্রচার প্রসার বেড়ে যায়। লাবণী পরিবেশন করে একজন, কখনো কখনো বা দু'জন শিল্পী। গ্রামীণ জীবন তথা সৌন্দর্য নানাভাবে বর্ণনা করা হয় এই আঙ্গিকে। তবে লাওনী বা লাবণী ও বুর্রাকথার মধ্যে একমাত্র মিল বা সাদৃশ্য হ'লো এই যে, উভয় আঙ্গিকেই শিল্পীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গায়। তবে লাবণীতে সুঠামো কাহিনীর যেমন অভাব লক্ষ্য করা যায় তেমনি এর পরিবেশনে কোনোরূপ তালবাদ্যও প্রযুক্ত হয় না। শিল্পী নিজের পায়ে তাল রেখেই গতির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বুর্রাকথা পরিবেশন করে সাধারণতঃ তিনজন শিল্পী। বুর্রাকথার পরিবেশনে হারমোনিয়াম এবং তবলার প্রয়োগ ক'রেছেন কুম্পারী মাষ্টার। আগে মাটি বা ধাতুর তৈরী ঢোল বাজানো হ'ত। আর শিল্পীরা বিশেষ এক ধরনের পোষাক প'রে পায়ে পরত ঘুঙুর। বুর্রাকথায় প্রযুক্ত বর্তমানের বেশভূষার প্রচলন ঘটান নজর সাহেব। তবে সামান্য পরিবর্তিত রূপে আগেও এর প্রচলন ছিল, ছিল যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'বীরতা-পর্ব'ম'-এ উল্লেখিত বেশভূষার পরিচয় থেকে। বীরতাপর্ব'ম অনুসারে বুর্রাকথার শিল্পীরা পায়ের গোছ অবধি ঝোলানো ধুতি, বড় ধরনের পাগড়ী ও চাদর ব্যবহার ক'রত। এই পোষাক প'রেই

শিল্পীরা গলায় ঢোল-ঝুলিয়ে বুর্রাকথা পরিবেশন করত। একজন গান গাইত আর একজন গলায় ঝোলানো তারযন্ত্র (সেতারের অনুরূপ, বুর্রা) বাজিয়ে নৃত্য পরিবেশন করত। বর্তমানে তো শিল্পীরা খাদির জামা, ধুতি ও টুপি প'রে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা পরিবেশন করে। যে গান গায় সে হাঁটু অবধি ঝোলানো জামা গায়ে দেয়।

বুর্রা বাদকই হ,লো বুর্রার সূত্রধার। বুর্রা বাজিয়ে নাচের ঢঙে সে সমস্ত মঞ্চটাই প্রদক্ষিণ করতে থাকে। নাচের সময় সে পা দিয়ে তাল রাখে। গায়ক গান গাওয়ার সময় "সা, সা ,, "সা, সা, ভাই (তন্দানা)" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ ক'রতে থাকে। অনেক সময় দু'জন শিল্পী এমন ভিন্নভাবে গান শুরু করে বা ধুয়ো টানে যে একের সঙ্গে অপরের কোনো মিলই থাকে না। যাইহোক, বুর্রাকথায় বিষয়ের কোনো কৌলিন্য নেই, ফলে ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয়, এবং রাজনৈতিক সমস্ত বিষয়ই পরিবেশিত হ'য়ে থাকে।

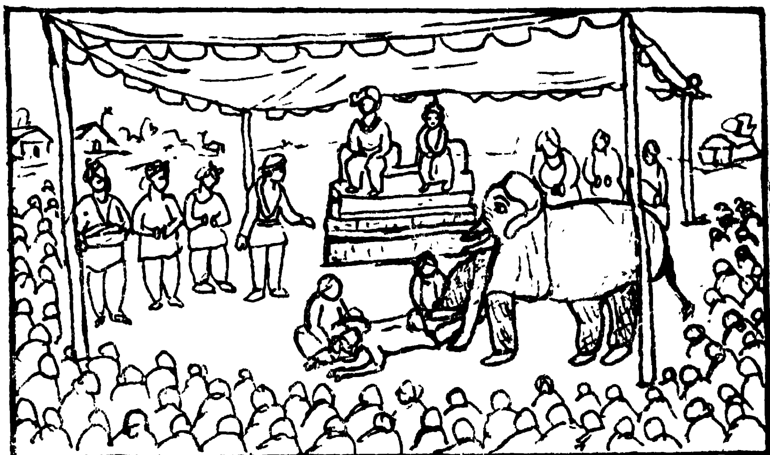
ডঃ সুব্বা রাও-এর 'বাবুরাম বুর্রাকথা'ই প্রথম আধুনিক বুর্রাকথা। বাবুরাম বুর্রাকথা ছাড়াও সুব্বা রাও 'তান্যা' নামক আরেকখানি বুর্রাকথা রচনা ক'রেছিলেন। এস সত্যনারায়ণও অনেকগুলি বুর্রাকথা রচনা ক'রেছেন। বুর্রাকথার এইসব পালা অনেক জাগগাতেই বেশ সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হ'য়েছে।

ডঃ সুব্বা রাও এবং এস. সত্যনারায়ণ ব্যতিরেকে আরো যাঁরা কাহিনী রচনা ক'রে বুর্রাকথার ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রেছেন, তাঁরা হ'লেন—শ্রীযুক্ত শায়ক নজর, জে. চন্দ্রশেখর রাও, এন. গঙ্গাধরণ, নরসিংহ শাস্ত্রী, কাশীর সত্যনারায়ণ শাস্ত্রী, টি. রামানুজাচারুলু, লক্ষীকান্ত মোহন প্রমুখ বিশেষভাবেই উল্লেখ যাগ্য।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আন্দোলনের অনেক নেতাই বুর্রাকথার শিল্পী ও রচনাকারদের অনুপ্রাণিত ক'রেছিলেন। ফলে অনেক রাষ্ট্রনেতার জীবনী অবলম্বন ক'রে বুর্রাকথা রচনা ক'রে তার সফল প্রয়োগও করা হ'য়েছে। এইসব প্রয়োগ জনসাধারণের মনে রাষ্ট্রীয় ভাবনা সঞ্চার ক'রতে খুবই সহায়ক হ'য়েছিলো। বিভিন্ন সব রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টভঙ্গির প্রচারেও বুর্রাকথাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার ক'রেছে। এর ফলে বুর্রাকথার জনপ্রিয়তা বর্তমানে খুবই বেড়ে গেছে।

একথা সত্য যে, চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের ব্যাপক প্রচারের ফলে অন্ধ্রের শহর বাসীদের কাছে বুর্রাকথা খুব একটা সমাদর পায় না। তবে অন্ধ্রের গ্রামাঞ্চলে লোকশিক্ষা ও লোকানুরঞ্জনের সবচেয়ে শক্তিশালী এক মাধ্যম বা আঙ্গিক হিসেবে বুর্রাকথা খুবই গুরুত্বপূর্ন এক ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

উড়িষ্যার লোকনাট্য



□ যাত্রা

উড়িষ্যায় লোকনাট্যের সাধারণ নাম হ'লো যাত্রা। পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা ব'লতে যেমন বিশেষ এক লোকনাট্য বোঝায়, উড়িষ্যায় তেমন নয়। উড়িষ্যায় সমস্ত লোকনাট্যকেই যাত্রা ব'লে চিহ্নিত করা হয়। তবে বাংলা যাত্রার মত উড়িয়া যাত্রারও প্রচলন আছে। ভাষাগত ভিন্নতা ব্যতিরেকে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আজকাল তেমন চোখে পড়ে না। যাইহোক, যাত্রা শব্দটির উৎস নির্ণয়ে নানা মতের প্রচলন আছে। পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা প্রসঙ্গে সেগুলির অবতারণা করা হ'য়েছে। এখানে শুধুমাত্র উড়িষ্যার লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধেয় ধীরেন দাশের অভিমতটিই সংক্ষেপে বিবৃত হ'লো। শ্রদ্ধেয় দাশ মনে করেন, যাত্রা ও থিয়েটার সমার্থক। কেননা, যাত্রার হিন্দী ও সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে থিয়েটারের বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষার উচ্চারণের ধ্বনি-সাম্য খুবই স্পষ্ট। দু'টি শব্দই ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। ফলে এ দু'য়ের উৎস এবং অর্থ এক ব'লে মনে করেন দাশ। দাশের এই অভিমত যেমন রুচি-সিদ্ধ, তেমনি ভাষা বিজ্ঞানের দ্বারাও সমর্থন যোগ্য বলে মনে হয়।

যাইহোক, উড়িষ্যায় পর্যাপ্ত মাত্রায় শিল্পময় পাথুরে নিদর্শন পাওয়া গেছে। ফলে, আজকের উড়িয়া যাত্রার উৎস নির্ণয় অনেকটা সহজ হ'য়ে পড়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মহারাজ খারাবেলা উদয়গিরির হাতীগুম্ফায় এই সব শিলালিপি খোদিত ক'রেছিলেন। এর মধ্যে সাতারা শব্দটি পাওয়া গেছে। সম্রাট খারাবেলা তাঁর প্রজাদেব জন্য যে নাট্যগৃহ নির্মাণ করেছিলেন তারই নাম ছিল সাতারা। এই সাতারা থেকেই যাত্রা শব্দটির উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন।

যাইহোক, খারাবেলার সাতারা থেকে বোঝাযায় যে, উড়িষ্যায় যাত্রার ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। কিন্তু পরবর্তিকালে একের পর এক রাজনৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক অচলাবস্থা এবং লোক ও নাগর সংস্কৃতির বিভেদমাত্রার বৃদ্ধিতে যাত্রা খুবই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এসব সত্বেও আজও সঙ্গীত এবং নৃত্য সমন্বিত ঐতিহ্যমণ্ডিত যাত্রা উড়িষ্যার আপামর জনসাধারণকে মোহিত করে। একদা খারাবেলার সাতারায়, স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে যাত্রা অভিনীত হ'ত। আর আজকের উড়িষ্যায় যাত্রাওয়ালারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে অস্থায়ী আসরে যাত্রার অভিনয় করে।

উড়িষ্যায় বেশ কিছু সংখ্যক নৃত্য, গীত ও অভিনয় সমন্বিত লোকনাট্য আঙ্গিক আছে। এদের মধ্যে যেমন আছে একক ও দ্বৈত অভিনয়াত্মক আঙ্গিক, তেমনি আবার বহু অভিনেতার দ্বারা পরিবেশিত আঙ্গিক। একক অভিনয়াত্মক আঙ্গিকগুলি হ'লো—(১) বহুরূপী, (২) ঘটপটুয়া, (৩) মুন্দাপোতা কেলা, (৪) জামুঘণ্টা, (৫) যোগী, (৬) ঘুড়ুকী, (৭) ধানকইলা, (৮) গল্প সাগর, (৯) কথক, (১০) হরিকথা প্রভৃতি। দ্বৈত অভিনয়াত্মক আঙ্গিকগুলির মধ্যে উল্লখযোগ্য হ'লো—(১) ঘট কলসী, (২) ধোবানাচ, (৩) শবর-শবরানী, (৪) কেলা কেলুনী, (৫) দশকাঠিয়া প্রভৃতি। আর চার থেকে আটজন শিল্পীর দ্বারা অভিনীত আঙ্গিকগুলি হ'লো—(১) গোটি পোয়া, (২) সখীনাট, (৩) ঘুড়ুকীনাট, (৪) ধুম্পাগীত, (৫) নাচুনী নাচ, (৬) মহরীনাচ (৭) নাগ নাচ, (৮) পটুয়া যাত্রা, (৯) অপ্সরা নৃত্য, (১০) চৈতী ঘোড়া (১১) পালা, (১২) ধান কইলা, (১৩) দলখাই রসের কেলি, (১৪) যমুদালী, (১৫) গুঞ্জীকূট প্রভৃতি আর কুড়ি থেকে পচিশ জন শিল্পী দ্বারা পরিবেশিত লোকনাট্যগুলি হ'লো—(১) লীলা, (২) সুয়াঙ্গা, (৩) দণ্ডনাট, (৪) বন্দীনাট, (৫) প্রহ্লাদ নাটক, রামনাটক এবং হরিশ্চন্দ্র নাটক (৬) পাইকানাট, (৭) লাউড়ী নাট, (৮) ছৌনাট, (৯) ঘুমর নাট, (১) রণপা নাট, (১০) সম্প্রদা, (১২) মেলানা প্রভৃতি।

আগেই বলা হ'য়েছে যে, উড়িষ্যাতে যাত্রা বলতে সাধারণতঃ লোকনাট্যই বোঝায়। ফলে উপরে উল্লেখিত আঙ্গিকগুলিকেও যাত্রা বলা হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ উড়িষ্যাতে নৃত্য, গীত ও অভিনয় সম্বলিত কোনো কাহিনীর উপস্থাপনাই হ'লো যাত্রা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান লোকনাট্য আঙ্গিকটির নামই

যাত্রা আর মহারাষ্ট্রে নাট্যোৎসবকেই বলা হয় যাত্রা। তবে উড়িষ্যাতে লোকনাট্যকে কেবল যাত্রাই নয়, সমাজ, লীলা, নাট, নাচ, সুয়াঙ্গা এবং তামাশা নামেও অভিহিত করা হ'য়ে থাকে। যাত্রার বৈশিষ্ট্য ও উৎস অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। আর সমাজ বলতে বোঝায় নাটক। লীলা হলো দেবতা অথবা অবতার-কল্প মানুষেরই কীর্তি কাহিনীর প্রদর্শন। নাট নাট্যেরই সমার্থক আর নাচ হলো নৃত্যের প্রাধান্য বিশিষ্ট নাটক আর তামাশা হ'লো রঙ্গ নাট্য। উড়িষ্যাতে 'তামাশার'র প্রচলন মধ্য যুগে, মোঘল আমলে। তখন এর নাম ছিল মোঘল তামাশা। মোঘল তামাশায় উড়িয়ার সঙ্গে উর্দু ও পার্শীর ব্যবহার হয়ে থাকে। এতে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। আর সুয়াঙ্গা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত স্বাঙ্গ থেকে। স্বাঙ্গ অর্থ উত্তম অভিনয়। উড়িষ্যাতে কাব্যনাট্য, গীতি-নাট্য ও নৃত্য নাট্যকে সাধারণতঃ সুয়াঙ্গা বলা হয়ে থাকে। শোনা যায়, অসমের অঙ্কিয়া নাটের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন পুরীতে ছিলেন তখন তিনি এই সুয়াঙ্গা দ্বারা ভীষণভাবেই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়কার প্রখ্যাত উড়িয়া কবি বলরাম দাসের লেখা লক্ষ্মী পুরাণ সুয়াঙ্গা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ফলে পরবর্তী কালের জনজীবন-এই সুয়াঙ্গা দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবিত হ'য়ে পড়ে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাত্রায়ও বেশ পরিবর্তন এসেছে। যেমন আগে চরিত্ররা মঞ্চে এসে আত্ম-পরিচয় দিত এবং অভিনেতারা তাৎক্ষণিক-সব-সংলাপের সাহায্যে যথাযথ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেত ঈপ্সিত পরিণতির দিকে। কিন্তু এখন আর স্বমুখে আত্মপরিচয় দেয়ার রীতি যেমন নেই তেমনি তাৎক্ষণিক সংলাপ সংযোজনের প্রথাও একেবারে উঠে গেছে বললেই হয়। তাছাড়া যাত্রায় আজ আর আগের মত কেবল পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনীই পরিবেশিত হয় না, সমকালীন সামাজিক কাহিনীও পরিবেশিত হচ্ছে। আগেকার দিনের যাত্রা ছিল একান্তভাবেই গীতিবহুল কিন্তু আজকাল এমন যাত্রাও পরিবেশিত হচ্ছে যাতে একটিও গান নেই। অবশ্য গান অন্তর্ভুক্ত না হলেও এখনো এই যাত্রায় শুরুতে, শেষে এবং প্রতিটি অঙ্কের আরম্ভের সময় ঐকতান বাদন অবশ্যই থাকে। প্রাচীন যাত্রায় বিদূষক থাকত, আজকের যাত্রা বিদূষকহীন।

উড়িষ্যার যাত্রায় কিন্তু সংস্কৃত নাট্যের কিছু কিছু উপকরণ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যেমন—বন্দনা গীতি, নাচ, পরিচয় দানের জন্য সূত্রধার, গন্ধর্ব, নৃত্য, নাট্য ঘটনার মাঝে মধ্যে হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করে রিলিফ দেয়া, সমবেত গান ইত্যাদিতে সে অনুসরণ-প্রবৃত্তি স্পষ্ট। তবে উপরোক্ত উপকরণগুলি আমাদের শাস্ত্রীয় না লোকনাট্যের নিজস্ব ব্যাপার সে নিয়েও মতানৈক্য আছে। যাইহোক, উড়িষ্যার প্রখ্যাত যাত্রা পালাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোপাল দাস, জগন্নাথ

পাণি, গোপাল রেণু দাস, বন্ধু নায়েক, ভিখারী নায়েক, বৈষ্ণব পাণি, বালকৃষ্ণ মহান্তি, রামচন্দ্র সোয়েন প্রমুখ।

উড়িয়া যাত্রার মঞ্চ যেমন সহজ-সরল, তেমনি আড়ম্বরহীন। একখণ্ড ফাঁকা জায়গার ঠিক কেন্দ্রস্থলে থাকে এই মঞ্চ বা রঙ্গস্থল। এই রঙ্গস্থলের চারদিকে বৃত্তাকারে বসে দর্শক। সাজঘর বা গ্রীনরুম থাকে বেশ কিছুটা দূরে। মঞ্চ থেকে সাজঘর অবধি একটি পথ ছেড়ে দিয়েই তবে দর্শকরা আসন নেয়। এই পথটিকে বলা হয় পুষ্পপথ। এই পুষ্পপথটি অনেক সময় মঞ্চের প্রলম্বিত অংশ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ মঞ্চের যে দিকে এই পুষ্পপথটি থাকে, ঠিক তার বিপরীত দিকে দর্শকের সম্মুখেই বসে গায়ন-বায়ন। অনেক সময় অংশ্য পুষ্পপথের ওপর একটি উঁচু পাটাতনের ওপরই আসন নেয় গায়ন-বায়ন। উড়িয়া যাত্রায় এখনো মঞ্চোপকরণ বলতে মঞ্চে থাকে শুধুমাত্র একটি চেয়ার। এই চেয়ারটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কখনো এই চেয়াটি হয়ে ওঠে রাজার সিংহাসন, আবার কখনো বা কোনো গাছ আবার কখনো বা কোনো ভিখিরির কুঁড়ে ঘর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গের যাত্রামঞ্চেও অনুরূপ এক স্থায়ী চেয়ারের প্রয়োগ ছিলো পাঁচের দশক অবধি।

যাইহোক, এক্ষণে উড়িষ্যায় যাত্রা প্রজাতির কয়েকটি আঙ্গিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো।

গল্পসাগর, হরিকথা এবং কথক: দীর্ঘদিন ধরে এই আঙ্গিকগুলি উড়িষ্যায় প্রচলিত রয়েছে। সাধারণতঃ কোনো ফাঁকা জায়গায় সমতল ভূমিতেই এগুলি পরিবেশিত হয়। বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে একজন শিল্পীই এটি পরিবেশন ক'রে থাকে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় মন্দিরা, একতারা, রামতাল এবং দশকাঠি। শিল্পী তার কণ্ঠস্বর বদলে বদলে একাই বিবিধ চরিত্রের সংলাপ উচ্চারণ ক'রে চলে। নানাবিধ কৌতুক ও হাস্যরসের অবতারনা ক'রে সে পরিবেশিত কাহিনীকে সরস এবং আকর্ষনীয় ক'রে রাখে। সাধারণ উড়িয়া পোষাক পরেই সে কাহিনী পরিবেশন ক'রে থাকে।

দশকাঠিয়া: দশ-কাঠিয়া পরিবেশন করে দু'জন শিল্পী। প্রধান শিল্পীকে বলে গায়ক আর তার সহকারীকে বলে পালিয়া। পালিয়া মাঝে মাঝেই সুর ক'রে ব'লে ওঠে—জয় রামজী, জয় রামজী, নবীন সুন্দর রামজী, জয়-রামজী। সাধারণতঃ রামায়ণের কাহিনীই দশকাঠিয়াতে পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। গানের সাহায্যেই বিবৃত হয় কাহিনী। বিশেষ বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে অবশ্য সংলাপও সংযোজিত হয়। তখন গায়ক ও পালিয়া দুই ভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে একে অপরের বিপরীতে অভিনয় ক'রে চলে। দশকাঠিয়ার একটি আসর সাধারণতঃ তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হ'য়ে যায়। গায়ক ও পালিয়া উভয়েই বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে গায়কের হাতে থাকে একফালি বা রামতালি

আর পালিয়ার হাতে থাকে দশকাঠিয়া। দশকাঠিয়া হচ্ছে দু'ই খণ্ড কাঠ দিয়ে তৈরী এক ধরনের তালযন্ত্র। দেবতার কাহিনী পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ-কৌতুক পরিবেশন ক'রে দশকাঠিয়ার শিল্পীদ্বয় দর্শকের মনোরঞ্জন সাধন ক'রে থাকে। বর্তমানে উড়িষ্যায় প্রায় ১৫০টির মত দশকাঠিয়ার দল আছে এবং এর সবকটিই প্রায় গঞ্জাম জিলার।

চৈতী ঘোড়ানাট: চৈত্রমাসে জেলেরা চৈতী ঘোড়ানাট প্রদর্শন করে। সমকালীন জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা, সামাজিক নকশা এবং নানাবিধ রঙ্গ-কৌতুকই এর মুখ্য উপজীব্য। কথিত আছে যে রামচন্দ্রের বনবাসকালে জনৈক মাঝি তাঁকে সরযূ নদী পার ক'রে দিলে রামচন্দ্র খুশি হ'য়ে তাকে একটি ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন। জেলেরা নিজেদের সেই মাঝির উত্তর পুরুষ বলে মনে করে। তাই সেই গৌরবময় স্মৃতি—এই ঘোড়া নাচের মাধ্যমেই বহন ক'রে চলেছে। চৈতী ঘোড়ানাটের ঐতিহ্য যে দীর্ঘদিনের তা উপরের কাহিনীটি থেকেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

জনা পাচেক শিল্পী নিয়ে ঘোড়ানাটের একটি দল তৈরী হয়। এরমধ্যে একজন ঢুলী, একজন মুহুরী থাকে। আর থাকে রাউত, রাউতানি আর ঘোড়া নাচিয়ে।

বাঁশ ও কাপড় দিয়ে ঘোড়ার উর্দ্ধাঙ্গের অনুরূপ একটি ফাঁপা কাঠামো তৈরী করা হয়। একজন অভিনেতা এই ফাঁপা কাঠামোটির মধ্যে দেহ ঢুকিয়ে তারপর কাঠামোটিকে কোমরের সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধে ঘোড়া সাজে এবং গান ও বাজনার তালে নাচতে থাকে।

ঘোড়ানাটের মূল গায়ক হচ্ছে রাউত। আর রাউতানী হলো তার স্ত্রী। রাউতানী যেমন নৃত্য পরিবেশন ক'রে দর্শক আকর্ষণ করে, যেমনি রাউতের গানেরও দোয়ারকি করে। রাউতানীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটিও মঞ্চে নাচতে থাকে। রাউতের গান, রাউত ও রাউতানির মধ্যেকার তাৎক্ষণিক সংলাপ, রাউতানী ও ঘোড়ার নাচ এবং নানাবিধ রঙ্গরসে উড়িষ্যার জেলেদের এই ঘোড়ানাট বেশ জমে ওঠে।

ছৌ-নাট: উড়িষ্যায় ছৌনাচ ছৌনাট হিসেবে পরিচিত হলেও তা নাচ হিসেবেই সমধিক প্রচলিত ও পরিচিত। তাই আর তার আলোচনা করা হ'লো না।

পালা: পালা শব্দটি মূলতঃ পালি ভাষা থেকে এসেছে। এককালে কলিঙ্গের জনসাধারনের ভাষাই ছিল পালি। যাইহোক, পালা দুই ধরনের। বৈঠকী পালা এবং থিয়া পালা। মোঘল যুগে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পারস্পরিক সংমিশ্রণে উভয় ধর্মের দেবতা হিসাবে আবির্ভাব ঘটেছিলো সত্যপীরের। বৈঠকী পালা

সত্যপীরের পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর থিয়া পালার মূল নিহিত র'য়েছে দণ্ডনাটকের 'বিনকারা' অংশের মধ্যে।

পূর্বরঙ্গ ভারতীয় লোকনাট্যের অন্যতম এবং অনিবার্য একটি অঙ্গ। পালাতেও নাট্যারম্ভের সূচনায় পূর্বরঙ্গ সংঘটিত হয়। পালার এই পূর্বরঙ্গে নাট্য-শাস্ত্রে উল্লেখিত পূর্বরঙ্গ বিধির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যাইহোক, থিয়া পালা উৎকৃষ্ট সাহিত্য গুণে সমৃদ্ধ। থিয়া পালার একটি দলে সাধারণতঃ ছ'জন অভিনেতা থাকে। প্রত্যেকেই জাঁকজমকপূর্ণ প্রাচীনকালের রাজকীয় পোষাক পরে। দলনেতাকে বলা হয় গায়ক। তার হাতে থাকে চামর এবং মঞ্জিরা। বাকিদের বলা হয় পালিয়া। এরা সমবেত ভাবে ধুয়ো টানে এবং দোহার ধ'রে মূল গায়ককে অনুসরণ করে। পালায় গায়কের মঞ্জিরা ছাড়াও বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খোল এবং করতাল ব্যবহৃত হয়। পালায় একজন ভাঁড়ও থাকে। নানাবিধ অঙ্গাভিনয় সহযোগে সে কৌতুকাভিনয় পরিবেশন করে। গায়ক ধারা বিবরণীর মত ক'রে কাহিনী বর্ণনা ক'রে যায়। কাহিনীর নাটকীয় অংশগুলিতে পালিয়াদের মধ্য থেকে একজন উঠে কোনো এক চরিত্রের ভূমিকাভিনয় করে এবং তাৎক্ষণিক সংলাপের সাহায্যে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পালায় নৃত্যের খুবই উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা আছে।

কখনো কখনো পালায় একাধিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়। একে বলা হয় বাদী পালা।

দশকাঠিয়া পালা: পালা এবং দশকাঠির সংমিশ্রণে সম্প্রতি দশকাঠিয়া পালার প্রচলন হয়েছে।

দণ্ডনাট: দণ্ডনাট উড়িষ্যার অন্যতম প্রাচীন লোকনাট্য। এই নাট অভিনয়ের প্রাক্কালে একটি দণ্ড পূজিত হয় ব'লে একে দণ্ডনাট বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই দণ্ডপূজায় শাস্ত্রীয় নাট্যের 'ধ্বজদণ্ড' বা জর্জরের প্রভাব র'য়েছে।

দণ্ডনাটকের দুটি পর্ব—পানি দণ্ড এবং ভূমি দণ্ড। প্রথম পর্বটি পরিবেশিত হয় রাত্রিতে। এই পর্বে নৃত্য, গীত ও নাট্যাংশ থাকে। তবে দণ্ডনাটকের কাহিনী আদি, মধ্য ও অন্তযুক্ত কোনো সম্পূর্ণ কাহিনী নয়, নীতি ও ধর্মভিত্তিক অনেকগুলি ছোটো কাহিনী এতে পরিবেশিত হয়। দণ্ডনাটকে যেসব চরিত্র খুবই জনপ্রিয় তাঁরা হলেন—প্রভা, চাধাইয়া, যোগী, কেলা, পাত্র-সূর্য, বিনকারা, বইধান, শিব, পার্বতী, কৃষ্ণ এবং গোপী।

দণ্ডনাটকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢোল, মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, শঙ্খ এবং কহালী দণ্ডনাটকের নৃত্যাংশ দর্শকের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

রাসলীলা, লাউড়িনাট, রহস কীর্তন, রাধা-প্রেমলীলা, কৃষ্ণলীলা আধারিত যাত্রা। রাসলীলার মুখ্য অবলম্বন প্রখ্যাত সাধক কবি অচিন্তানন্দের জনপ্রিয়

কাব্য 'রাস'। রাধা-প্রেমলীলা যাত্রা গীত-গোবিন্দের অনুসরণে রচিত। কৃষ্ণ-লীলা যাত্রায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বিভিন্ন ঘটনা পরিবেশিত হয়। সম্পূর্ণ কৃষ্ণ-লীলার পরিবেশনে সাত-আট দিন লেগে যায়। আর কালীয় দমন যাত্রায় কেবল-মাত্র কৃষ্ণ কর্তৃক কালীদহে কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয় নাগ দমনের কাহিনীই উপস্থাপিত হয়।

পটুয়া যাত্রা : পটুয়া যাত্রাও দণ্ডনাটের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নানা ধরনের পটুয়া আছে, যেমন—ঘট পটুয়া, উড় পটুয়া, নিয়ান পটুয়া, কাঁটা পটুয়া, খণ্ড পটুয়া, ঝুল পটুয়া এবং শুধু পটুয়া। এই শুধুপটুয়াতেই নাচ, গান এবং অভিনয়ের সুসম বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, সামগ্রিকভাবে পটুয়ার উপস্থাপন রীতি চৈতী ঘোড়ার উপস্থাপন রীতিরই সমগোত্রীয়।

ঘুড়িকি নবরঙ্গ নাট : ঘুডিকি হ'লো কাঠের তৈরী একধরণের বাদ্যযন্ত্র। এই নাট্যের উপস্থাপনে ঐ বাদ্যযন্ত্রটি সারাক্ষণ ধ'রে বেজে চলে বলেই বাদ্যযন্ত্রটির নামানুসারেই নাট্যটির অনুরূপ নামকরণ করা হ'য়েছে। ঘুড়িকি একটি পূর্ণায়ত নাট্য আঙ্গিক। সাধারণতঃ এতে আট থেকে দশ জন অভিনেতা অংশ নিয়ে থাকে. বালিকাবেশী দুটি বালকের নাচগান দিয়েই শুরু হয় ঘুড়িকির অভিনয়। এতে একই অভিনেতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করে থাকে। ঘুড়িকি নবরঙ্গ নাট পরিবেশনে সাধারণতঃ তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে।

বন্দীনাট : বন্দীনাট মূলতঃ মধ্য ও পশ্চিম উড়িষ্যায় তথাকথিত নিম্ন-বর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত। এটিও দণ্ডনাটকের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। রাধার স্বামী চন্দ্রসেনের বোন অর্থাৎ রাধার ননদের নাম ছিল বন্দী। বন্দী কিভাবে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমলীলায় নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য ক'রেছিল, তাই-ই বন্দীনাটের মুখ্য উপজীব্য। বন্দীনাটের আসর বসে সমতলভূমিতেই। অভিনেতারা অভিনয় শেষ হ'লে দর্শকদের মধ্যে গিয়েই আসন নেয়, আবার সময় এলে দর্শকদের মধ্য থেকে উঠে এসে রঙ্গস্থলে অভিনয় করতে থাকে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে কেবলমাত্র ঢোলই এতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতলীলা বা দ্বারীনাট : অর্জুন ও সুভদ্রার মিলন কাহিনীই ভারত-লীলার বিষয়বস্তু। একে দ্বারীনাটক বলা হয়। কেননা এর অন্যতম মুখ্য চরিত্র দ্বারী (সূত্রধার) কেবলমাত্র কাহিনীর মুখ্য বর্ণনাকারীই নয়—অর্জুন ও সুভদ্রার প্রেমপর্বের মুখ্য সহায়কও বটে। কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানাবিধ হাস্যকৌতুক এবং নৃত্যগীত ছাড়াও সংলাপ এবং বর্ণনার সাহায্যে গভীর শাস্ত্রা-লোচনাও করা হয় এই নাটকে। দ্বারী নাটে হাস্যকৌতুকের বিশিষ্ট এক ভূমিকা আছে।

দেশীনাট : দেশীনাট উড়িষ্যায় কোরাপুট জিলায় প্রচলিত এক প্রাচীন

লোকনাট্য। এই নাটকে দেবদেবী, রাক্ষস-রাক্ষসী, মানুষ, জীবজন্তু এবং পশুপক্ষী—প্রায় সব ধরনের চরিত্রেরই সমাবেশ ঘটে। দেশীনাট্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হ'লো এই যে এটি একটি মুখোশ নাট্য, কেননা সব চরিত্রই এতে মুখোশ পরে মঞ্চাবতীর্ণ হয়। রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীই এতে পরিবেশিত হ'য়ে থাকে।

রামলীলা: ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত উড়িষ্যাতেও রামলীলাভিনয়ের প্রচলন আছে। তবে সব চরিত্রই মুখোশ পরে এমন রামলীলা একমাত্র উড়িষ্যাতেই প্রচলিত। এরকম রামলীলার একমাত্র নজির তাই দেশীনাট। ত'বে রামলীলা নামে প্রচলিত এখানে রামকাহিনীর পরিবেশনে চরিত্রাভিনেতারা কখনো বা মূকাভিনয় ক'রে আর কখনো বা সংলাপাভিনয় ক'রে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর গায়ক তার সহকারীদের নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে। সাধারণতঃ রামলীলা ঐতিহ্যগতভাবে পর্যায়ক্রমে কয়েক রাত্রি ধ'রেই পরিবেশিত হয়।

লঙ্কাপোড়ী: লঙ্কাপোড়ী মূলতঃ রামলীলাভিনয়েরই অংশ। সমগ্র উত্তরভারতে এটি লঙ্কাদহন বা দশেরা অনুষ্ঠান নামেই পরিচিত। যাইহোক, উড়িষ্যার দশপাল্লা অঞ্চলে প্রচলিত লঙ্কাপোড়ী অনুষ্ঠান তার বৈচিত্র্য ও বিশালতার কারণে স্বতন্ত্র একটি লোকনাট্যের মর্যাদা অর্জন ক'রে উড়িয়া লোকনাট্যে বিশেষ একটি স্থান করে নিয়েছে। লঙ্কাপোড়ীর জন্য প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ একটি স্থান নির্বাচন করা হয়। এর দৃশ্যসজ্জাও খুবই বৈচিত্র্যময়। পুষ্পকরথে রাবণের সীতাহরণের দৃশ্য এতে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই উপস্থাপন করা হয়। শেষে হনুমান এসে লঙ্কা পুড়িয়ে দিলে তবে লঙ্কাপোড়ীর অভিনয় শেষ হয়।

ধনুয়া যাত্রা: সম্বলপুরের বরাগড়ের ধনুয়া যাত্রা কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। ধনুয়াযাত্রার অভিনয়ক্ষেত্র হিসেবে কয়েকটি গ্রাম, শহর এবং নদী ব্যবহৃত হয়। এই বিশাল ক্যানভাসে শ্রীকৃষ্ণলীলার বৃন্দাবন ও মথুরাপর্ব পরিবেশিত হয়। কোনো গ্রাম হয় বৃন্দাবন আর কোনো শহর হয়ে ওঠে মথুরা। এই শহর ও গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা একই সঙ্গে ধনুয়া যাত্রার দর্শক এবং প্রদর্শক। ধনুয়া যাত্রার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে এতে যেখানে কংসের অত্যাচারী চরিত্রের অভিনয় হয় সেখানে রাজা কংস উপস্থিতপ্রজা (দর্শক) বৃন্দের যাকে যে পরিমান অর্থদণ্ড দেন তাকে তা মেনে নিয়ে সেখানেই সেই অর্থ কংসকে দিয়ে তবে শাস্তি মুকুব ক'রতে হয়। অবশ্য সমস্ত কিছুই সংঘটিত হয় অভিনয়-ছলে। ধনুয়া যাত্রা তার ব্যাপ্তি, বিশালতা ও আড়ম্বরের দিক থেকে রামনগরের রামলীলার সঙ্গেই তুলনীয়।

শব্দ স্বর নাট: সাধারণ যাত্রার সঙ্গে শব্দস্বর নাটের প্রায় সব ব্যাপারেই

মিল আছে। তবে শব্দ স্বর নাটের অন্যতম চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিহিত এর নাচে। এতে নৃত্যাংশে সংযোজিত হয় তাণ্ডব নৃত্য। তাণ্ডব নৃত্যকে আবার শব্দ নৃত্য ও বলা হ'য়ে থাকে। শব্দ নৃত্য আবার দুই প্রকার। প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় স্বর। কৃষ্ণ জীবনের নানাবিধ কাহিনীই এর মুখ্য অবলম্বন। যাইহোক উড়িষ্যায় শব্দস্বর নাটের ব্যাপক প্রচলন আছে। সম্বলপুর জিলার বরপালি অঞ্চলের কুম্ভারী গ্রামের শব্দস্বর নাট খুবই বিখ্যাত।

কান্ধেই নাট : উড়িষ্যায় সূত্রচালিত পুতুলনাট্য কান্ধেই নাট নামে পরিচিত। সখীনাচ, গোপলীলা ইত্যাদি বিষয় এই পুতুল নাটকে পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। এছাড়া রাবণ ছায়া নামে খুবই সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যশালী এক ছায়া পুতুলনাট্যেরও প্রচলন আছে উড়িষ্যাতে। অন্যত্র এর বিস্তৃত আলোচনা করা হ'য়েছে।

প্রহ্লাদ নাটক : মঞ্চ গঠনের দিক থেকে প্রহ্লাদ নাটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রহ্লাদ নাটকের মঞ্চ ভারতের অন্য যেকোনো লোকমঞ্চ থেকেই স্বতন্ত্র। তাছাড়া সাজ পোষাক, সঙ্গীত এবং পরিবেশন পদ্ধতির দিক থেকেও এর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। তাই সবিস্তারে এর আলোচনা করা হ'লো।

উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায় এই বর্ণময় ঘটনাবাহুল লোকনাট্যের প্রচলন আছে। গঞ্জামের জলন্তর তালুকের সামন্ত শ্রী রামকৃষ্ণ ছোটরায়ের পৃষ্ঠপোষণায় প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার গোপীনাথ পরিছা সর্বপ্রথম পালাটি লেখেন। যেহেতু তিনি শ্রী ছোটরায়ের দরবারে ছিলেন সেহেতু নাটকটি তার নামে প্রচলিত! নাটকটির বর্ণময় প্রযোজনায় আকৃষ্ট হ'য়ে পার্শ্ববর্তী তালুকদাররা যথা সুরঙ্গীর রাজা কিশোরচন্দ্র হরিচন্দন জগদেও, পারলাখেমুণ্ডির রাজা পদ্মনাভ রাও এবং তারালার রাজা রামচন্দ্র সুরদেও প্রহ্লাদ নাটক রচনায় তাদের সভা-কবিদের উৎসাহিত করেন। সম্ভবতঃ এইসব নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই লেখা হ'য়েছিল।

প্রহ্লাদ নাটক ধ্রুপদী নাট্যাদর্শ মেনে লেখা হয়নি। সমগ্র নাটকে কোনো অঙ্ক বা দৃশ্য বিভাগ নেই। নাটকটিতে 'গাহক' অর্থাৎ প্রধান গায়ক ও ব্যাখ্যাকর্তা ছাড়া কুড়িটি পুরুষ চরিত্র এবং পাঁচটি নারী চরিত্র আছে।

নাটকে 'গাহক' বা গায়ক তার নির্দিষ্ট গান ও সংলাপের সাহায্যে পালার ব্যাখ্যাকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেবদেবীদের স্তুতি বা বন্দনা গীতি গান, মঞ্চের নেপথ্যে নাটকের যেসব ঘটনা ঘটছে তার বিবরণ দেন এবং নাটকের ঘটনার 'পূর্বকথা দর্শকদের অবহিত করেন। সংস্কৃত বহুল উড়িয়া ভাষায়, পাত্র-পাত্রীদের মঞ্চে অভিনয়ের আগে, ঘটনার অবস্থা ও দৃশ্য সম্পর্কে দর্শকদের জানিয়ে দেন। পাত্রপাত্রীরা গীতিধর্মী সংলাপে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করে। এইভাবে কোনো দৃশ্যের আগে 'গাহক' তার গানের মধ্য

দিয়ে দৃশ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ জানিয়ে দেন। অভিনেতারা মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করতে পারবে না, অথচ নাটকের প্রয়োজনে যেগুলো প্রকাশিত হওয়া দরকার, সেগুলো দর্শককে জানাবার ভার 'গাহক' এর। চরিত্রদের ভাবনা এবং মুড কেমন আছে সে সম্পর্কে দর্শকরা 'গাহক' এর এর গান থেকে জানতে পারেন। নাটকের মূল গীতি ও বাক্যাংশ উপস্থাপনের দায়িত্ব 'গাহক'এর। অভিনেতাদের দায়িত্ব হ'চ্ছে সংলাপ অর্থাৎ উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক আলাপের মধ্য দিয়ে নাটকটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

'প্রহ্লাদ নাটক' গীতি প্রধান, এতে একশো কুড়িটা গান আছে, প্রত্যেক গানের জন্য রাগ ও তাল নির্দিষ্ট। বন্দনাগীতি হ'য়ে যাবার পর 'গাহক' দর্শক-মণ্ডলীর কাছে পালা উপস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং সম্ভাব্য ভুল-ত্রুটির জন্য অগ্রিম ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তারপর নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

নাটকের ভাষা হিসাবে কথ্য উড়িয়া এবং সংস্কৃতবহুল সাধুউড়িয়া উভয়ই ব্যবহৃত হয়। নিম্ন স্তরের চরিত্ররা কথ্য উড়িয়া ভাষায় কথা বলে। নাটকটিতে প্রাচীন ধ্রুপদী থিয়েটার এবং প্রচলিত লোকনাট্যের সংমিশ্রন ঘটেছে। অধিকাংশ দীর্ঘ বর্ণনামূলক, গুরুগম্ভীর অলঙ্কারবহুল পদ্য-বদ্ধ সংলাপ গাহক এবং দ্বারীর জন্য নির্দিষ্ট। চলতি উড়িয়ায় ছোটো ছোটো বাক্যের সংলাপে এই সব পদ সমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বিষয়কে সহজবোধ্য করার জন্য এর প্রয়োজনও আছে। কেননা প্রহ্লাদ নাটকের অধিকাংশ দর্শকই সাধারণ নিরক্ষর গ্রামবাসী। গদ্য সংলাপে পারসী এবং তেলেগু শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে। এই নাটকে গীতি সংলাপের ব্যবহার রয়েছে, অর্থাৎ গানের মধ্য দিয়ে চরিত্ররা কথোপকথনে অংশ নেয়।

প্রহ্লাদ নাটকের মঞ্চ কিছুটা অদ্ভুত। খোলা মাঠে অস্থায়ী মঞ্চে এর অভিনয় হয়। খোলামাঠে কিছুটা জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে অভিনয় ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। এই অভিনয় ক্ষেত্রের একদিকের প্রান্তে কাঠ দিয়ে চার বা পাঁচ তলা মঞ্চ খাড়া করা হয়। একেবারে উপরের তলায় ৪´×৩´-মাত্রা বিশিষ্ট প্রসারিত ক্ষেত্র থাকে। এখানে একটি চেয়ার রাখা হয় যেটা সিংহাসন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই মঞ্চটি বাদ দিয়ে দড়ি দিয়ে ঘেরা অভিনয় ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য হয় কুড়ি ফুট এবং প্রস্থ পনেরো ফুট। দর্শকরা ক্ষেত্রটির তিনদিক ঘিরে বসে, মঞ্চের বাঁদিকে গাহক, বাদ্যযন্ত্রী ও কোরাস গায়কদের নিয়ে অবস্থান করে। নাটকের পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা উঠে দাঁড়িয়ে বা বসে গান বাজনা পরিবেশন করে। আগে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে মারদালা বা পাখোয়াজ এবং গিনি ব্যবহৃত হোত। তবে এখন হারমোনিয়াম, বেহালা সহ নানা ধরনের ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রও

ব্যবহৃত হ'চ্ছে। গাহক-কোয়ালের বসবার স্থান এবং কাঠের মধ্যবর্তী এলাকায় একটা সরু পথ থাকে। এই পথ দিয়ে পাত্র-পাত্রীরা অভিনয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

প্রহ্লাদ নাটক একটি অপেরা ধর্মী গীতিনাট্য। যদিও নাটকে গানের প্রাধান্য খুব বেশী তবুও কাব্য সংলাপের সঙ্গে গদ্য সংলাপও প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নাটকের গান, গদ্য ও পদ্য সংলাপের প্রতিটি অংশই লিখিত। এই লিখিত পাণ্ডুলিপির বাইরে যাবার স্বাধীনতা কারো নেই। মূকাভিনয় এবং ঐতিহ্যানুসারে শারীরিক মুদ্রার ব্যবহারও প্রহ্লাদ নাটকে পরিলক্ষিত হয়। বাদ্যযন্ত্রীরা সমবেত ভাবে 'গণেশ বন্দনা' দিয়ে নাট্যের সূচনা করে। নাটকের প্রতিটি পর্বের সূচনাতেই ঐকতান বাদন হয়। ঐকতান বাদনের শেষে গান দিয়ে আরম্ভ হয় অন্য পর্ব।

অল্প কয়েকজন ছাড়া সব চরিত্রকেই নাচতে হয়। হিরণ্যকশিপুর ভয়াল নাচের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মারদালা অশুভ অমঙ্গলসূচক ধ্বনিতে বেজে ওঠে। হিরণ্যকশিপুর চরিত্রাভিনয় প্রহ্লাদ নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শারীরিক ভাবে শক্তিশালী, দক্ষ-অভিজ্ঞ কলাকুশলীরাই সাধারণতঃ এই চরিত্রে অভিনয় করে! নামী হিরণ্যকশিপু চরিত্রাভিনেতাদের খুবই সমাদর আছে। প্রহ্লাদ নাটক-এর বিভিন্ন দল তাদের ভাড়া করে নিয়ে যায়। যদিও নৃসিংহ চরিত্র মঞ্চে একবারই আসে. তবু সে মুহূর্তটি দর্শকদের কাছে খুবই রোমাঞ্চকর হয়, বিশাল নৃসিংহ মুখোশ পরা অভিনেতার কোমরে দড়ি বাঁধা থাকে এবং একদল বলশালী লোক শক্ত করে সেই দড়ি ধরে থাকে। লোকেরা ভীত হয় এই ভেবে যে পাছে নৃসিংহ সত্যি সত্যিই সংহার মূর্তিতে জেগে ওঠে এবং ভয়ানক কিছু ঘটিয়ে ফেলে। সেটা আটকানোর জন্যই ঐ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

কেরালার কথাকলি নাচের অনুরূপ বিশদ ও বর্ণময় রূপসজ্জা ও পোশাকের ব্যবহার প্রহ্লাদ নাটকে লক্ষ্য করা যায়। হিরণ্যকশিপু আঁটো সাঁটো রঙিন জামা ও নকল গয়নায় রাজকীয় হয়ে ওঠে। তার মুখে লাল রঙ আর দাড়িতে বাদামী রঙ লাগানো হয়, জরির সুতো দিয়ে গোঁফ পাকিয়ে পাকিয়ে কানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। মাথায় পরানো হয় একটা বিরাট মুকুট। তার পারিষদরা মুসলমান আমীর ওমরাহদের পোশাক পরে। এই মুসলিম পোশাক এবং সংলাপে পারসী শব্দের ব্যবহার এই লোকনাট্যে মুসলিম প্রভাবের নিদর্শন।

একটা ছোটোছেলে প্রহ্লাদের ভূমিকায় অভিনয় করে। প্রহ্লাদ ফুলহাতা জামা এবং গয়না পরে, নারীচরিত্ররা শাড়ী পরে এবং রাক্ষসদের মুখে থাকে মুখোশ।

প্রহ্লাদ নাটকের চরিত্রলিপি নিম্নরূপ :—

পুরুষ চরিত্র		স্ত্রী চরিত্র
বিঘ্নেশ্বর	সূত্রধার	দিতি (হিরণ্য কশিপুর মা)
ব্রহ্মা	চরগণ	লীলাবতী („ „ রাণী)
ইন্দ্র	দ্বারী	ভূদেবী (ধরিত্রী মাতা)
নারদ	অসুরগন	দাসী
হিরণ্য কশিপু	বালক	ধাই
মন্ত্রী	গজকর্ণ	
শুক্রাচার্য্য	মাহুত	
চন্দমর্ক (শুক্রাচার্য্যের পুত্র)	সাপুয়া	
প্রহ্লাদ	কপ্ত (রাক্ষস)	
ঋষি		

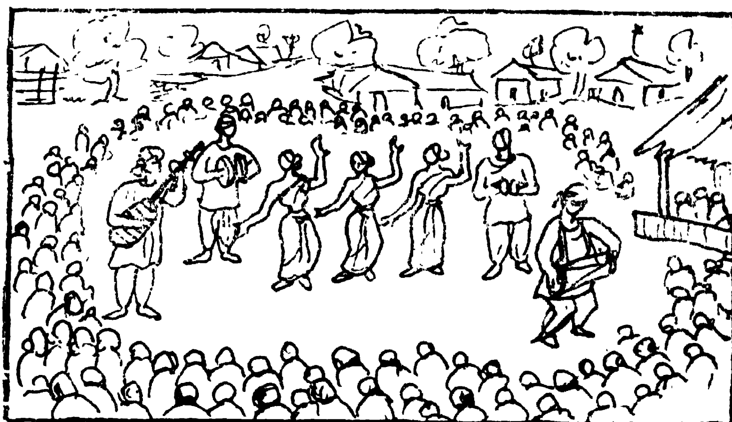
সম্ভবতঃ নৃসিংহপুরাণের জনপ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে 'সুয়াঙ্গা, ও 'লীলা' আঙ্গিকের অনুসরণে 'প্রহ্লাদ' নাটকের সৃষ্টি করা হয়। প্রহ্লাদ নাটকে আমাদের শাস্ত্রীয় নাট্যের প্রভাব খুব বেশী। 'সুয়াঙ্গা' এবং যাত্রাতেও প্রহ্লাদ কাহিনী নিয়ে পালা প্রচলিত আছে। তাছাড়া আছে নটবর ভ্রমরবর লিখিত 'নৃসিংহ রাস'। 'নৃসিংহ রাস' ও বিভিন্ন জায়গায় গীত হয়। প্রহ্লাদ নাটকে সংস্কৃত শ্লোক আছে বিয়াল্লিশটি।

বন্দনা গীতির পর 'গাহক'এর আহ্বানে সূত্রধার অভিনয় ক্ষেত্রে এসে নাটকে ব্যবহৃত রাগ, রাগিনী, বাদ্যযন্ত্র, মুদ্রা, নাট্য শাস্ত্রানুযায়ী নায়ক, নায়িকা নাটকের রসের ব্যাখ্যা দেন।

দ্বারী, 'প্রহ্লাদ' নাটকের বিদূষক চরিত্র, সে রাজার প্রবেশ ও প্রস্থান করার সময়, খবরদার বলে হেঁকে ওঠে, ভাঁড়ের নাচ নাচে এবং লম্বা বাক্যে রাজার স্তুতি করে। সব মিলিয়ে দ্বারী দর্শকদের হাস্যরসের যোগান দেয়।

নাটকে বাস্তবতা আনার জন্য আগে রাজা হিরণ্যকশিপু সত্যিকারের হাতীতে চড়ে মঞ্চে আসতেন। প্রহ্লাদকে হাতী দিয়ে পিষে ফেলার দৃশ্যে সত্যিকারের হাতী, এবং সাপ দিয়ে দংশন করানোর দৃশ্যে মঞ্চে সত্যিকারের সাপ আনা হতো। এখন অবশ্য এসব আর দেখা যায় না। নাটকটি মঞ্চস্থ করতে সময় লাগে চার থেকে পাঁচঘণ্টা। প্রহ্লাদ নাটকের প্রচার প্রসার মূলতঃ রাজানুকুল্যে, তাই এর অন্য নাম রাজা নাটক। এই নাটকে সঙ্গীতেরই আধিক্য, তাই একে সঙ্গীত প্রহ্লাদ নাটকও বলা হ'য়ে থাকে।

মহারাষ্ট্রের লোকনাট্য



□ তামাশা

সাতশো আটশো বছর আগেও মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন সব লোক-আঙ্গিকের প্রচলন ছিল। সন্তকবি একনাথও অনেক প্রহসন-ধর্মী গীতি রচনা করেছিলেন যেগুলি গাওয়া হত বারুদের ঢঙে। এছাড়া প্রহসন-ধর্মী ললিত ও ধর্মমূলক গোন্ধল তো ছিলই। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা এই সব লোক-আঙ্গিককে প্রথম তামাশা বলে অভিহিত করে। এথেকে বোঝাযায় যে ষোড়শ শতাব্দীর আগেই মহারাষ্ট্রে লোক-নাট্যাভিনয়ের চল ছিল। কিন্তু আজ মহারাষ্ট্রের গ্রামে ও শহরে যে তামাশার অজস্র দল বা ফড় মারাঠী জনসাধারনের মনোতুষ্টি সাধন করে চলেছে—তার সূত্রপাত যে কবে থেকে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কেননা, পূর্ব মধ্যযুগের কোনো সাহিত্যে এমনকি দলিল দস্তাবেজেও তামাশার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের কোনো উল্লেখ নেই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রের গ্রাম্য-মানুষের অন্যতম আনন্দ উপকরণ 'গম্‌মত'-কে ব্যাপকভাবে খেল-তামাশা বলা হলেও যে তামাশা আজ আমরা দেখি তার প্রচলন কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে-পেশোয়াদের রাজত্বকালে। তবে তার আগে, ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়কালে মোগল সেনাবাহিনীর চিত্ত-বিনোদের জন্যে উত্তর থেকে কিছু সংখ্যক নাচনী-ওয়ালীকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন জীবিকার প্রয়োজনে ডোম্বরী এবং

কোলহাটি সম্প্রদায়ের লোকেরাও এদের কাছে নাচ শেখে। স্থানীয় কবিদের গান গেয়ে তারাও যোগ দেয় মোগল সেনার চিত্ত-বিনোদনে। ঐতিহ্যসম্পন্ন ধর্মমূলক গোন্ধলের প্রশ্নোত্তর-ধর্মী গীতাভিনয় এবং রাজা ও সামন্ত প্রভুদের বীরত্ব ও যশোকীর্তন পাওয়াড়াও নতুন প্রাণ এনে দেয় এদের সেই আনন্দোপকরণ-মূলক নৃত্যগীতে। এসবের ফলেই ঔরঙ্গজেব-পরবর্তী দাক্ষিণাত্যের অধিপতি শিবাজী-পৌত্র শাহুর সময় তামাশা স্পষ্ট এক নাট্য-আঙ্গিকের চেহারা নিতে থাকে। শাহু স্বয়ং তামাশা শিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন। এরফলে তামাশার শিল্পীরা খুবই উৎসাহিত হয়।

এরপর থেকে প্রায় ১০০ বছর ধরে রাজানুকূল্য পেয়ে বাজীরাও-এর সময়ে এসে তামাশা স্পষ্ট এক নাট্য-আঙ্গিকের রূপলাভ করে। আর রাজা ও সামন্ত-প্রভুদের চিত্ত-বিনোদনই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় তামাশায় প্রথমাবধি স্থূল শৃঙ্গার রসই প্রাধান্য পায় এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের 'মহর' ও 'মাঙ'-রাই কেবলমাত্র এর চর্চা করতে থাকে। ফলে উচ্চবর্ণের লোকেরা একে খুবই ঘৃণার চোখে দেখে—দেখতে থাকে। তবুও প্রায় দুশো বছর আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে তামাশা খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে অশ্লীলতা ও স্থূল রঙ্গ-রসিকতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের বেশ কয়েকজন গুনী শিল্পী তখন তামাশার চর্চায় আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—অনন্ত ফন্দী, রামযোশী এবং প্রভাকর। এঁরা তিনজনই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং সমাজচ্যুত।

এই তিন গুনী শিল্পীর মধ্যে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন রামযোশী। ইনি শোলাপুরের লোক। তামাশা নর্তকীদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার দরুন বড় ভাই রামযোশীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বাড়ি-ছাড়া হয়ে রামযোশী পন্ধর-পুরের কৃষ্ণ-স্বরূপ বিঠোবার মন্দিরে গিয়ে সেখানকার পুরোহিতদের কাছে সংস্কৃত ভাষা এবং আমাদের ধর্মীয় দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তবুও বাড়িতে তাঁর জায়গা হয়না। তখন তিনি পুনরায় তামাশার চর্চায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। গড়ে তুললেন নিজস্ব একটি 'ফড'। নিজের এই দল বা ফড় নিয়ে তিনি মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তামাশা দেখিয়ে বেড়াতে থাকলেন। কাব্য-রচনায় ছিল তার জন্মগত অধিকার। ফলে মহৎ এক কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিলেন তিনি অসাধারণ সব 'লাবণী' রচনা করে। তাঁর রচিত সে সব 'লাবণী-র কাব্যোৎকর্ষ আজও স্বীকৃত। রামযোশীর 'লাবণী-র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাওয়াবাঈ নামে এক বারাঙ্গনা তার লাবনীতে সুর দিয়ে নিজস্ব বৈঠকখানায় অনুগ্রহদাতাদের মনোরঞ্জন করতে থাকে এবং অচিরেই রামযোশীর প্রেমে পড়ে যায়। তখন সে রামযোশীর সঙ্গে থেকে এই গুণী মানুষটিকে অনুপ্রাণিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে বাওয়াবাঈ প্রকাশ্য কোনো সমাবেশে রামযোশীর কোনো 'লাবণী কখনোই গায়নি।

খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠার দরুণ রামযোশী তামাশা প্রদর্শন করে অনেক টাকা আয় ক'রলেন। ফলে সামন্ত প্রভুদের অনুরূপ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকেন তিনি। সেই অর্থ আজ আর নেই, কিন্তু তামাশার ভাণ্ডারে তিনি রেখে গেছেন এমন অনেক লাবণী যা আজকের তামাশাতেও অমূল্য সম্পদ হয়ে অজস্র মারাঠীর চিত্তবিনোদন করে চলেছে। বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, রূপক এবং শৃঙ্গারিক প্রতিবিম্বে উদ্ভাসিত তাঁর অনেক কবিতাও মারাঠী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। যমকের ব্যবহারেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কবিতায় প্রযুক্ত 'পয়োধর' বাচ্যার্থে 'মেঘ' কিন্তু ব্যঞ্জনার্থে 'স্তন'। ফলে তিনি যখন লেখেন 'জল-ভরা মেঘ' তখন শ্রোতার কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় 'দুধ ভরা কালো স্তন'। (যোশীর জন্ম—১৭৬২ খ্রীঃ আর মৃত্যু ১৮১২ খ্রীঃ)।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্য এক কবি বা গীতিকার হলেন 'হোনাজী'। তিনি জাতিতে গোয়ালা। অসাধারণ সব গান তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা গান-গুলি গাইতেন তাঁর সহকর্মী বালা। বালা পেশায় ছিলেন দর্জি। তাদের দলটি 'হোনাজী বালা গম্মত' নামে পরিচিতি লাভ করে। সগনভাউ নামক এক অস্ত্র-নির্মাতা ছিলেন এঁদের 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। বাজীরাও দ্বিতীয়ের দরবারে এঁরা সকলেই সমান মর্যাদায় সমাদৃত হয়েছিলেন।

পেশোয়ারদের সময় তামাশার নর্তকী সাজতো কিন্তু কিশোররা। এদের বলা হতো নাচইয়া-পরৃইয়া। এদের শৃঙ্গারধর্মী নাচ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে বারাঙ্গনারা অবধি এদের কাছে নাচ শিখত—তাদের অনুগ্রহকারীদের মনোরঞ্জন করার জন্য।

ইংরেজ আমলে খুবই স্বাভাবিক কারণে মারাঠা-দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা আর রইল না। তামাশা এখন সম্পূর্ণভাবেই রুচি-জ্ঞানহীন জীবন-বিমুখ ধনী-ভূস্বামী এবং তাদের উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী দুলালদের বিলাস-মাধ্যমে পরিণত হয়। এদের হাতে পড়ে আমাশার স্থূলতা গেল আরো বেড়ে। এমনি এক অধঃপতনের যুগে তামাশার চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন পাট্ঠে বাপু রাও (জন্ম ১৮৮৮ খ্রীঃ মৃত্যু ১৯৪১ খ্রীঃ)। ব্রাহ্মণ বংশীয় এই গায়ক কবির খ্যাতি অতি অল্পবয়সেই ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। বিবাহিত হয়েও বাপুরাও মহর সম্প্রদায়ের মেয়ে পাওয়ালার রূপে মুগ্ধ হলেন। পাওয়ালার গায়ের রঙ ছিল কাঁচা কলাপাতার মত সবুজ। জাত কবি তার মধ্যে আবিষ্কার করলেন সম্ভাবনার বীজ। কাজে কাজেই প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি। তাকে শেখালেন নাচ, গান এবং অভিনয়। পাওয়ালাকে নিয়ে গড়ে তুললেন একটি নতুন দল। এর ফলে তাঁর সম্প্রদায় এবং স্ত্রী-পুত্র পরিবার সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে। ১৯০০ খ্রীঃ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ এই কুড়ি বছরের সময় সীমায় তামাশার জনপ্রিয়তা একেবারে তুঙ্গে পৌছায়। বাপুরাও ও পাওয়ালা জুটির প্রশংসা তখন সাধারণ মারাঠীর মুখে মুখে। এই সময়ে বোম্বাই-এর তিনটি

বিখ্যাত থিয়েটার হল 'দ্য এলফিনস্টোন,' 'দ্য বোম্বে' এবং 'দ্য রিপন'-এ সপ্তায় পাঁচদিন করে তামাশার অভিনয় হতে থাকে। পাওয়ালার খ্যাতিও এই সময়ে একেবারে তুঙ্গে। ফলে অনেক ধনী ব্যক্তি তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে তাকে বাপুরাও থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। নারীর মন বোধহয় শেষাবধি প্রলোভন এড়াতে পারে না। পাওয়ালাও পারলো না। ১৯২০ সালে সে এক ধনীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে। পড়ে থাকেন বাপুরাও একা। ভগ্নহৃদয় বাপুরাও হয়ে পড়লেন হতোদ্যম। ছেড়ে দিলেন তামাশা। অচিরেই টান পড়লো লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে। চললো অনিবার্য উপবাস। এলো আকাঙ্খেয় পরিণতি। লাবণীর শেষ-প্রতিভা মৃত্যুবরণ করলেন অনাহারে। তবুও তারই জন্যে তামাশা আজও এত সমাদৃত। আর পাওয়ালা? সেই হলো তামাশার প্রথম এবং সার্থক মহিলা নর্তকী। পরবর্তীকালের তামাশায় মহিলা-নর্তকীর নিরবচ্ছিন্ন ধারার সেই হলো প্রতিষ্ঠাতা। সবকিছু সত্ত্বেও তাই আজকের তামাশা প্রদর্শকদের কাছে এঁরাই হলেন প্রাতঃস্মরণীয় নমস্য পূর্বসূরী।

বর্তমানে প্রায় ৮০০ ফড় মহারাষ্ট্রের গ্রামে ও নগরে তামাশা দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোরঞ্জন করে চলেছে। অন্যদিক থেকে দেখলে দেখা যায় প্রায় ৪০০০০ লোকের জীবিকা নির্ভরশীল এই তামাশার ওপর। আর পাওয়ালার বংশোদ্ভূত মহর সম্প্রদায়ের প্রায় তিনহাজার মহিলা নর্তকী হিসেবে তামাশার দলে কাজ করে চলেছে।

সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে বা শহরের বস্তী এলাকায় নীচু একটি পাটাতনের উপর তামাশার অভিনয় হয়। দর্শক বসে মঞ্চের তিনদিকে ঘিরে। শহরের প্রসেনীয়াম মঞ্চেও তামাশার অভিনয় হয় এবং কোনো প্রকার মঞ্চ-আড়ষ্টতা সেসব প্রদর্শনীতে দেখা যায় না। পুনার লক্ষ্মীরোডে অহিভূষণ থিয়েটারে প্রতি-রাত্রেই তামাশার অভিনয় হয়।

(গ্রামের দিকে) ঢোলকী ও হলগীর তীক্ষ্ণ আওয়াজ দিয়েই শুরু হয় তামাশার অনুষ্ঠান। ঢোলকী হ'লো একধরনের ঢোলক, কিন্তু এর একমুখে গাব লাগানো থাকে। সর্দার (সূত্রধার) বা মূলগায়েনের গলার সঙ্গে বাঁধা থাকে এর সুর। ঢোলকী যে বাজায় তাকে বলা হয় ঢোলকওয়ালা। আর হলগী হলো একধরনের ম্যাণ্ডোরিন। এর একমুখে চামড়া লাগানো থাকে—অন্যমুখটি থাকে খোলা। বামহাত দিয়ে বাম কানের কাছে ধরে ডানহাতের পাতা ও অঙ্গুল দিয়ে বিভিন্ন বোলে যে এটিকে বাজায় তাকে বলা হয় হলাগ-ওয়ালা। হলগির আওয়াজ খুবই জোরালো এবং তীক্ষ্ণ। কর্-কর্-কর্ করে আকাশ কাঁপিয়ে হলগিই পার্শ্ববর্তী তিনমাইল এলাকার মানুষকে জানিয়ে দেয় যে তামাশা আরম্ভ হতে চলেছে। একেবারে প্রথমপর্বে ঢোলকিওয়ালা এবং হলগিওয়ালা নিজেদের মধ্যে এক অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। ঢোলকি

ও হলগির এই (প্রতিদ্বন্দ্বিতার) বাজনার চমৎকারিত্বের ওপরই তামাশার একটি ফল্ডের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভরশীল। ঢোলকিওয়ালা এবং হলগিওয়ালা ছাড়াও তামাশার বাজনদারদের মধ্যে থাকে মঞ্জীরাওয়ালা এবং তুনতুনাওয়ালা। আলাদা করে মঞ্জীরার পরিচয় দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তুনতুনা হলো একধরনের ত্রিকোণাকৃতির একতারা। তামাশার গানে এরা দুজন দোয়ারকিদারের কাজ করে—অর্থাৎ ধুয়োটানে মূলগায়েনের। নিমগ্নচিত্তে চড়াগলায় যখন এরা ধুয়োটানে তখন একবার মনে হয় এই বুঝি তাদের চোখ-মুখ দিয়ে রক্ত বেরবে ফিনকি দিয়ে, আবার পরক্ষণে মনে হয় গভীর বেদনায় বুঝি তারা কাঁদছে।

দলের সর্দার—একাধারে সূত্রধার এবং মূলগায়েন—মঞ্চমধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ করে চলেন। বর্ণনার সাহায্যে দুটি ঘটনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ক'রে নাট্যকাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলেন সমাপ্তির দিকে। কখনো তিনি আবার চরিত্রের হয়ে গান গেয়ে দেন। সূত্রধার যখন এসব করেন তখন বাজনদাররা তাঁর পেছনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের হাতের কেরামতি এবং গলার মাষ্টারি দেখিয়ে চলে।

ঢোলকিওয়ালার গায়ে থাকে আজানুলম্বিত সাদা আলখাল্লা, তারওপর এমব্রয়ডারি করা ওয়েস্টকোট আর মাজায় বাঁধা থাকে লাল রঙের শেলা বা কোমরবন্ধ এবং মাথায় ফ্যাটা বা পাগড়ী—পরনে থাকে ধুতি। ধুতির দুটি আঁচল বা খুঁটই গোঁজা থাকে পেছনে, ফলে পাদুটো একেবারেই থাকে আলাদা আলাদা। তবে হাঁটুর কাছে বেশ বেশী কাপড় থাকে—এরফলে পা দু'টোকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। সামান্য হেরফের ঘটিয়ে হলগিওয়ালা ও তুনতুনা-ওয়ালা এই ধরনেরই পোষাক পরে। সামর্থ্য থাকলে অবশ্য সোনালী পাড় দেয়া হলুদ, পিঙ্ক ও কমলালেবু রঙের পাগড়ী পরে। কোলাপুরের লোক আবার সব ব্যাপারেই একটু ছুঁৎমার্গী। এখানকার বাজনদার এবং গায়করা আবার ২৫ গজ লম্বা ফিকে নীল, সবুজ এবং অন্যান্য গাঢ় রঙের পাগড়ী পরে। পাগড়ীর উর্দ্ধাংশ আবার বাঁদিকে একটু বেঁকে থাকে। এলাকার কুস্তীগীররাও ঠিক এই ধরনেরই পাগড়ী পরে। ফলে এই পাগড়ী বাজনদারদের মনে স্বতন্ত্র এক গর্ববোধ এনে দেয়।

ঢোলকি এবং হলগির যুগলবন্দীর পরপরই শুরু হয় 'গণ' বা গণেশবন্দনা। গণ তামাশার অবশ্য পালনীয় পূর্বরঙ্গবিধি। গণেশবন্দনার সময় সঙ্গীত-শিল্পীরা সকলেই দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় এবং একবার এগিয়ে একবার পেছিয়ে সমবেতভাবে স্তুতিগান করে। ইহাই তামাশার আবাহন বা গণেশ আরতি। কখনো কখনো আবার হর-পার্বতীর উদ্দেশ্যেও স্তুতি গাওয়া হয়—কেননা এরা পূজ্য গণেশেরই বাবা-মা।

গণেশবন্দনার সময় কোনো স্ত্রীলোকই মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেনা। তবে ভাঁড় (সঙপাত্রা) এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই সময়ে সে অবশ্য আর ভাঁড় নয়। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এক ভক্ত গায়ক বিশেষ।

তামাশার পূর্বরঙ্গ-বিধির পাঁচটি পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো 'গবলন'। আক্ষরিক অর্থে গোয়ালিনী বা কৃষ্ণচরিত্রের গোপী। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তামাশার নর্তকী। সংস্কৃত নাটকে নটী মঞ্চে আসে নাটকের শুরুতেই এবং সূত্রধারের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকাভিনয় শুরু করে। তামাশাতে গবলনের ভূমিকাও প্রায় সেই রকম। কিন্তু তামাশার প্রাসঙ্গিকতায় গবলন হ'লো গীতি। এতে অংশ নেয় গোপীও তার মাসি এবং কৃষ্ণ ও তার সহকারী পেনদিয়া। কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে সাধারণতঃ সোঙাড্যা আর গোপীর মাসির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নারী বেশধারী এক পুরুষ অভিনেতা। এইকারণেই অংশটি দর্শকের কাছে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

পরিবেশনের ধরণে কিংবা তামাশার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দরুণ গবলনের কৃষ্ণ-চরিত্র শৃঙ্গাররসাশ্রিত মানবিক বিষয়ে পরিণত হ'য়ে দর্শককে অপার আনন্দ দেয়। পরিবেশনের লোকধর্মিতাও গবলন অংশকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। গবলনে যে জাতীয় সংলাপ খুবই জনপ্রিয় তার একটু পরিচয় দেয়া গেল।

ঢোলকিওয়ালা। আচ্ছা, দোস্ত ! এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?
কৃষ্ণ । (চক্রাকারে দ্রুত ঘুরতে ঘুরতে) মথুরায়।
ঢোলকিওয়ালা। সেখানে কি দরকার ?
কৃষ্ণ । নানা, ঠিক মথুরায় নয়। এই পথেই একটু কাজ আছে।
ঢোলকিওয়ালা। ওহো ! তুমিতো দুধ বিক্রী করবে। গোপীদের সঙ্গেও দেখা করবে নিশ্চয়ই।
কৃষ্ণ । তুমি একটা গণ্ডমূর্খ দেখছো খালি হাত অথচ বলছো দুধ বিক্রী করতে যাচ্ছি।
ঢোলকিওয়ালা। না মানে খুব ব্যস্ত আর জোরে হাঁটছো কি-না, তাই জিগ্যেস করছি কাজটা কি ?
কৃষ্ণ । কেন, জাননা ? আমার কাছ··· গোপীদের সঙ্গে একটু হাসিঠাট্টা করা। আসলে ওদের কাজ থেকে একটু দুধ খাবো।
মঞ্জীরাওয়ালা । মাথার কলসী থেকে ? না···থেকে ?
কৃষ্ণ । আমি তাদের আঁচল ধরে টানবো এবং ধরে ফেলবো। আর তখনইতো তারা দুধ দেবে।
তুনতুনীওয়ালা । চুপ ! দেখো সে।
কৃষ্ণ । কোথায় ?

তুনতুনাওয়ালা । (মেয়েদের মত করে হাঁটে) তাহলে সে এসে গেছে নূপুর বাজিয়ে পাছা দুলিয়ে। শোনো তার পদবিক্ষেপে কেমন এক মিষ্টি সুর বেজে উঠছে।
(ঘোমটার আড়াল থেকে তীব্র কটাক্ষ হানতে হানতে সঙ্গে আসে তামাশার নর্ত্তকী।)

পেনদিয়া । (গোবলনকে ধরে) কৃষ্ণকে খাজনা দাও। তোমার দুধ। (তামাশার নর্ত্তকী তখন মাথা থেকে কাল্পনিক কলসী নামিয়ে তারপর ঝাঁকিয়ে কৃষ্ণের যুক্ত করে তা থেকে দুধ ঢালার অভিনয় করে এবং গানও গায়।)

হাস্যমিশ্রিত শৃঙ্গার রসাত্মক গবলনের পরের অধ্যায়টি হলো "সওয়াল জওয়াব কী লাওনী"। এই পর্বটি মেজাজে একেবারেই ভিন্ন। জীবনবোধে সমৃদ্ধ এই দার্শনিক অধ্যায়টি তামাশার দর্শককে আবার টানটান ক'রে বসিয়ে রাখে—ফলে সৃষ্টি হয় এক ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ। তামাশার পরিভাষায় একে ঝগড়াও বলা হয়। লোকগীতি ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যবর্তী এক গেয়রীতিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কূটপ্রশ্নের অবতারণা ও তার সমাধান এই অংশের প্রধান আকর্ষণ।

ঝগড়ার পরে আসে রঙবাজি। রঙবাজির সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়ার সেই ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ আবার দূর হয়। সমগ্র আসর আবার মুখর হয়ে ওঠে পেটফাটা হাসিতে। অধিকাংশ ফড় প্রায় অপরিবর্ত্তিতরূপে যে রঙবাজিটি পরিবেশন করে তা হলো স্বামী বাইরে গেছে। ঘরে একা তার স্ত্রী। তিনটি যুবক তখন ষড়যন্ত্র করে তার ঘরে ঢোকার। তাদের সর্দার তখন বন্ধ ঘরের দরজায় আঘাত করে। কিন্তু স্ত্রী লোকটি এদের মতলব বুঝতে পারে। তখন সে একগাল হেসে ঠোঁট উলটিয়ে দাঁড়ায় ছেলেটির মাত্র তিনফুট দূরে। মধ্যে সেই কাল্পনিক দরজা। এই কাল্পনিক দরজার দুইপাশে দুই বিবদমান পক্ষ তখন পরিবেশন করে উপভোগ্য এক মজাদার দৃশ্য।

যুবক । ভেতরে কি আছে কেউ?
স্ত্রীলোক । না।
যুবক । ও। তাহলে যে আছে সে একাই আছে?
স্ত্রীলোক । না।
যুবক । তাহলে? স্বামীরত্নটিও আছেন?
স্ত্রীলোক । না।
যুবক । বাইরে গেছেন বুঝি?
স্ত্রীলোক । না।
যুবক । আমি কি তাহলে ভেতরে আসবো?

স্ত্রীলোক। না।

যুবক। এখন আমি যদি তোমাকে একটু আদর করি তাহলে কি তুমি কিছু করবে?

স্ত্রীলোক। না।

যুবকটি তখন এক ঝটকায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে (অভিনয় মাধ্যমে)। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে লুটোপুটি খায় দর্শক।

আমাদের লোকবিশ্বাস মতে—স্ত্রীলোকের না আসলে হ্যাঁ-ই। ফলে ফুলশয্যার রাতে স্বামী যখন তার বউ-এর ঘোমটা সরাতে চায়—তখনো সে না না ক'রে চলে। ফলে স্ত্রীলোকের না-এর দরজা এক সময়ে ভেঙে ফেলে সব পুরুষই।

রঙবাজির পরের অধ্যায়টি হলো মুজরো। মুজরো হলো শাহির বা সন্তের স্তুতিগান। আজকাল অবশ্য মুজরোর প্রচলন খুব একটা নেই। তবে কোনো কোনো 'ফড়' এখনো বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে মুজরো পরিবেশন করে। ফলে মুজরার ঐতিহ্য এখনো টিকে আছে। একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়নি।

যেহেতু অধিকাংশ 'ফড়' আজকাল আর মুজরো পরিবেশন করে না, সেইহেতু অধিকাংশ অনুষ্ঠানে রঙবাজির পরই আরম্ভ হয় ভগ—বা মূল-নাটক। ভগের বিষয়-বৈচিত্র্য সত্যিই বিস্ময়কর। সেনাপতি এবং রাজার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, বণিক এবং তার স্ত্রীর জীবন, যুদ্ধ করতে গিয়ে বিদেশ ভূমিতে সৈনিকের প্রেম ও তার ফলাফল, কৃপণ-স্বামীর দুই বউ ফলে দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন সব রূপকথা, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক প্রেমগাথা—এর সবই তামাশার ভগে আশ্রয় পেতে পারে। ভারতের অন্যান্য লোকনাট্যের মত ভগও সত্যের জয় হয় এবং অসত্যের পরাজয় ঘোষণা ক'রে সমাপ্ত হয়। পেটফাটা কৌতুক, হৃদয়াবেগে ভরপুর 'লাবনী' কামোত্তেজক নৃত্য, সুললিত কণ্ঠে গীত মধুর সঙ্গীত এবং ঢোলকির মনমাতানো চলন এসবই তামাশার ভগকে অতিমাত্রায় উপভোগ্য ক'রে তোলে। তবে ভগের প্রচলন কিন্তু তামাশায় প্রথম থেকেই ছিল না। যাইহোক বর্তমানে তামাশার ফড়গুলি দুটি ভাগে বিভক্ত। (১) ঢোলকিবারী (২) সংগীত বারী। সংগীতবারী ভগ প্রদর্শন করে না। এরা মুখ্যতঃ গানও তার সঙ্গে নাচ্যার নাচ পরিবেশন ক'রে আসর মাতিয়ে রাখে। বর্তমানে আবার ফিল্মীগানের সংযোজন এদের বেশ জনপ্রিয় ক'রে তুলছে। আর ভগ পরিবেশন করে ঢোলকিবারীর ফড়গুলি।

যাইহোক, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিটি ভগের জন্য বিশেষভাবে রচিত হ'ত লাবনী এবং অভিনয়ের পূর্বে বেশ নিষ্ঠা সহকারে তার তালিম দেয়া হ'ত। কিন্তু সংলাপের পূর্ণ দায়িত্ব থাকত অভিনেতার ওপর। ফড়ের সর্দার কাহিনীর মূল কাঠামোটি শুধু জানিয়ে দিতেন তাদের এবং বেশ ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতেন তার পরিণতি। আর সর্দারের নির্দেশমত অভিনেতা তার কল্পনা শক্তি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা ক'রে কাহিনীকে

পৌঁছে দিত তার ঈপ্সিত পরিণতিতে। ফলে একই ফড়ের একই ভগ ভিন্ন ভিন্ন প্রদর্শনীতে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নিত। কখনোই তা স্বাদু হয়ে পড়ত না। আর এরই জন্যে সমৃদ্ধ হত অভিনেতার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভা। আপন প্রতিভার জাদুস্পর্শে প্রতি অভিনয়েই সে দর্শককে এনে দিত নতুনের স্বাদ। এই ভাবে নিত্য-নতুনের পরিবেশনে তামাশার অভিনেতারা ছিল নজির বিহীন ভাবেই সিদ্ধহস্ত। অন্যদিকে সর্দার অভিনেতার এই সংলাপ-যোজনা অপ্রাসঙ্গিক হ'তে থাকলে অভিনেতার খেয়ালিপনায় বাধা দিয়ে ভগের জন্যে নির্দিষ্ট লাওনী গেয়ে কাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রাখতেন। তারপর তিনি আবার ছেড়ে দিতেন অভিনেতাদের জিম্মায়। এই ভাবেই তখন চলত ভগের অভিনয়। প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বই ছিল তখনকার ভগের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু বর্তমানে, মুখ্যতঃ সরকারী নির্দেশের জন্যেই 'ভগ' লেখা হচ্ছে। ফলে সংলাপ যোজনায় অভিনেতার সৃজনশীলতার পথ একেবারেই বন্ধপ্রায়।

তামাশার জনপ্রিয়তার বোধহয় সবচেয়ে বড় কারণ হ'লো এর লাওনী। লাওনী হলো শৌর্য-বীর্য ও প্রেমভালবাসা সম্বলিত বর্ণনাত্মক কাব্যগীতি। নাট্যকাহিনীর জীবনশক্তি বা মেরুদণ্ড এই লাওনী। প্রধান গায়ক মহোল্লাসে প্রথম পঙক্তিটি গেয়ে দেন। তারপর ক্রমান্বয়ে চড়াগলায় সমবেতভাবে পরবর্তী লাইনগুলি গাওয়া হয় খুবই দ্রুতলয়ে। অনেকটা ছড়ার চলনে। তবে বর্ণনাংশ খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খ। ফলে খুব সহজে কাহিনী অংশটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সর্দার বা মূল গায়েন তখন বাঙ্ময় ক'রে তোলেন গানের কথা বা শব্দ। সূক্ষ্ম-নাটকীয় মুহূর্তে ঢোলকিতে আওয়াজ তোলে ঢোলকিওয়ালা। আর তুনতুন্যাওয়ালা ও মঞ্জীরাওয়ালা তাদের তীক্ষ্ণ গলায় তখন ধুয়ো টেনে চলে। পানের রসে টকটকে লাল তাদের জিবগুলি তখন বেরিয়ে আসে। এদের অফুরন্ত দম—তাই ফুরিয়েও ফুরোতে চায় না। লাবনী কিভাবে কাহিনীর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে, তা এক রাজা ও তার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কাহিনীতে লাবনীর ব্যবহার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কাহিনীর শুরুতেই লাবনীর সাহায্যে রাজার প্রতাপ-প্রতিপত্তির বর্ণনা দেওয়া হয়—জানানো হয় তার কত ঘোড়া, কত সৈনিক আছে এবং একেবারে শেষে জানানো হয় "তার একজন দুর্নীতিপরায়ণ সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন„—এই লাইনটি তখন ধুয়ো হ'য়ে যায়—সমবেত কণ্ঠে তখন গাওয়া হয়—"তার একজন······।" এবারে মূলগায়েন দ্রুত একটি স্তবক গেয়ে ফেলে একক কণ্ঠে। তারপর আবার আসে ধুয়োটি। এইভাবে প্রথম লাওনীটি চরিত্রের পরিচয় দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত ঘটায় এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরবর্তী জটিল নাট্য-ঘটনার রসাস্বাদনের জন্যে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ক'রে তোলে। এবারে আরম্ভ হয় গদ্য সংলাপ, যার অবসান ঘটায় পরবর্তী লাবণীটি। এক একটি লাবণীর পরিবেশনে সর্দারের পরিমিতিবোধ এবং সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কখনো কখনো পরিবেশটাকে একটু পালটে দেয়ার জন্য নাচেরও সংযোজন করা হয় লাবণীর সঙ্গে—এতে ক'রে দর্শক দারুণভাবে আবেগাপ্লুত হ'য়ে পড়ে। এই সময় নর্তকী গান থামিয়ে শুরু করে উদ্দাম-নৃত্য। ঢোলকিওয়ালা এবং অন্যান্য বাদ্যশিল্পীরা তখন নৃত্যের তালে তালে একবার এগোয় একবার পেছোয়। এতে ক'রে নর্তকীর নৃত্যের উদ্দামতা যায় বেড়ে। ফলে উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে দৃশ্যটি।

সাধারণভাবে এক একটি ভগে প্রায় ত্রিশটির কাছাকাছি লাওনী থাকে এবং অভিনয়ের প্রায় অর্ধেক সময় লেগে যায় এগুলির পরিবেশনে। অর্থাৎ নাটকটি যদি তিন ঘণ্টার হয়, তাহলে কেবলমাত্র লাবণী পরিবেশনেই কেটে যায় দেড় ঘণ্টা। অনেক রকমের লাবণী আছে। তবে ভগে প্রযুক্ত লাবণী কাহিনী বিবৃত করে। বেলঘাটি লাবণীতে গাওয়া হয় বিচ্ছেদের গান, দককড় লাবনীতে মূর্ত হয়ে ওঠে চিরকালীন প্রেম, ধোত লাবণী এনে দেয় জীবনের গতি। অন্যদিকে ঝুনরে কোনো সুর-বৈচিত্র্য নেই—একঘেয়ে একটা সুরে বিবৃত হয় কোনো এক কুমারীর বেদনা-বিধুর কাহিনী। যে ধরনেরই হোক না কেন, প্রত্যেকটি লাবনী গাওয়া হয় কিন্তু খুবই আবেগের সঙ্গে। 'পরদেশী' অতি পরিচিত পুরনো এক লাবণী। এর প্রতিটি শব্দ, তার অর্থানুষঙ্গ দর্শক-শ্রোতার অনুপরমাণুতে শিহরণ জাগায়। ভারতীয় ভাষা-সমূহের উদ্ভব-মুহূর্তে উত্তর ও দক্ষিণের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ছোঁয়াচ এই সব লাবণীর শব্দ সঞ্চয়নে স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গীতাংশেও লক্ষ্য করা যায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব। 'কলিংড়া' 'ভৈরব', 'পীলু' 'ইমন', 'ভৈরবী' প্রভৃতি রাগ লাবণীতে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

তামাশার নর্তকী :

বাপুরাও কর্তৃক মহর সম্প্রদায়ের পাওয়লাকে নিজের সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেওয়ায় পাওয়ালার খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা দুইই বেড়ে যায়, বেড়ে যায় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সমাজের নীচুতলার—বিশেষ ক'রে মহর সম্প্রদায়ের—মেয়েরা এই ঘটনায় খুবই অনুপ্রাণিত হয়। ফলে তারা দলে দলে এসে যোগ দেয় তামাশার দলে। তামাশায় সবচেয়ে বেশি সমাদর পায় কিন্তু কোলহাটির মেয়েরা, তাদের অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং শারীরিক কসরতে পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার এবং দক্ষতার কারণে। বর্তমানে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি সংখ্যক নর্তকী তামাশার দলে নেচে গেয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, যে শৃঙ্গার রসাত্মক স্থুল অথচ মন-মাতানো নৃত্য এদের প্রধান হাতিয়ার তা এরা পেয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর কিশোর নর্তকী 'নাচাইয়া পরইয়া' দের কাছ থেকে।

ইলোরার পার্শ্ববর্তী শহর পৈঠান বিশেষ ধরনের শাড়ির জন্য বিখ্যাত। এখানকার শাড়ির নাম তাই পৈঠানী শাড়ি। গাঢ় উজ্জলবর্ণের এই শাড়ির

আকর্ষনীয়তা বাড়িয়ে দেয় সোনালী সব রকমারী ফুল এবং পাড়। নয়গজ লম্বা এই পৈঠানী শাড়ি তামাশার নর্তকীরা এমনভাবে পরে যাতে তাদের দু'খানি পা-ই পৃথকভাবে চলাচল করতে পারে অর্থাৎ নাচের চলনে ও ভঙ্গিতে পরনের শাড়ি যাতে কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি করতে না পারে।

ব্লাউজের রঙ সাধারণতঃ সবুজ এবং টকটকে লাল। ব্লাউজেও রঙিন সুতো দিয়ে তোলা থাকে নানা রকমের ফুল, তবে তা শাড়ির ফুলের চেয়ে আকারে ছোটো। হাফহাতা ব্লাউজের হাতার শেষাংশে থাকে সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ। এদের অলঙ্কার বলতে রঙ-বেরঙের চুড়ি, একধরণের হার, ঝুবাস নামক চটকদার নাকছাবি এবং সোনার ঝরিদার কাঁচুলি। প্রত্যেক পায়েই এরা বেঁধে নেয় একগুচ্ছ ঘুঙুর। এদের সিঁথিতে থাকে সিঁদুর, কপালে থাকে বড় বড় আকারের লাল টিপ, আর হাতের তালুতে ও পায়ের পাতায় শোভা পায় আলতার কারুকার্য। মাথায় থাকে বড় আকারের খোপা, আর তাতে শোভাপায় নানা ফুলের মালা। সব মিলিয়ে সে যখন মঞ্চে এসে অতি অবসন্ন এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তার হরিণ-চোখে আলতো করে চায়, তখন দর্শকের বুকের ভেতরটা যেন একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়। আর সে যখন বামহাত কোমরে রেখে ডানহাত-খানা দুলকি চালে সামনে পেছনে দুলিয়ে কালো চোখের চকিত ঈশারায় অনেক না বলা কথা কয়ে মঞ্চ পরিক্রমণ করে কিংবা উদ্দাম-নৃত্যের মাঝে ঘোমটার ফাঁকে চোখ ও মুখের ভাষায় মায়ার জাল বিস্তার করে, তখন দর্শক একেবারে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে।

আজকের তামাশার জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ এই নর্তকীদের নাচ। কোনো লোক বা শাস্ত্রীয় নৃত্যের সঙ্গে এর কিন্তু কোনো মিল নেই। অনেকে অবশ্য কথকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য কল্পনা করে থাকেন, কিন্তু তা কেবলমাত্র কল্পনাই-কেননা কথকে নাচিয়ের পা মাটি থেকে উপরে ওঠে নৃত্যের তালে তালে। অন্যদিকে তামাশায় নর্তকীদের পা প্রায় কখনোই মাটি থেকে ওপরে ওঠে না। উপরন্তু এই নাচের তাল রাখা হয় গোঁড়ালির আঘাতে। অর্থাৎ এই নাচে যেমন কোলহাটির মেয়েদের শারীরিক কসরতের প্রভাব আছে, তেমনি উত্তর-ভারতের নৌচের প্রভাবও যে একেবারে নেই তাও আবার বলা যাবে না। তবে এর নিজস্বতা এর কমোত্তেজনায়, এর আবেগদীপ্তিতে। তামাশার দর্শককে তাই সবচেয়ে বেশি টানে তামাশার নর্তকী। অভিনয় দেখতে যাওয়ার আগে তাদের সাগ্রহ জিজ্ঞাসা থাকে—"নৌচি" (তামাশার নর্তকী) কে?

তামাশার নর্তকী এবং অভিনেত্রীদের অধিকাংশই অবিবাহিতা। দলের বা দলের বাইরের যাকে তার পছন্দ হয় তার সঙ্গেই সে সহবাস করে—এবং জন্ম দেয় সব অবৈধ সন্তানের। এ ব্যাপারে তাদের কোনো হীনমন্যতা নেই, বরং আছে একধরণের অভিমান-স্ফুর্ত গর্ব।

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে যখন রাজা বা সামন্ত প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্যে তামাশা দেখানো হতো তখন সেই সব আসরে কোনো মহিলা দর্শকের প্রবেশধিকার ছিল না। ফলে নর্তকীর বেশধারী কিশোররা তাদের কল্পনাশ্রিত তাবৎ রঙ্গ-তামাশা প্রদর্শন ক'রত নিঃসংকোচে। পরবর্তীকালের নর্তকীদের গুরু এই কিশোর নাচিয়েরা (নাচইয়া পরইয়া)। ফলে তখনকার সেই স্থুল রঙ্গ-তামাশা সবই পূর্ববৎ আজও বহাল আছে। আইনের চোখ রাঙানিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। কেননা তামাশা দর্শকের অবচেতন মনে এসবের অতি সযত্ন প্রশ্রয় আছে। অন্যদিকে তামাশার নর্তকীরা সকলেই তাদের সমাজ এবং আত্মীয় পরিজনদের দ্বারা পরিত্যক্তা। ফলে এই পচনশীল সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের কাছে কোন দায় নেই তাদের—কেননা তারা মনে করে এই সমাজই তাদের এই শোচনীয় অধঃপতনের মূলে। সকলেই তাদের ঘৃণা করে কুনজরে দেখে। ফলে প্রদর্শনীর সময় তাদের ভেতরের জিঘাংসা-পরায়ণ মনোবৃত্তি খুবই সোচ্চার হয়ে ওঠে—তাই অল্প সময়ের জন্যে হ'লেও সভ্যতার মুখোশপরা দর্শক সমাজকে নারীর বিধ্বংসী শক্তির দ্বারা প্রলুব্ধ ক'রে আপন পায়ের তলায় ফেলে দলিত-মথিত করতে চায়—এবং করেও।

বিষয় এবং পরিবেশনগত কারণে তামাশা দুটি ভাগে বিভক্ত। ভাগ দুটি হলো সঙ্গীতবারী এবং ঢোলকবারী একথা আগেই বলা হয়েছে। ছয় থেকে সাতজন শিল্পী নিয়ে গঠিত হয় সঙ্গীতবারীর একটি দল। বাজনদারদের মধ্যে একজন হারমোনিয়াম একজন ক্লারিওনেট এবং একজন ড্রাম নিয়ে মঞ্চের একপাশে বসে। সঙ্গীতবারী নাটক বা 'ভগ' পরিবেশন করে না। এরা মনোহর নৃত্য সহযোগে অতি সুললিত গান পরিবেশন করে। বলাই বাহুল্য যে নাচ ও গানের জন্যে তিন-চার জনের এই দলটি গঠিত হয় মেয়েদের নিয়ে। তামাশার একটি আসরে অনেকগুলি সঙ্গীতবারীর দল একের পর এক তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনেক সময় একই আসরে সঙ্গীতবারী ও ঢোলকীবারী তাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সে সময় সঙ্গীতবারীর অনুষ্ঠানটি ঢোলকিবারীর অনুষ্ঠানের অর্থাৎ ভগের বা নাটকের আগে কার্টেন-রেইজারের কাজ করে থাকে। তবে তামাশা বলতে মুখ্যতঃ ঢোলকীবারীর দলকেই বোঝায়। এরাই নাটক বা ভগ পরিবেশন ক'রে থাকে। ১৫ থেকে ২৫ জন অবধি শিল্পী নিয়ে ঢোলকী-বারীর একটি দল গঠিত হয়।

সমগ্র মহারাষ্ট্রে আজ প্রায় ২০০ থিয়েটার হল আছে, আর এদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে কমপক্ষে চারটি করে তামাশার দল যুক্ত। বেলগাঁও, শোলাপুর এবং কোলাপুরের দিককার থিয়েটার হলগুলি তো আজ সম্পূর্ণভাবে তামাশার উপরই নির্ভরশীল। অহিভূষণ থিয়েটার পুনার একমাত্র ব্যবসায়িক মঞ্চ। এখানে প্রতি-দিনই কোনো না কোনো দলের তামাশা পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। দলের খ্যাতির

সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই হয় দর্শকের সমাগম। থিয়েটার হলের সামনে তাই সম্বৎসরই ঝোলানো থাকে তামাশার রঙ বেরঙের পোষ্টার।

পছন্দমত নায়ক-নায়িকা মঞ্চে উপস্থিত না থাকলে তামাশার দর্শক আসন ছেড়ে বাইরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। প্রিয় নায়ক-নায়িকা মঞ্চে এলে সে আবার সাগ্রহে আসন নেয়। অন্যান্য সব প্রদর্শনীর মত আর্থভূষণ থিয়েটারেও এটা লক্ষ্য করা যায়। প্রিয় এবং মনমাতানো নর্তকীর আগমনে দর্শকের সম্মিলিত আনন্দোচ্ছাস যেন গিয়ে আছড়ে পড়ে মঞ্চের ওপর। যারা আবার নিজেদের একটু বীরপুরুষ বলে মনে করে—তারা বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায় একেবারে মঞ্চের সামনে, নগদ-অর্থে পুরস্কৃত করে তাদের স্বপ্নের রাণীকে। নর্তকী তখন মধ্য মঞ্চ ছেড়ে মঞ্চের সম্মুখভাগে এসে স্বীকার ক'রে নেয় সেই পুরস্কার, নেয় সাধারণতঃ পেটের দিকে নজর রেখেই। দর্শক তাকে অনুরোধ করে তার প্রিয় লাবনী গাওয়ার জন্যে। নর্তকী প্রাপ্ত অর্থ রেখে দেয় সর্দারের কাছে বা হারমোনিয়ামের ওপর। প্রদর্শনী শেষে এইভাবে প্রাপ্ত অর্থের দুইভাগ মেয়েদের এবং একভাগ ছেলেদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেয়া হয়। এই অর্থকে বলা হয় 'দৌলত জ্যাদা। কেননা তামাশার প্রচলিত রীতি অনুসারে দর্শক যখন নগদ অর্থ দিয়ে তামাশার নর্তকীকে উৎসাহিত করে তখন নর্তকীও স্মিত হাস্যে তাদের ধনবৃদ্ধির কামনা করে। ফলে কেবলমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই যে এইভাবে অর্থসাহায্য দেয় তা কিন্তু নয়—অনেক গরীবলোকও এই দৌলতজ্যাদা (নগদ অর্থ ও প্রথাটির নাম)-য় অংশ নিয়ে থাকে। দৌলত জ্যাদার সময় স্থূল নৃত্যানুষ্ঠানে কিন্তু ছেদ পড়ে না—তখন অন্য আরেকজন নর্তকী এসে নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। তারপর পুরস্কর্তার অনুরোধ মত আগের নর্তকী লাবণী পরিবেশন করে। এই সময়ে তামাশার দর্শক যেন আত্মহারা হ'য়ে পড়ে। তখন তারা একের পর এক অংশ নেয় দৌলতজ্যাদায়। মেতে ওঠে আসর। দৌলতজ্যাদা কিন্তু শিল্পোৎকর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন নয় বরং এটি হলো নর্তকীর কামোত্তেজক এবং স্থূল রঙ্গ তামাশার প্রতি সাধারণ জনতার স্বাভাবিক এক প্রতিক্রিয়া। সরকার থেকে তাই তামাশার অনুষ্ঠানে দৌলতজ্যাদা নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু তামাশা নর্তকীর স্বাভাবিক আয় এত কম যে সরকারী এই নিয়ম লঙ্ঘন ক'রতে কেউই তেমন অনুৎসাহী নয়। দৌলত জ্যাদা তাই আগের মত এখনও আছে—সুদূর ভবিষ্যতেও এ বন্ধ হ'য়ে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

প্রসেনিয়াম মঞ্চে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতবাদীর বাজনদাররা বসে উইংসে। আর উইংসে অথবা সাইক্লোরামার পেছনে পাতা কাঠের বেঞ্চে অথবা ড্রেসের বাকসের ওপর ব'সে নর্তকীরা পান বিড়ি খেতে খেতে মঞ্চে উপস্থিত হবার জন্যে অপেক্ষা ক'রতে থাকে। সব মিলিয়ে তামাশার পরিবেশ বেশ অস্বাস্থ্যকর।

আমরা আগেই দেখেছি যে তামাশার জনপ্রিয়তার মুখ্য কারণই হলো এর

নর্তকী। অথচ নর্তকীদের জন্তে মাসিক বেতনের নিশ্চিত ব্যবস্থা এখনো তামাশায় অপ্রচলিত। আগেকার মত এখনো তাদের মজুরি দেয়া হয় দৈনিকহারে। মজুরির পরিমাণও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তাছাড়া তামাশার প্রতিটি ফড়ে আবার একজন দু'জন করে এক্সট্রা নর্তকী থাকে। এদের মজুরি তো একেবারেই নামমাত্র। তবে অন্যান্য জায়গার চেয়ে জলগাঁও এর নর্তকী বা শিল্পীদের বেতন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

পাটঠে বাপুরাও-এর মন্ত্রশিষ্য মঙ সম্প্রদায়ের ভাউ-বাপু খুড়ে নারায়ন গাঁও-করের নামাঙ্কিত ফড়টিই সম্ভবত এখন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বিখ্যাত তামাশার দল। ভাউ-বাপুর ভাইপো বাপুরস খুড়ে এখন এই ফড়ের সর্দার। এই বাপুরসই একমাত্র তামাশা-শিল্পী যিনি 'সঙ্গীত-নাটক একাডেমি' পুরস্কার পেয়েছেন। ভাউ বাপুর তিন মেয়ের এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাছাড়া পাঁচ, ছটি ক'রে সন্তানের জননী হওয়া সত্বেও তারা এখনো অন্যান্য তামাশা নর্তকীর মতই দর্শকদের আনন্দ দিয়ে চলেছে।

আজকের তামাশা সবচেয়ে অভিজ্ঞ ঢোলকিওয়ালা হলেন দামাজী কোরে গাঁওকর কোম্পানীর ঠাককু। ঠাককুর বয়স এখন প্রায় সত্তর বছর। কড়াপড়া হাতে যখন তিনি ঢোলকিতে তাঁর কেরামতি দেখান, তখন অন্য কেউই, এমনকি নর্তকীও আর দর্শককে আকর্ষণ ক'রে রাখতে পারে না। বিস্মিত চোখে সকলেই তখন তাকিয়ে থাকে ঠাককুর দিকে।

নতুন যেসব শিল্পী বিশেষ করে নর্তকী আজকাল তামাশায় আসছে, তামাশার নিজস্ব শৈলীতে তারা একেবারেই অনভিজ্ঞ। ফলে চলতি ফিল্মের হিটগানের দ্বারাই তারা দর্শককে খুশি করার চেষ্টা করছে। এতে করে সঙ্গীত-বারির ছোটো ছোটো দলগুলির জনপ্রিয়তা তাই আগের থেকে আজ অনেক বেশি। তাই নর্তকীদের গান আজ ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত। অন্যদিকে তুনতুনাওয়ালা, মঞ্জীরাওয়ালা এবং নর্তকী ঢোলকিবারীর পরিবেশনের বিষয় ও রীতিতে পুরনো ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে অনেক প্রতিভাবান সমকালীন নাট্যকারও নাট্যকর্মী তামাশার বিষয় ও অঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভেঙ্কটেশ মদগুলকারের হুতাশনী, পি-এল দেশ-পাণ্ডের 'সরবেস্ত।' খুবই সফল। জি-ডি. সদগুলকার এবং বসন্ত বাপতের নামও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

তামাশা ও তামাশার জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে মারাঠীতে বেশ কয়েকখানি চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে—এর সব কটিই বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে বেশ সফল। এগুলির মধ্যে রামযোশীর জীবনী' এবং 'সঙ্গতে আইকা' খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

স্বাধীনতোত্তর কাল থেকে কমিউনিষ্টপার্টি তামাশাকে তাদের প্রচার-মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার ক'রে আসছে। মঙ সম্প্রদায়ের আন্না ভাউ সাঠে এবং অমর

শেখ এ ব্যাপারে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লাওনী ও ভগের সফল প্রয়োগ করে তাঁরা হাজার-হাজার মেহনতি মানুষকে মার্কসীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উদ্দীপিত করে তুলেছেন। তামাশাকে কাজে লাগিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন—যাতে করে তামাশা থেকে স্থূল রঙ্গ-রসিকতা দূর করা যায়। সরকারও নানা বিধি নিষেধ আইনবদ্ধ করেছেন। ফলে 'তামাশা বোর্ড অফ মহারাষ্ট্রের' 'নো অবজেকশন' স্ট্যাম্প ব্যতিরেকে তামাশার কোনো অনুষ্ঠান না হওয়ারই কথা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই আইন কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা সেখানকার আমলারা অবধি তামাশার রঙ্গ-তামাশার সমজদার। সামগ্রিক ভাবে তামাশা পূর্ববৎ স্থূল এবং অসংস্কৃত রয়ে গেছে।

তামাশার সংস্কার কার্যে হাত দেয়ার আগে একটা কথা সকলেরই মনে রাখা দরকার যে উচ্চবর্ণের লোকের কাছে যেটা অশ্লীল সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের কাছে তা সকল সময় অশ্লীল নাও হ'তে পারে। তাছাড়া প্রচলিত অর্থের স্থূলতা তামাশা-দর্শকদের দুঃখ-কষ্ট যেমন দূর করে, তেমনি দূর করতে সাহায্য করে তাদের ভেতরকার সামাজিক ভেদা ভেদও।

(খ) "ললিত"

সন্ত তুকারামের একটি অভঙ্গে ললিতের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে ললিত মধ্যযুগে প্রচলিত এক লোক-নাট্য। তুকারামের অভঙ্গটি হলো—

গলিত ঝালী কায়া।
হৈচি ললিত পন্ঢরিরায়া॥

নবরাত্র-উৎসবের শেষদিন রাত্রে উৎসব দেবতা সিংহাসনারূঢ় হন—এই বিশ্বাসে ঐ দিনরাত্রে কয়েকটি স্বাঙ্গ অভিনয় করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব দেবতার কাছ থেকে প্রসাদ পাওয়ার অভিনয় ক'রে সেই প্রসাদ উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। নাটকের মতই কুল দেবতার বেশধারণ ক'রে যে অভিনয় করা হয়—তাই ললিত। তুকারামের উপরের অভঙ্গটিতে যে ললিতের উল্লেখ আছে তার অর্থটি অবশ্য ভিন্ন। যাইহোক—কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন—লীলা থেকেই এসেছে ললিত। মধ্যযুগে বিভিন্ন অবতারের বেশধারণ ক'রে তাঁদের জীবনের নানা কাহিনী গান ও অভিনয়ের সাহায্যে (মঞ্চোপরি) প্রদর্শন করার একটা রীতি প্রচলিত ছিল। ইহাই লীলানাট্য হিসেবে পরিচিত। লীলা নাটকের মতই নৃত্যগীত সহযোগে অভিনয় মধ্যযুগের সমস্ত লোক-ধর্মী নাট্য-আঙ্গিকের অন্যতম চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য। লীলা নাটকের মত

ধর্মের প্রচারও এই সব নাট্যআঙ্গিকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লীলার ব্যাপক অর্থে এগুলিকেও তাই লীলা বলাটা অন্যায় হবে না। সেদিক দিয়ে ললিতকেও লীলা বলতে কোনো বাধা থাকে না। অনেকে আবার মহারাষ্ট্রে সন্ত কবিদের রূপকাশ্রিত কাব্যশৈলী ভারূড়কেই ললিতের উৎস বলে মনে করেন।

ভাষা ॥

প্রাচীন ললিতের কিছু কিছু অংশ আজও উপলব্ধ। এই সব অংশের ভাষা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ণ করলে ললিতের উৎস সম্বন্ধে অন্য এক ধারণা জন্মে। ললিতের ভাষায় উত্তর-ভারতের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। ললিতের স্টক ক্যারেক্টার চোপদার এবং পাতিল শুদ্ধ হিন্দীতে কথা বলে। গ্রাম্যভাট এবং রাজভাটও কথা বলে হিন্দীতেই। ললিতের মধ্যে প্রায়ই হিন্দী সংলাপের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আজকের মত যখন হিন্দীর প্রচার ছিল না তখনও সাধারণ মানুষ এই সব সংলাপ নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো। নাহলে—এর প্রচলন বা প্রযোগ উঠে যেত। এ থেকে মনে হয় ললিত উত্তর-ভারত থেকেই মহারাষ্ট্রে এসেছিল। আসলে মারাঠী নাটক বিকসিত হয়ে ওঠার অনেক আগেই ললিত হিন্দী গন্য-দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। দক্ষিণী হিন্দী তখন উত্তরের হিন্দী থেকে পর্যাপ্ত নাট্য-সামগ্রী আহরণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলো। মারাঠী সন্তদেরও কেউ কেউ এই সময় হিন্দীতে কবিতা বা পদ রচনা করেছিলেন। আর ললিতের প্রচারে সন্ত কবিদেরও ভূমিকা ছিল, কেননা ললিত মূলতঃ ধর্মীয় নাট্য। সব মিলিয়ে সেসময়ের মারাঠী নাট্যে হিন্দীর স্বীকরণ অনেকটাই সহজ হয়ে পড়েছিল।

পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বোম্বাই নিবাসী দাদাপন্ত ললিতাভিনয়ে নতুন জোয়ার নিয়ে এলেন। তিনি পুণার সাওজী মল্লপা, বরোদার বাধোজী বুওয়া এবং বোম্বাই-এর পাটিল বুওয়াকে নিজ নিজ দল গড়ার অনুপ্রেরণা দিলেন। দাদাপন্ত যে এই তিনজনকে কেবলমাত্র দলগড়ার অনুপ্রেরনাই দিলেন তা নয়, তিনি তাদের নিজের কাছে এনে অনেকদিন রেখে ললিতাভিনয়ের শিক্ষাও দিলেন। মারাঠী বিদ্বানদের অভিমত—ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক মারাঠী নাটকের পূর্বসূরী হলো ললিত। কেননা উত্তর-মধ্যযুগে ধর্মীয় ও অর্দ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনী ললিত-নাটকের জনপ্রিয় বিষয় হ'য়ে ওঠে। ললিতের ওপর তাঞ্জোরেরও প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঞ্জোরে নবরাত্রোৎসবে অভিনীত নাটক ললিতেরই সদৃশ। মুখ্যতঃ দক্ষিণ তাঞ্জোরে যেখানে মারাঠী শাসক ছিলেন সেখানে মারাঠী নাটক অবশ্যই প্রশ্রয় পেয়েছিল। অন্যদিকে অনেকে আবার মনে করেন গোয়ার তটবর্তী এলাকায় এবং ব্রিটিশ শাসিত কোঙ্কণে যে সব নাটক অভিনীত হতো—তার সঙ্গে বাংলা যাত্রার মিল খুব বেশি। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলের নাটকে বাংলা-যাত্রারও প্রভাব পড়ে থাকবে। মহারাষ্ট্রে তাই নাট্যোকোৎসব 'যাত্রা' নামে পরিচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে মারাঠী ভাষায় প্রথম নাটক লেখা হয় আর মারাঠী-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রে ললিতের প্রচার-প্রসার ও জনপ্রিয়তা খুব-বেশি ছিল।

ললিতের বেশভূষা খুব চটকদার বা আড়ম্বরপূর্ণ নয়। চোপদার সাধারণতঃ মাথায় পাগড়ী পরে, হাতে নেয় ছড়ি আর লাল আংরাখা, লাল সালোয়ার, দুপট্টা এবং কোমরপটী ব্যবহার করে থাকে। পাটিলের পরিধানে সাদা আংরাখা, পায়জামা, পাগড়ী এবং দুপট্টা থাকে। আর বিদূষকের পায়ে থাকে ঘুঙুর মাথায় উঁচু টুপী এবং কপালে বড় তিলক আঁকা। ললিতের অনেক কাহিনী দারুণভাবেই মনোরঞ্জনাত্মক। ফলে স্বাঙের অনুরূপ পোষাক প'রে চরিত্ররা মঞ্চে আসে। আধ্যাত্মিক বিষয়ও খুবই সরল ভঙ্গীতে হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে অভিনীত হ'য়ে থাকে। কাহিনীর অর্থ করার সময়ও হাসির ছলে অনেক গূঢ় তত্ত্ব দর্শকের গোচরীভূত করা হয়। ললিতের উল্লেখযোগ্য স্বাঙগুলির মধ্যে চাধ্যা-মুরলী অন্যতম। চাধ্যা-পুরুষ আর মুরলী নারী। নেচে গেয়ে এরা এই স্বাঙখানি পরিবেশন ক'রে থাকে। এরা উভয়েই মাহ্লারীর মত্তণ্ডদেবের ভক্ত। অনুষ্ঠানের সময় গ্রাম-প্রধান এদের নাচ-গানের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর পছন্দমত পদ গাওয়ার ফরমায়েশ করে। আর তারাও তাদের নাচ গানের আসরে সেই সব পদ গেয়ে পাটিল ও অন্যান্য দর্শকদের আনন্দ দেয়।

উত্তর ভারতে প্রচলিত হাসি ঠাট্টায় পরিপূর্ণ স্বাঙের প্রভাব ললিতে আছে—এবং একটু বেশী মাত্রাতেই। একরাত্রির এক অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ থেকে ষাটখানি স্বাঙ্গ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। মারাঠী বাগধারা—রাত্রথেড়ি নি সোগে ফর—এই স্বাঙ্গ বহুলতারই পরিচায়ক।

(গ) ॥ গোন্ধল ॥

গোন্ধল এক ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রথা বিশেষ। মহারাষ্ট্রে প্রাচীনকাল থেকেই গোন্ধলের প্রচলন আছে। গোন্ধলে দেবীস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণাত্মক অভিনয় সযত্নে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। আর এই কারণেই গোন্ধল লোক-নাট্য হিসেবে স্বীকৃত। (তাছাড়া) আধুনিক মারাঠী নাটকের বিকাশে গোন্ধল প্রয়োজনীয় উপকরণ-অভিজ্ঞতারও যোগান দিয়েছে। শব্দগত অর্থের দিক থেকে গোন্ধল মানে হ'লো—বিশৃঙ্খলা। তবে গোন্ধল এসেছে 'গণ-দল'-এর উচ্চারণ বিকৃতি থেকে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে শঙ্করের ১১ জন রুদ্রগণ মনিকর্ণিকা ঘাটে তপস্যা করেন। তাঁদের তপস্যায় খুশি হয়ে শঙ্কর তাঁদের ডমরু, সর্প, বাঘছাল, গঙ্গা, চন্দ্র, ভস্ম, রুদ্রাক্ষমালা ইত্যাদি দিয়ে খুশি করেন। রুদ্রগণ শঙ্করের একনিষ্ঠ ভক্ত। পরবর্তীকালে তাই গণ বলতেই বোঝায় ভক্ত। স্বভাবতই ভক্তবৃন্দ হলো গণদল। এই গণদলই বিকৃত হয়ে হয়েছে গোন্ধল।

শঙ্করের ভক্তবৃন্দের কাছে মন এবং বাণীর গোচরীভূত এই বিশ্ব হলো গ-কার (বা গ-রূপী) আর জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভাবরূপী অগোচর বিশ্ব হলো ণ কার। এই দু'য়ের সম্মিলনই হলো 'গণ'। আর এই গণের যিনি স্বামী তিনি হলেন গণেশ (গণ+ঈশ)। অর্থাৎ গণের স্তুতির অর্থ গোচর ও অগোচর বিশ্বেরই স্তুতি। আর স্তুতিগান যারা করে তারাই গোন্ধল রূপে পরিচিত। গোন্ধল সম্প্রদায়কে বলা হয় গোন্ধলী। কিন্তু আজ আর গোন্ধলী ভক্তরূপে মান্য নয়। চার-পাঁচশো বছর আগে থেকে তারা শঙ্করের স্তুতি না করে জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিশ্বের আদিজননীর বন্দনা করে আসছে। সম্ভবতঃ নিজেদের যজমানদের মনোতুষ্টি সাধনেই তারা দেবীরস্তুতিগানে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। কেননা বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই মহারাষ্ট্রে শক্তিপূজারই প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রের লোক-সাহিত্যের একটা বড় অংশ দখল করে আছেন এই শক্তি (দেবী)। তাছাড়া বনশঙ্করী, ভবানী, দুর্গা, তুকাঈ, কমল ভৈরবী, একবীরা, যমাই, রেনুকা প্রভৃতি রূপে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন মন্দিরে তিনি পূজা পেয়ে আসছেন। এই সব মন্দিরে প্রতিবছরই মহাধুমধামের সঙ্গেই ভক্তবৃন্দ এঁদের পুজো করে থাকে। স্বভাবতঃই ভক্ত-সম্প্রদায়গুলো অর্থাৎ গোন্ধলীরা শক্তির এই ব্যাপক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। মারাঠী সন্ত কবি নামদেব গোন্ধল নামে এক স্বতন্ত্র অভঙ্গ রচনা করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে নামদেবের আগেও গোন্ধলের প্রচলন ছিল।

সাধারণতঃ বিবাহানুষ্ঠানেই গোন্ধল-এর আয়োজন করা হয়। খণ নামক এক-ধরনের কাপড় বিছিয়ে তার ওপর কলম ও আম্রপত্র সহযোগে অম্বামাতাকে স্থাপন করে গোন্ধলী গোন্ধল আরম্ভ করে। পাওয়াড়া প্রভৃতি পদ গ্রাম্যবাদ্য সহযোগে খুবই উৎসাহের সঙ্গেই গাওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। ধর্মানুষ্ঠানে গাওয়ার অবসরে নাট্যাভিনয় মূর্ত হয়ে ওঠে।

গোন্ধলের সঙ বা অভিনয়াংশ খুবই আকর্ষক। ধর্মাচার সম্পর্কিত প্রাথমিক কথাবার্তার পর গোন্ধল আরম্ভ হয়। পূজারীর অনুকরণ করতে করতে হাস্য-রসের অভিব্যক্তি খুবই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই সময় কখনো কখনো সমাজের কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে সেই সমাজের ধারণাও প্রকাশ পায়। আর এরই স্বাভাবিক ফল যে তিক্ততা তা এড়ানোর জন্যে গোন্ধলী এখানকার ঘটনা ওখানে আর ওখানকার ঘটনা এখানে দেখানোয় সিদ্ধ-হস্ত হয়ে ওঠে।

মহারাষ্ট্রের তুলজাপুর অঞ্চলে গোন্ধলীদের বলা হয় পোতরাজ। শোনা যায় দেবীপূজার সময় কদম্বরাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। কাকুৎস্থ (৫৩৫ খ্রীঃ) মৃগেশ (৫৭০ খ্রীঃ) এবং ভানু (৬০০ খ্রীঃ) ছিলেন কদম্ব বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। ষষ্ঠ শতাব্দীতেই চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মা কদম্বদের পরাস্ত করেন। তখন থেকে চালুক্যরা তুলজাপুরের ভবানীকে নিজেদেরও কুলদেবতা বলে স্বীকার করে।

চালুক্যদের এই বিজয়-অভিযানের আগে অবধি কদম্বরাজ বরাবরই তুলজাপুরে আয়োজিত দেবীর উৎসবে উপস্থিত থাকতেন। এখানে পোতরাজ বা গোন্ধলী গলায় কড়ির মালা পরতো। আর দেবীর গলায় শোভাপেত সোনার পুতুলের মালা। শিবাজীর সময় মহারাষ্ট্রে এক নতুন জাগরণ আসে। এই সময় পাওয়াড়া ছন্দে বীরগীতি গাওয়ার গুরুদায়িত্বও ঘাড়ে নেয় এই পোতরাজরাই।

সে যাইহোক, দেবীর স্তুতির পর গোন্ধলীরা নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে সমবেত দেবীর ভক্তদের মনোরঞ্জন করতো। আর তারই ফলে গোন্ধল লোক-নাট্য হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে।

গোন্ধল দুইভাগে বিভক্ত। সাধা গোন্ধল বা মারাঠী গোন্ধল। এতে ভক্তি-রসেরই প্রাধান্য এবং কীর্তনের মত এরও পূর্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ রয়েছে। (২) কৃত্যে আরাধী ও পোতরাজদের গোন্ধল। আঙ্গিক ও বিষয়-বৈচিত্র্যই এর অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য।

মারাঠী গোন্ধলে অংশ নেয় চারজন। মুখ্য গোন্ধলীকে বলা হয় নাইক অর্থাৎ নায়ক। ঝাঁঝ হাতে নিয়ে নায়ক কাহিনী বলে চলে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এর সঙ্গে হাস্যরসাত্মক বিষয়ের অবতারণা করে। তৃতীয় ব্যক্তি পয়সা তোলে আর চতুর্থ ব্যক্তি তুণতুণে নামক বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

মুখ্যপ্রসঙ্গের মধ্যে হাসির সংযোজনের ফলে উপকাহিনী গড়ে ওঠে। এই অন্তকাহিনীর সরসতা নির্ভরশীল নাটকীয় প্রকাশভঙ্গীর ওপর। একজন গদ্যে কিছুটা অংশ বলে যায়—তারপর আরেকজন গানের সাহায্যে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই গান গাওয়ার ঢঙ বা রীতি যেমন গায়কের নিজস্ব তেমনি পরম্পরাশীল। গোন্ধল অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যেমন বিধিসম্মত এর অভিনয়াংশও তেমনি প্রথাবদ্ধ। পোতরাজরা সকলেই প্রায় নিরক্ষর। তবুও ভাষার প্রতি তাদের দখল সাহিত্যানুরাগী মানুষকেও মুগ্ধ ক'রে দেয়। ধর্মীয় সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় পরিবেশিত হয়ে থাকে গোন্ধলে। তবে ধর্ম সম্পৃক্ত নাটকীয়তা গোন্ধলকে অধিকতর জনপ্রিয় করেছে। চারণদের মত যশ—বর্ণনার নৈপুণ্য যেমন আছে পোতরাজদের, তেমনি আছে নাটকীয় প্রকাশ কৌশলের চমৎকারীত্ব। পোতরাজদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতারই ফসল এটি। সাধুসন্তেরা গোন্ধলের উদ্ভব ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আজ একে বাঁচিয়ে রেখেছে সাধারণ মানুষ।

দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই গোন্ধলের একটি অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। কোনো খোলা জায়গাতেই সাধারণতঃ গোন্ধলের আয়োজন করা হয়। আর দর্শকরা সকলেই দাঁড়িয়ে থাকে। অনুষ্ঠানের মাঝে দর্শক গোন্ধলীদের কাছে নানাবিধ প্রশ্ন করে তার উত্তর জেনে নেয়। প্রচলিত জনবিশ্বাস মতে দেবী স্বয়ং গোন্ধলীদের জিহ্বায় ভর করেন। ফলে গোন্ধলীদের উত্তরকে বেদবাক্য মনে

করে তারা শিরোধার্য্য করে নেয়। সেই যাইহোক গোন্ধল পরিবেশনের সময়ও সময়সীমার কোনো স্থিরতা বা বিধি-নিষেধ নেই। দিনের বেলায় তো গোন্ধল হয়ই। আবার সমস্ত রাত ধ'রেও হতে পারে। গোন্ধল পরিবেশনের জন্য কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না।

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সম্পন্ন কোনো শুভ কাজের আরম্ভে গোন্ধল আয়োজিত করা হয়—এবং গোন্ধলের সাহায্যেই সমস্ত দেবী ও দেবতার আবাহন করা হয়। লোকের বিশ্বাস এতে শুভকার্য বাধাহীনভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে।

তবে গোন্ধলীরা একনিষ্ঠ ধার্মিক বা ভক্ত নয়, সেই কারণে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই তারা তাদের মনের আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটায়। আর লোক-নাট্য-হিসেবে গোন্ধলের অস্তিত্বও এখানেই।

ধর্মীয় বিশ্বাসের চরিতার্থতা, নিরক্ষর মানুষের কাব্যপ্রতিভার বিকাশ এবং মনোরঞ্জন ইত্যাদি কারণে গোন্ধল সেই প্রাচীন কাল থেকে আজও খুবই জনপ্রিয় লোক-নাট্য হিসেবে মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের জীবনে নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে।

(ঘ) দশাবতার ॥

হিন্দুধর্ম মতে ভগবান বিষ্ণু এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহুবারই অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তবে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। আর বিষ্ণুর এই দশ-রূপকেই একত্রে দশাবতার বলা হয়।

বৈদিক সাহিত্যে, পুরাণে ও মহাকাব্যে বিষ্ণুর প্রত্যেক অবতার লীলার বিস্তৃত বিবরণ আছে। তবে সংক্ষেপে বললে বলতে হয় যে মৎস্যাবতার প্রজাপতি মনুকে মহাপ্রলয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আর কূর্মাবতারে তিনি ধারিত্রীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। নৃসিংহ অবতারে তিনি দৈত্য সম্রাট হিরণ্য-কশিপুকে হত্যা করে ভক্তপ্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলেন আর বামনাবতারে তিনি দৈত্যরাজ বলীকে পদানত করেছিলেন. পরশুরাম একুশবার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজা রাবণকে বধ করে সীতা উদ্ধার করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণাবতারে বিষ্ণু বহু বিচিত্র লীলা করেছিলেন। তবে এই অবতারে তাঁর প্রধান কীর্তি কুরুবংশ ধ্বংস এবং পাণ্ডবদের নায়কত্বে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনা। বুদ্ধ অবতারে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন আর ভক্তজনের বিশ্বাস কল্কি অবতারে তিনি এই কলিযুগে পুনরায় ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করবেন।

বহুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত আছে। তবে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাজদের রাজত্বকালে এই বৈষ্ণবধর্ম খুবই প্রসারলাভ করেছিল

গুপ্তরাজারা প্রায় সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং 'পরমভাগবত' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবেই খুব প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে কৃষ্ণযাত্রার প্রচলন ছিল। অবশ্য ঠিক কবে থেকেই যে এর প্রচলন হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা এখনো সম্ভব হয় নি। তবে খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে লিখিত ভাসের 'বালচরিত'-এ বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের উল্লেখ আছে। কিন্তু দশাবতারের সবচেয়ে উজ্জল নিদর্শন মেলে জয়দেবের গীত-গোবিন্দে। গীত-গোবিন্দের প্রথম সর্গের অষ্টপদী শ্লোকে সবিস্তারে বিষ্ণুর দশ-অবতারের গুণ-কীর্তন করা হয়েছে। ফলে অচিরেই গীত-গোবিন্দের এই দশাবতার-অষ্টপদী সমগ্র ভারতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কেরালার কথাকলির পূর্বরঙ্গে আজও গীত-গোবিন্দের কোনো না কোনো পদ গীত হয়। ফলে গীত-গোবিন্দের এই দশাবতার-অষ্টপদীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা অনেককেই দশাবতার নাটক পরিবেশনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তবে এই পৃথকভাবে দশাবতার নাট্য-শৈলী প্রচলনের অনেক আগে থেকেই নাটকে বিষ্ণু দশাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়ে আসছিলেন। ফলে শুধুমাত্র ভাসের বালচরিতেই নয়, নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণেও বুদ্ধ ব্যতিরেকে বিষ্ণুর বাকি নয় অবতারের বিভিন্ন মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ উপলব্ধ হয়।

দশাবতারের সেই প্রাচীন ধারার অনুসরণে বর্তমানেও মহারাষ্ট্রে, গোয়ায় এবং কঙ্কণেও দশাবতার নাটক প্রচলিত আছে। তাছাড়া কর্ণাটকের যক্ষগানও 'দশাবতার আটা' নামে পরিচিত।

মহারাষ্ট্রে দশাবতার খেল মধ্যরাত্রে আরম্ভ হয়ে সূর্যোদয়ের পর সমাপ্ত হয়। একেবারে শুরুতে সূত্রধার মঞ্চে এসে গণেশের বন্দনা গায়। বন্দনাগীতি শেষ হলে মঞ্চে আসেন স্বয়ং গণেশ। সাধারণতঃ মঞ্চ থেকে ১০ থেকে ২০ গজ দূরে থাকে সাজঘর। এই সাজঘর থেকে মঞ্চে আসার জন্যে একটি রাস্তা থাকে। দর্শক এই রাস্তা ছেড়ে রেখে তবে আসন গ্রহণ করে। নাটকের প্রধান অপ্রধান সব চরিত্রই সাজঘর থেকে বেরিয়ে নাচতে নাচতে এই পথ দিয়েই মঞ্চে আসেন। দশাবতারের চরিত্রের মঞ্চাবতরণ তাই খুবই আড়ম্বর পূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। যাইহোক বন্দনাগীতির পর গণেশের সঙ্গে এই পথ দিয়েই নাচতে নাচতে মঞ্চে আসেন সরস্বতী। গণেশ ও সরস্বতী প্রস্থান করলে মঞ্চাবতরণ ঘটে শঙ্খাসুরের। শঙ্খাসুর তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেখাতে থাকে। এমনি সময়ে মঞ্চে আসেন মৎস্যরূপী বিষ্ণু। ঘোরতর যুদ্ধে শঙ্খাসুরকে পরাস্ত করে তিনি বেদোদ্ধার করেন। এমনি করে বুদ্ধও কল্কি ব্যতিরেকে বিষ্ণুর অন্য আট অবতারের লীলা একে একে পরিবেশিত হয়। দশাবতারের কোনো একটি আসরে সব অবতারের লীলা সমান গুরুত্ব পায় না। তবে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সব আসরেই একটু বেশি গুরুত্ব পান। ফলে রাম ও কৃষ্ণলীলা বিশদভাবেই পরিবেশিত হয়। আজকাল অবশ্য অনেক জায়গায় সব আসরে সব অবতারের লীলা প্রদর্শিত হয় না। তবে কোন্

আসরে কোন্ অবতার আবির্ভূত হবেন তা নির্ভর করে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর চাহিদা এবং দল-পরিচালকের ইচ্ছার ওপর।

কোনো পাত্র মঞ্চে প্রবেশ করা মাত্রই সূত্রধার দর্শকের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। মঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রথমে পাত্র স্বয়ং তার পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক একক নৃত্য পরিবেশন করে, পরে স্বগতোক্তির সাহায্যে আপন উদ্দেশ্য ও কর্ম-পরিকল্পনা ব্যক্ত করে।

দশাবতারের বিদূষক চরিত্রের নাম 'মহাদবী'। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে মহাদবী সংস্কৃত নাটকের বিদূষক মাধব্যেরই অপভ্রংশ। যাইহোক, 'মহাদবী' সব চরিত্র এমনকি দর্শকের সঙ্গেও সহজ ভাষায় সরল হাস্য-পরিহাস করে থাকে।

দশাবতারের প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র হলো ঝাঁঝ এবং মৃদঙ্গ। দশাবতারের মঞ্চ খুবই সাদাসিধে। সাধারণতঃ দেড় দু'ফুট উঁচু বর্গাকার একটি চৌপায়াই দশাবতারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মঞ্চের যেদিকে সাজঘর থাকে, সেইদিকে রঙিন একখানি পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মঞ্চের একপাশে বাজনদাররা বসে।

বহু-বিচিত্র মুখোশ দশাবতারের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফলে প্রত্যেক চরিত্রই মুখোশ ব্যবহার করে থাকে। মুখোশগুলি কাঠের তৈরী এবং ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক রঙ ও রেখায় চিত্রিত। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সাজ-সজ্জাও চরিত্রানুরূপ এবং পৌরাণিক বিশ্বাসের পরিপূরক।

আগে মহারাষ্ট্রে দশাবতারের প্রচলন থাকলেও ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে দশাবতার-অভিনয়ের কোনো উল্লেখ কোনো গ্রন্থে এমন কি দলিল-দস্তাবেজেও পাওয়া যায় না। মনে হয় এই সময়ে কোনো এক অনুপলব্ধ কারণে মহারাষ্ট্রে দশাবতার-অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আজ যে মহারাষ্ট্রে দশাবতার-অভিনয় প্রচলিত তার সূত্রপাত করেন শ্যামজী কালে নায়েক। ইনি ছিলেন পূর্ব কর্ণাটকের অধিবাসী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে তিনি মহারাষ্ট্রে দশাবতার-অভিনয়ের পুনঃপ্রচলন ঘটান।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বঙ্গদেশেও আগে দশাবতার অভিনয়ের প্রচলন ছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদের উৎসাহে এখানে দশাবতাব খুবই প্রসার লাভ করেছিল। দক্ষিণ কোঙ্কণ এবং গোয়াতেও যাত্রা নাটকের সূচনায় দশাবতার পরিবেশিত হত। মহারাষ্ট্রের অনেক জায়গাতেও দশাবতারকে যাত্রা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ফলে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে সেই প্রাচীন কালেই বেশ ঘনিষ্ঠ এক সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা যায়। বাংলার ফরিদপুরেও এক সময়ে অবতার নৃত্যের প্রচলন ছিল। এই অবতার নৃত্যে একই ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে দশাবতারের নৃত্য পরিবেশন করত।

আসলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসারের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-নাট্যে অবতার নাট্যের প্রচলন হয়েছিল। তবে মহারাষ্ট্রের দশাবতার তার উপস্থাপন ভঙ্গির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যই স্বতন্ত্র একটি লোক-নাট্য-আঙ্গিকের দাবিদার।

মধ্যপ্রদেশের লোকনাট্য

(ক) পাণ্ডওয়ানী

পাণ্ডওয়ানী (বা পাণ্ডববাণী) ছত্তিসগড়ের গীতিধর্মী লোকনাট্য-আঙ্গিক। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, সাধারণতঃ পাণ্ডবদের কাহিনী বা মহাভারতের বিভিন্ন অংশই এর অবলম্বিত বিষয়। তবে বর্তমানে পাণ্ডওয়ানী একটি স্বতন্ত্র লোকনাট্য আঙ্গিক হওয়ায় মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীও এই মাধ্যমে পরিবেশিত হ'তে দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, একজন গায়ক বজ্রাসনে বা হাঁটু গেড়ে বসে (বাসিনের ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গন, পুণারাম নিসাদ, চেতন প্রভা যাদব প্রমুখ) বা দাঁড়িয়ে (ভিলাই-এর তিজনবাঈ) তম্বুরা বাজিয়ে মহাভারত (বা রামায়ণ)-এর কাহিনী ভাবমুদ্রাসহ স্থানীয় লোকগীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সাহায্যে গেয়ে চলেন। একজন দোহারকিদার (বা রাগী) তাকে সাহায্য করে এবং সমগ্র গীত-অংশের সঙ্গত করে করতাল এবং মঞ্জীরা বাদক। পাণ্ডওয়ানীর মঞ্চ একেবারেই সাধারণ। দর্শকাসনের সমতলে দর্শক পরিবেষ্টিত সামান্য একটু জায়গা।

মহাভারতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বলা হ'য়ে থাকে যে ব্যাসদেব এর কাহিনী বিবৃত করেছিলেন এবং গণেশ তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই বিবৃতিদান এবং তা লিপিবদ্ধ করার কাজটি সম্পন্ন হয়েছিলো কিন্তু পারস্পরিক শর্তারোপের মধ্য দিয়ে। ব্যাসদেবের আগ্রহে গণেশ জানিয়েছিলেন যে তিনি লিপিবদ্ধ করতে রাজি আছেন, তবে ব্যাসদেবকে বিরামহীনভাবে অনর্গল কাহিনী বিবৃত ক'রে যেতে হবে। মহামতি ব্যাসদেব এই শর্তে রাজি হ'য়ে গণেশকে বলেন বিবৃতকরণে ব্যাকরণ দোষ থাকে কিন্তু লিপিবদ্ধকরণে এই দোষ থাকলে চলবে না। গণেশ এতে রাজি হলেন। ফলে মহামুনি ব্যাস অনর্গল ভাবে বলে যান মহাভারতের কাহিনী আর তা ব্যাকরণ-সিদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ করেন গণেশ। এক্ষণে এই শর্তারোপে কে কতখানি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তার বিচার না ক'রে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মহাভারতের কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে শ্রুতিরূপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। আর সম্ভবতঃ সেই কারণেই ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় লোকবিশ্বাস জড়িয়ে আছে।

মধ্যপ্রদেশের—ছত্তিসগড়ও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানকার মানুষের দৃঢ়

বিশ্বাস পাণ্ডবরা এখানেও এসেছিল। ফলে মোরধ্বজের কাহিনীটি (বিলাসপুরের) রতনপুরের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। এমনকি এই রতনপুরে কৃষ্ণার্জুনী নামক একটি পুকুরও আছে—যা পাণ্ডবদের স্মৃতিচিহ্ন এখনো বহন ক'রে চলেছে। ফলে ছত্তিসগড়ের পাণ্ডওয়ানীতে যে মহাভারত গীত (অভিনীত) হয় তা ব্যাসদেবের মহাভারতেরই ছত্তিসগড়ী রূপবিশেষ। ফলে কেবলমাত্র মহাভারতের চরিত্রগুলিই এতে আছে—তার সমস্ত ঘটনাই প্রায় নিজস্ব রঙে রঞ্জিত।

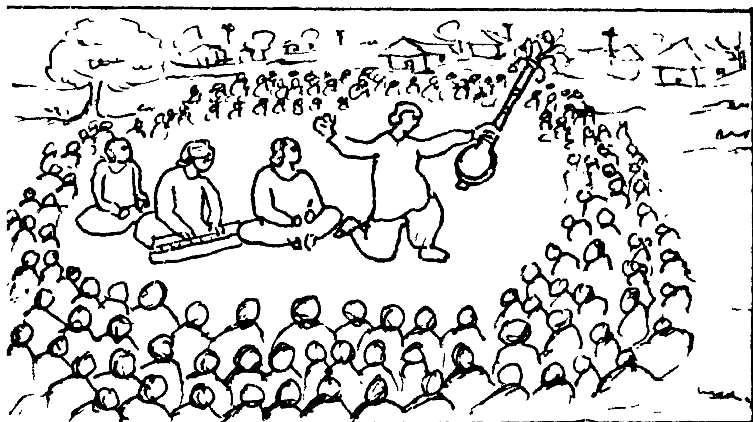
পাণ্ডওয়ানীর আবার দুটি শাখা (১) কপালিক শাখা এবং (২) বেদমতি শাখা। কপালিক শাখার পাণ্ডওয়ানী যদিও পাণ্ডব-সম্বন্ধীয় তবে ওর নায়ক হ'লেন ভীম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলিকাতার পঞ্চমবৈদিক প্রযোজিত 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর নায়কও ভীম। ফলে এর কাহিনীতে এই কপালিক শাখার পাণ্ডওয়ানীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট। যাইহোক কপালিক শাখার পাণ্ডওয়ানী সম্পূর্ণরূপে ছত্তিসগড়েরই মহাভারত, ফলে ছত্তিসগড়ের সমাজজীবন এই পাণ্ডওয়ানীতে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পাণ্ডওয়ানীর কপালিক গায়ক স্থানীয় লোক-বিশ্বাস এবং ঘটনা আশ্রয় করেই পাণ্ডওয়ানীর প্রস্তুত ও পরিবেশন ক'রে থাকে। কপালিক শাখার পাণ্ডয়ানী কপালিক গায়কের স্বকপোল কল্পিত, তাই এই শাখার নাম হয়েছে কপালিক।

বেদমতী শাখার পাণ্ডওয়ানী হলো—বেদ অর্থাৎ শাস্ত্র সম্মত পাণ্ডব কাহিনী। এই শাখার পাণ্ডওয়ানী জনশ্রুতি নির্ভর পাণ্ডওয়ানী থেকে স্বতন্ত্র এবং মহামুনি ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুসারী। বেদমতী শাখার পাণ্ডওয়ানী গায়কেরা আবার দু'টি দলে বিভক্ত। একদলের গায়কেরা ব্যাসকৃত মহাভারতের মৌখিক বা লোকায়ত ধারার অনুসারী এবং অন্যদলের গায়কেরা সবলসিংহ-কৃত মহাভারত লোকশৈলীতে পরিবেশন ক'রে থাকে। বলাই বাহুল্য পাণ্ডওয়ানীর প্রবাদ-পুরুষ ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গন এই দ্বিতীয় দলটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। যাইহোক, মৌখিক ধারার কাহিনীও কিন্তু শাস্ত্রসম্মত এবং এর পরিবেশন রীতি সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। এই ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় গায়ক হলেন বিলাসপুরের আনন্দরাম সংনামী। আনন্দরাম পাণ্ডওয়ানীর পরিবেশনে তম্বুরা (তিন তার বিশিষ্ট এক তারের একটি বাদ্যযন্ত্র), তম্বুরা বানানোর জন্যে একটি মোটা তার—যার একমাথায় একতোড়া ঘুঙুর বাঁধা থাকে—ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আবার তম্বুরা এবং করতাল, আবার কেউ কেউ তম্বুরা, করতাল, তবলা এবং মঞ্জীরা ব্যবহার করে থাকে। তম্বুরা এবং করতালের ব্যবহার গায়ক নিজেই ক'রে থাকেন। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন সঙ্গতকারী যন্ত্রীরা। মূল গায়কের

একজন দোহারকিদার থাকে, পাণ্ডওয়ানীর পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'রাগী' (রাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ)। রাগী মূল গায়কের সঙ্গে দোহারকি বা ধুয়ো টানার ফাঁকে ফাঁকে শ্রোতৃমণ্ডলীকে নানাভাবে হাসানোরও চেষ্টা করে থাকে। মূল গায়কের পরনে থাকে দু'টি পা পৃথক ক'রে পরা ধুতি, গায়ে থাকে কুরতা (যার নিম্নভাগ ঝালরের মত হাঁটু অবধি নামানো)। এদের গলার দু'পাশ দিয়ে সামনের দিকে ঝোলানো থাকে ভাঁজ করা একখানি চাদর বা দু'পাট্টা, গলায় থাকে হার। মাথা খালিই থাকে, তবে কেউ কেউ মুকুটও পরে থাকেন। অন্যান্যরা ছত্তীসগড়ের দৈনন্দিন পোষাকেই পাণ্ডওয়ানীতে অংশ নিয়ে থাকে। বাদ্যযন্ত্র ও পোষাকের ক্ষেত্রে পাণ্ডওয়ানীতে কোনো শ্রেণীভেদ দেখা যায় না।

যাইহোক, আগেই বলা হ'য়েছে যে অন্য ধারাটির নেতৃত্ব দেন বাসিনের ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গণ। এই ধারার প্রবর্ত্তক ঝাড়ুরাম স্বয়ং। ঝাড়ুরামও তাঁর কুশলী শিষ্যদের জন্যই এই ধারাটির প্রচার প্রসার এবং খ্যাতি সর্বাধিক।

ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গণ এবং পাণ্ডওয়ানী



ভিলাই থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে বাসিন নামক গ্রামে ১৯১৭ সালে ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গনের জন্ম। খুবই অল্প বয়স থেকেই দেবাঙ্গন পাণ্ডওয়ানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ঝাড়ুরামই প্রথম পাণ্ডওয়ানীর সংস্কার কার্যে হাত দেন। মহাভারতের নাম ক'রে কিংবদন্তী তথা কল্পনা-প্রসূত কাহিনী পরিবেশনের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে ঝাড়ুরাম একে শাস্ত্র-

সম্মত ক'রে তোলার চেষ্টা করেন। আর এর জন্য তিনি সাহায্য নিলেন সবল সিংহকৃত দোহা ও চৌপাইতে বিধৃত মহাভারতের কাহিনী। পরিবেশনের সময় তিনি ছত্তীসগড়ী ভাষার ব্যবহার করেন তবে শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করেন না। পাণ্ডওয়ানী পরিবেশন করা হয় দুই ভাবে।—(১) 'গায়ন' দ্বারা এবং (২) টীকা বা 'প্রবচন' দ্বারা। মুখ্য গায়ক ছত্তীসগড়ের লোকগীতির সাহায্যে মহাভারতের গান ক'রে টীকা সহকারে ছত্তীসগড়ের ভাষাতে তার ব্যাখ্যাও দেন। ঝাড়ুরাম একটি চৌপাই-এর ব্যাখ্যা করেন তিন ভাবে—গূঢ়ার্থে, যথার্থ অর্থে এবং শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের কথা মনে রেখে। গায়কীতে তিনি ছত্তীসগড়ের লোকস্বরের প্রয়োগ করেছেন অন্যান্য পাণ্ডওয়ানী গায়কদের মত করে। তবে তাঁর অবদান হ'লো এই যে তিনি একে নিশ্চিত মাত্রায় বেঁধে একে শাস্ত্রসম্মত করে তুলেছেন। ঝাড়ুরাম তার পাণ্ডওয়ানীতে ৩২টি রাগের ব্যবহার করে থাকেন। এক একটি দোহা বা চৌপাইতে তিনি পৃথক পৃথক রাগের প্রয়োগ করেন। কখনো কখনো আবার রাগ একই থাকলেও চলনের গতি কখনো মন্থর কখনো বা দ্রুত করে দোহা, চৌপাই-এর স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেন।

পাণ্ডওয়ানীতে রাগীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে যেমন মূল গায়েনকে বিশ্রাম দেয়, তেমনি গায়কীর স্বর ও মেজাজ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। নীচের পদটিতে রাগীর ভূমিকা কতখানি তা দেখানো হ'লো।

মূল গায়েন—ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গন
রাগী—রামানাথ যাদব।
মূল গায়েন—চরণ কমল বলিহারি,
রাগী—রঘুনাথ কুঁঅর কী রামা
মূল গায়েন—শোভ বরননি জাঈ
রাগী—রঘুনাথ কুঁঅর কী।
মূল গায়েন—অতি প্রসন্ন স্বনহি ভূপালা।
রাগী—রঘুনাথ কুঁঅর কী রামা
মূল গায়েন—জো প্রতিপালহি ইয়হী সংসারা
রাগী—রঘুনাথ কুঁঅর কী
মূল গায়েন—তুম সম ইয়হ সংসার ন কোঈ
রাগী—রঘুনাথ কুঁঅর কী
মূল গায়েন—তে নর পরম মো সম হোঁহি
রাগী—রঘুনাথ কুঁঅর কী
চরণ-কমল বলিহারি
রঘুনাথ কুঁঅর কী রামা।

রাগীর ধুয়ো ছাড়াও দেবাঙ্গণ নিজে গানের মাঝেমধ্যে প্রায়ই 'রামে, রামে, রামে, গা ভাই'—এই ধুয়োটি ব্যবহার করেন। এতে দর্শক সকল সময়ই মূল কাহিনী সম্পর্কে সচেতন থাকে। আর এই ধুয়োর আরেকটি আনুষ্ঠানিক অর্থ হ'লো—নূতন সুর, তাল পরিবেশিত হতে যাচ্ছে। দেবাঙ্গণের শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। একটানা কাহিনী শোনার যে স্বাভাবিক বিরক্তি তাও এই ধুয়োতে দূরীভূত হয়।

পাণ্ডওয়ানীর পরিবেশনে ঝাড়ুরাম নির্দিষ্ট কোনো অভিনয় পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। ঝাড়ুরাম নিজে বলেন—পাণ্ডওয়ানী গাওয়ার সময় আমি পাণ্ডওয়ানীর এত গভীরে নিমগ্ন হয়ে পড়ি যে অভিনয় করার কথা একেবারেই মনে থাকে না। কিন্তু চরিত্র অনুসারে অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্যে আমার হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক সবই যেন স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ভীমের প্রসঙ্গ এলে দেবাঙ্গণের ভারী মুখখানি হঠাতই বেলুনের মত ফুলে ওঠে, চোখদুটো হয়ে ওঠে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বড় এবং জবাফুলের মত লাল। চোখ-মুখের এরকম এক অভিব্যক্তি নিয়ে তিনি তখন হাতের তম্বুরাখানি এমনভাবে ব্যবহার করেন যে দর্শক তখন সেটিকে ভীমের গদা বলে মনে করে। আবার পরক্ষণেই অর্জুনের বীরত্বের বর্ণনার সময় হাঁটুতে ভর দিয়ে হাতের তম্বুরাখানি ধনুকের অনুরূপে বাম হাত দিয়ে ধ'রে ডান হাতের মুঠো ডান কানের পাশে এনে ভ্রূকুঁচকে রক্তিম চোখে এমনভাবে নিশানা করেন যে দর্শক তখন গাণ্ডীব হাতে মহাভারতের অর্জুনকে চাক্ষুষ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কোলকাতার নাট্যামোদী দর্শক পুনারাম নিষাদ (নান্দীকারের জাতীয় নাট্যাৎসব '৮৪তে) ও তিজন বাঈ (পদাতিকের নৃত্য-নাট্যাৎসব—'৮৬)-এর পাণ্ডওয়ানীতে এটা চাক্ষুষ করেছেন। বিচিত্র হস্তোপকরণ হিসেবে তম্বুরার নাট্যধর্মী প্রয়োগ পাণ্ডওয়ানীর আকর্ষণীয়তা তথা জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। যাইহোক ঝাড়ুরামের অভিনয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ শিল্পসম্মত ও আকর্ষণীয় ভূমিকা পালন করে তাঁর ঠোঁট এবং চোখ। প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হতে না হতেই ঝাড়ুরামের ঠোঁট এবং চোখ তাদের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিতে দর্শককে সম্পূর্ণভাবেই বিস্মিত ক'রে দেয়।

ফলে ঝাড়ুরাম (ও অন্যান্য প্রোথিতযশা পাণ্ডওয়ানী গায়ক বৃন্দ)-এর অভিনয় শাস্ত্রের বন্ধনহীন এক স্বাভাবিক অভিনয়—যা বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বতই অভিব্যক্ত হয়। স্বাভাবিক অভিনয় যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের স্পষ্টিকরণে সক্ষম তা পাণ্ডওয়ানীর গায়কদের, বিশেষ করে ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গণের পাণ্ডওয়ানী না দেখলে কল্পনা করাও অসম্ভব।

ঝাড়ুরাম তম্বুরা, করতাল, মঞ্জীরা প্রভৃতি পাওওয়ানীর প্রচলিত যন্ত্র ছাড়াও হারমোনিয়াম এবং ব্যাঞ্জো ব্যবহার করে থাকেন।

(খ) মাচ ॥

মধ্যপ্রদেশের লোকনাট্য বলতে আমরা কেবলমাত্র 'মাচ'-এর উল্লেখ করে থাকি। তবে পাওওয়ানী, নাচা, কাঠি, গম্মত, স্বাঙ্গ, রাঈ প্রভৃতি অতি সমৃদ্ধ লোকনাট্য আঙ্গিক এই প্রদেশের অসংখ্য মানুষের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ ক'রে থাকে। তবে এসব লোকনাট্য-আঙ্গিকের কোনোটিই, মুখ্যত: ভাষাগত কারণে, তার আঞ্চলিক ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সমগ্র প্রদেশের লোকনাট্য হ'য়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু মালওয়ার মাচ এব্যাপারে স্বতন্ত্র নজির সৃষ্টি করে মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্যের স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে। ফলে মাচ আজ আর কেবলমাত্র মালওয়া তথা মধ্যপ্রদেশেরই লোকনাট্য নয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতেও বর্তমানে মাচের জনপ্রিয়তা প্রায় কল্পনাতীত। এখানে সংক্ষেপে 'মাচ'-এর আলোচনা করা হলো।

মাচ: 'মাচ' শব্দটি মঞ্চেরই অপভ্রংশ। বাংলা মাচার মত এরও অর্থ বিস্তৃতি আছে। তবে মধ্যপ্রদেশের মালওয়ায় মঞ্চ নির্মাণ করে তার ওপর অভিনয় করার সমগ্র প্রক্রিয়াটিই 'মাচ' নামে পরিচিত। অর্থাৎ বর্তমানে 'মাচ' হলো মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্য।

মহাকবি কালিদাসের বাসভূমি উজ্জয়িনী বা উজ্জৈন হলো মাচের উৎসভূমি, আর এর প্রসার ক্ষেত্র হলো মালওয়া। আজ থেকে দুশো বছর আগে মালওয়াতে লোকানুরঞ্জনের বিবিধ সব মাধ্যম প্রচলিত ছিল। এরমধ্যে কৃষ্ণের জীবনাশ্রিত ঢারাঢারীর অভিনয়, নৃত্যগীতি 'গরবা' এবং প্রতিযোগিতামূলক কাব্যগীতি 'তুর্রাকলঙ্গী-র ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। তবে স্বাঙ্গ, নকল এবং ভাণও এই সময়কার মালওয়ার জনজীবনকে ভীষণভাবেই প্রভাবিত করেছিল। আজকের মাচ ঐতিহ্যসম্পন্ন কোনো এক স্বতন্ত্র লোক-নাট্য-আঙ্গিকের পরিণতি বিশেষ নয়। কেননা মাচের প্রবর্তনে উপরে উল্লেখিত লোক-আঙ্গিক-গুলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আজ থেকে দু'শো বছর আগে, রীতিকালীন বিলাসিতার যুগে 'মাচ' তার বর্তমান রূপ লাভ করে। এই সময়ে মালওয়ার জনজীবনে ভক্তিভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে। ফলে রীতিকালীন বিলাসিতা সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের মত এখানকার জনজীবনকেও প্রভাবিত করে। এই সময়ে মালওয়া ছিল ছোটো ছোটো সামন্ত প্রভুদের অধীনে। বড় কোনো উদ্দেশ্য সামনে না থাকায় এদের অধিকাংশ সময় কাটতো বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়ে। ফলে বিভিন্ন সব আমোদ উপকরণের সঙ্গে শিল্প-মাধ্যমগুলিরও কপালে জুটলো রাজাশ্রয়। তার দরুণ জনজীবনেও এই সব শিল্পমাধ্যমের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। সামন্ত প্রভুরা বিভিন্ন সব উৎসব আসরে স্বীকৃতি ও উপহার দিয়ে এই সব লোক-

শিল্পীদেরও সাহায্য করতে থাকলেন। এই সময়ে সামন্ত প্রভুরা লোকপ্রতিভার সাহায্যে জনগণের ধর্মীয় ও শৃঙ্গারাত্মক পিপাসা দূর করতে থাকলেন। ফলে চারাচারীর অভিনয়, গরবা-নৃত্য, স্বাঙ্গ-নকল এবং তুর্রা-কলঙ্গীর প্রচার প্রসার গেল বেড়ে। তবুও এই সব শিল্প মাধ্যমগুলি প্রসার লাভ করেছিলো বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে। এইসব বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোক-মাধ্যমগুলি থেকে উপকরণ—অর্থাৎ চারাচারীর অভিনয় থেকে অভিনয়, গরবা থেকে সঙ্গীত, তুর্রা-কলঙ্গী থেকে কাব্যগীতি এবং স্বাঙ্গ নকল থেকে অভিনয়, হাস্য-পরিহাস ও রসালো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-সংগ্রহ করে উজ্জয়িনীর প্রতিভা সম্পন্ন লোকশিল্পী বা গুরুরা তাঁদের সহযোগী শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুললেন নতুন এক অভিনয় আঙ্গিক, যা পরবর্তীকালে গুরু বালমুকুন্দের সময়ে এসে 'মাচ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

মাচের প্রথম-পর্বের রূপকারদের মধ্যে একজন হলেন উজ্জয়িনীর গুরু গোপালজী। ১৮৫০ সম্বতে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ভৈরবের আশীর্বাদ নিয়ে নিজে দল গড়ে উজ্জয়িনীর ভাগসীপুরায় নাট্যাভিনয় শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর এই নাট্যাভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লোকমুখে গোপালজীর নাট্যাভিনয়ের প্রশংসা শুনে জয়সিংহ-পুরার গুরু বাল-মুকুন্দজী একদিন তাঁর তান্ত্রিক বন্ধু সুখরান এবং শেঠ মুকুন্দরামজীকে সঙ্গে নিয়ে ভাগসীপুরায় গেলেন এই নাট্যাভিনয় দেখতে। সেদিন গোপালজীর নাট্যাভিনয় দেখার জন্য খুব ভিড় হয়েছিল। জায়গা না পেয়ে বালমুকুন্দজী সঙ্গীদের নিয়ে মঞ্চের এক কোণে গিয়ে বসলেন। সমবেত ভাগসীপুরবাসী এতে করে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। সমবেত-ভাবেই তাঁরা বালমুকুন্দজীকে বললেন—অভিনয় দেখার যদি—এতই শখ তো নিজের জায়গায় তার আয়োজন করলেই তো পারো। এঘটনায় খুবই অপমানিত হলেন গুরু বালমুকুন্দজী। সঙ্গীদের নিয়ে তিনি তৎক্ষণাতই সেই অভিনয়ক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। পরে সুখরানের অনুপ্রেরণায়, শেঠরাম মুকুন্দজীর সহযোগিতায় এবং ভৈরবের আশীর্বাদ নিয়ে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। বলাই বাহুল্য সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে ১৯০১ সম্বত্তে শুরু করলেন জয়সিংহ-পুরার নাট্যাভিনয়। বালমুকুন্দের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি নিজে ১৬ খানি মাচ রচনা করেন, যার মধ্যে ১০ খানি মাচ প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রতিম রচনা, অদ্বিতীয় অভিনয় কৌশল এবং আকর্ষণীয় নাট্যপস্থাপনার সাহায্যে খুব দ্রুতই তিনি মালওয়ার নাট্যাভিনয় জগতে নতুন এক আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। আর সে কারণেই তাঁর রচিত 'মাচ' থেকে তাঁর প্রবর্তিত নাট্যরীতি 'মাচ' নামে পরিচিতি লাভ করলো।

[1] বালমুকুন্দের জন্ম সম্বত ১৮৬৫ এবং মৃত্যু ১৯৩২ সম্বতে। বালমুকুন্দের পর বেগমপুরার গুরু রামকিশনজী (জন্ম-সম্বত ১৮৯০, মৃত্যু সম্বত ১৯৪৬), নয়াপুরার গুরু ভৈরবলালজী (জন্ম সম্বত—১৮৯৯, মৃত্যু সম্বত—১৯৬০), বিলোটীপুরের

গুরু রাধাকিষাণজী (সম্বত—১৯০৭—২০২০) দৌলতগঞ্জের উস্তাদ কালুরামজী (সম্বত—১৯১৪—১৯৮৪), আম্বালপুরের গুরু ফকীরচাঁদজী (সম্বৎ—১৯১২—১৯৬০) নিজ নিজ প্রতিভা অনুসারে 'মাচ' রচনা ক'রে তার অভিনয়ও করেছেন। উজ্জয়িনী জিলার বড়নগর তহশীল (কাছারি)-এর গুরু শিভুরামজী (সম্বত ১৮৯১—১৯৬১), উজ্জয়িনী তহশীলের মঙ্গরোলা গ্রামের চুন্নীলাল গুরু (সম্বত—১৮৭৪—১৯৩৪) রতলাম জিলার জাওরা তহশীলের শ্রীচম্পালাল এবং বর্তমানে উজ্জয়িনীর সিদ্ধেশ্বর সেন, বড়নগরের শ্রীশ্যামদাস চক্রধারী এবং মঙ্গরোলার শ্রীমোহন সিং অনেক মাচ রচনা করেছেন এবং নিজেদের মণ্ডলী দিয়ে সেসবের সফল অভিনয় করে মাচের অভিনয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। অন্যত্র মাচকারদের জীবনী, সাহিত্য ও অবদানের মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এখানে মাচ-মঞ্চ ও অভিনয় রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। মাচের অভিনয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এর মঞ্চ।

মনোযোগ সহকারে দেখলে দেখা যাবে মাচ-মঞ্চের নির্মাণ-পদ্ধতির সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত মঞ্চ-নির্মান পদ্ধতির খুব নিকট একটা সম্পর্ক আছে। মাচ প্রদর্শনের জন্যে নির্দিষ্ট তারিখের ১৫ দিন আগে শুভলগ্নে মাচমঞ্চের ভিত্তি অর্থাৎ মঞ্চের চারকোণার খুঁটি চারটি পোঁতা হয়—মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। খুঁটি পোঁতার পর অভিনেতা ও মণ্ডলীর কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে গোষ্ঠীগুরুর হাত দিয়ে এই খুঁটিগুলির পুজো দেয়—মাচের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ঢোলকের বাজনা সহযোগে। আম্র-মুকুল, আম্রপত্র, ধনে, গুড় এবং একখণ্ড লাল কাপড় এই পূজার উপকরণ। পূজা শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উদ্দেশ্য—অভিনয়ের সময় মঞ্চটি যেন অক্ষত থাকে। তাই এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মাচ-মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই পূজার পর বিধিসম্মত ভাবে শুরু হয় মঞ্চ-নির্মাণের অন্যান্য কাজ।

প্রসাদ-বিতরণের পর খুঁটি চারটির ওপরকার আড়ার ওপর পেরেক মেরে বসানো হয় কাঠের তক্তা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাটি থেকে এই তক্তাগুলির উচ্চতা ১০ থেকে ১২ ফুট। মঞ্চের মুখ যাতে পূর্ব-মুখী হয় তার জন্য খুবই সতর্ক থাকা হয়। তক্তা বসানো হয়ে গেলে খুঁটি চারটির মাথায় টাঙানো হয় সাদা কাপড়ের একটি চাঁদোয়া। আঠা দিয়ে এই চাঁদোয়ায় লাগিয়ে দেয়া হয় রঙ-বেরঙের কাগজের ফুল। গাছের রঙিন পাতা, লাল এবং সবুজ কাগজ কিংবা কাপড়ের টুকরো, আমের পাতার ঝালর এবং মৌসুমী ফুল মঞ্চের চারদিকে ঝুলিয়ে খুব করে সাজানো হয় মঞ্চটিকে। মঞ্চটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে প্রয়োজনে মঞ্চের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কমানো বাড়ানো যায়। আগে মঞ্চের চারদিকই খোলা থাকতো। তখন দর্শক বসতো মঞ্চের চারদিক ঘিরে। তবে মঞ্চের সুরক্ষার জন্য ঐতিহ্য-অনুসারে সব ব্যবস্থাই নেয়া হ'ত। বর্তমানে মঞ্চের পৃষ্ঠ-ভাগে

অর্থাৎ পশ্চিম দিকে (কেননা মাচ-মঞ্চ নির্মাণ করা হয় পুবমুখী করে) একখানি পর্দা টাঙিয়ে দেয়া হয়। ফলে দর্শক বসে তিন দিক ঘিরে। রঙ্গস্থলীর পশ্চাৎভাগে থাকে ১২ ঘাটকা পাট (বা পাটাতন বা বসবার আসন)। মণ্ডলীর উপদেষ্টাবৃন্দ মঞ্চের সুরক্ষা এবং অভিনয়ের অন্যান্য কাজকর্ম তদারকির জন্ম আসন-গ্রহণ করে থাকে এখানে। ১২ ঘটকা পাট-এর পরে থাকে 'টেক কা পাট'। এখানে আসন নেয় মাচের অভিজ্ঞ ও কুশলী শিল্পীরা। এরা গানের ধুয়ো টানে এবং দোহারকির কাজও ক'রে থাকে। মাচের অভিনেতা যখন তার বোল (গীতিধর্মী সংলাপ) রচনা করে, তখন এরা তার পুনরাবৃত্তি করে। দলগত ভাবে পুনরাবৃত্তি করাকে 'মাচ'-এর পরিভাষায় বলা হয় টেক ঝেলনা। এতে —এই দোহারকির জন্যে মাচের বোল যা একক অভিনেতা আবৃত্তি করে বা গায়—তা অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এর জন্যেই লাউড-স্পীকার না থাকা সত্বেও মাচের গীতি-সংলাপ একেবারে পেছনের সারির দর্শকের কাছেও খুব স্পষ্টরূপে পৌছাতে পারে। অভিনেতারাও এই ফাঁকে নাচ বা বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে যায়। অন্যদিকে নবাগত শিল্পীরা এই দোহারকি দোয়ার মধ্য দিয়ে মাচের গায়কীতে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

মঞ্চের এক কোণে নির্দিষ্ট থাকে বাজনদারদের জন্যে আসন। মাচে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোলক এবং সারেঙ্গীই প্রধান। তবে বর্তমানে কোনো কোনো মণ্ডলী হারমোনিয়ামেরও ব্যবহার করছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোলকের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা ঢোলকই 'মাচ'-অনুষ্ঠানকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রাখে। গায়ক, দোহারকি-দার এবং নৃত্য তাই নির্ভরশীল এই ঢোলকের ওপর। তাই মাচে ব্যবহৃত ঢোলকগুলিও তৈরী করা হয় বিশেষ যত্ন সহকারে। অভিনয়ের শুরু থেকে শেষাবধি একটানা ঢোলক বাজানো ও যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্যে কুশলী হাতের অভিজ্ঞতা ও শারীরিক সামর্থ্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। আর এই কারণে প্রত্যেক মাচ-মণ্ডলীর নিজস্ব এক ঢোলক বাদক থাকে। মাচ অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বাদ্য-যন্ত্র হিসেবে ঢোলকের পরে আসে সারেঙ্গী। সারেঙ্গী সহযোগে সাধা কণ্ঠে গীত গান 'মাচ' অনুষ্ঠানে সমস্ত রাত ধরেই দর্শককে মুগ্ধ ক'রে রাখে। কোনো কোনো দল অবশ্য বর্তমানে হারমোনিয়াম ব্যবহার ক'রলেও মাচ অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পূর্ণভাবেই ঢোলকের ওপর নির্ভরশীল।

মঞ্চে অভিনীত ঘটনাকে সম্যকরূপে দৃশ্যায়িত করার জন্যে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আগে আলোক সরবরাহের কাজ ক'রত ত্রিশূলাকৃতির একধরণের মশাল। মশালগুলি মাচ-মঞ্চের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেয়া হ'তো। মশালের আলো কমে এলে তিলের তেল অথবা রেড়ির তেলে ভেজানো শল্‌তে মশালে সংযুক্ত করা হতো। অভিনয়ে প্রয়োজনীয় আলো সরবরাহের জন্যে আলোর পরিমাণ যথেষ্ট মাত্রায় রাখার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তখন খুবই

নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কোরতো গ্রামের নাপিত। বর্তমানে যেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে সেখানে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব আলোক সরবরাহ করে থাকে। তবে যেসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেখানে এখনো মশাল বা গ্যাসের আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মাচের অভিনয় শুরু হয় সাধারণতঃ রাত দশটায়। কখনো কখনো রাত নটায়ও অভিনয় শুরু করা হয়। তবে রাত ন'টার আগে মাচের অভিনয় আরম্ভ করার কোনো চল নেই। শৌখীন প্রদর্শক ও অনুরাগী দর্শকের সুবিধের কথা বিবেচনা ক'রেই সাধারণতঃ রাত দশটায় 'মাচ'এর অভিনয় শুরু করা হয়। শহর কিংবা গ্রাম যেখানেই এর অভিনয় হোক না কেন—সমস্ত রাত ধরে অভিনয় দেখার জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েই দর্শক বাড়ি থেকে বেরোয়। মাচের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে মাচ অভিনয়ের খবর মুখে মুখেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে খুব দ্রুত। আর সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য মানুষ এসে জড়ো হয় অভিনয় স্থলে। অভিনয় দেখবার জন্য আশপাশের গ্রামের মানুষ গরুর গাড়ীতে করে চলে আসে। ভালোভাবে বসে অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শক নিজের বাড়ি থেকে বসবার আসন—পাটি, মাদুর এমন কি চৌকি অবধিও ঘাড়ে করে নিয়ে আসে। তারপর সেই আসনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে অথবা একা একা অত্যন্ত আরাম ক'রে বসে সমস্ত রাত ধরে অভিনয় দেখে নিজ নিজ বসবার আসন পুণরায় ঘাড়ে করে আনন্দে বাড়ি ফেরে। আশপাশের রাস্তা কিংবা বাড়ির বারান্দা—সবই দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মাচের দর্শক সামান্য সময়ের জন্যেও অভিনয়ে পরিবেশিত রস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। ফলে মাঝপথে উঠে চলে যাওয়ার কোনো চল নেই। সমস্ত রাত ধরে দারুণ আগ্রহে সে অভিনয় দেখে।

ঢোলক বেজে উঠতেই কোন্ পালা পরিবেশিত হবে তা জানার জন্যে দর্শক সাধারণ খুবই উৎসুক হয়ে ওঠে। দর্শকের এই স্বাভাবিক ঔৎসুক্য মাচ মণ্ডলীর কাছে খুবই আকাঙ্ক্ষেয়। ফলে মণ্ডলীর প্রধান অভিনয় আরম্ভ করার আগে কিছুতেই মাচের নাম ঘোষণা করে না। প্রত্যেক দল গরমের সময় বিশেষ করে বৈশাখ মাসে পাঁচ থেকে সাতটি কাহিনী পরিবেশন করে থাকে। আর দর্শকরাও দলের তৈরী মাচগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহালও থাকে, তবুও প্রত্যেক দল তাদের দ্বারা প্রদর্শিতব্য মাচ-গুলির ক্রমে সামান্য হের ফের ঘটিয়ে দর্শক-দের চমৎকৃত করে থাকে।

অভিনয় আরম্ভের পূর্বেকার ঢোলকের বাজনা মূলতঃ দর্শকদের আমন্ত্রণ জানায় তাড়াতাড়ি এসে আসন গ্রহণ করার জন্যে। দর্শকরা এসে আসন নেয়ার পর মাচের শিল্পীরা দৈনন্দিন জীবনের পোষাক পরেই মঞ্চে আসে এবং ভৈরবের জয়ধ্বনি করে। কেননা মাচ শিল্পীদের স্থির বিশ্বাস হলো—ভৈরবই মাচের রচয়িতা এবং কেবলমাত্র তাঁরই আশীর্বাদে মাচের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে

ওঠে। এরপরে মঞ্চের এককোণে মাচ-প্রণেতা গুরুর জন্যে নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে পড়েন মণ্ডলীর প্রধান। এবারে মাচের নাম বলা হয় এবং মাচের ভূমিকানুসারে অভিনেতাদের ডাকা হয়। অভিনেতারা সাধারণ পোষাকে মঞ্চেই উপস্থিত থাকে। ভূমিকানুসারে ডাকা হলে তারা একে একে উঠে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে পর্দার পিছনে চলে যায় চরিত্রানুসারে সাজ-পোষাক করার জন্যে। ইত্যবসরে অভিনেতব্য মাচে কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করছে, তাও দর্শকরা জানতে পারে।

এরপরে পূর্বরঙ্গ বা কার্টেন রেজারের অনুরূপে স্বাঙ্গ-নকল ও হাস্য-পরিহাস-মূলক প্রসঙ্গ পরিবেশন করা হয়। অভিনেতব্য মাচের রসানুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে এবং দর্শকের মনোরঞ্জনার্থে একে একে মঞ্চে আসে ভিস্তী, ফর্রাসন *এবং নানকসাঈ কে পাণ্ডে। প্রথমে ভিস্তী এসে মঞ্চকে পরিষ্কার এবং পবিত্র করার উদ্দেশ্যে জল ছেটায়, এরপর ফর্রাসন এসে মঞ্চের ওপর বিছানা পাতার অভিনয় করে। এরা মাচ-মঞ্চে সবক্ষণের জন্যে উপস্থিত শেরমার খাঁ নামক stock chararter এর সঙ্গে বাক্যালাপ করে। শেরমার খাঁ মাচ-এর বিদূষক। সে প্রধান চরিত্রের বন্ধু হিসেবে তার সঙ্গেও নানাবিধ বাক্যালাপ করে এবং কাহিনীকে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুখ্য-চরিত্রের কোনো কোনো সংলাপ অধিক স্পষ্টরূপে দর্শকের কাছে পৌছানোর উদ্দেশ্যে শেরমার খাঁ ঐ সব সংলাপের পুনরাবৃত্তি করে। শেরমার খাঁ কেবলমাত্র হাস্য-পরিহাসেই নয়, নাচে গানেও খুবই দক্ষ।

মাচের এই পূর্বরঙ্গে উজ্জয়িনীতে প্রচলিত তান্ত্রিক হাজরাত বিদ্যা-র প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, ভিস্তী, ফর্রাসনের পর সমস্ত অভিনেতা ক্রমিকানুসারী সাজ-সজ্জা করে মঞ্চে আসে এবং পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে বা বসে পড়ে। মাচে স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় করে পুরুষ অভিনেতা। সেই কারণে স্ত্রী চরিত্রের বেশভূষা এবং অলঙ্করণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ভালো জরির শাড়ি, রেশমী ঘাঘরা এবং মার্টিনের কঞ্চুকী পরে পুরুষ অভিনেতা যখন স্ত্রী বেশে মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখন দর্শক একেবারে মোহিত হ'য়ে পড়ে। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রাজার সাজ-সজ্জা সত্যিই আকর্ষণীয়। তার মাথায় থাকে 'চীরা'—অর্থাৎ জরি ও মোতি দ্বারা নির্মিত একধরণের পাগড়ী, জরির কোট, কোমরে হলুদ রঙের দুপট্টা। ডানহাতে মখমলের খাপে ঢাকা তরবারি, বাম হাতে মোতির জপমালা এবং পরনে থাকে সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা সাদা ধুতি। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে শেরমার খাঁ, ভিস্তী মন্ত্রী প্রমুখের পোষাক বাস্তবানুকূল—অর্থাৎ মাথায় পাগড়ী, গায়ে আচকান, কোমরে দুপট্টা পরনে চুড়িদার পায়জামা, পায়ে ঘুঙুর এবং হাতে তরবারি। তবে চোপদার, ভালদার, ফর্রাসন প্রমুখ চরিত্রের পোষাক খুবই সাধারণ। পোষাকের মত

অঙ্গরাগ সাজসজ্জা বা মেকআপেরও বেশ যত্ন নেয়া হয়। কাজল, সিঁদুর অথবা আবির এবং পাউডারই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। মেকআপে অভিনেতার মুখাকৃতি যতদূর সম্ভব সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করা হয়। তবে স্ত্রী চরিত্রের মাথায় মুখঢাকা বড় ঘোমটা থাকার দরুণ তাদের মেকআপের দিকে খুব একটা যত্ন নেওয়া হয় না। অনেক সময় স্ত্রী চরিত্রাভিনেতার মুখের গোঁফও কামানো হয় না। যাই হোক, রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে পূর্বরঙ্গাভিনয় শেষ হয়। শুরু হয় মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলাচরণে সমস্ত অভিনেতাই চরিত্রানুরূপ সাজসজ্জা করে মঞ্চে আসে এবং গণেশজীর বন্দনা করে। একটি বালককে চোল বা লাল কাপড় পরিয়ে বিশাল ভুঁড়ি এবং লম্বা শুঁড় লাগিয়ে গণেশ সাজানো হয়। গণপতিজীকে মঞ্চের ওপর বসানো হয়। মণ্ডলীর গুরু গণেশের উদ্দেশ্যে বন্দনা গীতি গেতে থাকেন। অন্যান্য অভিনেতারা তার পুনরাবৃত্তি করে। গণেশ বন্দনা শেষ হ'লে একে একে সরস্বতী, ভৈরবী, ভবানী, বজরঙ্গ প্রমুখ দেবদেবীর স্তুতি গান করা হয়ে গেলে শেষ হয় মঙ্গলাচরণ। আরম্ভ হয় অভিনেতব্য মাচের অভিনয়।

মাচের প্রধান চরিত্র উঠে দাঁড়িয়ে মাঝমঞ্চে এসে গানের সাহায্যে নিজের পরিচয় দেয়। শুরু হয়ে যায় অভিনয়। শেরমার খাঁ প্রধান চরিত্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে—এগিয়ে চলে কাহিনী। দু'টি চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপকে 'মাচ'-এর পরিভাষায় 'বোল' বলা হয়। মাচের 'বোল' রচিত হয় সাধারণতঃ দোহা-ছন্দে এবং বিভিন্ন সুরে তা গীত হয়। চরিত্রের পদ্যবদ্ধ সংলাপের পুনরাবৃত্তি করে দোহারকিদাররা, আর সেই ফাঁকে চরিত্রাভিনেতা ঢোলকের বাজনা-সহযোগে নৃত্য করতে থাকে। বোলের যথাযথ পরিবেশনের মধ্যদিয়ে মাচ অভিনেতা নিজের দক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। যথাযথ তালে ও সুরে বোল পরিবেশিত হ'লে দর্শকেরা সমস্বরে 'কোই কী হ্যায়' অর্থাৎ "দারুণ! দারুণ!" ব'লে অভিনেতাকে অভিনন্দন জানায়। দর্শকের এই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যায় মাচের বোল কতটা প্রভাবশালী। পদ্যবদ্ধ সংলাপে, চরিত্রের পরিচয় দানে ও চরিত্র-চিত্রণেও মাচ অভিনেতারা প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মাচের অভিনয়ে একেবারে নিজস্ব এবং ঐতিহ্যবাহী রীতিপদ্ধতি এখনও উপলব্ধ হয়, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কোনো অভিনেতাকে কোনো কারণে কয়েক মাইল দূরে কোথাও যেতে হয় তাহলে সে তৎক্ষণাৎ ঢোলকের বাজনার তালে তালে কয়েকবার মঞ্চটি ঘুরে উল্লেখিত দূরত্ব অতিক্রম করে এবং গন্তব্যস্থলে পৌছায়। কোনো কারণে যদি প্রধান চরিত্রকে মঞ্চ ছেড়ে যেতে হয়—তাহলে সে তার তরবারি এবং মালাটি যেকোনো অভিনেতার হাতে দিয়ে দেয় এবং মঞ্চ পরিত্যাগ করে। দর্শকদের কাছে মুখ্য চরিত্রের তরবারি ও মালা হাতে

অভিনেতাটি তখন মুখ্য পাত্র হিসাবে গণ্য হয়। আবার যদি কোনো স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা তার অভিনয় অবসরে মঞ্চের কোণে ব'সে ব'সে বিড়ি টানে বা কোনো কারণে ঘোমটাটি খুললে তার গোঁফ জোড়া দৃশ্য হ'য়ে পড়লেও দর্শকবৃন্দ বিন্দুমাত্রাতেও বিরক্ত হয় না, কোনো রকমের রসবিপর্যয়ও ঘটেনা। দীর্ঘদিন থেকে লালিত এইসব মঞ্চ-পদ্ধতিগুলির প্রয়োগে মাচের দর্শকদের কল্পনাশক্তি খুবই তীব্র হ'য়ে উঠেছে। মঞ্চোপস্থাপনায় বাস্তবের যাবতীয় ঘাটতি তারা কল্পনাশক্তি বলে ভ'রিয়ে তোলে—অনায়াস সহজতায়।

ধর্ম, পুরাণ, প্রেম ও সমাজ-ভিত্তিক কাহিনী নিয়ে 'মাচ' লেখা হ'য়েছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন মণ্ডলীর গুরু এবং স্বতন্ত্র মাচকাররা সর্বসাকুল্যে সোয়া একশোর কাছাকাছি মাচ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই আবার একই বিষয় নিয়ে মাচ রচনা করেছেন, যেমন—রাজা ভর্তৃহরি, গোপীচন্দ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণলীলা হীর-রান্‌ঝা, প্রহ্লাদলীলা, রাজা রিসালু, নল-দময়ন্তী ঢোলা-মারুনী প্রভৃতি। অদ্যাবধি মোট ত্রিশখানি মাচ প্রকাশলাভ করেছে। তবে অপ্রকাশিত 'মাচ'গুলিও অভিনীত হয়ে থাকে। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির আকারে এ'সব মাচ বর্তমানের কোনো না কোনো মণ্ডলীর গুরুর কাছে সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক মণ্ডলীতে আবার এমন দুই একজন অভিনেতা আছে যারা নিজেদের মণ্ডলীর সব মাচই কণ্ঠস্থ বলতে পারে। কিছু এমন দর্শকও আছে—যারা প্রত্যেক মণ্ডলীর মাচ দেখে এবং তাদের প্রায় সব মাচ থেকেই 'বোল' মুখস্থ বলতে পারে।

একই কাহিনী, একই অভিনেতা এবং একই অভিনয়-পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও মালওয়ার জনজীবনে প্রতিটি মাচ অভিনয় নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। মাচ অভিনয় গ্রীষ্মকালেই জমে ভালো। শৃঙ্গার-ধর্মী মাচগুলি অভিনীত হয় মুখ্যত পুরুষ দর্শককে লক্ষ্য ক'রেই। এর দরুণ 'মাচ' অশ্লীল এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, আর সেই কারণেই স্ত্রীলোক ও বালকদের মাচ দেখতে দেয়া হয় না।

আসলে শৃঙ্গারধর্মী মাচগুলিতে লোকজীবনের উদ্দাম শৃঙ্গারিক প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাই বলে একে অশ্লীল বলা ঠিক হবেনা। কেননা শৃঙ্গারধর্মী মাচগুলিরও মুল উদ্দেশ্য লোকজীবনের কল্যাণ সাধন। আর বালক ও স্ত্রীলোকদের যে 'মাচ' দেখতে দেয়া হয় না, তার প্রধান কারণ হ'লো—সমস্ত রাত জেগে অভিনয় দেখাটা স্ত্রীলোক ও বালকদের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাছাড়া মালওয়ার মহিলারা পুরুষ লোকের সম্মুখে তাদের ঘোমটা খুলতে অভ্যস্ত নয়, অথচ অভিনয় দেখতে গেলে ঘোমটা খোলাটা অনিবার্য। অসংখ্য পুরুষ দর্শকের সামনে ঘোমটা খুলে সহজভাবে নাটকাভিনয় দেখতে পারে না বলেই তারা মাচ দেখতে যায় না। ফলে

'মাচ' পুরুষ দর্শকদেরই মনোরঞ্জন মাধ্যম হ'য়ে র'য়েছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অবাধ প্রকাশের জন্য মাচ-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাধারণ মানুষ বেশ স্বস্তি খুঁজে পায়। তাই বৈশাখের প্রচণ্ড গরমেও মাচ মালওয়া তথা সমগ্র মধ্যপ্রদেশের মানুষকে সম্বৎসরের জন্যে রসাপ্লুত রাখতে সক্ষম হয়।

সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে যেয়ে মাচের পরিবেশন পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন-সূচক প্রয়োগ করা হ'য়েছে। আর যেহেতু উজ্জয়িনীর বিভিন্ন মাচমণ্ডলীর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মাচের বিকাশ হ'য়েছে, সেইহেতু পরবর্তীকালের প্রতিটি মাচ-মণ্ডলীই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য মাচ-এর প্রদর্শনে নিত্য নতুনের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করে এসেছে। পরিবর্তন-সূচক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ করেছেন দৌলতগঞ্জের কালুরাম উস্তাদ। কালুরাম বালমুকুন্দেরই সমসাময়িক। গুরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের উদ্দেশ্যে উস্তাদজী তাঁর মণ্ডলীতে মহিলা শিল্পীর আমদানী ঘটান। লহরগীর গুঁসাই-কে তিনি মঞ্চে নামান। 'মাচ মঞ্চের প্রথম মহিলা শিল্পী এই লহরগীর। কালুরাম উস্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আধুনিক মাচকার সিদ্ধেশ্বর সেন ও শাজাপুরের লোকগায়িকা পুখরাজ পাণ্ডেকে তার নিজের নাটকে মহিলা চরিত্রে রূপদানের জন্য মাচমঞ্চে নামান। বলাই বাহুল্য, লহরগীর বা পুখরাজ খুবই শক্তিশালী গায়িকা হওয়া সত্ত্বেও মাচের অভিনয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তার কারণ, যে দাপটের সঙ্গে স্ত্রী-চরিত্রাভিনেতারা দর্শকের মনোরঞ্জন করে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে তা কোনো মহিলা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া মাচের অভিনয় মূলতঃ তক্তাভাঙা অভিনয়। কেননা মাচের অভিনয় হ'য়েছে অথচ মাচ-মঞ্চের কোনো না কোনো তক্তা ভাঙেনি মাচের এমন অভিনয় প্রায় বিরল দৃষ্টান্ত।

মালওয়ার 'মাচ' ও রাজস্থানের খ্যালের পূর্ব রূপ হলো 'গম্মত' বা বৈঠকী গান। তাই মাচ ও খ্যালের মধ্যে খুবই নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে খুব অভিনিবেশ সহকারে দেখলে এই দুই লোকনাট্য আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্যও চোখে পড়ে। সেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য মাচ ও খ্যালের তুলনামূলক আলোচনা করা হ'লো।

ভূমিকা এবং উপকরণ :

খ্যাল :—

(১) মঞ্চ থেকে স্বতন্ত্র একটি স্থানে অনুষ্ঠানের সমস্ত চরিত্র (অভিনেতা) একত্রিত হয়ে সমবেত কণ্ঠে সরস্বতী ও গণেশের বন্দনা করে।

(২) খ্যাল মঞ্চে প্রথম যে অভিনেতা প্রবেশ করে তাকে বলা হয় ভঙ্গী। ভঙ্গী আসে প্রধানতঃ মঞ্চ পরিস্কার করতে কিংবা গুছিয়ে নিতে। এরপর গানের সাহায্যে সে তার পরিচয় ব্যক্ত করে।

(৩) এরপর চামড়ার ব্যাগে জল নিয়ে যে অভিনেতা আসে তাকে বলা হয় ভিশতী। ভিশতী এসে মঞ্চে জল ছিটোয়। এর সংলাপও গীতিবদ্ধ।

(৪) এরপর গড়বাংলো থেকে দূত এসে নায়কের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। খ্যালের পরিভাষায় এই দূতকে বলা হয় হলকারা। হলকারাই খ্যালকারের পরিচয় দেয়। তারপরই আরম্ভ হয় খ্যাল।

মাচ :—

(১) মাচ মঞ্চের ওপরেই সমস্ত অভিনেতা এবং কর্মকর্তা গণেশ, ভেরুণী ও মাচকারের বন্দনা করে। তারপর সমবেতভাবে নগরের সমস্ত দেবতারই স্তুতিগান করা হয়। এটি মাচ অনুষ্ঠানের একটি আবশ্যিক অধ্যায়।

(২) মাচে ভঙ্গী আসে না।

(৩) ভিশতী এসে অভিনয়াত্মক ঢঙে মঞ্চের ওপর জল ছিটোয়। এদের বলা হয় ভূপালী ভিশ্তী। ভিশতী নিজেই 'এসেছি ভূপালী ভিশতী……' ইত্যাদি গেয়ে আত্মপরিচয় দেয়।

(৪) ভিশতীর পরে আসে ফর্াসন। ফর্াসন এসে গানের সাহায্যে মাচকার গুরুর স্তুতিগান করে এবং মঞ্চের ওপর বিছানা পাতার (বা ফরাস বিছানোর) অভিনয় করে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে তার এই অভিনয়। দুঃখে ভরা ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলে ফর্াসন দর্শকের সহানুভূতি কেড়ে নেয়।

(৫) এরপরই গণেশ এবং সরস্বতীর বন্দনা। প্রথমে দেবীর পাণ্ডার আগমন ও পরে দেবীর। এরপর দেবীকর্তৃক গুরুর আশীর্বাদ ও জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে মাচের আরম্ভ।

(৬) মাচের আরম্ভও বেশ নাটকীয়। পূজা শেষে সকলে একে একে মঞ্চে আসে, তখন চোপদার এদের পরিচয় দেয়। অবশ্য বর্তমানে মালওয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় মাচের রূপ অনেক পাল্টে গেছে। এইসব জায়গায় মাচ আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই অভিনেতারা সব মঞ্চে এসে ব'সে থাকে। আর অপেক্ষাকৃত উঁচু এক জায়গা থেকে এক ব্যক্তি মঙ্গলাচরণের সূক্ত উচ্চারণ করে এবং সমবেত ভাবে অভিনেতারা তার ধুয়ো-টানে বা দোয়ারকি করে। এই মঙ্গলাচরণকে বলে তন্দ্রানা। এই সব মঙ্গলানুষ্ঠানের অবশ্য কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যাই হোক, অভিনয়ের সময় মাচ প্রণেতা পাণ্ডুলিপি হাতে অভিনেতার পেছনে পেছনে চলতে থাকেন। মঞ্চের ওপর ঐভাবে চলতে চলতে তিনি একের পর এক সংলাপ বলে যান এবং অভিনেতারা পুনরায় তা উচ্চারণ করে। অবশ্য প্রম্পটিং-এর এই রীতি আজকাল আর খুব একটা দেখা যায় না।

মাচের প্রবর্তক বালমুকুন্দ গুরু তাঁর সমস্ত মাচ-রচনাকেই খ্যাল হিসেবে

অভিহিত করেছেন, যেমন—'খ্যাল ম্যাচের চৌলামাক্নী" "প্রকৃত খ্যাল মাচের সেঠসেঠানি" "খ্যাল-মাচের নাগজী-দুধজী।" বালমুকুন্দ যেন স্বচরিত মাচের নামকরণের সাহায্যে খ্যাল ও মাচের পার্থক্য দূর করার চেষ্টা করেছেন। তৎসত্ত্বেও রাজস্থানের খ্যাল ও মধ্যপ্রদেশের মাচ কিন্তু সর্বতোভাবে এক নয়। এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

অভিনয় আরম্ভের পূর্বে অর্থাৎ পূর্বরঙ্গ-বিধিতে মাচও খ্যালের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও মূল অভিনয়াংশে কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মাচ ও খ্যালের তুলনা—অভিনয় আরম্ভের পর :

(১) ভূমিকার পর উভয় আঙ্গিকেই প্রথমে আসে নায়ক। মঞ্চে এসেই সে আত্ম-পরিচয় দেয়। এরপর অন্যান্য চরিত্র মঞ্চে আসতে থাকে এবং নাটক এগিয়ে চলে।

(২) উভয়ই সঙ্গীতপ্রধান। খ্যালে রাগরতোয়া, লাওনী, বেহাগ, ভাড়, কাফী, সোরঠ, আঁশাবরী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগে রচিত হয় সংলাপ। আর মাচের ধুনকে বলা হয় রঙ্গত।

(৩) উভয়েরই কথোপকথন সংক্ষিপ্ত এবং গীতিধর্মী। কথোপকথন এগিয়ে চলে রাগ-রাগিনীর সাহায্যে।

(৪) উভয়েতেই শারীর অভিনয়ের চেয়ে বাচিক অভিনয়ের গুরুত্ব বেশি। উভয় আঙ্গিকেই অভিনেতারা অভিনয়ের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যে গুরু ধরে। অভিনেতাদের বলা হয় স্বরূপ, কখনো কখনো বা রূপ বা স্বাঙ্গ। অভিনেতারা সকলেই গৃহস্থ ঘরের মানুষ।

(৫) উভয়েরই কাহিনী পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক, তবে প্রায় ক্ষেত্রেই লৌকিক এবং অর্ধ-ঐতিহাসিক। কাহিনী মিলনাত্মক।

(৬) উভয়েরই কোনো নেপথ্যগৃহ নেই এবং বিভিন্ন সব ইঙ্গিতের সাহায্যে দৃশ্যান্তর বোঝানো হ'য়ে থাকে।

(৭) উভয়েরই আরম্ভ মধ্যরাতে পরিসমাপ্তি সূর্যের প্রথম রশ্মিপাতে।

(৮) উভয়েতেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সামূহিক এবং একক নৃত্যের প্রচলন আছে। অভিনেতা সম থেকে অতি দ্রুতই নৃত্যের গতি অবলম্বন ক'রতে পারে।

রাজস্থানের খ্যালের মত উত্তর-প্রদেশের রাসের সঙ্গেও মাচের কিছু কিছু বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এ দু'য়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হ'লো।

মাচ ও রাসের তুলনামূলক বিচার :—

(১) পদ্যধর্মী দীর্ঘ সংলাপের আধিক্য থাকায় রাস মূলতঃ শ্রব্যকাব্য।

কিন্তু মাচের সংলাপের লৌকিক আবেগের বাঙ্ময় প্রকাশে তার দৃশ্যধর্মিতা স্বতঃই মূর্ত হয়ে ওঠে।

(২) মিরাকল্ বা মিস্ট্রী প্লের সঙ্গে রাসের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী লীলারূপে প্রকাশ করা হয়, ফলে রাস সাধারণতঃ মন্দির অথবা কোনো পবিত্র স্থানে প্রদর্শিত হয়। আর মাচের অভিনয় হয়, মন্দিরের বাইরে, কোনো খোলা জায়গায়। তবে-নির্মাণের আগে জায়গাটি পবিত্র করে নেয়া হয়।

(৩) অভিনয়ের দিক থেকেও এদের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

যাই হোক, মালওয়ার মাচ আজ মধ্যপ্রদেশ তথা সমগ্র উত্তরভারতেরই এক জনপ্রিয় লোকনাট্য। মাচের এই জনপ্রিয়তার পশ্চাতে প্রণেতাদের ভূমিকাই মুখ্য। মাচের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন (১) বালমুকুন্দ গুরু, (২) কালুরাম উস্তাদ, (৩) ভেরু গুরু, (৪) গুজর গৌড়, (৫) রাধাকিষাণ গুরু, (৬) লালুসিংহ উস্তাদ (৭) সেবারাম পরমার (৮) সিদ্ধেশ্বর সেন। শ্রীসেন প্রায় ১৮ খানি মাচ রচনা ক'রেছেন। এরমধ্যে আবার বেশ কয়েকখানি পুরনো মাচেরই নবীকরণ বিশেষ। শ্রীসেনের এই মাচে অশ্লীলতার লেশমাত্রও উপলব্ধ হয় না। তবে এগুলির কাহিনী বিন্যাস খ্যাল-শৈলী দ্বারা প্রভাবিত। আর জনপ্রিয়তার দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, শ্রীসেনের স্থান মাচের প্রবর্তক বাল-মুকুন্দগুরুর ঠিক পরে। তাছাড়া মালওয়ার 'মাচ'কে সমগ্র হিন্দীভাষী এলাকায় জনপ্রিয় করে তোলার কৃতিত্বও তাঁরই। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় নাট্যসংঘের উদ্যোগে দিল্লীর ফিরোজশাহ ময়দানে আয়োজিত ১২ই মে থেকে ১৯শে মে অবধি এক সপ্তাহ ব্যাপী লোকনাট্যোৎসবে শ্রীসেন মহিলা-শিল্পী সহযোগে 'রাজা ভর্তৃহরি' ও বীর তেজাজী প্রদর্শন করেন। দেশ-বিদেশে মাচের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সেখান থেকেই। ভিখারী ঠাকুর যেমন সমগ্র বিদেসিয়াকে জনপ্রিয় করেছেন, শ্রীসেনও তেমনি 'মাচ' এর সর্বভারতীয় খ্যাতি এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসাশ্রিত মাচ কাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস ভিত্তিক করে তোলার কৃতিত্বও তাঁরই। শ্রীসেনের মাচ 'বন্দী ছোড় কেদারসিংহ' তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসবের ফলে মাচ আজ আর কেবলমাত্র ১ কোটী মালওয়াবাসীরই নয়, সমগ্র উত্তর ভারতেরই জনপ্রিয় এক লোকনাট্য।

মাচের অভিনয়ে ঢোলক এবং সারেঙ্গীর গুরুত্ব যে কতখানি তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই বালমুকুন্দ গুরুর সময় থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত ঢোলক এবং সারেঙ্গীবাদক মাচের সেবা করে এসেছেন এখানে শুধুমাত্র তাঁদের নামোল্লেখ করা হলো।

ঢোলকবাদক :

(১) বাপু উস্তাদ (বালমুকুন্দের সমকালীন),

(২) আত্মারাম (বাপু উস্তাদের ভাগনে),
(৩) দুলিচন্দ (আত্মারামের বড়ছেলে),
(৪) বুদ্দিয়া,
(৫) নাগরজী প্রমুখ।

সারেঙ্গীবাদক :

(১) থাবরজী (বাপু উস্তাদের ভাই),—এঁর হাত এত ভালো ছিল যে অনেক সময় গলার আওয়াজ ও সারেঙ্গীর স্বর পৃথক করা সম্ভব হয়ে উঠত না।

(২) আত্মারাম (বাপু ও থাবরজীর ভাগনে)
(৩) ভগীরথ (আত্মারামের ছোটোছেলে)।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে, রচনা ও অভিনয়ের মত মাচে প্রযুক্ত বাজনার ক্ষেত্রেও বংশানুক্রমিক অধিকার লক্ষ্য করা যায়।

মাচকে বলা হয় 'তক্তা ভাঙা নাটক' কেননা, মাচের এমন আসর প্রায় খুব কমই উপলব্ধ হয়, যে আসরে নাচের সময় মাচ-মঞ্চের তক্তা ভাঙে না। মাচের এই উদ্দাম নৃত্যের জন্যে মেয়েরা আগে মাচের অভিনয়ে অংশ নেয়ার কথা ভাবতেও পারত না। আর এর কাহিনীর অতিরিক্ত শৃঙ্গারধর্মিতার কারণে মহিলারা ও শিশুরা মাচ দেখত না। ফলে আগে মাচ ছিল সম্পূর্ণ ভাবেই পুরুষদেরই লোকনাট্য। তবে আজ মহিলারা বেশ ভালো সংখ্যায় মাচের অভিনয় দেখছে। সরকারী উদ্যোগ তথা বেতার মাধ্যমে মাচের ব্যাপক প্রচারের ফলে এর জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যাওয়াতেও এটা অনেক সহজ হয়েছে। তাছাড়া মাচের বিষয়েও অনেক পরিবর্তন এসেছে। যাইহোক, বর্তমানে মাচ আর কেবলমাত্র মালওয়ীতেই নয়, মালওয়ী এবং খড়ীবলীর উপযুক্ত মিশ্রনেও রচিত হচ্ছে। ফলে মাচ আজ আক্ষরিক অর্থেই মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকনাট্য হয়ে উঠেছে।

(গ) নাচা॥

ঝাড়ুরাম দেবাঙ্গণ, পুণারাম নিসাদ এবং তিজনবাঈ-এর ব্যক্তিগত প্রতিভার কারণে পাণ্ডওয়ানী বা পাণ্ডববাণী আজ ভারতবর্ষের নাট্যামোদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হলেও ছত্তীসগড়ে এই লোকনাট্য কেবলমাত্র সংনামী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। অন্যদিকে নাচা ছত্তিসগড়ের মুখ্য লোকনাট্য-আঙ্গিক, যা এই জিলার অসংখ্য মানুষের মনোরঞ্জন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।

'নাচা' শব্দটি থেকে মনে হয় এটি বুঝি কোনো নৃত্য আঙ্গিক। কিন্তু তা নয়। নাচ বা নৃত্য থাকা সত্ত্বেও নাচায় অভিনয়ের অংশ বরং বেশি। নাচা মূলতঃ প্রহসন-ধর্মী লোকনাট্য। ছত্তিসগড়ের মুখ্য অঞ্চলের উন্মুক্ত আকাশের নীচে

চারদিক থেকে দর্শক পরিবেষ্টিত হয়ে এই লোকনাট্য সমস্ত রাতধরে ছত্তিসগড়ের পরিশ্রমক্লান্ত মানুষের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করে চলেছে। নাচার মঞ্চ খুবই সাধারণ এবং আড়ম্বরহীন। দর্শকবেষ্টিত সমতল ভূমিতেই এর অভিনয় হয়। দৈনন্দিন জীবনের পোষাক পরেই অভিনেতারা এর অভিনয় করে থাকে। আর মেকআপে ব্যবহৃত হয় খড়ি আর গেরুয়ামাটি।

দর্শক মনোরঞ্জনের দিক থেকে নাচা যেমনি সক্ষম তেমনি ব্যয় ও আড়ম্বরহীন। ফলে ছত্তিসগড়ের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই নাচার দল আছে। দলগুলির অধিকাংশই শৌখীন। তবে বেশ কিছু সংখ্যক পেশাদারী নাচার দলও আছে। বিবাহোৎসব, গণেশোৎসব বা অনুরূপ অন্যসব উৎসব বা আনন্দজনক অনুষ্ঠানে ছত্তিসগড়ের মানুষ বেশ উৎসাহের সঙ্গেই নাচার আয়োজন করে থাকে।

বিশুদ্ধ মনোরঞ্জনই নাচার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া সত্বেও সামাজিক দায়িত্বপালনেও নাচার শিল্পীরা সদাই সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকে। অতীতে দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও নাচার শিল্পীরা আন্দোলনের স্বপক্ষে এগিয়ে এসেছিল। সে সময়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যাপারেও নাচার শিল্পীরা বেশ সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলো। এ ব্যাপারে যে কাহিনীটি নাচার প্রায় সব দলকেই আকৃষ্ট করেছিলো, সেটি হলো—"এক গ্রামে খুবই সমৃদ্ধ এক সৎনামী পরিবার আছে। পরিবারের লোকজনের ইচ্ছা হয় নিজেদের বাড়িতেই সত্যনারায়ণের পুজো দেয়ার। কথাবাচক পণ্ডিতকে অনুরোধ করা হলো কিন্তু তিনি এ অনুরোধে সাড়া দিলেন না। পরিবারের অবিবাহিতা আইবুড়ো মেয়েটি এই ঘটনায় খুবই ক্রুদ্ধ হয়। সে তখন নিজে পণ্ডিতজীর বাড়িতে যায়। পণ্ডিতজী মেয়েটির রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাড়িতে গীতাপাঠ করতে রাজি হয় এবং মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করে। মেয়েটি পণ্ডিতের এই আকস্মিক এবং অপ্রচলিত প্রস্তাবে সাড়া দেয় না। পণ্ডিতজী তখন তাকে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে জানায় যে এই সংসারে ছোটো বড় বলে কিছু নেই। কেননা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। এই কথা শুনে মেয়েটি তখন পণ্ডিতজীর মহানুভবতার প্রশংসা করে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। পণ্ডিতজী বাধ্য হয়ে সে প্রস্তাবে রাজি হয়। নাটক শেষ হয়।

স্বাধীনতোত্তর কালে আরেকখানি নাটক খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। নাটকখানি হলো 'মুন্সী মুন্সাইন'। নাটকখানি যে কে রচনা করেছিলো, তা আজ আর জানা যায় না। কিন্তু আজ অনেক নাচার দল নাটকখানি মঞ্চস্থ করে থাকে। এমন অনেক হাস্য-ব্যঙ্গের উপকরণ নাটকখানিতে আছে যে আজও এটি দেখার সময় দর্শক সাধারণ হেসে একেবারে গড়াগড়ি যায়। খুবই সংক্ষেপে 'মুন্সী মুন্সাইন'-এর কাহিনীটি নিম্নরূপ—"এক গ্রামে এক বিধবার একটি ছেলে আছে। ছেলেটি বেকার, কোনো কাজকর্ম নেই তার। মা কষ্টে-সৃষ্টে কোনোরকমে সংসার চালায়। ছেলেটি এতে মনে মনে খুবই কষ্ট পায়। ফলে

একদিন সে ঠিক করে যে কাজের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়বে। এরপর ছেলেটি সত্যি সত্যিই একদিন মায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। কথায় কথায় পরিচয় জমে ওঠে। লোকটি তখন জানায় যে ছেলেটির বাবা তাকে ছোটো ভাইএর মত দেখতো। ফলে কাকা থাকতে ভাইপো কেন এভাবে অনাথের মত ঘুরে বেড়াবে। লোকটি তখন ছেলেটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলে—"যাও বাড়ী যাও এবং বাড়ি গিয়ে মাকে এই টাকা পাঁচটা দাও। ছেলেটি খুশি মনে টাকা পাঁচটা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরে কাকার কথামত সে টাকা পাঁচটা মাকে দিতে যায়। কিন্তু মা প্রথমে নিতে রাজি হয় না। কিন্তু ছেলেটি বারবার বলাতে তার মা টাকাটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। ছেলেটি তখন স্নান করতে যায়। অপরিচিত লোকটি সেই ফাঁকে তাদের বাড়িতে আসে। ছেলেটির মাকে সে বৌদি বলে সম্বোধন করে। পরে তার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বলে। এই আকস্মিক প্রস্তাবে ছেলেটির মা একেবারে হকচকিয়ে ওঠে এবং অস্বীকার করে। ছেলেটি তখন নৈতিকতার দোহাই পেড়ে তাকে তার সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। ছেলেটির মা অরাজি হলে লোকটি বলে তোমার ছেলে তো আমাদের গ্রামে গিয়ে নিলামে তোমাকে বিক্রী করে এসেছে। আমিই সেই ক্রেতা। পাঁচ টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে নিয়েছি। ছেলেটির মা তখন এই অপরিচিত ব্যক্তির প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়।" নাটকটির মাধ্যমে বিধবা-বিবাহকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে ছত্তীসগড়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেওর-বৌদির বিয়ে প্রায়ই হয়ে থাকে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এইভাবে বিয়ে করাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'চুরি পহনানা'।

নাচার অনেক নাটকে আবার সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস, অসমঞ্জস বিবাহ এবং শোষণ-প্রবৃত্তিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং মানুষের শুভ চেতনার উন্মেষ ঘটনোর চেষ্টা করা হয়েছে।

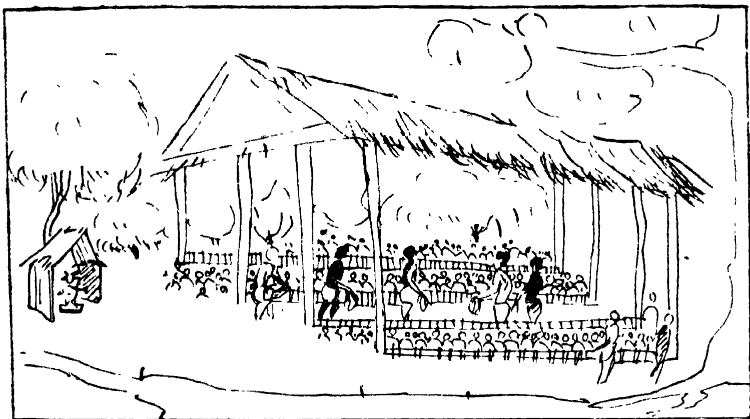
সহজ সরল কাহিনীর সাহায্যে আড়ম্বরহীন অথচ জনমনোরঞ্জক পরিবেশন-পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে নাটকের আধুনিক তত্ত্বে অভিজ্ঞ হাবীব তনবীর 'নাচা' নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এখানকার শিল্পীদের নিয়ে 'নাচা'-র অভিনয় পদ্ধতিকে আশ্রয় করে তিনি বেশ কয়েকখানি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এর মধ্যে মহাভারত, আগরা বাজার এবং চরণদাস চোর আশাতীতভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। নাচার অন্তর্গত 'নকটা নাচ' ও 'নজরিয়া নাচ' এই অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। নকটা নাচ মূলতঃ মহিলা লোকনাট্য, কেননা এর দর্শক প্রদর্শক উভয়েই মহিলা। ছেলের বিয়েতে বাড়ির পুরুষরা সব চলে গেলে বাড়ির মেয়েরা সারা রাত জেগে নাটকাভিনয়ের আয়োজন করে। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা নতুন এক মাত্রা পায় এক নকটা নাচে। আর নজরিয়া নাচে সমকালীন জীবনযাত্রাকে গান ও রসালো সংলাপের সাহায্যে পরিবেশন

করা হয়ে থাকে। নাচ ও গানের আকর্ষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এর বাজনা। নজরিয়া নাচে-নাচার অনুরূপে—মোহরী, ডফড়া, ডমরু এবং মঞ্জীরা ব্যবহৃত হয়।

ছত্তীসগড়ে 'ডঙ্গচথা' নামে একধরনের লোকনাট্য বেশ জনপ্রিয়। রণপায়ে ছোটো ছোটো সামাজিক নকশা এবং বিভিন্ন কষ্টকর শারীরিক কসরৎ দেখানো হয় এতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে হাবীব তনবীর তাঁর বাহাদুর কালারিণে এই 'ডঙ্গচথা'-র প্রয়োগ করেছেন।

বিভুবা নামে এক ধরনের স্বাঙও এখানে বেশ জনপ্রিয়। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের স্বাঙ্গ প্রস্তুত করা হয় বিভুবায়। বিভিন্ন ধরণের জাদুও দেখানো হয়। বিভুবার বিদূষক বা ভাঁড় হলো জোকার। নানাপ্রকারের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও কৌতুকাভিনয়ের সাহায্যে এই জোকার বিভুবার দর্শককে আনন্দ দিয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য



আলকাপ

স্বতন্ত্র এক পরিবেশন রীতির কারণে আলকাপ পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট এক লোকনাট্যের মর্যাদা লাভ ক'রেছে। বারেন্দ্রভূমি, দক্ষিণ রাঢ় এবং উত্তর নদীয়ায় লোক-সংস্কৃতির এই ক্ষয়িষ্ণুতার কালেও আলকাপের জনপ্রিয়তা প্রায় তুলনাহীন। স্থানকাল ভেদে আলকাপ অবশ্য বিভিন্ন নামে প্রচলিত, যেমন বীরভূমে একে বলা হয় 'ছাঁচোড়' এবং মুর্শিদাবাদের (আলকাপ বা) আলকাটা কাপ। সম্প্রতি অবশ্য মুর্শিদাবাদের আলকাপের দলগুলি নিজেদের পঞ্চরস অপেরা বলতেই অধিক পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যাই হোক, আলকাপের সূচনা যে কবে তা নিয়ে কিন্তু বিতর্ক আছে। লোক-সংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক ডঃ ফণী পালের মতে আলকাপের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। প্রায় দু'শো বছর আগে মালদহের মনাকষা গ্রামের বনমালী প্রামাণিক ওরফে বোনা কানা আলকাপের প্রবর্তন করেন। আলকাপের প্রখ্যাত উস্তাদ ঝাঁকসুও বোনা কানাকেই আলকাপের স্রষ্টা বলে মনে করতেন। আবার ১৩৭০ সালে প্রকাশিত জঙ্গীপুর গ্রন্থমেলা স্মারক গ্রন্থে বলা হ'য়েছে যে একশো বছর আগে মালদহের মনাকষার ভবতারণ সরকার আলকাপের সৃষ্টি করেছিলেন। আর বোনা কানা ছিলেন তাঁরই শিষ্য।

কিন্তু কোনো লোকশিল্পই কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। তবে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি একটি আঙ্গিকের পুনরুজ্জীবন সাধন করতে পারেন, সংস্কৃত বা পরিমার্জিত করে তুলতে পারেন, এমন কি একটি সম্ভাবনাকে অস্তিত্বে পরিণত ক'রে তাকে জনপ্রিয়ও করে তুলতে পারেন। কিন্তু লোকনাট্যের মত ঐকান্তিক এক সামাজিক ব্যাপারের কোনো স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব।

অতএব উৎস সন্ধানে সতর্ক হলে ধরা পড়ে যে বারেন্দ্রভূমি তথা মালদাতে শিব উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই কোনো না কোনো রূপে গম্ভীরা নৃত্য ও গীতের প্রচলন রয়েছে। এই গম্ভীরা নৃত্য ও গীত আদিতে সূর্য পূজার সঙ্গে সম্বন্ধিত ছিলো। পরবর্তীকালে শূন্য পূজা, ধর্ম পূজা এবং শিব পূজার অঙ্গ হিসেবে সংযোজিত হয় এই গম্ভীরা। এই আদি গম্ভীরার উৎস থেকেই আলকাপের সৃষ্টি হ'য়েছে বলে অনুমান করা যায়। কেননা সূর্য পূজা আসলে কৃষি দেবতারই পূজা। শূন্য, ধর্ম এবং শিবও তাই মূলতঃ কৃষি দেবতা। কৃষি দেবতার পূজার সঙ্গে প্রাচীন মানব সমাজ যে সব আচার, আচরণ, নৃত্য-গীত ইত্যাদির আয়োজন করত সেগুলির মূলে প্রকৃতি ও আবহাওয়াকে আবিষ্ট করার এক জাদু-বিশ্বাসও নিহিত ছিলো। প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতীয় কৃষক ও স্থূল রঙ্গ তামাশা এবং ভাঁড়ামির সঙ্গে সুপ্রজননের কার্যকারণ গত জাদু-সম্পর্কে প্রত্যয়ী ছিলো। তাই দিওন্যুসাস উৎসব-জাত রঙ্গরস পূর্ণ কোমসের মতই মালদার গম্ভীরাতেও অশালীন রঙ্গরসে ভরা অনুষ্ঠান থাকাটা একান্তভাবেই স্বাভাবিক। আলকাপ সেই অনুষ্ঠানেরই দৃশ্যরূপ—এরকম মনে করাটা খুব অযৌক্তিক নয়। কেননা আলকাপের কাপ অংশটি রঙ্গরসেরই দ্যোতক।

যাই হোক, এব্যাপারে কিন্তু কোনো দ্বিমত নেই যে গম্ভীরা ও আলকাপ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই সম্পর্কান্বিত। গম্ভীরা গানের প্রধান রস হচ্ছে হাস্য এবং আলকাপেরও তাই। অদ্যাবধি গম্ভীরা গান ও নৃত্য শিব উৎসবের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, অর্থাৎ তা ধর্ম-সাপেক্ষ। অবশ্য একথাও উল্লেখযোগ্য যে গম্ভীরা গানের একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রূপও বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ গম্ভীরা গান ও নাচ একই সঙ্গে যেমন ধর্মসাপেক্ষ তেমনি আবার ধর্ম-নিরপেক্ষও বটে। অন্যদিকে আলকাপ, বর্তমানে প্রচলিত আলকাপ, তার সূচনা থেকেই ধর্ম-নিরপেক্ষ। তবুও আজও কিন্তু শিবের ছড়া গান গাওয়া আলকাপের এক অপরিহার্য অংশ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতে—"আদি আলকাপেরই একটি শাখা গম্ভীরা। এখনো এই দেবতা তার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আলকাপের মূল স্রোত কালক্রমে দেবতাটিকে পিছনে রেখে এগিয়ে যায়"। অর্থাৎ সিরাজ সাহেব বলতে চান যে আলকাপ আদিতে শিব-গাজনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পরে আলকাপ থেকে গম্ভীরা তার স্থান নেয় আর আলকাপ হ'য়ে ওঠে সেকুলার বা ধর্ম-নিরপেক্ষ।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'লো—আদিতে শিব-গাজনে অনুষ্ঠেয় অংশটিকে কি নামে ডাকা হত ? আলকাপ, না গম্ভীরা ? সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক যে আদিতে যে অনুষ্ঠানটি হ'ত সেটি কি সেকুলার ছিলো ? এবং পরবর্তিকালে তারই একটি সেকুলারই রইলো এবং আরেকটি অংশ স্পিরিচুয়ালিস্টিক হ'য়ে গেল ? আমরা জানি যে শিল্পের উদ্ভবের সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলো এবং প্রাকৃতিক ধর্ম-সমূহও জন্ম নিয়েছিলো উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে। বস্তুত মানব-সভ্যতার উষালগ্নে, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সূচনা-পর্বেই শিল্পের কোনো কোনো ধারা সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার অনিবার্য তাগিদেই ধর্মের খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। আর্য অনুপ্রবেশের সময় থেকেই বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে ধর্ম এবং সমাজের সর্বাপেক্ষা চিহ্নিতকরণ-যোগ্য স্বতন্ত্র পর্বের সূচনা হয়। অনুরূপ আরো কয়েকটি পর্বের মুসলমানদের আগমন বাংলার ধর্ম ও সমাজকে আরো সুনির্দিষ্ট রূপে বিচ্ছিন্ন করে।

ধর্ম ও সমাজের ভেতরকার এই বিচ্ছিন্নতা লোকশিল্পে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক প্রভাব ফেলে ; কেননা এরফলে লোকশিল্পের কোনো কোনো ধারা যেমন ধর্ম নিরপেক্ষ রূপে পুনর্গঠিত হয়, তেমনি আবার ধর্ম-সমন্বিতই থেকে যায়। এছাড়া লোকশিল্পের কোনো কোনো ধারা আবার দ্বিধা-বিভক্ত হ'য়ে যায়, একটি হয় ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং অন্যটি হয় ধর্ম-সাপেক্ষ। আবার কোথাও কোথাও এতদুভয়ের মিশ্রণেও নতুন লোকশিল্প অস্তিত্ব লাভ করে। তবে সে সবের বিস্তৃত আলোচনার কোনো অবকাশ এখানে নেই। যাইহোক, ধর্ম-নিরপেক্ষ আলকাপ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ধর্ম-সাপেক্ষ গম্ভীরার আলোচনা থেকে নিশ্চিতরূপেই অনুমান করা যায় যে আলকাপ এবং গম্ভীরার উৎস একই। আর সে উৎস হ'লো শিব গাজনের সঙ্গে অনুষ্ঠেয় লোকশিল্প। এখন প্রশ্ন হ'লো আদিতে একে কি নামে ডাকা হ'ত ? আলকাপ না গম্ভীরা ? অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, শিবগাজন উপলক্ষে শিবের যে ঘর নির্মিত হ'ত বা এখনো হয় তাকে বলা হয় গম্ভীরা। আবার ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় গামার কাঠের পিঁড়ি বা দোলা ব্যবহৃত হ'ত। এই গামার থেকেও গম্ভীরা শব্দটি আসতে পারে। ফলে গম্ভীরাকে ঘিরে বা গামার কাঠের দোলা নিয়ে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাকে কেন্দ্র করে যে লোকশিল্প তার নাম গম্ভীরা হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষণে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুর্শিদাবাদ জিলার জঙ্গীপুর মহকুমায় সামাজিক বিষয় অবলম্বী এক ধরণের ছড়ার গান প্রচলিত ছিলো। একে বলা হ'ত আলকাপ। বোনা কানারও তিরিশ বছর আগে বুনু কানা ছিলেন এই ধারার এক বিশিষ্ট শিল্পী। এই তথ্যটি থেকে এ অনুমান করা যায় যে প্রাচীন গম্ভীরায় আলকাপ বা কাপ জাতীয় একটা অনুষ্ঠান হয়ত ছিলো, যা ছড়ার ধরনে গীত হ'ত। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে, প্রাচীন গম্ভীরা লোকশিল্প থেকেই পরবর্তীকালে আলকাপ এই স্বতন্ত্র এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ শিল্প ধারাটি

উদ্ভূত হ'য়েছে—এরকম একটা অনুমান করা যেতে পারে। আবার এ প্রসঙ্গে বিপরীত মতটি হ'লো এই যে প্রাচীন এবং প্রচলিত আলকাপেরই প্রেরণায় পরবর্তীকালে সুফী মাষ্টার অর্থাৎ শেখ সুফী এবং আরো অনেকে বর্তমান গম্ভীরা লোকনাট্যের প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং বর্তমানের গম্ভীরা লোকনাট্য আলকাপেরই অনুজ। অর্থাৎ আলকাপ থেকে গম্ভীরা সৃষ্টি হ'য়েছে না গম্ভীরা থেকে আলকাপ সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাপারে এখনো কোনো ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয় নি। তবে এ দু'য়ের উৎস যে একই এ ব্যাপারে কোনো মতদ্বৈধতা নেই।

আলকাপ শব্দের অর্থ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। তবে এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত যে আল এবং কাপ এই দুটি পৃথক শব্দের সংযোজনের ফলেই হ'য়েছে আলকাপ। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী এবং দেশী সব ভাষাতেই আল শব্দটি আছে। আরবীতে আল শব্দের অর্থ সন্তান, ফার্সীতে এর অর্থ সীসা, রং বা মদ, সংস্কৃত অর্থ সূচীমুখ কীলক বা হুল আর দেশীতে এর অর্থ বিষাক্ত কাঁটা (যেমন মৌমাছি, বোলতা ও ভীমরুলের আল) এবং ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারক বা জল নিরোধক মাটির সরু বাঁধ। আর কাপ সম্ভবত সংস্কৃত কাপট্যেরই দেশীরূপ। এক্ষণে, সংস্কৃতে আল এবং কাপ (বা কাপট্য)-এর সমন্বিত অর্থ দাঁড়ায়—'হুল মেশানো কাপট্য' বা 'তীব্র পরিহাস-যুক্ত রঙ্গ'। আলকাপের এই কথাটি তার বিষয়ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আলকাপের প্রখ্যাত উস্তাদ ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় সরকারও বলতেন, "যে কাপে হাসির সঙ্গে হুলের বিষ মেশানো তাই আলকাপ"। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে আলকাপ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রহসন-সঙ্গত সম্প্রদায়'। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন যে নাট্যগীতিতে এবং যাত্রার নাচে পাত্রপাত্রীর ভূমিকায় সাজ করার এবং সঙ সাজার নামই ছিল কাচ (কৃত্য) বা কাপ (কল্প)। আবার আলকাপের অন্য এক উস্তাদ মনকির হোসেন বলতেন যে আল মানে রং বা রঙ্গ (শব্দটির ফার্সী অর্থও তাই) এবং কাপ হ'চ্ছে সঙ সাজা। এক্ষনে সুকুমার সেন ও মনকির এতদুভয়ের মত মিলিয়ে আল-কাপের যে অর্থ দাঁড়ায় তা হ'লো রঙ্গ করার জন্য কোনো চরিত্রে বা ভূমিকায় সাজা বা অবতীর্ণ হওয়া। কবিশেখর ভারতচন্দ্রও রঙ্গরসকারী অর্থে কাপ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন—

"কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।"

আবার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতে আল শব্দটি সম্ভবতঃ আউলা থেকেই এসেছে। আউলার অর্থ এলোমেলো, যেমন—আউলা কেশ। এখন কাপ

শব্দের অর্থ যদি রঙ্গরসকারী এবং রূপসজ্জাকারী দুই-ই হয়, তাহলে সিরাজ সাহেবের আল-এর অর্থানুসারে আলকাপ শব্দটির দু'টি অর্থ হয়—(১) এলো মেলো রঙ্গরসকারী এবং (২) এলোমেলো রূপসজ্জাকারী। আবার এলোমেলো শব্দটি একই সঙ্গে তুলনা এবং বৈচিত্র্যের দ্যোতক। ফলে অন্যান্য লোকশিল্পের তুলনায় তা এলোমেলো এবং বৈচিত্র্যময় অর্থাৎ আলকাপ নামের আউল রঙ্গ বা রূপ-সজ্জায় বহুবিধ রস এবং নাট্যোপকরণ একসঙ্গে খিচুড়ি পাকিয়ে ওঠে। লক্ষ্যনীয় যে বীরভূমে আলকাপকে ছাঁচোড় বলা হয়। ছাঁচোড় (বা ছ্যাঁচড়া) শব্দের অর্থ হ'লো—মাছের কাঁটা, তেল ইত্যাদির সঙ্গে শাকাদি মিশ্রিত ব্যঞ্জন। অর্থাৎ পাঁচমিশেলি একটা ব্যাপার আর কি। যাইহোক, আলকাপের এই অর্থটিও কিন্তু তার বিষয়ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুর্শিদাবাদের অনেক জায়গায় আলকাপকে নিন্দার্থক অর্থে আলকাটা কাপ বলা হয়। সিরাজ সাহেবের মতে এর অর্থ সংক্ষিপ্ত কাপ। আবার ডঃ দীলিপ ঘোষের মতে 'কাটা' শব্দটি ছড়া কাটা অর্থেই ব্যবহৃত হ'য়েছে। কিন্তু আলকাটা শব্দের একটি প্রচলিত অর্থ হ'চ্ছে 'ভোঁতা' বা 'স্থূল'। ফলে স্থূল কাপ বা মোটা দাগের প্রহসন বোঝাতেও 'আলকাটা কাপ' শব্দটি ব্যবহার করা হ'তে পারে। যাইহোক, শেষবিচারে বলা যায় যে আলকাপ হ'লো রঙ্গরস প্রধান এবং বহুবিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট মূলতঃ প্রহসনধর্মী এক লোকনাট্য।

আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে যে আলকাপের দলগুলি অধুনা নিজের 'পঞ্চরস অপেরা' বলে প্রচার করতেই অধিকমাত্রায় আগ্রহী। বোনা কানা প্রবর্তিত আলকাপের সঙ্গে এই পঞ্চরস অপেরাগুলি দ্বারা পরিবেশিত আলকাপে গুরুত্বপূর্ণ সব বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চরস অপেরা আলকাপের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে দারুণভাবেই ক্ষুণ্ণ ক'রেছে। অন্যদিকে চীৎপুরের যাত্রার সঙ্গে এই পঞ্চরস অপেরার বেশ মিল লক্ষ্য করা যায় এবং চীৎপুরের যাত্রাই যেমন যাত্রার সাম্প্রতিক যাত্রার প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি পঞ্চরস অপেরাগুলির আলকাপই আজকের আলকাপের প্রতিনিধিস্বরূপ।

বোনাকানা প্রবর্তিত আলকাপকে যদি মূল আলকাপ বলা হয়, তাহলে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে মূল আলকাপে আলকাপের উস্তাদ তার সহ-অভিনেতাদের নিয়ে একটি চাঁদোয়ার নীচে আসন গ্রহণ করত বৃত্তরেখায়। আর ঐ বৃত্তের কেন্দ্রে বসত বাদ্যযন্ত্রীরা। আর অভিনেতাদের বৃত্তরেখার চারধারে গোল হ'য়ে বসত দর্শকবৃন্দ। বাদ্যযন্ত্রীদের কেন্দ্রে এবং অভিনেতাদের বৃত্তরেখায় বা পরিধিতে রেখে যে বৃত্ত বা গোলাকার ক্ষেত্রটি গড়ে উঠত সেটিই ছিল মূল আলকাপের অভিনয়স্থল বা মঞ্চ বা আসর। অভিনয়ের জন্য স্বতন্ত্র কোনো উঁচু মঞ্চ তখন ছিলই না। ফলে দর্শক আসন ছিল অভিনয় ক্ষেত্রের চতুর্দিকে একই তলে। তাছাড়া অভিনেতারা সকল সময়ের জন্যেই আসরেই উপস্থিত থাকতো।

ফলে মূল আলকাপে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে অভিনেতাদের মঞ্চে আসার জন্য স্বতন্ত্র কোনো পথের প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া অভিনেতাদের অঙ্গরাগ-অঙ্গসজ্জার জন্য স্বতন্ত্র এবং অস্থায়ী সাজঘর তৈরীরও কোনো প্রচলন ছিলো না। কিন্তু আজকের পঞ্চরসের মঞ্চ যাত্রার অনুরূপে কাঠের পাটাতন দিয়ে দর্শকাসনের তল থেকে বেশ কিছুটা উঁচু করে তৈরী করা হয়। স্বভাবতঃই আজকের এই উঁচু মঞ্চ মূল আলকাপের আসর সংস্থানের প্রাচীন আদলটি ভেঙে দিয়েছে। আজ তাই বাদ্যযন্ত্রীরা বসে আসরের কেন্দ্রস্থলের পরিবর্তে যাত্রা'র অনুরূপে মঞ্চের দুই পাশে। তাছাড়া অভিনয় চলাকালে আজকাল আর অভিনেতারা আগের মত সকল সময়ের জন্যেই মঞ্চে উপস্থিত থাকে না। তাদের জন্য এখন গ্রীণরুম আছে। অভিনয় অবসরে তারা এখন এই গ্রীণরুমেই অপেক্ষা করে এই গ্রীণরুম থেকে মঞ্চে আসবার জন্য যাত্রার অনুরূপ একটি পথেরও বন্দোবস্ত আছে। আর এই গ্রীণরুমের জন্যে দর্শক আর আগের মত আসর ঘিরে বৃত্তাকারে বসতে পারে না। গ্রীণরুমের দিকটি ছেড়ে বাকি তিন দিকেই তারা আসন নেয়। মূল আলকাপ ও বর্তমানের পঞ্চরসের আসরের আরেকটি প্রধান পার্থক্য হ'লো এই যে মূল আলকাপের আসর ছিল বৃত্তাকার আর পঞ্চরসের আসর হ'লো আয়তাকার, তবে কখনো কখনো বর্গাকার আসর বা মঞ্চও বাঁধা হ'য়ে থাকে।

মূল আলকাপে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত প্রথমে ঢোলক, বাঁশি এবং করতাল। পরে এর সঙ্গে সংযোজিত হয় হারমোনিয়াম ডুগি-তবলা এবং ফ্লুট। অধুনা পঞ্চরস অপেরাতে সাইড-ড্রাম এবং ম্যারাকাসও প্রযুক্ত হ'চ্ছে।

মূল আলকাপে সাজগোজ (মেকআপ বা অঙ্গরাগ) করত কেবলমাত্র দু'জন অভিনেতা। এদের মধ্যে একজন হ'লো বিদূষক বা কৌতুকাভিনেতা। পদ্মার দক্ষিণ তীরে এই কৌতুক অভিনেতাকে বলা হয় 'সাঙাল' বা 'কপ্যা' আর পদ্মার উত্তর তীরে অর্থাৎ মালদায় একে বলা হয় কমেডিয়ান বা লাব্বার। মূল আলকাপ ও পঞ্চরস অপেরা উভয়েতেই এই কপ্যা বা লাব্বারের ভূমিকা খুব বেশি। যাইহোক, লাব্বারের মেকআপ কিন্তু যাত্রার মত নয়। সে মুখে শুধু চুনকালি মাখত আর হাতে বাঁধা থাকতো কানি। পরনে লুঙ্গি। তবে গায়ে কিছু থাকত না, কখনো কখনো ছেঁড়া জামা বা গেঞ্জি বা ফতুয়া পরত। প্রাচীন আলকাপে যে সত্যিসত্যিই মেকআপ করত সে হ'লো—ছোকরার চরিত্রাভিনেতা। ছোকরা হ'চ্ছে আলকাপের প্রাণ। নারীবেশধারী এক কিশোর সে। ছোকরার চরিত্রাভিনেতা নারীর চলনে বলনে ও ছলাকলায় পারদর্শী। আলকাপের আসরে সে নিজেকে নারীর রূপসজ্জায় সাজিয়ে নিত। তার চুল হ'ত মেয়েদের মত লম্বা, তার কানে থাকত দুল, প্রয়োজনে নাকে ঝুলত নোলক, হাতে থাকত চুড়ি, পরণে শাড়ি এবং মেয়েদের আনুষঙ্গিক অন্যান্য পোষাক। অর্থাৎ সব দিক থেকেই আলকাপের নারীবেশী ছোকরাকে দর্শকের মনে নারীর বিভ্রম

উৎপাদনকারী রূপসজ্জা করতে হ'ত। লাব্বার ও ছোকরা ছাড়া আলকাপের আর কোনো চরিত্রই কিন্তু কোনোরূপ সাজ সজ্জা করত না। তবে আধুনিক পঞ্চরস অপেরায় সকল চরিত্রই যাত্রার অনুরূপ অঙ্গরাগ অঙ্গসজ্জা ক'রে থাকে।

আলকাপের প্রধান পুরুষ হ'লো এর উস্তাদ। মালদহে উস্তাদকে বলা হয় খলিফা। এই খলিফাকে কেন্দ্র করেই আলকাপের দল গড়ে ওঠে। খলিফাই আলকাপের সূত্রধার বা পরিচালক, প্রযোজক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলের মালিকও। অন্যান্য লোকনাট্যের মত মূল আলকাপেও লিখিত পালা পরিবেশনের কোনো প্রচলন নেই। আলকাপের পালার পরিকল্পক হ'লো এর খলিফা। খলিফাই পালার মূল কাঠামোটি দলের অন্যান্য সদস্যদের কাছে উপস্থাপন করে। এইভাবে সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত গল্পের ছকটি খলিফার কাছ থেকে জেনে নিয়ে আলকাপের চরিত্রাভিনেতারা অভিনয়ের সময়েই তাৎক্ষণিক সংলাপ, গান ইত্যাদির সাহায্যে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অভিনয় চলাকালে অভিনেতাদের এই তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনার দক্ষতা এবং উপযুক্ত গান সংযোজনের নৈপুণ্য নির্ভর করে দলের খলিফার প্রশিক্ষণের ওপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খলিফা স্বয়ং প্রধান চরিত্রাভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দলের আসর বন্দনা, বৈঠকী এবং ভোলার বন্দনার গানগুলিও খলিফা স্বয়ং রচনা করে থাকে। তবে পছন্দমত গান সে অন্যকারো কাছ থেকেও সংগ্রহ করতে পারে এবং ক'রেও থাকে। তবে ছড়া কিন্তু খলিফার একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি। ফলে অন্য কারো কাছ থেকে ছড়া সংগ্রহের চল আলকাপে নেই। আলকাপের পরিভাষায় ছড়াকে বলা হয় কবি (কবিগান)। যাইহোক, খলিফাকে কিন্তু একাধারে দলের ছড়ার বা কবির রচয়িতা এবং গায়ক হ'তে হয়। আলকাপের আলকাপ বা কমেডীনাট্য—যাকে আলকাপের পরিভাষায় ফার্স বা চাঁচর বলা হয়—তার মুখ্য উপস্থাপক অবশ্যই দলের কমেডিয়ান। কমেডিয়ানই যে কপ্যা বা লাব্বার একথা আগেই বলা হ'য়েছে। এই চাঁচর বা কমেডীনাট্যের কাঠামোটিও কিন্তু খলিফাকেই রচনা করতে হয়। এসব ছাড়াও আলকাপের মুখ্য আকর্ষণ যে ছোকরা বা নারী চরিত্রাভিনেতা তাকে প্রশিক্ষিত ক'রে তোলার দায়িত্বও কিন্তু খলিফার। দলের ছোকরা কতটা কুশলী হ'য়ে উঠবে, তা নির্ভর করে খলিফার সৃজনশীলতা ও প্রশিক্ষণদক্ষতার ওপর। বস্তুতঃ খলিফা একাধারে কাহিনীর স্রষ্টা, গীত রচয়িতা, নৃত্য-গীত ও নাট্য পরিচালক এবং প্রধান নটের ভূমিকা পালনকারী। আলকাপের দলে সে তাই একাই একশো। খলিফার পর দলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলো কমেডিয়ান, যাকে বলা হয় কপ্যা বা লাব্বার। ডঃ ফণী পালের মতে লাববার শব্দটি ইংরেজি লোফার শব্দেরই অপভ্রংশ। দলের সুনাম বেশ কিছুটা পরিমানে এই লাব্বারের ওপরই নির্ভরশীল। আগেই বলা হ'য়েছে যে আলকাপে নারী চরিত্রের অভিনয় করে

কিশোররা। এদের বলা হয় ছোকরা। একটি দলে কমপক্ষে দু'জন ছোকরা থাকেই। তবে বেশিও থাকতে পারে, যেমন পঞ্চরসের দলগুলিতে কমপক্ষে চারজন করে ছোকরা রাখা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আজকাল পঞ্চরস অপেরাগুলিতে ছোকরার ভূমিকায় মেয়েদেরও নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া দলে থাকে দোহারকিদার ও পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতারা। নাটকের প্রয়োজনে দোহারকিদাররাও পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর দলে থাকে বাদ্যযন্ত্রীরা। এছাড়াও ম্যানেজার এবং বাহকরাও থাকে। তবে এরা আলকাপের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না।

আলকাপের একটি অনুষ্ঠান ন'টি (৯টি) পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলিকে ক্রমানুসারে সাজালে দাঁড়ায়—(১) যন্ত্র সঙ্গীত, (২) জয়ধ্বনি, (৩) কনসার্ট, (৪) আসর বন্দনা, (৫) বৈঠকী, (৬) ভোলার বন্দনা, (৭) আলকাপ, (৮) ছড়া এবং (৯) পালাগান। আজকাল আবার পঞ্চরস অপেরায় ভোলার বন্দনা এবং আলকাপের মধ্যবর্তী অংশে 'টেলর' নামে ক্ষুদ্র একটি নাটিকাও পরিবেশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ পঞ্চরস অপেরা আবার দশটি পর্বে বিভক্ত।

এক্ষণে খুবই সংক্ষেপে এই পর্বগুলির আলোচনা করা হচ্ছে। অন্যান্য লোকনাট্যের মত আলকাপের শুরুতেও সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত বাজানো হয়। এই যন্ত্রসঙ্গীতের নাটকীয় গুরুত্ব হ'লো এই যে অনুষ্ঠান যে শুরু হতে যাচ্ছে তা দর্শক অভিনেতাকে জানানো হয়। এর ফলে অভিনেতারাও যেমন অভিনয়ের জন্য সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে, তেমনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। এই যন্ত্রসঙ্গীত অনুপস্থিত অথচ দর্শনেচ্ছু বহু ব্যক্তিকে ত্বরিতে আসরে উপস্থিত হ'তে আমন্ত্রণ জানায়। এই যন্ত্রসঙ্গীত শেষ হলেই দোহারকিদাররা সমবেতভাবে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে—"জয় জয় মা বাকবাদিনী কী জয় !

জয় জয় বাবা শ্যামচাঁদ কী জয় !

জয় জয় উস্তাদ তান সেন কী জয় !"—ইত্যাদি।

জয়ধ্বনি শেষ হলে আবার একপ্রস্থ যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এই দ্বিতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের পর শুরু হয় আসর বন্দনা। দলের ছোকরারাই নাচের সঙ্গে বিভিন্ন সব দেব-দেবীর বন্দনা গায়। এই বন্দনাগীতি যেমন খলিফার নিজের রচনা হতে পারে তেমনি আবার অন্য কোনো প্রখ্যাত কবি রচিত জনপ্রিয় ভক্তিগীতিও হতে পারে। বন্দনা গীতি গাইবার সময় ছোকরারা ক্রমান্বয়ে চারিদিকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে নাচে। এরফলে যেমন সব দর্শকদের দিকেই মুখ ফেরানো হয় তেমনি চতুর্দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেবতাদেরও বন্দনা করা হয়। এইভাবে চতুর্দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর বন্দনা করা ভারতীয় লোকনাট্যের এক অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আসর বন্দনার শেষে ছোকরারা আবার আসরে অবতীর্ণ হয়। শুরু হয় আলকাপ বা পঞ্চরসের বৈঠকী পর্ব। আলকাপের পরিভাষায়

একে 'বোটকী'ও বলা হয়ে থাকে। খলিফাই সাধারণতঃ এই বৈঠকী গায়। বোটকী যেমন বাংলা ভাষায় পরিবেশিত হয়, তেমনি আবার ভোজপুরী বোলীতেও পরিবেশিত হতে পারে। মালদার কালিয়াচক এবং বিহার সংলগ্ন এলাকাতে চাঁই, বেদিয়া, মৈথিলী, রাজপুত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কথ্য ভাষা হিসেবে হিন্দী বুলি মিশ্রিত একধরণের বাংলা-ভাষা চালু আছে। আলকাপের পৃষ্ঠপোষক এই জনমণ্ডলীর মুখের ভাষাও কখনো কখনো বৈঠকী গানের ভাষা হয়ে ওঠে। বৈঠকী গানের সঙ্গে সঙ্গে ছোকরারা প্রথমে দলবদ্ধভাবে খেমটা নাচ নাচে। দলগত নাচ শেষ হলে দলের প্রত্যেক ছোকরাই আবার একক নৃত্য পরিবেশন করে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে গানও চলতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বৈঠকী গান ভক্তিরস ছাড়া অন্য যে কোনো রসেই পরিবেশিত হতে পারে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এখানে বৈঠকী গানের নমুনা পেশ করা হলো—

১। "আপন করম কো বাতিয়া নীহারো হো লোক
আপন করম কো বাতিয়া নীহারো
আজ বগলী কাহে শ্বেতবরণজী
কোয়েল কাহে কারী।
আজ মুর্খ কাহে রাজ করতু হৈ
পণ্ডিত হোতা হৈ ভিখারী॥"

২। "মা হম্মে তো যাব নি,
ওকর ভাত খাবেনি,
সাস ননদ কে জ্বালা
সহেল পারব নি।
মাগে গৌণাকর রাতি,
মারকে দু ফরাটি,
দুবছর ভেল দাগ মিটল নি।
মাগে শিরোয়া সে পকাল পুরি
হামরা ধারালকো সুখা খাব নি
মাগে আনি দেল কো নারিয়েল তেল
সবকোই মাখো বেল বেল
হাম্মে কহে মখেল পারবে নি।

বৈঠকী শেষ হলে শুরু হয় ভোলার বন্দনা। ভোলার বন্দনাও গায় স্বয়ং খলিফা। ভোলার বন্দনা গম্ভীরার শিবস্তুতির মতই। ভোলার বন্দনা গম্ভীরা ও আলকাপের সম-উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা, ভোলার বন্দনাতেও শিবস্তুতির অবসরে, গম্ভীরার নানার অনুরূপে, শিবকে সাক্ষী রেখে সাধারণ

মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরা হয় এবং শিব সেগুলোর সমাধান করছেন না বলে অনুযোগ করা হয়।

ভোলার বন্দনার পর শুরু হয় কৌতুকাভিনয়। একে কাপ বা আলকাপ বলে। মালদহে অবশ্য একে চাঁচরও বলা হয়ে থাকে। যাইহোক, এই অংশটির প্রধান চরিত্র হলো দলের প্রধান কমেডিয়ান বা কাপ্যা (সঙাল, সঙদার) বা লাব্বার। লাব্বার ছোকরার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক পাতিয়ে রসালাপ শুরু করে দেয় এই পর্বে বা কাপে। ফলে অচিরেই একখানি হাস্য-কৌতুক বা রঙ্গে-ভঙ্গে একখানি ফার্সিক্যাল কমেডী দর্শকের চোখের সামনেই রচিত ও পরিবেশিত হয়। আলকাপের কোনো পর্বে লিখিত পাণ্ডুলিপির কোনো ভূমিকা নেই। পারিবারিক কাহিনীর আদলে নিজেদের তৈরী সংলাপ ও গীতের মধ্যে বিভিন্ন সব পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা জট পাকিয়ে ওঠে। তখন মীমাংসা করতে ডাকা হয় মোড়লকে। গম্ভীরাতে আসে শিব বা নানা, আর আলকাপে আসে মোড়ল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বয়ং খলিফাই মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর কৌতুককর সংলাপ, বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর ও চোখ মুখের ভাবাভিনয়ের সাহায্যে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ্য করে রাখে লাব্বার।

কাপ শেষ হলে আবার খলিফা উঠে দাঁড়ায়। শুরু হয় ছড়া, যা কবিগানের মতই। খলিফা আসরে দাঁড়িয়েই মনে মনে ছড়া কেটে তৎক্ষণাৎ তা আবৃত্তি করে। পালার আসর যেখানে বসে অর্থাৎ—যেখানে দু'টি দল মুখোমুখি বসে আলকাপের দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়, সেখানে দুই দলের দুই খলিফার মধ্যে ছড়ায় চাপান উতোরও চলে। ছড়ার বিষয় হিসেবে খলিফা মানব সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ই অবলম্বন করতে পারে এবং করেও। আলকাপের দর্শক এই ছড়া অংশে খলিফার মুখ থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগ, সংস্থা, প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদির এক ছন্দবদ্ধ রূপ শুনতে পায় এবং এ সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে এই নাট্যাংশটির সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ছড়ার পর শুরু হয় পালাগান। পালাগানে কাহিনীর পরিচয়, ঘটনার অগ্রগতি এবং পরিণতি সম্পর্কে খলিফা বা ওস্তাদ আগে থেকেই দলের সকলকে জানিয়ে দেয়। সময় সম্পর্কে একটা ধারণাও অভিনেতাদের মনে কাজ করে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পালা অংশের সময়কাল তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা। যাইহোক, কাহিনী কিন্তু এগিয়ে যায় অভিনেতাদের তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী করা সংলাপ ও অন্যান্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে। খলিফা প্রায় ক্ষেত্রেই পালার কোনো না কোনো মুখ্য চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কখনো কখনো সে পালাগানে একেবারেই অংশ নেয় না। তবে খলিফা পালাগানে অংশগ্রহণ করুক আর নাই করুক তাকে সকল অবস্থাতেই সতর্ক থাকতে হয় যাতে ক'রে কাহিনীর বিকাশ বিপথগামী না হয় এবং কাহিনীর অগ্রগতি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিণতির

দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ফলে যখনই প্রয়োজন হয়, তখনি উঠে দাঁড়ায় খলিফা এবং ঘটনার রাশ নিজের হাতে তুলে নেয়, কাহিনীকে ঠিক পথে নিয়ে আসে আর নির্দিষ্ট সময়ে ঘটনাকে নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছে দেবার জন্যে যে গতি দরকার নাট্যকাহিনীর অগ্রসরতায়, সেই গতি সঞ্চার করে। পূর্বে রচিত কিংবা প্রচলিত কয়েকখানি গান ছাড়া পালা অংশের সমস্ত কিছুই এক্সটেম্প্যারি। এই এক্সটেম্প্যারি সংলাপ বা ক্রিয়াকাণ্ড নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্দিষ্ট গতিতে পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব খলিফার। পালা অংশের কাহিনী সাধারণভাবে সামাজিক, তবে পুরাণ এবং প্রচলিত লোককাহিনী বা ইতিহাস থেকেও পালার কাহিনী সংগৃহীত হ'য়ে থাকে। ফলে মুসলমানী কিস্সা, যেমন—আলোমতী, রূপবান্তর কিসসা, ঐতিহাসিক বিষয় হিসেবে সিরাজদৌলা প্রভৃতি অভিনীত হয়। বর্তমানে অবশ্য পঞ্চরস অপেরায় উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও হিন্দী ফিল্মের কাহিনী, চিৎপুরী যাত্রার জনপ্রিয় কাহিনী এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত উত্তেজক ঘটনার আশ্রয়ে পালা পরিবেশিত হ'চ্ছে। এই পালা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নয় পর্ব বিশিষ্ট আলকাপের একটি অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে সম্প্রতি পঞ্চরসী আলকাপে টেলর নামে আরেকটি পর্ব সংযোজিত হ'য়েছে। ভোলার বন্দনা ও চাঁচরের মধ্যবর্তী সময়ে এটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। পুরাণের কোনো কাহিনীকে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে নাট্যায়িত করা হয়। মূকাভিনয়ের সাহায্যে টেলরের এই নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয়। এই মূকাভিনয় আলকাপের নিজস্ব অভিনয়ের রীতি থেকেই সৃষ্ট। সম্ভবতঃ পঞ্চরস অপেরার পালা অংশে পুরাণাশ্রিত কাহিনী কমে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দর্শকের ঐতিহ্যগত চাহিদার কথা মনে রেখেই এই টেলর-অংশের সংযোজন ঘটেছে।

যাইহোক, যাত্রার মত আলকাপে কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি না থাকায় আলকাপের অভিনেতাদের তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ সৃষ্টি করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাই আলকাপের আসরে ছোট বড় কোনো অভিনেতারই নেহাত দায়সারাভাবে অভিনয় করার কোনো সুযোগ নেই। তাৎক্ষণিক বিচক্ষণতা আলকাপ অভিনয়ে বিশিষ্ট এক চমক এনে দেয়। তাই আলকাপের সব পালাই ভিন্ন ভিন্ন আসরে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হ'য়ে থাকে। আলকাপের বৃত্তাকার আসর ও সমতলীয় অভিনয়-ভূমির কথা আগেই বলা হয়েছে, বলা হ'য়েছে দর্শক ও মঞ্চের সমতলীয় অবস্থানের কথা। আসর ও মঞ্চের এই বৈশিষ্ট্য আলকাপের অভিনয়-রীতিতেও বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে পঞ্চরস অপেরায় যাত্রার অনুরূপ মঞ্চ ও আসর-সংস্থান-রীতির প্রচলন হওয়ায় সেই বিশিষ্টতা মূলগতভাবেই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর "আলকাপ নাট্যরীতি ও থার্ড থিয়েটার" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে আলকাপ নাট্যরীতির সঙ্গে

চলচ্চিত্রের অভিনয়রীতির একটা মিল আছে। কেননা, একটা ঘটনার শেষে সংশ্লিষ্ট অভিনেতারা আসন গ্রহণ ক'রতে না করতেই পরবর্তী ঘটনার পরিবেশক অভিনেতারা আসরে উঠে দাঁড়ায়—অনেকটা চলচ্চিত্রের ফেড ইন, ফেড আউটের মত। তাছাড়া একই মুহূর্তে দুটি ভিন্ন স্থানে (বা দৃশ্যে) দুজনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বোঝাতে জ্যামকাটের অনুরূপ পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হ'ত। অভিনেতারা সর্বক্ষণের জন্য আসরে উপস্থিত থাকার ফলেই এটা সম্ভব হত। কিন্তু এখন পঞ্চরসের অভিনেতারা যেহেতু গ্রীনরুমে চলে যায় তাদের অভিনয় অবসরে এবং মঞ্চও দর্শক-সমতল থেকে তিন চার ফুট উঁচু করে নির্মিত হয় সেইহেতু দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন বা একই সময়ে একাধিক দৃশ্যের সমপাতন বা মিশ্রণের স্বাভাবিক সুযোগ নষ্ট হয়েছে।

আলকাপের দর্শক-অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও এই নতুন মঞ্চ ব্যবস্থায় গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছে। কেননা আগেকার মঞ্চ-ব্যবস্থায় দর্শকেরও অভিনয়াংশে অংশগ্রহণের নানা সুযোগ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আলকাপের একটি চরিত্র হয়ত পথ হারিয়েছে। কোনো একটা গ্রামে তার বাস। নিজের গ্রাম থেকে কার্য-ব্যপদেশে সে অন্য গ্রামে যাবে। ফলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে রওনা হয়। বাজনদারদের বেড় দিয়ে বৃত্তাকারে মঞ্চে সে হাঁটতে থাকে, হাঁটছে তো হাঁটছেই। ফালারের মত বাজনা বাজছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে একটা গ্রামে এসে পৌঁছানোর অভিনয় করে। অপরিচিত গ্রাম। ফলে গ্রামের নামটি তার জানা দরকার। তখন দর্শকদের ভেতর থেকে একজনকে বেছে নিয়ে সে প্রশ্ন করে—"রাজা ! কুন গেরামে এলু গো ?" স্বভাবতই দর্শকটি তার নিজের গ্রামের অর্থাৎ যে গ্রামে অনুষ্ঠান হচ্ছে তার—নাম করে। পথিক অভিনেতা এবার দর্শকটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়। দর্শকটিও সোৎসাহে তার সঙ্গে যোগ দেয়। অভিনেতাটি কিন্তু কাজের কাজী। এই আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই সে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আগেকার দিনে এইভাবেই আলকাপের দর্শক আলকাপের নাট্যাংশে বা তার অভিনয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করত। এইভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী দর্শক অনেক সময় দর্শকাসন থেকে অভিনয় আসরেও উঠে আসত। কিন্তু পঞ্চরস অপেরায় মঞ্চ অনেক উঁচু হওয়ায় এটা আর সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে পঞ্চরস অপেরায় দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার দূরত্ব অনেকটা বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে নতুন মঞ্চ-বিধান ও উপস্থাপন ভঙ্গীর ভিন্নতার কারণেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রেশট্‌ তাঁর পরিকল্পিত এপিক থিয়েটারে বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন, বলেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, নাটক দেখার সময় দর্শককে সকল সময়েই এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে এটা নাটক, জীবন নয়। ফলে নাট্য ঘটনার সঙ্গে সে কখনোই আবেগগতভাবে সংযুক্ত হবে না। তাহ'লে সে নাট্য-

ঘটনাকে আপন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারবে। অর্থাৎ নাটকের আবেদন থাকবে দর্শকের বুদ্ধির কাছে, আবেগের কাছে নয়। নাটক দেখতে দেখতে দর্শক যাতে মায়া-বিভ্রান্তির শিকার না হয় সেই জন্যেই ব্রেশট্‌ নাট্যঘটনার নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি এবং আবেগের ঊর্দ্ধারোহনকে ভাঙবার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর প্রবর্ত্তিত এপিক থিয়েটারে ভি-ইফেক্টের প্রয়োগ করেন। ব্যবহারিকভাবে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এই যে নাটকের ঘটনায়, রূপ-সজ্জায়, মঞ্চে এবং অন্যান্য সমস্ত উপকরণেই বাস্তবের বিভ্রমকে নষ্ট করে নাটকটা যে নাটক সেটা প্রতিষ্ঠা করা। আলকাপের দর্শকের জন্য আলকাপের খলিফারাও অনুরূপে বাস্তব বিভ্রমের অবকাশ তেমন একটা রাখে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মুল আলকাপে নারীবেশী ছোকরা এবং কমেডিয়ান সাঙাল ছাড়া আর কেউই কোনোরূপ রূপ-সজ্জার ধার ধারত না। এমনকি দজ্জাল শাশুড়ির ভূমিকাভিনয় করত দোহার-কিদারদেরই কেউ। প্রয়োজনে গায়ের চাদরটি মাথায় দিয়ে সেই-ই উঠে দাঁড়ত। চাদরের একপ্রান্ত মাথায় দিয়ে সে ঘোমটা করে নিত এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে নিজের পোষাক যতটা সম্ভব ঢেকে নিত। বলাই বাহুল্য যে সে যখন ঝগড়ায় রত হত তখন তার ঘোমটার ফাঁক দিয়ে গোঁফটি দর্শকের দৃষ্টিগোচর হ'ত। দর্শকরা এসব ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দিত না। উপরন্তু শাশুড়ির ভূমিকা-ভিনয়ে তারা মুগ্ধ হ'ত। ফলে ঝগড়াটে সেই দজ্জাল শাশুড়ির হেনস্থায় সমস্ত আসরই হাসিতে ফেটে পড়ত। আসলে ধ'রে নিতে হয়, আর আলকাপের দর্শক তা পারেও। আর তা না হলে কে না জানে যে, যে লোকটা শাশুড়ির অভিনয় করছে সে মালদার ফুলবাড়ির রামচন্দ্র চাঁই মণ্ডল বা তাদেরই পরিচিত অন্য কোনো খলিফা। অর্থাৎ তথাকথিত যথাযথ ও বাস্তবের ওপর আলকাপের মজা কখনোই নির্ভর করেনি। তাই একটা করতালকে থালা বা অন্য কোনো ব্যাবহারিক বা ব্যবহার্য জিনিস ভেবে নিতে অসুবিধা হয় না আলকাপের দর্শকের। ফলে আলকাপের আসরে দর্শক বা অভিনেতাদের কেউ নীচু হয়ে পিঠ পাতলে সেই পিঠটাই তখন হয়ে ওঠে টেবিল। আর সেই টেবিলের উপর বেত রেখেই পাঠশালা চালু করে আলকাপের মাষ্টারমশায়। অর্থাৎ আলকাপের আসরে প্রতিমুহূর্তেই বাস্তবের খুদ ও কল্পনার অমৃত মিলে প্রস্তুত ও পরিবেশিত হয় আলকাপের পরমান্ন। ব্রেশটের নাট্যচিন্তা ও আলকাপ নাট্যরীতির বাস্তব-বিভ্রম বিরোধী নাট্য প্রয়োগের তুলনা করার উদ্দেশ্য কিন্তু এই নয় যে আলকাপ ও ব্রেশটের এপিক থিয়েটারের উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য একই। ব্রেশট যে ধরণের বৌদ্ধিক অভিনিবেশ এবং প্রতিক্রিয়া তাঁর দর্শকের কাছে প্রত্যাশা করেন, আলকাপের চাহিদাও হুবহু তাই এমন কথা বলাটা নিশ্চয়ই অতিসরলীকরণ এবং হাস্যকর। সঙ্গে সঙ্গে একথা বলাটা অযৌক্তিক হবে না যে উভয় নাট্যধারাই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে

চলে। আলকাপের চাঁচরে, ছড়ায় এবং পালায় সর্বত্রই বাস্তব সমাজ জীবন উপস্থাপিত এবং সমালোচিত হচ্ছে। এই সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই আলকাপিয়াদের নিজস্ব জীবনদর্শন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। আলকাপ ও গম্ভীরা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ওস্তাদ ঝাকসু বলেছিলেন—"আলকাপ হোল রগড়। হাসি, তামাসা, মেয়েছেলেদের কুচ্ছা। গম্ভীরা হচ্ছে রাষ্ট্র নিয়ে আর আলকাপ পরিবার নিয়ে"। ওস্তাদজী সম্ভবতঃ আলকাপকে পারিবারিক বিষয়াশ্রিত রঙ্গ-নাট্য হিসেবেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যাইহোক, তাঁর বক্তব্যের গভীরে গেলে যে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো এই যে আলকাপ জীবনের একান্ত প্রত্যক্ষ সমস্যা ও বিষয়কে নিয়েই গড়ে উঠেছে। কোনো সমস্যা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিস্তৃতিতে দেখলে সাধারনীকরণ জনিত কারণেই তা বিমূর্ত হয়ে ওঠে। গম্ভীরা যে অধিকমাত্রায় সাঙ্গীতিক এবং আলকাপ যে অধিকমাত্রায় নাট্যিক তার মর্মও সম্ভবতঃ এখানেই নিহিত।

মূল আলকাপ থেকেই এসেছে পঞ্চরসী আলকাপ। নাচ, গান, ছড়া, কাপ ও পালা—এই পাঁচটি উপাদান এতে আছে বলেই একে বলা হয়েছে পঞ্চরস। পঞ্চরস আলকাপের মূল বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে ক্ষুণ্ন করেছে—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই আলকাপ-শিল্পীরা নিজেদের মাধ্যমকে পঞ্চরস অপেরায় পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছে।

আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ওপরই বিশেষ কোনো লোকশিল্পের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দ্রুত দূর করছে। সঙ্গে সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে সিনেমা, টি. ভি. রেডিও ও খবরের কাগজের ব্যাপক প্রসার। মালদা বা মুর্শিদাবাদের একান্ত কোনো গণ্ডগ্রামও আজ আর এই ভুবনজোড়া নেট ওয়ার্কের বহির্ভূত নয়। এটা ভালো কি মন্দ সে প্রশ্নের নিরসন কোনো বড় ব্যাপার নয়। কেননা এটাই বাস্তব। এই বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কোনো লোকশিল্পকে বাইরের কোনোরূপ হিতৈষণা বা বদান্যতার প্রার্থী না হয়ে তার নিজস্ব দর্শক-পৃষ্ঠপোষণার শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঁচার লড়াই লড়তে হলে তাকে অবশ্যই নিত্য নতুন আয়ুধে নিজেকে উপযোগী মাত্রায় সমৃদ্ধ করে তুলতে হয়। প্রাচীন আলকাপের পঞ্চরস হয়ে ওঠার পেছনেও এরকম এক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল রয়েছে।

এসব সত্ত্বেও অনেকেই ছোকরার ভূমিকায় কিশোরের পরিবর্তে কিশোরী নামানোর সমালোচনা করেন। ঐতিহ্যের অপলাপ সমঝদার রসিককে আহত করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তো ভাবা দরকার যে রেড়ির তেলের স্বল্পালোকে নারীবেশিনী কিশোরকে দিয়ে ছলাকলাময়ী নারীর যে রূপ প্রতিষ্ঠা করা যায়, বিদ্যুতের তীব্র আলোয় আদৌ তা সম্ভব কি-না। আবার

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আগেকার আসরগুলির তুলনায় এখনকার আসরে দর্শক সমাগম বেশি হয়। নাট্যোপস্থাপনাকে তাদের সকলের কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে গেলে অপেক্ষাকৃত উঁচু মঞ্চের দরকার আছে কিনা—সেটাও অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। তাছাড়া সিনেমা, টিভি থেকে আজকের দর্শক অনেক বেশি উত্তেজক দৃশ্যের আস্বাদ পেয়েছে। ফলে এইসব আধুনিক সংস্কৃতি-মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের জন্য আজকের গ্রাম্য দর্শকের রুচিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। দর্শকের এই পরিবর্তিত রুচির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে আলকাপকেও তার নিজের গঠন কাঠামোয় বেশ কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়েছে। কেননা আলকাপ শিল্পীরা যদিও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, তবুও আলকাপই তাদের অন্যতম পেশা। আর সেই কারণেই সকল সময়ই তাদের দর্শক রুচি ও সামর্থ্যের কথা ভাবতে হয়েছে। তবুও এই ভাঙা এবং পরবর্তিত আলকাপ নিয়ে নানান বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। এই সব বিবিধ টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে আলকাপের বিশুদ্ধতা ও দর্শকরুচির মধ্যে সঙ্গত কোনো বোঝাপড়া হয়ত একদিন সম্ভব হয়ে উঠবে।

আলকাপ প্রধানত মেলা-নির্ভর। এখনও মালদা মুর্শিদাবাদের বড় কোনো মেলাই যেন ঠিক জমতে চায়না যদি না সেই মেলায় আলকাপের আসর বসে। এর মধ্যে শহর মালদার অনতিদূরে আমৃতির শিবরাত্রি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী মেলায় জিলার বিভিন্ন স্থানের নামী দামী সব আলকাপ দলগুলির যে আসর বসে তা খুবই বিখ্যাত। মেলাগুলিতে সাধারণত: আলকাপের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিযোগী দুটি দলের জন্যে মেলার নির্দিষ্ট স্থানে আলকাপের আসর পাতা থাকত মুখোমুখি। দুই আসরের মাঝখানে ঝোলানো থাকত মেডেল এবং কলা। একদলের গাওনা শেষ হলেই শুরু করত অন্যদল। বিজয়ী দল পেত মেডেল বিজিত অতএব কলা। অর্থাৎ ফল হাতে নাতে। ভালো গাওনার জন্যে পুরস্কার আর খারাপ গাওনার তিরস্কার। আলকাপের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের তামাশার দু'টি ফড়ের মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক প্রতিযোগিতার তুলনা করাটা তাই মোটেই অসঙ্গত নয়। যাইহোক, মেলায় আলকাপের একটি দলের পালা যখন মাঝপর্বে, অন্যদল তখন তাদের আসরে কনসার্ট শুরু করে। ফলে প্রথম দলটি তখন প্রাণপণে দর্শক টেনে রাখার চেষ্টা করে। অচিরেই জমে ওঠে লড়াই। একদলের পালার সঙ্গে অন্যদলের বৈঠকীর। যে আসরে দর্শক সংখ্যা অধিক, বিজয়ীর মেডেল তারাই ঘরে তোলে। মেলার এই লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে হারজিতের মধ্যে দিয়েই দলগুলির র‍্যাংকিং ঠিক হয়ে যায়। যাইহোক, আজকাল কিন্তু আলকাপ বা পঞ্চরসের আসরও বসে। বলাই বাহুল্য যে, সেগুলির জনপ্রিয়তাও কম নয়।

মালদা মুর্শিদাবাদের গ্রাম-গঞ্জের অধিকাংশ মেলার সংগঠক হলো

জুয়াড়িরা। মেলায় যাতে অধিক লোকসমাগম হয় তার জন্য তারা বেশ সচেষ্ট থাকে। কেননা, অধিক জনসমাগমে তাদের ব্যবসা বেশ জমে ওঠে। আর ঐ অঞ্চলে আলকাপ খুব জনপ্রিয় হওয়ায় ভালো ভালো নামী দলের আলকাপের বন্দোবস্ত করলে এই অধিক লোকসমাগমের ব্যাপারটি খুবই সহজসাধ্য এবং নিশ্চিত হয়ে যায়। ফলে আলকাপের নামী দলগুলিকে তারা আগে থাকতেই বায়না করে আসে। এসব তথ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে আলকাপের একবালের ছোকরা এবং বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আলকাপ সম্পর্কিত উপন্যাস মায়া মৃদঙ্গে। বিশেষ একটি লোকনাট্যকে আশ্রয় করে লেখা উন্নতমানের এমনতর উপন্যাস ভারতীয় সাহিত্যে দ্বিতীয় আর নেই বললেই চলে। এ প্রসংগে স্বরূপ সিংহের আলকাপ উপন্যাসখানিও উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চরসের দৌলতে আলকাপের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। ফলে এখন একরাত্রির গাওনার দক্ষিণা দল হিসেবে বারোশো টাকা থেকে দুহাজার তিন-হাজার টাকা অবধিও হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দলের মালিক এবং খলিফা বা সূত্রধার একই ব্যক্তি। তবে একেবারে ভিন্ন কোনো ব্যক্তিও দলের মালিক হতে পারে। যাইহোক, আলকাপের শিল্পীরা (এখন) সকলেই কিন্তু পেশাদার। ফলে দলকে পেশাদারি ভিত্তিতেই চালাতে হয়। শিল্পীদের অগ্রিম অর্থ দিয়ে চুক্তি করাতে হয়। একে বলা হয় 'দাদন' দেয়া।

আলকাপ সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন যে এটা শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষকদের মধ্যেই প্রচলিত। আবার আলকাপের স্থূল রসাধিক্য অনেক রুচিশীল চিত্তকে পীড়া দিয়েছে বলেও অভিযোগ আছে। কিন্তু আলকাপ যে শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ধনঞ্জয় চাঁই মণ্ডল ওরফে ঝাঁকসু, সুধীর দাস প্রমুখ বিখ্যাত হিন্দু (আলকাপ) ওস্তাদদের নাম থেকেই বোঝা যায়। অনেকে আবার আলকাপকে গম্ভীরার প্রতিবাদী হিসেবে উপস্থাপন করতে আগ্রহী। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, আলকাপ এবং গম্ভীরা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত এবং একই উৎস থেকে উপজাত (অথচ) দুই ভিন্ন লোকনাট্য আংগিক। আর রুচি বিকৃতির বা স্থূলতার অভিযোগ তো কেবলমাত্র আলকাপের বিরুদ্ধেই নেই, গম্ভীরার বিরুদ্ধেও আছে। গম্ভীরার বোলবাই বা বোলওয়াই খুবই অশ্লীল। আসলে আলকাপ এবং গম্ভীরার বিরুদ্ধে স্থূলতার অভিযোগ সমাজের হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের উচ্চ বর্ণের মানুষদের মধ্যে প্রথম থেকেই প্রচলিত ছিল। লোকসংস্কৃতির প্রতি এই অভিযোগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভেদ দ্বারাই পরিচালিত।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে আলকাপে আদিরসের বড়ই বাড়াবাড়ি এবং গম্ভীরায় স্থূল ভাঁড়ামোর। কিন্তু এ দুয়ের বিরুদ্ধে সমাজের উপরি মহলের

অভিযোগের আরো একটি কারণ আছে। আর তা হলো এই যে উভয়ই খুবই প্রত্যক্ষ ও খোলাখুলিভাবে সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরে এবং যথাযথভাবে আক্রমণও করে। এদের আক্রমণের ধারাটি অনেকটা সংবাদপত্রেরই অনুরূপ। অর্থাৎ যে অঞ্চলে আলকাপের আসর বসতে যাচ্ছে সেই এলাকার কোনো ঘটনা যা সম্প্রতি ঘটেছে—তাকেই বিষয় করে নেয়া হয়। স্থানীয় এবং তাৎক্ষণিক বিষয়ের এইসব প্রায় সরাসরি উপস্থাপন সমাজের হোমরা-চোমরাদের বিব্রত করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ আক্রমণের বর্শামুখটি থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরই দিকে ঘোরানো। অবশ্য সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনার্থে চটুল রঙ্গ তামাশা ও স্থূল ভাঁড়ামোর আশ্রয় নেয়া হত এবং এখনো হয়। ফলে সমাজের উপরের স্তরের মানুষ সরাসরিভাবে মাধ্যমটিকে আক্রমণ না করে এবং এদুয়ের ওপর তাদের বিরক্তির মূল কারণটিকে আড়াল ক'রে এদের অন্তর্বাহী স্থূলতাকেই আক্রমণ ক'রে থাকে। সমাজের উঁচু তলার মানুষের এই আক্রমণ উপেক্ষা করে আলকাপ তার নিজের মত করেই সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিতার সমালোচনা ক'রে থাকে। এইভাবে দীর্ঘদিন ধ'রে কঠিন এক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আলকাপ তার নিজের মত ক'রে গণনাট্যের আকাঙ্ক্ষিত সাংস্কৃতিক পার্লামেণ্ট বা আদালত হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলো এবং আজও নানান প্রতিকূল অবস্থায় আপন বৈশিষ্ট্যের অকেখানি বিসর্জন দিয়েও সে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

মালদহের গম্ভীরা

মালদহের গম্ভীরা অনেক দিন আগে থেকেই লোক সংস্কৃতির গবেষক এবং ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে আসছে। কিন্তু গম্ভীরা কেবলমাত্র জ্ঞান-চর্চার বিষয় হিসেবেই সীমিত হ'য়ে আসেনি। গম্ভীরা আজও মালদা জিলার অন্যতম লোক-শিল্প তথা জনপ্রিয় লোকনাট্য হিসেবে বহমান রয়েছে।

গম্ভীরা প্রধানতঃ তিন ধরনের, যথা—গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য, গম্ভীরার সঙ এবং গম্ভীরা গান। গম্ভীরা একই সঙ্গে ধর্ম-নিরপেক্ষ আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই অঙ্গ। তাই শিব উৎসব বা গাজনের বিশিষ্ট একটি অঙ্গ হিসেবেই মালদহে বহুকাল আগে থেকেই গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে।

প্রচলন রয়েছে গম্ভীরা শব্দের অর্থ নিয়েও নানা মতের। যেমন লোক-সংস্কৃতির অন্যতম গবেষক সুধীর কুমার চক্রবর্তীর মতে গম্ভীর শব্দের আপ

প্রত্যয়ান্ত উদ্ভব হ'লো গম্ভীরা। শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গ বিশেষ। গম্ভীর শব্দটিরও বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ হলো শিব। আর লোকায়ত অর্থ হলো বুদ্ধ। হীনযানীদের কাছে গম্ভীর হলেন সর্ব-বন্ধন-মুক্ত জ্ঞানী। আর মহাযানীরা বুদ্ধের অবলোকিতেশ্বর মূর্তিকে বলেন আনন্দ সুগম্ভীর অর্থাৎ অতলান্ত আনন্দযুক্ত কল্যাণ। আর এঁর আবাস-স্থল হলো গম্ভীরা অর্থাৎ মন্দির। রাঢ়ের লোক-সংস্কৃতি গম্ভীরার প্রথম গবেষক হরিদাস পালিত-এর মতে গম্ভীরা হলো শিব-মন্দির। আবার ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ মনে করেন গম্ভীরা হলো বাড়ির অন্তর্প্রকোষ্ঠ। আবার উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী রাজবংশীরা ধর্মঠাকুরের পুজো করত এবং এখনও করে। অতীতে এই ধর্মঠাকুরের পূজায় গামার কাঠের পিঁড়ি বা দোলা ব্যবহৃত হত। এই গামার কাঠ থেকেও গম্ভীরা শব্দটি আসতে পারে বলে মনে করাটা অযৌক্তিক নয়। কেননা শিব পূজা, ধর্ম পূজা, শূন্য পূজা এবং সূর্য পূজা কোনো না কোনো রূপে পরিবর্তিত সময়ে নামান্তরে কৃষি দেবতারই পূজা। গম্ভীরাও মূলত কৃষি দেবতার উৎসবের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে অবশ্য শিব উৎসব বা গাজনের সময় গড়ে তোলা অস্থায়ী (কোথাও কোথাও অবশ্য স্থায়ী) মন্দিরকে বলা হয় গম্ভীরা। আর এই গম্ভীরায় বা গম্ভীরাকে ঘিরে যে নৃত্য গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাই-ই গম্ভীরা নাচ বা গম্ভীরা গান নামে পরিচিত।

মালদহ জিলার প্রায় সর্বত্রই গম্ভীরা পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের অন্যান্য জিলার মত মালদহেও চৈত্র সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয় চড়ক। সাধারণতঃ চৈত্র-সংক্রান্তির আগের চারদিন ধরে গম্ভীরা পূজা ও উৎসব হয়। কিন্তু মালদহের সর্বত্রই কিন্তু একই সময়ে এই পূজা বা উৎসব হয় না। গম্ভীরার উৎসব কোন গ্রামে কোন সময়ে হবে তা বহুকাল আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত এখানকার বিভিন্ন গ্রামে গম্ভীরা উৎসব হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট দিন থেকে এ অনুমান করা যায় যে অতীতে কোনো এক সময়ে মালদহের সমাজপতিরা কোনো নির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা অনুসারেই এটা করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেটি ছিল শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং দল বাছাই-এর। তা না হলে হিন্দু পূজা পার্বণগুলি তো সর্বত্রই বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট তিথিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য মালদহের সমাজপতিদের সেই পরিকল্পনার সপক্ষে কোনো প্রামান্য তথ্য এখনো আমাদের হস্তগত হয় নি।

যাইহোক, চারদিন ধরে গম্ভীরার পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে হয় ঘটভরা, দ্বিতীয় দিনে ছোটো তামাশা তৃতীয় দিনে বড় তামাশা এবং চতুর্থ দিনে হয় আহারা বা বোলবাই।

প্রথম দিন অর্থাৎ ঘটভরার দিন প্রধান ভক্ত বা মূল সন্ন্যাসী তার সঙ্গীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে নিকটবর্তী কোনো জলাশয় থেকে ঘটে করে জল ভরে আনে। এদিন গম্ভীরার অন্য কোনো অনুষ্ঠান হয় না।

গম্ভীরা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে হয় ছোটো তামাশা। 'তামাশা'-র অর্থ রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকনাট্যের নামও তামাশা। আবার মহারাষ্ট্রের শিবভক্তদের মধ্যে গম্ভীরা নামের এক নৃত্য নাট্যের প্রচলন আছে এবং মহারাষ্ট্রের নাট্যোৎসবকে যাত্রা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এসব থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে সুদূর অতীতে বাংলাদেশের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক ছিলো। যাইহোক ছোটো তামাশার দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রধান ভক্ত বা মূল সন্ন্যাসী ঘট ও শিবের মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ায়। আর তার পশ্চাতে সারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় অন্যান্য ভক্তরা। এরপর প্রধান ভক্ত শিবের বন্দনা শুরু করে। এই সময়ে প্রত্যেককে একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। বন্দনার এক একটি অংশ শেষ হলে সকলকেই ঐ একপায়েই দু'বার লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার দু'বার লাফিয়ে পেছিয়ে পূর্বস্থানে ফিরে আসতে হয়। এই শিব-বন্দনাকে শিব গড়ার বন্দনাও বলা হয়ে থাকে। শিববন্দনার অনেকগুলি অংশ আছে। অংশগুলি যথাক্রমে (ক) আবাহন, (খ) সৃষ্টি প্রকরণ, (গ) শূন্যাকারে ধর্মস্থিতি, (ঘ) পৃথিবীর জন্ম কথা, (ঙ) দেহ ও মুণ্ডশুদ্ধি, (চ) মন্দির শুদ্ধি, (ছ) জীবসৃষ্টি, (জ) কাপিলা গমন, (ঝ) দেবগণের সমুদ্রমন্থন এবং আহৃত দ্রব্যাদির বণ্টন (ঞ) গম্ভীরা বন্দনা এবং (ট) দেবতার আহ্বান। বন্দনার এক একটি অংশ শেষ হলে সমবেত দর্শকমণ্ডলী "শিবনাথ কী মহেশ" বলে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এইভাবে শিবগড়ার বন্দনা শেষ হলে শিবের পূজা হয়। পূজা শেষে অনেক রাত্তিরে গম্ভীরা শিল্পীরা নাচ, গান ও মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করে।

গম্ভীরার তৃতীয় দিন হলো বড় তামাশার দিন। এই দিন দুপুরে সম্পন্ন হয় হর-গৌরীর পূজা। তারপর বিকেলে হয় সম্মিলিত ভক্তদের শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় ভূত-পেত্নী, বাজীকর, বাজীকর-স্ত্রী, সাঁওতাল প্রভৃতির সঙও থাকে। সঙ সহ শোভাযাত্রাটি এক পাড়ার মণ্ডপ থেকে অন্য পাড়ার গম্ভীরার মণ্ডপে ঘুরে বেড়ায়। শোভাযাত্রায় কোনো কোনো ভক্ত আবার বুক বা কোমরের দুপাশে ছোটো ছোটো দু'টি লোহার বাণ বিদ্ধ করে বাণের অগ্রভাগে তেল ভেজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। শোভাযাত্রায় ধুনো, কেরোসিন তেল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ এই জ্বলন্ত বাণে ছিটিয়ে দিয়ে বাণের আগুনের শিখাটি বাড়িয়ে চমৎকার সৃষ্টি করা হয়। তবে বর্তমানে বাণ-বিদ্ধ-করণের এই ব্যাপারটি আর সচরাচর দেখা যায় না। যাইহোক, শোভাযাত্রা শেষ হলে, সন্ধেবেলায়, হনুমানের মুখোশ পরা নর্তকের কাঁচা কলার পাতা দিয়ে তৈরী লম্বা লেজে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। তারপরে দুজন লোক একখানি কাপড় একটু উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে গেলে জ্বলন্ত লেজ নিয়ে হনুমান তখন লাফ দিয়ে একবার কাপড়টির ওপারে যায়, আবার এপারে আসতে থাকে। গম্ভীরার লোকধর্মী

অভিনয় মাধ্যমে এটি হনুমানের লঙ্কা দহনেরই পুনরাবৃত্তি বিশেষ। লঙ্কাদহনের পর হয় ফুলভাঙা। ফুলভাঙায় কাঁটাগাছ ও সিদ্ধিগাছের ডাল একত্র করে বুকে নিয়ে নৃত্য করতে থাকে, ঢাক ও কাঁসির বাজনার তালে তালে। এই নৃত্যে মুখ্যতঃ বাণ-ভক্তরাই অংশ নিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর নর্তকেরা ঐভাবে নাচতে নাচতেই গম্ভীরায় এসে পুরোহিতের কাছে ডালগুলি গচ্ছিত রাখে। পরে একটু রাত হলে শুরু হয় মুখোশ-নৃত্য। অন্যান্য নৃত্যের সঙ্গে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য করার চলও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থ দিনের প্রত্যুষে মশান নাচ দিয়ে শুরু হয় আহারা অনুষ্ঠান। কালী, চামুণ্ডা, বাঁশুলী প্রভৃতি মুখোশ পরে আলুলায়িতকেশে নর্তকরা এই নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্যের শেষে পুরোহিত ধুপ ধুনো জ্বেলে নর্তকের সামনে রেখে দেয়। নর্তক তখন এই ধোঁয়া গ্রহণ করে ভরগ্রস্ত হয়। কিছুক্ষণ ভরগ্রস্ত থাকার পর সে একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মশান নাচের শিল্পীদের অধিকাংশই মালো সম্প্রদায়ের লোক। মশান নাচের পর হয় পার্বতীর পূজা। হোমও হয়। এসবের পর ব্রাহ্মণ এবং কুমারীদের আহার করানো হয়। এই আহার থেকেই আহারা শব্দটি এসেছে বলে মনে হয়। কাঁচা বাঁশ ও কঞ্চিতে কলার মোচা, আম প্রভৃতি শস্য ঝুলিয়ে এসবের পূজা করা হয়। পূজার পরই শেষ হয় আহারা। এদিনও কোথাও কোথাও সঙের শোভাযাত্রা বের হয়। গানও হয়। কিন্তু মুখোশ নৃত্য আর হয় না। গম্ভীরা গানের গীতিকারকে বলে খলিফা এবং গানকে বলা হয় মোদ্দা। মোদ্দা বা মুদ্দা আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো সারবস্তু বা বিষয়বস্তু। এদিন বিকেলে শিবের চাস অভিনীত হয়। কেউ হাল চালায়, কেউ ধান বোনে, কেউবা আবার রোপন করে। এ অনুষ্ঠানটিও সর্বত্র আর দেখা যায় না। আগে এ দিনটিতে ব্যাপকহারে সামশোল ছাড়ার প্রচলন ছিল। বর্তমানে অনুষ্ঠানটির ব্যাপকতা কমে এসেছে। এই অনুষ্ঠানে সন্ধ্যাবেলায় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তা জল দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়। তারপর তার মধ্যে মাছ ছাড়া হয়। মাছ ছাড়ার পর ভক্তরা লাফিয়ে লাফিয়ে গর্তটি পারাপার করতে থাকে। আগে ঢেঁকী চুন্না নামক একটি অনুষ্ঠানেরও প্রচলন ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি আর দেখা যায় না। সামগ্রিকভাবে এই হলো গম্ভীরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গম্ভীরা পূজা ও উৎসবে গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের বিশেষ এক ভূমিকা রয়েছে। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের মুখোশ নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং এখনো আছে। পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ-নাচ ছাড়াও চট্টগ্রামে 'বিউ' উপলক্ষ্যে মুখা খেল বেশ জনপ্রিয়। এসব ছাড়াও ঢাকা জিলার বিক্রমপুরেও এক সময় কথাকলির মত গাঢ় রঙে মুখ এঁকে নাচের প্রচলন ছিল। পুরুলিয়ার ছৌ-এর সঙ্গে মালদহের গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের

প্রধান পার্থক্য হলো এই যে গম্ভীরা নৃত্য আজও গভীরভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গম্ভীরার মুখোশ সাধারণতঃ নিমকাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরী হয়। নিমকাঠের ওপর মাটির হালকা প্রলেপ দিয়ে তা শুকিয়ে তার ওপর প্রয়োজনীয় রঙ করা হয়। মুখোশগুলি পুরুষানুক্রমে নর্তকের গৃহে রক্ষিত থাকে। নর্তক সম্বৎসরই নিয়মিতভাবে মুখোশের পুজো করে থাকে। এসব ছাড়াও আগে নৃত্যের আগে শিবের পুজারী-দ্বারা মুখোশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রথা ছিল। বিশ্বাসের তীব্রতা এবং সময়ের অভাবে বর্তমানে মুখোশের এই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার রীতিটি প্রায় উঠেই গেছে। যাইহোক, উপাদানগত কারণে গম্ভীরার মুখোশ যে ছৌ-এর মুখোশ থেকে ওজনে অনেক ভারী—এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তাছাড়া স্থানীয় লোকবিশ্বাস মতে গম্ভীরার কোনো কোনো মুখোশ যেমন কালী, চামুণ্ডা এবং নারসিংহী খুবই জাগ্রত। গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের নর্তক সাধারণতঃ চোস্ত জাতীয় পাজামা এবং ফুলহাতা জামা গায়ে দেয়। পায়ে পরে ঘুঙুর, মুখোশ পরার আগে নর্তক চোখ ও নাকের অংশটি বাদ দিয়ে মুখমণ্ডলের বাকি অংশটি কাপড়ের পাতলা আচ্ছাদন দিয়ে আবৃত করে তার ওপর পরে মুখোশ। মুখোশটি দড়ি দিয়ে মাথার পেছন দিকে বাঁধা থাকে। কোনো কোনো নৃত্যে যেমন নারসিংহী প্রভৃতিতেও মুখোশের উপরের অংশে চামর বেঁধে নেয়ারও চল আছে।

মুখোশ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গতকারী বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢাক এবং কাঁসী বাজানো হয়।

যাইহোক, বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পৌরাণিক—বাণকালী, নারসিংহী, বাঁশুলী, গৃধিনী বিশাল, চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, ঝাঁটাকালী, মহিষাসুর মর্দিনী, কার্তিক, গণেশ, হনুমান, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ, শিবদুর্গা, হিরণ্যকশিপু বধ, তারকাসুর বধ, সাবিত্রী সত্যবান, সুধন্বা বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ প্রভৃতি।

(২) গ্রামীণ বা লোকায়ত—বক, গরুর দুধ দোহা, কলসী কাঁখে বধু, ট্যাপা, সাঁওতাল, মহিষ-রাখাল, চাষা-চাষী প্রভৃতি।

(৩) প্রাণী সম্পর্কিত—সর্প, ব্যঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, হনুমান প্রভৃতি।

(৪) সামাজিক—মাতাল, মেমসাহেব, বুড়োবুড়ি।

(৫) মিশ্র ও অন্যান্য—পইরী (পরী), বংশ, রণপা, শব, জাদুকর, ভুত-পেত্নী, ঢালী প্রভৃতি।

গম্ভীরা গান গম্ভীরা উৎসবেরই প্রধান অংশ। গম্ভীরা গান অবশ্য শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গেই আজ আর সংশ্লিষ্ট নেই। কেননা মালদহের সাধারণ মানুষের কাছে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই ধর্ম-নিরপেক্ষ লোকনাট্য হিসেবে গম্ভীরা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে গম্ভীরা উৎসবের সময়, উৎসবের চতুর্থ দিনে

যে গম্ভীরা মণ্ডপের সামনে আচ্ছাদিত চত্বরে বা উন্মুক্ত খোলা মাঠে পরিবেশিত হয় তার ধর্ম-সংশ্লিষ্টতা এখনো রয়ে গেছে। উৎসবের গম্ভীরাগানে মণ্ডপের দিকটি ছাড়া বাকি তিন দিকেই বসে দর্শক। দর্শক পরিবেষ্টিত ১৬ ফুট ব্যাসার্ধের গোলাকার ক্ষেত্রটুকুতেই গম্ভীরা গানের আসর বসে। স্বতন্ত্রভাবে কোনো উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হয় না। যাইহোক, আসর সংস্থান বা মঞ্চ ব্যবস্থার ব্যাপারে ধর্ম নিরপেক্ষ ও ধর্মীয় গম্ভীরার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে সেখানে কোনো মণ্ডপ না থাকায় দর্শক বসে আসরের চারদিক ঘিরেই। আসর থেকে একটু দূরে কোনো বাড়ির বারান্দা বা খোলা জায়গায় অস্থায়ীভাবে গ্রীনরুম তৈরী করে নেওয়া হয়। গ্রীনরুম থেকে আসরে যাতায়াত করার জন্যে একটি সরু রাস্তা থাকে। মধ্যে বৃত্তাকার (বা কোথাও কোথাও আয়তাকার) আসরের একপাশে বসে গায়ন-বায়ন। বর্তমানে গম্ভীরায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা এবং বাঁশির ব্যাপক প্রয়োগ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু গম্ভীরায় আগে কেবলমাত্র ঢোল ও কাঁসি প্রযুক্ত হ'ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আগে গম্ভীরা উৎসবের জন্য স্থায়ীভাবে গম্ভীরা বা গম্ভীরা-মণ্ডপ নির্মাণ করা হত। বর্তমানে স্থায়ী মণ্ডপ নির্মাণের চল উঠে গেছে। তবে প্রাচীন গম্ভীরা মণ্ডপ নির্মাণের নিদর্শন হিসেবে ইংরেজ বাজারের টিনের গম্ভীরা এবং আইহোর গম্ভীরা মণ্ডপ দুটি টিকে আছে। স্থাপত্যকর্ম ও নাট্যগৃহের অন্যান্য অনেক দিক থেকেই কেরালার কুত্তমপলম ও অসমের ভাওনা ঘরের সঙ্গে এই গম্ভীরার বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়।

গম্ভীরা পালাগান আবার কয়েকটি নির্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি হলো— মুখপাদ, বন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈতগান, চারইয়ারী, পালাবন্দী গান এবং খবর বা রিপোর্ট।

মুখপাদে পালার চরিত্ররা সকলে আসরে উঠে গান গেয়ে প্রত্যেকের পরিচয় জানিয়ে দেয়। মুখপাদের আবার দুটি অংশ, ধুয়া এবং চিতানি। ধুয়াতে থাকে আড়াই ফের গান আর চিতানিতে থাকে দুই ফের গান।

মুখপাদের পরে বন্দনা। বন্দনার প্রথমেই শিবের আবাহন করা হয়। শিব গম্ভীরার আসরে নানা হিসেবেই পরিচিত। বাঘছাল পরে ডমরু ও ত্রিশূল হাতে নিয়ে জটাজুটধারী নানা এবার মঞ্চে আসে। নানার উপস্থিতিতে মঞ্চোপরি চরিত্ররা সমবেতভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সুখ দুঃখের কথা উপস্থিত করে এবং নানা এসবের কোনো প্রতিকার করছেনা ব'লে অভিযোগও করে। এই অংশে অভিযোগকারীদের সঙ্গে শিবের বাদানুবাদ চলে মুখ্যত গানের সাহায্যে, তবে মাঝে মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্য সংলাপেরও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এখানে অনুযোগকারীরা দরিদ্র, পীড়িত এবং অসহায় জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। ফলে তাদের পরনে থাকে হাঁটুর ওপর অবধি গুটিয়ে পরা কম বহরের

ধুতি, গায়ে থাকে ছেঁড়া গেঞ্জি এবং মাথায় ও হাতের কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বাঁধা থাকে। আর মেকআপ বলতে কপালে চুনের একটি টিপ আর কখনো কখনো চোখের নীচে ভুষো কালি আর নানা ওরফে মহাদেব এখানে শাসক প্রধানেরই প্রতিনিধি। অনুযোগকারীদের সঙ্গে একজন ক্ষমতা লোভী শাসক প্রধানের মতই বাদানুবাদ করে নানা শেষে নিজের জনপ্রিয়তা, ও গদী হারানোর ভয়ে উত্থাপিত সমস্যাদি দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে তখনকার মত আসর থেকে ছাড়া পায়।

বন্দনার পর বিভিন্ন সব বিষয়বস্তুর ওপর গান পরিবেশিত হয়। তবে বিষয় দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যাদি--সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় যাই হোক না কেন দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার মত একজন লোক সকল সময়ে মঞ্চে উপস্থিত থাকে। সমবেত দর্শকবৃন্দের নানা আশা আকাঙ্ক্ষা তার মুখে ব্যক্ত হয়ে থাকে। গম্ভীরার জনপ্রিয়তার মূল কারণ এখানেই। পালাগানের আসরে বিষয়বস্তু অনুসারে চরিত্র আসরে উপস্থিত থাকে। ডুয়েট বা দ্বৈতগীতিতে বিষয় সীমাবদ্ধ দুজনের মধ্যে। দুই ইয়ারিতে দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলে, চার ইয়ারীতে চারজন ইয়ার বা বন্ধু উপস্থিত থাকে, উপস্থিত থাকে নানাও। গান এবং সংলাপের সাহায্যেই বিষয় উপস্থিত হয়ে থাকে। গম্ভীরায় গানগুলি পরিবেশিত লিখিত বা পূর্বরচিত বা আগে থেকে সংগৃহীত হলেও সংলাপ পাত্রপাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবেই তৈরী করে নেয়।

গম্ভীরার গানে মালদা জিলার সাধারণ মানুষের ভাষাই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে মালদা জিলাতে বিভিন্ন ধরণের মানুষ বসবাস করে। ফলে দৈনন্দিন জীবনে তারা যে ভাষার ব্যবহার করে তা সর্বৈব বাংলা ভাষার অনুসারী নয়। পার্শ্ববর্তী বিহারে প্রচলিত হিন্দী তথা ভোজপুরী মালদার অনেক অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কথ্য বুলিতে গভীর ছাপ ফেলেছে। এই মিশ্র বুলি গম্ভীরার গানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে গম্ভীরাতে নানা বা শিবকে সামনে রেখে জনসাধারণের নানান অভাব অভিযোগ তথা দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরা হয়। কিন্তু শিবকে আসরে সশরীরে উপস্থিত করে অভাব অভিযোগ দায়ের করার রীতিটা কিন্তু খুব বেশিদিন প্রচলিত হয় নি। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রখ্যাত গম্ভীরা গায়ক শেখ সুফাই এই রীতিটির প্রবর্তন করেন। গম্ভীরা গানের শেষ অংশটি হলো রিপোর্ট। এই অংশে খবরের কাগজের মত করে সমকালীন স্থানীয় ও আকর্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরা হয়।

গম্ভীরাগানের বিষয় থেকে বোঝা যায় যে সামাজিক বিষয়ই এতে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। গম্ভীরা এই সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে অনেক আগে থেকেই তাই মালদহের স্থানীয় এবং আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে ছিলো। মহামান্য বিনয় কুমার সরকারের উদ্যোগে এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই মালদহতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিলো। এই পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো মালদহের লোকশিল্প বিশেষত গম্ভীরার পুনরুজ্জীবন সাধন এবং লোকশিক্ষার্থে এর প্রয়োগ। আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে গম্ভীরার মত এক আঞ্চলিক লোক আঙ্গিকের যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে এই পরিষদের ভূমিকা একই সঙ্গে বিস্ময়কর এবং প্রশংসার্হ।

গম্ভীরা গানের শিল্পী আসলে গণশিল্পী, তার কবিও আসলে গণকবি। তাই গম্ভীরা গানে কি স্বাধীনতার আগে কি পরে সর্বদাই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই স্বাধীনতা লাভের আগে গম্ভীরা গানে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীন হবার আকুতি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনের দশকে তাই গম্ভীরার বিষয় হয়েছে জিতু সাঁওতাল ও তার অনুগামীদের দ্বারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত লড়াই। স্বাভাবিকভাবেই গম্ভীরা রাজরোষে পড়েছিলো এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন গম্ভীরা শিল্পী গোবিন্দ শেঠ, গোপীনাথ শেঠ, মটরবাবু এবং শেখ সোলেমান প্রমুখ। সে সময়ে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের আগে নানাবিধ সামাজিক সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক দাবী দাওয়াও প্রতিফলিত হয়েছিলো। গম্ভীরার এই ভূমিকায় খুশি হয়ে সুভাষচন্দ্র বসুও তাই গম্ভীরা ও গম্ভীরা শিল্পীদের উৎসাহিত করেছিলেন। আবার দেশ বিভাগের আগে ও পরে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গম্ভীরা শিল্পীরা আহত হয়েছে। তাদের সেই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাদের দাঙ্গা বিরোধী গানে। সম্মিলিত হিন্দু মুসলমানের বাসভূমি মালদাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে গম্ভীরা শিল্পীরা সর্বদাই তৎপর থেকেছে। গম্ভীরা পূজা-উৎসব ও গান খুবই প্রাচীন কিন্তু আধুনিক গম্ভীরা—যা মূলতঃ আঙ্গিকগত দিক থেকে নাট্যধর্মী এবং বিষয়গতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক তার উদ্ভব খুব বেশি দিনের নয়—এই শতাব্দীরই প্রথম দশকে। তবুও ইতিমধ্যেই তা বাংলা লোকনাট্যের ধারায় খুবই সজীব এবং সম্ভাবনাময় এক প্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নির্মল দাস ওরফে নিরুবাবু বর্তমানে গম্ভীরার সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী।

